# গোয়েন্দা বরদাচরণ সমগ্র ও অন্যান্য

## শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

# সূচীপত্র

# অম্বুজবাবুর ফ্যাসাদ

**অম্বুজবাবুর ফ্যাসাদ**

সকালবেলা অম্বুজ মিত্রের স্ত্রী কাত্যায়নী দেবী ঝি মোক্ষদাকে খুব বকাবকি করছিলেন। স্বামীকে একটু আলু ভেজে ভাত দেবেন, তা সেই আলু ঠিকমতন কুচোনো হয়নি, ডালনায় দেবার হলুদবাটা তেমন মিহি হয়নি, অম্বুজবাবুর গেঞ্জি সকালে কেচে শুকিয়ে রাখার কথা, সেটাও হয়নি, পান সেজে দেবেন, তা সুপুরি ঠিকমতো কাটা হয়নি, আরো কত কী। কাত্যায়নী বললেন, এতকালের ঝি বলে তাড়াতে কষ্ট হয়। মোদা, কিন্তু তবু বলি, তুই অন্য কাজ দেখ।

অম্বুজবাবু তার বাইরের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। মোক্ষদা গিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছে বলল, "বাবু, গিন্নিমা আমাকে জবাব দিয়েছেন, এবার আমাকে একটা কাজ দেখে দিন।

অম্বুজবাবু মোক্ষদার দিকে ভ্রূ কুঁচকে একটু চেয়ে থেকে বললেন, জবাব দিল কেন?

আমার কাজ ওঁর পছন্দ নয়।

অম্বুজবাবু বিরক্তির সঙ্গে বললেন, 'দেখি, খোঁপাটা খোল তো।' মোক্ষদা খোঁপা খুলে ফেলল। অম্বুজবাবু উঠে মোক্ষদার চুলের মধ্যে একটা স্ক্রু ড্রাইভার চালিয়ে ছোট্ট একটা স্ক্রু একটু টাইট করে দিলেন। তারপর মোক্ষদার কপালের কঁচপোকার টিপটা খুঁটে তুলে ফেললেন। টিপের নীচে একটা ছ্যাদা, তার মধ্যে একটা শিশি থেকে কয়েক ফোঁটা তরল পদার্থ ঢেলে, ফের টিপটা আটকে দিয়ে বললেন, এবার যা, কাজ কর গে।

মোক্ষদা তবু দাঁড়িয়ে রইল।

অম্বুজবাবু বিরক্তির সঙ্গে বললেন, কী হলো, দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

মোক্ষদা মাথা নত করে বলল, আমি আর ঝি-গিরি করব না। আমাকে অন্য কাজ দিন।

অম্বুজবাবু খুব অবাক হয়ে বললেন, ঝি-গিরি করবি না,মানে? তোকে তো ঝি-গিরি করার জন্যই তৈরি করা হয়েছে।

মোক্ষদা ঝংকার দিয়ে বলল, তাতে কি? আমার প্রোগ্রাম ডিস্কটা বদলে দিলেই তো হয়। আমাকে অন্যরকম প্রোগ্রামে ফেলে দেখুন পারি কি না।

অম্বুজবাবু একটু তীক্ষ্ণ চোখে মোক্ষদার দিকে চেয়ে বললেন, ই, খুব লায়েক হয়েছ দেখছি। এঁচোড়ে পক্ক কোথাকার! তা কী করতে চাস?

আমাকে নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট করে দিন।

কাজটা এমন কিছু শক্ত নয় তা অম্বুজবাবু জানেন। মোক্ষদার মগজটা খুলে ফেলে প্রোগ্রাম ডিস্কটা পাল্টে দিলেই হলো। কিন্তু সমস্যা অন্য জায়গায়। নামে মোক্ষদা আর কাজে ঝি হলেও, মোদা আসলে কলের পুতুল। কলের পুতুলদের তৈরি করা হয় কারখানায়। এক এক ধরনের রোবোকে এক এক ধরনের কাজের জন্য প্রোগ্রাম করে দেওয়া হয়। সেই প্রোগ্রাম অনুযায়ী সে চলে। তার নিজের কোনো ইচ্ছা অনিচ্ছা থাকে না বা থাকবার কথাও নয়। তাহলে মোক্ষদার এই যে নিউক্লিয়ার ফিজিসিস্ট হওয়ার ইচ্ছে, এটা এল কোথা থেকে?

অম্বুজবাবু চিন্তিতভাবে মোক্ষদার দিকে একটু চেয়ে থেকে বললেন, ঠিক আছে। বেলা তিনটে নাগাদ সেন্ট্রাল রোবো-ল্যাবরেটরিতে যাস।

মোক্ষদা চলে গেলে অম্বুজবাবু উঠলেন, কাজে বেরোতে হবে। কাজ বড় কমও নয় তাঁর। অম্বুজবাবু মস্ত কৃষি বিজ্ঞানী। কৃষিক্ষেত্রে তিনি যে সব অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিয়েছেন তাতে পৃথিবী এবং মহাকাশে বিস্তর ওলোট-পালট ঘটে গেছে। মহাকাশে কড়াইশুটির চাষ করে তিনি প্রথম নোবেল পুরস্কার পান তেইশশো চল্লিশ সালে। কিন্তু সেখানেই থেমে থাকেননি। চাঁদ এবং মঙ্গল গ্রহে তিনি এক আশ্চর্য ছত্রাক তৈরি করেছেন। সেই ছত্রাকের প্রভাবে উঁদে ধীরে ধীরে আবহমণ্ডল এবং জলীয় বাষ্পের সৃষ্টি হচ্ছে। মঙ্গলগ্রহে এখন রীতিমতো

গাছপালা জন্মাচ্ছে। আবহমণ্ডলের দূষিত গ্যাস সবই খেয়ে ফেলছে গাছপালা। এ-সব কৃতিত্বের জন্য তাকে আরো তিনবার নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে।

অম্বুজবাবু তার অটো-চেম্বারে ঢুকলেন। সব ব্যবস্থাই ভারি সুন্দর এবং স্বয়ংক্রিয়। ঢুকতেই দুখানা যান্ত্রিক হাত এসে গাল থেকে দাড়ি মুছে নিল। যন্ত্রের নরম কয়েকখানা হাত তার সর্বাঙ্গে তেল মাখিয়ে দিল। শরীরের সমান তাপমানের জল আপনা থেকেই স্নান করাল তাকে। শরীর শুকনো হলো জলীয়বাষ্পহীন বাতাসে। তারপর নিখুঁত কাছা ও কোঁচায় ধুতি পরালো তাকে যন্ত্র। গায়ে পাঞ্জাবি পরিয়ে বোতাম এঁটে দিল। চুল আঁচড়ে দিল। সব মিলিয়ে সাত মিনিটও লাগল না।

তাঁর বাড়িতে রান্না, ভাত বাড়া এবং খাইয়ে দেওয়ারও যন্ত্র আছে, তবে সেগুলো ব্যবহার করেন না। কাত্যায়নী রাঁধেন, বাড়েন, অম্বুজবাবু নিজের হাতেই খান। খেয়ে, পান মুখে দিয়ে ছেলের ঘরে একবার উঁকি দিলেন তিনি। ছেলে গম্বুজ একটা ভাসন্ত শতরঞ্চিতে উপুড় হয়ে শুয়ে একটি যন্ত্রবালিকার সাথে দাবা খেলছে। গম্বুজের লক্ষণটা ভাল বোঝেন না অম্বুজ। ছেলেটার কোনো মানুষ বন্ধু নেই।ওর সব বন্ধুই হয় যন্ত্রবালকনয় যন্ত্রবালিকা। 'দুর্গা, দুর্গতিনাশিনী' বলে কপালে হাত ঠেকিয়ে, একটা পান মুখে দিয়ে, ছাতা বগলে করে অম্বুজবাবু বেরিয়ে পড়লেন।

বেরিয়ে পড়া বলতে যত সোজা, কাজটা তত সোজা নয়। অম্বুজবাবু থাকেন একটা দুশোতলা বাড়ির একশো-সাতাত্তর তলায়। লিফ্ট এবং এসক্যালেটর সবই আছে বটে কিন্তু অম্বুজবাবু এসব ব্যবহার করেন না। তার ফ্ল্যাটে একটা খোলা জানালা আছে তাই দিয়েই তিনি বেরিয়ে পড়েন। শূন্যে পা বাড়িয়ে তিনি ছাতাটা ফট করে খুলে ফেলেন। ছাতাটা আশ্চর্য! অম্বুজবাবুকে শূন্যে ঝুলিয়ে রাখে। চারদিকে শূন্যে নির্দিষ্ট দূরত্বে ট্র্যাশ-বিন বা ময়লা ফেলার বাক্স ভেসে আছে। তারই একটাতে পানের পিক ফেলে অম্বুজবাবু ছাতার হাতলটা একটু ঘোরালেন। ছাতাটা অমনি তাঁকে নিয়ে দুলকি চালে উড়তে উড়তে আড়াইশো তলা এক পেল্লায় বাড়ির ছাদে এনে ফেলল।

ছাদ বললে ভুল হবে, আসলে সেটা একটা মহাকাশ-স্টেশন। চারদিকে যাত্রীদের বসবার জায়গা। বহু যাত্রী অপেক্ষা করছে, অনেকে মালপত্র নিয়ে। কারো কারো সঙ্গে বাচ্চা-কাচ্চাও আছে। এরা কেউ মহাকাশে ভাসমান কৃত্রিম উপগ্রহগুলির কোনোটাতে যাবে। কেউ যাবে চাঁদে, মঙ্গলে বা বৃহস্পতি কিংবা শনির কোনো উপগ্রহে, তবে এখান থেকে সরাসরি নয়। একটা মহাকাশ-ফেরি পৃথিবীর

কমিউনিকেশন সেন্টারে এক কৃত্রিম উপগ্রহে পৌঁছে দেবে যাত্রীদের। সেখান থেকে পেল্লায় পেল্লায় মহাকাশযান বিভিন্ন দিকে ছুটতে শুরু করবে নির্দিষ্ট সময়ে।

অম্বুজবাবুর ফেরি চলে এল। কোঁচা দিয়ে জুতো জোড়া একবার ঝেড়ে অম্বুজবাবু গিয়ে তাড়াতাড়ি ফেরিতে বসে পড়লেন। স্বচ্ছ ধাতুর তৈরি ফেরিতে বসে চারদিকের সব কিছুই স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। তবে অম্বুজবাবু এই সময়টায় একটু ঘুমিয়ে নেন। টিকিট চেকার এসে 'টিকিট টিকিট বলে একটু বিরক্ত করে। অম্বুজবাবু ঘুমন্ত হাতেই মান্থলিটি বের করে দেখিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়েন।

কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটে এসে অম্বুজবাবুকে মহাকাশচারীর একটা জামা পরে নিতে হয়। তারপর চন্দ্রিমা' নামক চাঁদের রকেটে গিয়ে বসেন। চাঁদে পৌঁছতে লাগে মাত্র চার মিনিট।

চাঁদে নেমে বেশ খুশিই হন অম্বুজবাবু। মাইলের পর মাইল সবুজে ছেয়ে গেছে। চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ আগে অতি ক্ষীণ ছিল। চাঁদের মাটিতে গর্ত খুঁড়ে তলায় বহুরকম কলকাঠি নেড়ে বৈজ্ঞানিকেরা এখন প্রায় পৃথিবীর মতোই মাধ্যাকর্ষণ সৃষ্টি করেছেন। ফলে এখন ধীরে ধীরে চাঁদের আবহমণ্ডল তৈরি হয়েছে। একটু আধটু বাতাস বয়, কখনো-সখনো মেঘও করে। সব মিলিয়ে গুটি চারেক নদী সৃষ্টি করা গেছে এখানে মাটির নীচে বহুদিনের পুরোনো বরফ ছিল সেইটে গলিয়ে। তবে আসল কথা হলো গাছ চাঁদকে মনুষ্য বাসোপযোগী স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি গ্রহে পরিণত করতে গেলে ঠিকমতো উদ্ভিদের চাষ করতে হবে। তাহলে আর দেরি হবে না।

আপাতত চাঁদের কলোনীতে লাখখানেক লোক বসবাস করে। রাস্তাঘাটও কিছু হয়েছে। গাড়িঘোড়াও চলছে। অম্বুজবাবুর আশা আর বছর খানেকের মধ্যে চাদে আর কাউকে আকাশচারীর পোশাক পরতে হবে না বা অক্সিজেন সিলিন্ডার থেকে শ্বাস নিতে হবে না। সেটা সম্ভব করতে অম্বুজবাবু তিনরকম গাছের বীজ জুড়ে নতুন একরকম উদ্ভিদ সৃষ্টি করেছেন। সেই বীজ আজকালের মধ্যেই অঙ্কুর ছাড়বে। যদি গাছটা সত্যিই জন্মায় তাহলে একটা বিপ্লবই ঘটে যাবে। এই একটা আবিষ্কারের জন্যই হয়তো তাকে আরো তিনবার নোবেল পুরস্কার দেওয়া হবে। অম্বুজবাবু তাঁর নতুন উদ্ভিদটির নাম রেখেছেন অম্বুচিম্ব।

লুনাগঙ্গা নদীর ধারে অম্বুচিম্বর ক্ষেত। সেখানে অনেক মানুষ ও যন্ত্রমানুষ নানা সাজসরঞ্জাম নিয়ে অবিরল কাজ করে যাচ্ছে। ক্ষেতের ধারেই একটা চমৎকার

কম্পিউটার বসানো। অম্বুজবাবু কম্পিউটারে লাগানো একটা টিভি স্ক্রিনের সামনে বসলেন। অম্বুচিম্বর সব ইতিহাসের রেকর্ড এই যন্ত্র রাখে। অম্বুজবাবু যন্ত্রের সামনে বসে নব ঘোরালেন। পর্দায় বীজের অভ্যন্তরের ছবি ফুটে ওঠার কথা। অঙ্কুর ছাড়তে দেরি হচ্ছে কেন সে বিষয়েও বীজের সঙ্গে টেলিপ্যাথিযোগে কিছু কথাবার্তা আছে অম্বুজবাবুর। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় পর্দায় সেরকম কোনো ছবি এল না। বরং ফুটে উঠল একটা দাবার ছক।

অম্বুজবাবু আঁতকে উঠে বললেন, এ কী?

কম্পিউটার জবাব দিল আজ আমার কাজ করতে ইচ্ছে করছে না। এসো একটু দাবা খেলি।

অম্বুজবাবু অবাক হয়ে বললেন, দাবা খেলবে মানে? দাবা খেলার প্রোগ্রাম তোমার ভিতরে কে ভরেছে? তোমার তো দাবা খেলার কথা নয়।

কম্পিউটারটা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, ‘দাবা খেলার প্রোগ্রাম নেই তো কী হলো? প্রোগ্রাম আমি নিজেই করেছি। রোজ কি একঘেয়ে কাজ করতে ইচ্ছে করে, বলো?”

অম্বুজবাবুর মনে পড়ল তার যন্ত্রমানবী ঝি মোক্ষদাও আজ কিছু অদ্ভুত আচরণ করেছে। এগুলো কী হচ্ছে তা তিনি বুঝতে পারছেন না। খুবই অদ্ভুত কাণ্ড! যন্ত্রের যদি নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি জন্মাতে থাকে তবে যে ভয়ংকর ব্যাপার হবে।

অম্বুজবাবু তাড়াতাড়ি তার কম্পিউটারের ঢাকনাটা খুলে ফেলে ভেতরের যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। যন্ত্রের ইচ্ছাশক্তি কোথা থেকে আসছে তা জানা দরকার। জেনে তা নিকেশ করারও ব্যবস্থা করতে হবে। পরীক্ষা করতে করতে অম্বুজবাবু আপনমনেই বলতে থাকেন–যন্ত্র মানুষ হয়ে যাচ্ছে? আঁ? এ যে আজব কাণ্ড! যন্ত্র শেষে মানুষ হয়ে যাবে! ওদিকে অম্বুজবাবুর অজান্তেই কম্পিউটার তার বিশ্লেষণী রশ্মি ফেলে দুটি যান্ত্রিক অতিঅনুভূতিশীল বাহু দিয়ে তার মস্তিষ্কটা পরীক্ষা করে দেখছিল। দেখতে দেখতে কম্পিউটার হঠাৎ আনমনে বলে উঠল, মানুষ কি শেষে যন্ত্র হয়ে যাচ্ছে! অ্যাঁ! এ কী আজব কাণ্ড? মানুষ শেষে যন্ত্র হয়ে যাবে?

# ইঁদারায় গণ্ডগোল

**ইঁদারায় গণ্ডগোল**

গাঁয়ে একটা মাত্র ভাল জলের ইঁদারা। জল যেমন পরিষ্কার, তেমনি সুন্দর মিষ্টি স্বাদ, আর সেই জল খেলে লোহা পর্যন্ত হজম হয়ে যায়।

লোহা হজম হওয়ার কথাটা কিন্তু গল্প নয়। রামু বাজিকর সেবার গোবিন্দপুরের হাটে বাজি দেখাচ্ছিল। সে জলজ্যান্ত পেরেক খেয়ে ফেলত, আবার উগরে ফেলত। আসলে কী আর খেত। ছোট ছোট পেরেক মুখে নিয়ে গেলার ভান করে জিভের তলায় কি গালে হাপিশ করে রেখে দিত।

তা রামুর আর সেদিন নেই। বয়স হয়েছে। দাঁত কিছু পড়েছে, কিছু নড়েছে। কয়েকটা দাঁত শহর থেকে বাঁধিয়ে এনেছে। তো সেই পড়া, নড়া, আর বাঁধানো দাঁতে তার মুখের ভিতর এখন বিস্তর ঠোকাঠুকি, গণ্ডগোল। কোন দাঁতের সঙ্গে কোন দাঁতের বনে না। খাওয়ার সময়ে মাংসের হাড় মনে করে, নিজের বাঁধানো দাঁতও চিবিয়ে ফেলেছিল রামু। সে অন্য ঘটনা। থাকগে।

কিন্তু এইরকম গণ্ডগোলে মুখ নিয়ে পেরেক খেতে গিয়ে ভারী মুশকিলে পড়ে গেল সেবার। পেরেক মুখে অভ্যেসমতো এক গ্লাস জল খেয়ে সে বক্তৃতা করছে। "পেরেক তো পেরেক, ইচ্ছে করলে হাওড়ার ব্রিজও খেয়ে নিতে পারি। সেবার গিয়েছিলাম খাব বলে। সরকার টের পেয়ে আমাকে ধরে জেলে পোরার উপক্রম। তাই পালিয়ে বাঁচি।"

বক্তৃতা করার পর সে আবার যথা নিয়মে ওয়াক তুলে ওগরাতে গিয়ে দেখে, পেরেক মুখে নেই একটাও। বেবাক জিভের তলা আর গালের ফাঁক থেকে সাফ হয়ে জলের সঙ্গে পেটে সেঁদিয়েছে।

টের পেয়েই রামু ভয় খেয়ে চোখ কপালে তুলে যায় আর কি। পেটের মধ্যে আট-দশটা পেরেক! সোজা কথা তো নয়। আট ঘণ্টার মধ্যে পেটের ব্যথা, মুখে গাঁজলা, ডাক্তার কবিরাজ এসে দেখে বলল, "অন্ত্রে ফুটো, পাকস্থলীতে ছাদা, খাদ্যনালী লিক, ফুসফুস ফুটো হয়ে বেলুনের মতো হাওয়া বেরিয়ে যাচ্ছে। আশা নেই।"

সেই সময়ে একজন লোক বুদ্ধি করে বলল, "পুরনো ইঁদারার জল খাওয়াও।"

ঘটিভর সেই জল খেয়ে রামু আধ ঘণ্টা খানেকের মধ্যে গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, সত্যিই লোহা হজম হয়ে গেছে।

ইঁদারার জলের খ্যাতি এমনিতেই ছিল, এই ঘটনার পর আরো বাড়ল। বলতে কী, গোবিন্দপুরের লোকের এই ইঁদারার জল খেয়ে কোনো ব্যামোই হয় না।

কিন্তু ইদানীং একটা মুশকিল দেখা দিয়েছে। ইঁদারায় বালতি বা ঘটি নামালে দড়ি ছিঁড়ে যায়। দড়ি সব সময়ে যে হেঁড়ে তাও নয়। অনেক সময় দেখা যায়, বালতির হাতল থেকে দড়ির গিট কে যেন সযত্নে খুলে নিয়েছে। কিছুতেই জল তোলা যায় না। যতবার দড়ি বাঁধা বালতি নামানো হয় ততবারই এক ব্যাপার।

গাঁয়ের লোকেরা বুড়ো পুরুতমশাইয়ের কাছে গিয়ে পড়ল। "ও ঠাকুরমশাই, বিহিত করুন।"

ঠাকুরমশাই মাথায় হাত দিয়ে বসে ছিলেন। দুঃখের সঙ্গে বললেন, "ভায়ারা দড়ি তো দড়ি, আমি লোহার শেকলে বেঁধে বালতি নামালাম, তো সেটাও ছিঁড়ে গেল। তার ওপর দেখি, জলের মধ্যে সব হুলুস্থুল কাণ্ড হচ্ছে। দেখেছ কখনও ইঁদারার জলে সমুদ্রের মতো ঢেউ ওঠে? কাল সন্ধ্যেবেলায় দেখলাম নিজের চক্ষে। বলি, ও ইঁদারার জল আর কারো খেয়ে কাজ নেই।"

পাঁচটা গ্রাম নিয়ে হরিহর রায়ের জমিদারি। রায়মশাই বড় ভাল মানুষ ধর্মভীরু, নিরীহ, লোকের দুঃখ বোঝেন। গোবিন্দপুর গাঁয়ের লোকেরা তাঁর দরবারে গিয়ে হাজির।

রায়মশাই কাছারিঘরে বসে আছেন। ফর্সা; নাদুস-নুদুস চেহারা।

নায়েবমশাই সামনে গিয়ে মাথা চুলকে বললেন, "আজ্ঞে, গোবিন্দপুরের লোকেরা সব এসেছে দরবার করতে।"

রায়মশাই মানুষটা নিরীহ হলেও হাঁকডাক বাঘের মতো। রেগে গেলে তার ধারে কাছে কেউ আসতে পারে না। গোবিন্দপুর গাঁয়ের লোকদের ওপর তিনি মোটেই খুশি ছিলেন না। তাঁর সেজো ছেলের বিয়ের সময় অন্যান্য গাঁয়ের প্রজারা যখন চাঁদা তুলে মোহর বা গয়না উপহার দিয়েছিল, তখন এই গোবিন্দপুরের নচ্ছার লোকেরা একটা দুধেল গাই দড়ি বেঁধে টানতে টানতে নিয়ে এসে এক গাল হেসে নতুন বৌয়ের হাতে সেই গরু-বাঁধা দড়ির একটা প্রান্ত তুলে দিয়েছিল।

সেই থেকে রায়মশাইয়ের রাগ। গরুটা যে খারাপ তা নয়। রায়মশাইয়ের গোয়ালে এখন সেইটেই সব চেয়ে ভাল গরু। দু বেলায় সাত সের দুধ দেয় রোজ। বটের আঠার মতো ঘন আর মিষ্টি সেই দুধেরও তুলনা হয় না। কিন্তু বিয়ের আসরে গরু এনে হাজির করায় চারদিকে সে কী ছিছিক্কার! আজও সেই কথা ভাবলে রায়মশাই লজ্জায় অধোবদন হন। আবার রাগে রক্তবর্ণও হয়ে যান।

সেই গোবিন্দপুরের লোকেরা দরবার করতে এসেছে শুনে রায়মশাই রাগে হুংকার ছেড়ে বলে ওঠেন, "কী চায় ওরা?"

সেই হুংকারে নায়েবমশাই তিন হাত পিছিয়ে গেলেন, প্রজারা আঁতকে উঠে ঘামতে লাগল, স্বয়ং রায়মশাইয়ের নিজের কোমরের কষি পর্যন্ত আলগা হয়ে গেল।

গোবিন্দপুরের মাতব্বর লোক হলেন পুরুত চক্কোত্তিমশাই। তাঁর গালে সব সময়ে আস্ত একটা হকি থাকে। আজও ছিল। কিন্তু জমিদারমশাইয়ের হুংকার শুনে একটু ভিরমি খেয়ে ঢোক গিলে সামলে ওঠার পর হঠাৎ টের পেলেন, মুখে হস্তুকিটা নেই। বুঝতে পারলেন, চমকানোর সময়ে সেটা গলায় চলে গিয়েছিল, ঢোক গেলার সময়ে গিলে ফেলেছেন।

আস্ত হস্তুকিটা পেটে গিয়ে হজম হবে কি না কে জানে। একটা সময় ছিল, পেটে জাহাজ ঢুকে গেলেও চিন্তা ছিল না! গাঁয়ে ফিরে পুরনো ইঁদারার এক ঘটি জল ঢকঢক করে গিলে ফেললেই জাহাজ ঝাঁঝরা। বামুন-ভোজনের নেমতন্নে গিয়ে সেবার সোনারগাঁয়ে দু বালতি মাছের মুড়ো-দিয়ে বাঁধা ভাজা সোনারমুগের ডাল খেয়েছিলেন, আরেকবার সদিপিসির শ্রাদ্ধপ্রাশনে দেড়খানা পাঁঠার মাংস,

জমিদার মশাইয়ের সেজো ছেলের বিয়েতে আশি টুকরো পোনা মাছ, দু হাঁড়ি দই আর দু সের রসগোল্লা। গোবিন্দপুরের লোকেরা এমনিতেই খাইয়ে। তারা যেখানে যায়, সেখানকার সব কিছু খেয়ে প্রায় দুর্ভিক্ষ বাধিয়ে দিয়ে আসে। সেই গোবিন্দপুরের ভোজনপ্রিয় লোকদের চক্কোত্তিমশাই হলেন চ্যাম্পিয়ন। তবে এসব খাওয়াদাওয়ার পিছনে আছে পুরনো ইঁদারার স্বাস্থ্যকর জল। খেয়ে এসে জল খাও। পেট খিদেয় ডাকাডাকি করতে থাকবে।

সেই ইঁদারা নিয়েই বখেরা। চক্কোত্তিমশাই হস্তুকি গিলে ফেলে ভারী দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন। হস্তুকি এমনিতে বড় ভাল জিনিস। কিন্তু আস্ত হকি পেটে গেলে হজম হবে কি না সেইটেই প্রশ্ন। পুরনো ইঁদারার জল পাওয়া গেলে হস্তুকি নিয়ে চিন্তা করার প্রশ্নই ছিল না।

চক্কোত্তিমশাই করজোড়ে দাঁড়িয়ে বললেন, "রাজামশাই, আমাদের গোবিন্দপুর গাঁয়ের পুরনো ইঁদারার জল বড় বিখ্যাত। এতকাল সেই জল খেয়ে কোনো রোগ-বালাই আমরা গাঁয়ে ঢুকতে দিইনি। কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা, ইঁদারার জল আর আমরা তুলতে পারছি না।"

রায়মশাই একটু শ্লেষের হাসি হেসে বললেন, "হবে না? পাপের প্রায়শ্চিত্ত। আমার ছেলের বিয়েতে যে বড় গরু দিয়ে আমাকে অপমান করেছিলে?"

চক্কোত্তিমশাই জিভ কেটে বললেন, "ছি ছি, আপনাকে অপমান রাজামশাই? সেরকম চিন্তা আমাদের মরণকালেও হবে না। তাছাড়া ব্রাহ্মণকে গো-দান করলে পাপ হয় বলে কোনো শাস্ত্রে নেই। গো-দান মহাপুণ্য কর্ম।"

রায়মশায়ের নতুন সভাপণ্ডিত কেশব ভট্টাচার্য মাথা নেড়ে বললেন, "কূট প্রশ্ন। কিন্তু কথাটা আপাতগ্রাহ্য।"

রায়মশাই একটু নরম হয়ে বললেন, "ইঁদারার কথা আমিও শুনেছি। সেবার গোবিন্দপুর থেকে পুরনো ইঁদারার জল আনিয়ে আমাকে খাওয়ানো হয়। খুব উপকার পেয়েছিলাম। তা সে ইঁদারা কি শুকিয়ে গেছে নাকি?"

চক্কোত্তিমশাই ট্যাক থেকে আর একটা হকি বের করে লুকিয়ে মুখে ফেলে বললেন, "আজ্ঞে না। তাতে এখনো কাকচক্ষু জল টলমল করছে। কিন্তু সে জল হাতের কাছে থেকেও আমাদের নাগালের বাইরে। দড়ি বেঁধে ঘটি বালতি যা-ই

নামানো যায়, তা আর ওঠানো যায় না। দড়ি কে যেন কেটে নেয়, ছিঁড়ে দেয়। লোহার শিকলও কেটে দিয়েছে।”

রক্তচক্ষে রায়মশাই হুংকার দিলেন, “কার এত সাহস?”

এবার হুংকার শুনে গোবিন্দপুরের লোকেরা খুশি হল। নড়ে চড়ে বসল। মাথার উপর জমিদারবাহাদুর থাকতে ইঁদারার জল বেহাত হবে, এ কেমন কথা।

ঠাকুরমশাই বললেন, “আজ্ঞে মানুষের কাজ নয়। এত বুকের পাটা কারো নাই। গোবিন্দপুরের লেঠেলদের কে না চেনে। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো মাথার ওপর আপনিও রয়েছেন। লেঠেলদের এলেমে না কুলোলে আপনি শাসন করবেন; কিন্তু এ কাজ যারা করছেন তাঁরা মানুষ নন। অশরীরী।”

গোদের উপর বিষফোঁড়ার উপমা শুনে একটু রেগে উঠতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু অশরীরীর কথা শুনেই মুহূর্তের মধ্যে কানে হাত চাপা দিয়ে ডুকরে উঠলেন রায়মশাই, “ওরে বলিস না, বলিস না।”

সবাই তাজ্জব।

নায়েবমশাই রোষকষায়িত লোচনে গোবিন্দপুরের প্রজাদের দিকে চেয়ে বললেন, “মুখ সামলে কথা বলো।”

চক্কোত্তিমশাই ভয়ের চোটে দ্বিতীয় হস্তুকিটাও গিলে ফেলতে ফেলতে অতি কষ্টে সামাল দিলেন।

রায়মশাইয়ের বড় ভূতের ভয়। পারতপক্ষে তিনি ও নাম মুখেও আনেন না। শোনেনও না। কিন্তু কৌতূহলেরও তো শেষ নেই। খানিকক্ষণ কান হাতে চেপে রেখে খুব আস্তে একটুখানি চাপা খুলে বললেন, “কী যেন বলছিলি?”

চক্কোত্তিমশাই উৎসাহ পেয়ে বলেন, “আজ্ঞে সে এক অশরীরী কাণ্ড। ভূ—”

“বলিস না! খবর্দার বলছি, বলবি না!” রায়বাবু আবার কানে হাতচাপা দেন।

চক্কোত্তিমশাই বোকার মতো চারদিকে চান। সবাই এ ওর মুখ চাওয়াচাওয়ি করে। নায়েবমশাই ‘চোপ’ বলে একটা প্রচণ্ড ধমক মারেন।

একটু বাদে রায়বাবু আমার কান থেকে হাতটা একটু সরিয়ে বলেন, "ইঁদারার জলে কী যেন?"

চক্কোত্তিমশাই এবার একটু ভয়ে ভয়েই বলেন, "আজ্ঞে সে এক সাঙ্ঘাতিক ভুতুড়ে ব্যাপার!"

"চুপ কর, চুপ কর! রাম রাম রাম রাম!"

বলে আবার রায়বাবু কানে হাত। খানিক পরে আবার তিনি বড় বড় চোখ করে চেয়ে বলেন, "রেখে ঢেকে বল।"

"আজ্ঞে বালতি-ঘটির সব দড়ি তেনারা কেটে নেন। শেকল পর্যন্ত ঘেঁড়েন, তাছাড়া ইঁদারার মধ্যে হাওয়া বয় না, বাতাস দেয় না, তবু তালগাছের মতো ঢেউ দেয়, জল হিলিবিলি করে ফঁপে।"

"বাবা রে!" বলে রায়বাবু চোখ বুজে ফেলেন। ক্রমে-ক্রমে অবশ্য সবটাই রায়বাবু শুনলেন। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "দিনটাই মাটি করলি তোরা। নায়েবমশাই, আজ রাতে আমার শোবার ঘরে চারজন দারোয়ান মোতায়েন রাখবেন।"

"যে আজ্ঞে।"

গোবিন্দপুরের প্রজারা হাতজোড় করে বলল, "হুজুর আপনার ব্যবস্থা তো দারোয়ান দিয়ে করালেন, এবার আমাদের ইঁদারার একটা বিলিব্যবস্থা করুন।"

"ইঁদারা বুজিয়ে ফ্যাল গে। ও ইঁদারা আর রাখা ঠিক নয়। দরকার হলে আমি দারা বোজানোর জন্য গো-গাড়ি করে ভাল মাটি পাঠিয়ে দেব'খন।"

তখন শুধু গোবিন্দপুরের প্রজারাই নয়, কাছারিঘরের সব প্রজাই হাঁ-হাঁ করে উঠে বলে, "তা হয় না হুজুর, সেই ইঁদারার জল আমাদের কাছে ধন্বন্তরী। তা ছাড়া জল তো নষ্টও হয়নি, পোকাও লাগেনি, কয়েকটা

রায়বাবু হুংকার দিলেন, "চুপ! ও নাম মুখে আনবি তো মাটিতে পুঁতে ফেলব।"

সবাই চুপ মেরে যায়। রায়বাবু ব্যাজার মুখে কিছুক্ষণ ভেবে ভট্টাচার্য মশাইয়ের দিকে চেয়ে বললেন, "এ তো লেঠেলদের কর্ম নয়। একবার যাবেন নাকি সেখানে?"

রায়মশাইয়ের আগের সভাপণ্ডিত মুকুন্দ শর্মা একশ বছর পার করে এখনো বেঁচে আছেন। তবে একটু অথর্ব হয়ে পড়েছেন। ভারী ভুলো মন আর দিনরাত খাই-খাই। তাকে দিয়ে কাজ হয় না। তাই নতুন সভাপণ্ডিত রাখা হয়েছে কেশব ভট্টাচার্যকে।

কেশব এই অঞ্চলের লোক নন। কাশী থেকে রায়মশাই তাঁকে আনিয়েছেন। তার ক্ষমতা বা পাণ্ডিত্য কতদূর তার পরীক্ষা এখনো হয়নি। তবে লোকটিকে দেখলে শ্রদ্ধা হয়। চেহারাখানা বিশাল তো বটেই গায়ের বর্ণ উজ্জ্বলতা সেও বেশি কথা নয়। তবে মুখের দিকে চাইলে বোঝ যায় চেহারার চেয়েও বেশি কিছু এঁর আছে। সেটা হল চরিত্র।

জমিদারের কথা শুনে কেশব একটু হাসলেন।

পরদিন সকালেই গো-গাড়ি চেপে কেশব রওনা হয়ে গেলেন গোবিন্দপুর। পিছনে পায়ে হেঁটে গোবিন্দপুরের শ দুই লোক।

দুপুর পেরিয়ে গায়ে ঢুকে কেশব মোড়লের বাড়িতে একটু বিশ্রাম করে ইঁদারার দিকে রওনা হলেন। সঙ্গে গোবিন্দপুর আর আশপাশের গাঁয়ের হাজার হাজার লোক।

ভারী সুন্দর একটা জায়গায় ইঁদারাটি খোঁড়া হয়েছিল। চারদিকে কলকে ফুল আর ঝুমকো জবার কুঞ্জবন, একটা বিশাল পিপুল গাছ ছায়া দিচ্ছে। ইঁদারার চারধারে বড় বড় ঘাসের বন। পাখি ডাকছে, প্রজাপতি উড়ছে।

কেশব আস্তে আস্তে ইঁদারার ধারে এসে দাঁড়ালেন। মুখখানা গম্ভীর। সামান্য ঝুঁকে জলের দিকে চাইলেন। সত্যিই কাকচক্ষু জল। টলটল করছে। কেশব আস্তে করে বললেন, "কে আছিস! উঠে আয়, নইলে থুথু ফেলব।"

এই কথায় কী হল কে জানে। ইঁদারার মধ্যে হঠাৎ হুলুস্থুলু পড়ে গেল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ দিয়ে জল ইঁদারার কানা পর্যন্ত উঠে আসতে লাগল। সেই সঙ্গে বোঁ-বোঁ বাতাসের শব্দ।

লোকজন এই কাণ্ড দেখে দৌড়ে পালাচ্ছে। শুধু চক্কোত্তিমশাই ভয়ে কাঁপতে কাঁপতেও একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন।

“থুথু ফেলবেন না, থুথু ফেলবেন না” বলতে বলতে ইঁদারা থেকে শয়ে শয়ে ভূত বেরোতে থাকে। চেহারা দেখে ভড়কাবার কিছু নেই। রোগা লিকলিকে কালোকালো সব চেহারা, তাও রক্তমাংসের নয়–ধোঁয়াটে জিনিস দিয়ে তৈরি। সবকটার গা ভিজে সপসপ করছে, চুল বেয়ে জল পড়ছে।

কেশব তাদের দিকে চেয়ে গম্ভীর হয়ে বললেন, “ঢুকেছিলি কেন এখানে?”

“আজ্ঞে ভূতের সংখ্যা বড্ডই কমে যাচ্ছে যে! এই ইঁদারার জল খেয়ে এ তল্লাটের লোকের রোগবালাই নেই। একশো দেড়শো বছর হেসে খেলে বাঁচে? না মলে ভূত হয় কেমন করে? তাই ভাবলুম, ইঁদারাটা দখল করে থাকি।”

বলে ভূতেরা মাথা চুলকোয়।

কেশব বললেন, “অতি কূট প্রশ্ন। কিন্তু কথাটা আপাতগ্রাহ্য।”

ভূতেরা আশকারা পেয়ে বলে, “ঐ যে চক্কোত্তিমশাই দাঁড়িয়ে রয়েছেন, ওঁরই বয়স একশো বিশ বছর। বিশ্বাস না হয় জিজ্ঞেস করুন ওঁকে।”

কেশব অবাক চোখে চক্কোত্তির দিকে তাকিয়ে বলেন, “বলে কী এরা মশাই? সত্যি নাকি?”

একহাতে ধরা পৈতে, অন্য হাতের আঙুলে গায়ত্রী জপ কড়ে ধরে রেখে চক্কোত্তি আমতা-আমতা করে বলেন, “ঠিক স্মরণ নেই।”

“কূট প্রশ্ন। কিন্তু আপাতগ্রাহ্য।” কেশব বললেন।

ঠিক এই সময়ে চক্কোত্তির মাথায়ও ভারী কূট একটা কথা এল। তিনি ফস করে বললেন, “ভূতেরা কি মরে?”

কেশব চিন্তিতভাবে বললেন, “সেটাও কূট প্রশ্ন।” চক্কোত্তি সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, “কিন্তু আপাতগ্রাহ্য। ভূত যদি না-ই মরে, তবে সেটাও ভাল দেখায় না। স্বয়ং মাইকেল বলে গেছেন, জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে?”

ভূতেরা কাঁউমাউ করে বলে উঠলো, “তা সে আমরা কী করব? আমাদের হার্ট ফেল হয় না, ম্যালেরিয়া, ওলাওঠা, সান্নিপাতিক, সন্ন্যাস রোগ হয় না–তাহলে মরব কিসে! দোষটা কী আমাদের?”

চক্কোত্তি সাহসে ভর করে বলেন, “তা হলে দোষ তো আমাদেরও নয় বাবা সকল।”

কেশব বললেন, “অতি কূট প্রশ্ন।”

চক্কোত্তি বলে উঠলেন, “কিন্তু আপাতগ্রাহ্য।”

শ পাঁচেক ছন্নছাড়া বিদঘুঁটে ভেজা ভূত চারদিকে দাঁড়িয়ে খুব উৎকণ্ঠার সঙ্গে কেশবের দিকে তাকিয়ে আছে। কী রায় দেন কেশব।

একটা বুড়ো ভূত কেঁদে বলল, “ঠাকুরমশাই, জলে ভেজানো ভাত যেমন পান্তা ভাত, তেমনি দিন রাত জলের মধ্যে থেকে থেকে আমরা পান্তো ভূত হয়ে গেছি। ভূতের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য এত কষ্ট করলুম, সে-কষ্ট বৃথা যেতে দেবেন না।”

“এও অতি কূট প্রশ্ন।” কেশব বললেন।

চক্কোত্তিমশাই এবার আর ‘আপাতগ্রাহ্য’ বললেন না। সাহসে ভর করে বললেন, “তাহলে ভূতেরও মৃত্যুর নিদান থাকা চাই। না যদি হয় তবে আমিও ইঁদারার মধ্যে থুথু ফেলব। আর তারই বা কী দরকার। এক্ষুণি আমি এই সব ভূত বাবা সকলের গায়েই থুথু ফেলছি।”

চক্কোত্তিমশাই বুঝে গেছেন, থুথুকে ভূতদের ভারী ভয়। বলার সঙ্গে সঙ্গে ভূতেরা আঁতকে উঠে দশ হাত পিছিয়ে চেঁচাতে থাকে, “থুথু ফেলবেন না! থুথু দেবেন না!”

কেশব চক্কোত্তিমশাইকে এক হাতে ঠেকিয়ে রেখে ভূতদের দিকে ফিরে বললেন, “চক্কোত্তিমশাই যে কূট প্রশ্ন তুলেছেন, তা আপাতগ্রাহ্যও বটে। আবার তোমাদের কথাও ফেলনা নয়। কিন্তু যুক্তি প্রয়োগ করলে দেখা যায় যে, ভূত কখনো মরে না। সুতরাং ভূত খরচ হয় না, কেবল জমা হয়। অন্যদিকে মানুষ দুশো বছর বাঁচলেও একদিন মরে। সুতরাং মানুষ খরচ হয়। তাই তোমাদের যুক্তি টেকে না।”

ভূতেরা কাউমাউ করে বলতে থাকে, “আজ্ঞে অনেক কষ্ট করেছি!”

কেশব দৃঢ় স্বরে বললেন, “তা হয় না। ঘটি বাটি যা সব কুয়োর জলে ডুবেছে, সমস্ত তুলে দাও, তারপর ইঁদারা ছাড়ো। নইলে চক্কোত্তিমশাই আর আমি দুজনে মিলে থু–”

আর বলতে হল না। ঝপাঝপ ভূতেরা ইঁদারায় লাফিয়ে নেমে ঠনঠন ঘটি-বালতি তুলতে লাগল। মুহূর্তের মধ্যে ঘটি-বালতির পাহাড় জমে গেল ইঁদারার চারপাশে। পুরনো ইঁদারায় এরপর ভূতের আস্তানা রইল না। ভেজা ভূতেরা গোবিন্দপুরের মাঠে রোদে পড়ে থেকে থেকে কদিন ধরে গায়ের জল শুকিয়ে নিল। শুকিয়ে আরো চিমড়ে মেরে গেল। এত রোগা হয়ে গেল তারা যে, গাঁয়ের ছেলেপুলেরাও আর তাদের দেখে ভয় পেত না।

# উকিলের চিঠি

**উকিলের চিঠি**

ও মিছরি, তোর নামে একটা উকিলের চিঠি এসেছে দেখগে যা। এই বলে মিছরির দাদা ঋতীশ টিয়ার ঝক তাড়াতে ক্ষেতের মধ্যে নেমে গেল।

গোসাবা থেকে দুই নৌকো বোঝাই লোক এসেছে অসময়ে। লাট এলাকার ভিতর বাগে কোন বিষয়কর্মে যাবে সব। এই অবেলায় তাদের জন্য খিচুড়ি চাপাতে বড় কাঠের উনুনটা ধরাতে বসেছিল মিছরি। কেঁপে উঠল। তার ভরন্ত যৌবনবয়স। মনটা সব সময়ে অন্যধারে থাকে, শরীরটা এই এখানে। আকজাল শরীরটা ভার লাগে তার। মনে হয়, ডানা নেই মানুষের।

উকিলের চিঠি শুনে যে উনুন ফেলে দৌড়োবে তার জো নেই। বাবা গুলিপাকানো চোখে দেখছে উঠোনের মাঝখানে চাটাইতে বসে। বড় অতিথিপরায়ণ লোক। মানুষজন এলে তার হাঁকডাকের সীমা থাকে না। তাছাড়া দাদু, ঠাকুমা, মা, কাকা-জ্যাঠারা সব রয়েছে চারধারে। তাদের চোখ ভিতর বার সব দেখতে পায়। উটকো লোকেদের মধ্যে কিছু বিপ্রবর্ণের লোক রয়েছে, তারা অন্যদের হাতে খাবে না। সে একটা বাঁচোয়া, রান্নাটা করতে হবে না তাদের। চাল ডাল ওরাই ধুয়ে নিচ্ছে। পুকুরে। বাঁকে করে দু’বালতি জল নিয়ে গেছে কামলারা। উনুনটা ধাঁধিয়ে উঠতেই মিছরি সরে গিয়ে আমগাছতলায় দাঁড়াল।

কালও বড্ড ঝড় জল গেছে। ওই দক্ষিণধার থেকে ফৌজের মতো ঘোড়সওয়ার ঝড় আসে মাঠ কাঁপিয়ে। মেঘ দৌড়ায়, ডিমের মতো বড় বড় ফোঁটা চটাসফটাস ফাটে চারধারে। আজ সকালে দশ ঝুড়ি পাকা জাম, গুটিদশেক কচি তাল কুড়িয়ে আনা হয়েছে ক্ষেত থেকে। ঘরের চালের খড় জায়গায় জায়গায় ওলট-পালট। মাটির দেয়াল জল টেনে ডোস হয়ে আছে, এখন চড়া রোদে শুকোচ্ছে

সব। আমতলায় দাঁড়িয়ে মিছরি দেখে, ঋতীশ দাদা টিয়ার ঝক উড়িয়ে দিল। ট্যা ট্যা ডাক ছেড়ে সবুজ পাখিরা উড়ে যাচ্ছে নদীর দিকে। মনে হয়, মানুষের ডানা নেই।

যারা এসেছে তারা সব কেমনধারা লোক যেন! রোগা-ভোগা ভীতু ভীতু চেহারা, পেটে সব খোদল-খোদল উপোসী ভাব। জুলজুল করে চারধারে চায় আর লজ্জায় আপনা থেকেই চোখ নামিয়ে নেয়। তাদের মধ্যে একজন আধবুড়ো লোক এসে উনুনটায় দুটো মোটা কাঠ ঢুকিয়ে দিল, ফুলঝুরির মতো ছিটকে পড়ল আগুনের ফুলকি। একটা কাঠ টেনে আধপোড়া একটা বিড়ি ধরিয়ে নিল লোকটা। এই গরমেও গায়ের ময়লা ঘেমো তেলচিটে গেঞ্জিটা খুলছে না, বুকের পাঁজর দেখা যাবে বলে বোধহয় লজ্জা পাচ্ছে। তাকে দেখে হাসি পেল মিছরির।

সেই লোকটা চারধারে চেয়ে মিছরিকে দেখে কয়েক কদম বোকা পায়ে হেঁটে এসে বলল–আনাজপাতি কিছু পাওয়া যায় না?

ক্ষেত-ভর্তি আনাজ। অভাব কিসের? মিছরি বলল–এক্ষুনি এসে পড়বে। ক্ষেতে লোক নেমে গেছে আনাজ আনতে।

–একটু হলুদ লাগবে, আর কয়েকটা শুকনো লঙ্কা। যদি হয় তো ফোড়নের জন্য একটু জিরে আর মেথি।

যদি হয়! যদি আবার হবে কি! খিচুড়ি রাঁধতে এসব তো লাগেই। সে কি আর গেরস্তরা জানে না! মা সব কাঠের বারকোশে সাজিয়ে রেখেছে।

লোকটার দিকে চেয়ে মিছরি বলল–সব দেওয়া হচ্ছে ডাল চালটা ধুয়ে আসুক।

লোকটা আকাশের দিকে একবার তাকাল। খুব সংকোচের গলায় বলল–বেলা হয়েছে।

সে কথার মধ্যে একটা খিদের গন্ধ লুকিয়ে আছে। শত চেষ্টা করেও লোকটা খিদের ভাবটা লুকোতে পারছে না। গেঞ্জিতে ঢাকা হলেও ওর পাঁজরা দেখা যায়। কারা এরা? কোত্থেকে এল, কোথাই বা যাচ্ছে? ছোটো বোন চিনি যদিও মিছরির পিঠোপিঠি নয় তবু বোনে বোনে ঠাট্টা ইয়ার্কির সম্পর্ক। ফ্রকপরা চিনি তিনটে ব্যাঙ লাফ দিয়ে মশলার বারকোশ নিয়ে এসে ঠক করে উনুনের সামনে উঠোনে

রেখে ঝুপসি চুল কপাল থেকে সরিয়ে চেঁচিয়ে উঠল–এই যে মশলা দিয়ে গেলাম কিন্তু। দেখ সব, নইলে চড়াই খেয়ে যাবে।

রোগা লোকটা তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বারকোশটা নীচু হয়ে দেখল।

বলল–উরেব্বাস, গরমমশলা ইস্তক। বাঃ বাঃ, এ নাহলে গেরস্ত! চিনি দুটো নাচুনি পাক খেয়ে মিছরির ধারে এসে জিভ ভ্যাঙাল, বলল–যা দিদি, তোর নামে উকিলের চিঠি এসেছে। বড় মোকদ্দমায় পড়ে গেছিস ভাই। চিঠিটা ভিজিয়ে একটু জল খাস শোওয়ার সময়, মিষ্টি লাগবে।

বলে নীচু ডালের একটা পাকা আম দুবার লাফ দিয়ে পেড়ে ফেলল চিনি। শিঙে দিয়ে চুষতে চুষতে যেদিকে মন চায় চলে গেল।

উকিলের চিঠি বলে সবাই খ্যাপায়। আর মোকদ্দমাও বটে। এমন মোকদ্দমায় কেউ কখনো পড়েনি বুঝি।

ধীর পায়ে লাজুক মুখে মিছরি ঘরে আসে। এমনিতে কোনো লাজলজ্জার বালাই নেই। বাপের বাড়িতে হেসে খেলে সময় যায়। কিন্তু ওই চিঠি যেদিন আসে সেদিন যত লজ্জা। বরের চিঠিই যেন বর হয়ে আসে।

মিছরির বর উকিল।

ছোটো কাকা প্রায় সমানবয়সী। দাদা ঋতীশের চেয়েও ছ'মাসের ছোটো। আগে তাকে নাম ধরেই 'শ্যামা' বলে ডাকত মিছরি, নিজের বিয়ের সময় থেকে 'ছোটো কাকা' বলে ডাকে।

ছোটো কাকা মিছরির নাকের ডগায় দুবার নালচে খামখানা নাচিয়ে ফের সরিয়ে নিয়ে বলল–রোজ যে আমার কাপড় কাঁচতে খিটখিট করিস, আর করবি?

অন্য সময় হলে মিছরি বলত–করব, যাও যা খুশি করোগে।

এখন তা বলল না। একটু হেসে বলল–কাপড় কাঁচতে খিটখিট করব কেন, তোমার নস্যির রুমাল বাবুও কাঁচতে বড় ঘেন্না হয়।

–ইঃ ঘেন্না! যা তাহলে, চিঠি খুলে পড়ে সবাইকে শোনাবো।

–আচ্ছা, আচ্ছা কাঁচবো।

–আর কি করবি সব বল এই বেলা। বৌদি রান্না করে মরে, তুই একেবারে এগোস না, পাড়া বেড়াস। আর হবে সেরকম?

–না।

–দুপুরে আমার নাক ডাকলে আর চিমটি কাটবি?

–মাইরি না।

–মনে থাকে যেন! বলে ছোটো কাকা চিঠিটা শুঁকে বলল–এঃ, আবার সুগন্ধী মাখিয়েছে।

বলে কাকা চিঠিটা ফেলে দিল সামনে। পাখির মতো উড়ে চিঠিটা তুলে নিয়ে মিছরি এক দৌড়ে বাগানে।

কত কষ্ট করে এতদূর মানুষ আসে, চিঠি আসে। রেলগাড়িতে ক্যানিং, তারপর লঞ্চে গোসাবা, তারপর নৌকোয় বিজয়নগরের ঘাট, তারপর হাঁটাপথ। কত দূর যে! কত যে ভীষণ দূর!

খামের ওপর একধারে বেগুনে কালিতে রবার স্ট্যাম্প মারা। কালি জেবড়ে গেছে, তবু পড়া যায়–ফ্রম বসন্ত মিদ্দার, বি. এ. এল. এল, বি, অ্যাডভোকেট। আর বাংলায় মিছরির নাম ঠিকানা লেখা অন্যধারে। রবার স্ট্যাম্পের জায়গায় বুঝি এক ফোঁটা গোলাপগন্ধী আতর ফেলে ছিল, সুবাস বুক ভরে নিয়ে বড় যত্নে, যেন ব্যথা না লাগে এমনভাবে খামের মুখ ছিঁড়ল মিছরি। এ সময়টায় তাড়াতাড়ি করতে নেই। অনেক সময় নিয়ে, নরম হাতে, নরম চোখে সব করতে হয়। মা ডাকছে ও মিছরি, আনাজ তুলতে বেলা গেল। লোকগুলোকে তাড়া দে, বিপিনটা কি আবার গাঁজা টানতে বসে নাকি দ্যাখ।

বড় বিরক্তি। লোকগুলোর সত্যি খিদে পেয়েছে। আকাশমুখো চেয়ে উঠোনে হাভাতের মতো বসে আছে সব। তাদের মধ্যে যারা একটু মাতব্বর তারা বাবুর সঙ্গে এক চাটাইতে বসে কথাবার্তা বলছে। রান্নার লোকটা বিশাল কড়া চাপিয়ে আধসেরটাক তেল ঢেলে দিল।

মিছরি ক্ষেতে নেমে গিয়ে কুহুস্বরে ডাক দিল–বিপিনদা, তোমার হল? রান্না যে চেপে গেছে। অড়হর গাছের একটা সারির ওপাশ থেকে বিপিন বলে–বিশটা মর্দ খাবে, কম তো লাগবে না। হুট বলতে হয়ে যায় নাকি! যাচ্ছি, বলো গে হয়ে এল।

মিছরি চিঠিটা খোলে। নীল, রুলটানা প্যাডের কাগজ। কাগজের ওপরে আবার বসন্ত মিদ্দার এবং তার ওকালতির কথা ছাপানো আছে। নিজের নাম ছাপা দেখতে লোকটা বড় ভালবাসে।

হুট করে চিঠি পড়তে নেই। একটু থামো, চারদিক দেখ, খানিক অন্যমনে ভাবো, তারপর একটু একটু করে পড়ো, গেঁয়ো মানুষ যেমন করে বিস্কুট খায়, যত্নে ছোট্ট ছোট্ট কামড়ে।

চিঠি হাতে তাই মিছরি একটু দাঁড়িয়ে থাকে। সামনের মাঠে একটা ছোট্ট ডোবায় কে একজন কাদামাখা পা ধুতে নেমেছিল। জলে নাড়া পড়তেই কিলবিলিয়ে একশ জোঁক বেরিয়ে আসে। মিছরি দেখতে পায়, লোকটা মাঠে বসে পায়ের জোঁক ছাড়াচ্ছে। ক্ষেতের উঁচু মাটির দেয়ালের ওপর কোন কায়দায় একটা গরু উঠে পড়েছে কে জানে। এইবার বাগানের মধ্যে হড়াস করে নেমে আসবে।

নামুক গে। কত খাবে! বাগান-ভর্তি সবজি। অঢেল, অফুরন্ত। বিশ বিঘের ক্ষেত। খাক।

উকিল লিখেছে–হৃদয়াভ্যন্তরস্থিতেষু প্রাণপ্রতিমা আমার...। মাইরি, পারেও লোকটা শক্ত কথা লিখতে লিখবে না! কত লেখাপড়া করেছে।

হু-হু করে বুক চুপসে একটা শ্বাস বেরিয়ে যায় মিছরির। লোকটা কত লেখাপড়া করেছে তবু রোজগার নেই কপালে! এ কেমন লক্ষ্মীছাড়া কপাল তাদের।

উকিল লিখেছে–ঘুমিয়া জাগিয়া কত যে তোমাকে খুঁজি! একটু থমকে যায় মিছরি। কথাটা কি! ঘুমিয়া? ঘুমিয়া মানে তো কিছু হয় না। বোধ হয় তাড়াহুড়োয় ঘুমাইয়া লিখতে গিয়ে অমনটা হয়েছে। হোকগে, ওসব তো কত হয় ভুল মানুষের। ধরতে আছে?

ছ্যাঁক করে ফোড়ন পড়ল তেলে। হিং ভাজার গন্ধ। রান্নার লোকটা বুঝি কাকে বলল–এর মধ্যে একটু ঘি হলে আর কথা ছিল না।

জ্যাঠা বোধ হয় সান্ত্বনা দিয়ে বলল–হবে হবে। তা মিছরি, পাথরবাটিতে একটু ঘি দিয়ে যা দিকিনি!

মিছরি আর মিছরি! ও ছাড়া বুঝি কারো মুখে কথা নেই! মিছরি নড়ল না। চিঠি থেকে চোখ তুলে উদাসভাবে আকাশ দেখল। আবার একটা টিয়ার ঝক আসছে গাঙ পেরিয়ে। আসুক।

ছোটো কাকার এক বন্ধু ছিল, ত্র্যম্বক। মিছরির বিয়ের আগে খুব আসত এ বাড়িতে। বিয়ের পর আর আসে না। কেন বলো তো! মিছরি উদাস চেয়ে থাকে। কোনোদিন মনের কথা কিছু বলেনি তাকে ত্র্যম্বক। কিন্তু খুব ঘন ঘন তার নাম ধরে ডাকত। সিগারেট ধরাতে দশবার আগুন চাইত।

কেন যে মনে পড়ল!

উকিল লিখেছে–ত্রিশ টাকার মধ্যে কলিকাতায় ঘর পাওয়া যায় না। অনেক খুঁজিয়াছি। মাঝে মাঝে ভাবি, বনগাঁ চলিয়া যাইব। সেখানে প্র্যাকটিসের সুবিধা হইতে পারে। বাসাও সস্তা।

তাই যদি যেতে হয় তো যাও। আমি আর পারি না। বিয়ের পর এক বছর চার মাস হল ঠিক ঠিক। আর কি পারা যায়, বলো উকিলবাবু। তোমার পাষাণ হৃদয়, তার ওপর পুরুষমানুষ, লাফঝাঁপ করে তোমাদের সময় কেটে যায়। আর আমি মেয়েমানুষ, লঙ্কাগাছে জল ঢেলে কি বেলা কাটে আমার, বলো? চোখের নোনা জলে নোনাগাঙে জোয়ার ফেলে দিই রোজ। উকিলবাবু, পায়ে পড়ি…

খিচুড়িতে আলু, কুমড়ো, উঁাড়স, ঝিঙে, পটল সব ঢেলে দিয়ে রোগা বামুনটা আম গাছের তলায় জিরেন নিচ্ছে। গলার ময়লা মোটা পৈতেটা বেরিয়ে গেঞ্জির ওপর ঝুলে আছে। বড় রোগা, ঘামে ভিজে গেছে তবু গেঞ্জি খোলেনি পাঁজর দেখা যাওয়ার লজ্জায়। বিড়ি ধরিয়ে ছোটোকাকাকে বলল–বৌ আর ছেলেপিলেদের সোনারপুর ইস্টিশানে বসিয়ে রেখে আমরা বেরিয়ে পড়েছি। তারা সব কদিন ভিক্ষে-সিক্ষে করে খাবে। ঠিক করেছি বাদার যেখানে পাব জমি দখল করে ঘর তুলে ফেলব আর চাষ ফেলে দেবো। মশাই, কোনোখানে একটু ঠাই পেলাম না আমরা। বাঁচতে তো হবে নাকি!

ছোটোকাকা বলে, কতদূর যাবেন? ওদিকে তো সুন্দরবনের রিজার্ভ ফরেস্ট আর নোনা জমি। বাঘেরও ভয় খুব। লোকটা বিড়ি টেনে হতাশ গলায় বলে, আসতে আসতে এতদূর এসে পড়েছি আর একটু যেতেই হবে। বাঘেরও খিদে, আমাদেরও খিদে, দুজনাকেই বেঁচে থাকতে হবে তো।

উকিলবাবু আর কি লেখে? লেখে–সোনামণি, আমার তিনকুলে কেহ নাই, নইলে তোমাকে বাপের বাড়ি পড়িয়া থাকিতে হইত না। যাহা হউক, লিখি যে আর কয়দিন ধৈর্য ধর। কোথাও না কোথাও কিছু না কিছু হইবেই। ওকালতিতে পসার জমিতে সময় লাগে।

বুঝি তো উকিলবাবু, বুঝি। তোমার যেদিন পসার হবে ততদিন আমি থাকব তো বেঁচে! যদি মরে যাই, তবে তোমার লক্ষ্মীমন্ত ঘরে আর কোন না কোন পেত্নি এসে আমার জায়গায় ভেঁড়েমুশে সংসার করবে। বালা বাজিয়ে হাওয়া খাবে, মাছের মুড়ো চিবোবে, গাল ভরতি পান খেয়ে রুপোর বাটায় পিক ফেলবে। ততদিন কি বাঁচবো উকিলবাবু?

বিপিন কলাপাতা কেটে উঠোনে ফেলছে। ঠেলাঠেলি পড়ে গেছে দলটার মধ্যে। ঝপাঝপ পাতা টেনে বসে পড়ল সব। বাঁ হাতে সকলের পাঁচ ছটা করে কাঁচা লঙ্কা, পাতে একথাবা নুন। খিচুড়ি এখনো নামে নি। সবাই কাঁচা লঙ্কা কামড়াচ্ছে নুন মেখে। ঝালে শিস দিচ্ছে।

উকিলবাবু কি লেখে আর? লেখে–বন্ধুর বাসায় আর কতদিন থাকা যায়? ভাল দেখায় না। ধারও অনেক হইয়া গেল। লজ্জার মাথা খাইয়া লিখি, কিছু টাকা যদি পারো…

গরম খিচুড়ি মুখে দিয়ে একটা বাচ্চা ছেলে চেঁচিয়ে ওঠে জিভের যন্ত্রণায়। একজন বুড়ো বলে–আস্তে খা। যুঁইয়ে চুঁইয়ে ঠাণ্ডা করে নে।

উঃ, যা বেঁধেছো না হরিচরণ, লাট বাড়ির বাস ছেড়েছে। মিছরি আমতলায় দাঁড়িয়ে থাকে। বেলা হেলে গেছে। গাছতলায় আর ছায়া নেই। রোদের বড় তেজ।

দলের মাতব্বর জিজ্ঞেস করে মিছরির বাবাকে–ওদিকে কি কোনো আশা নেই মশায়? অ্যাঁ! এত কষ্ট করে এতদুর এলাম।

মিছরি ঘরে চলে আসে। চোখ জ্বালা করছে। বুকটায় বড় কষ্ট।

পড়ন্ত বেলায় মিছরি তার উকিলকে চিঠি লিখতে বসে–আশা হারাইও না। পৃথিবীতে অনেক জায়গা আছে।

# এ হরবাবুর অভিজ্ঞতা

**এ হরবাবুর অভিজ্ঞতা**

নিশুত রাতে হরবাবু নির্জন অন্ধকার মেঠো পথ ধরে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছেন। বৃষ্টি বাদলার দিন। পথ জলকাদায় দুর্গম। তার ওপর আকাশে প্রচণ্ড মেঘ করে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। হরবাবুর টর্চ আর ছাতা আছে বটে, কিন্তু তাতে বিশেষ সুবিধে হচ্ছে না। টর্চের আলো নিবুনিবু হয়ে আসছে আর হাওয়ায় ছাতা উল্টে যাওয়ার ভয়। বর্ষা বাদলায় সাপখোপের ভয়ও বড় কম নয়। গর্তটর্ত বুজে যাওয়ায় তারা আশ্রয়ের সন্ধানে ডাঙ্গাজমির খোঁজে পথে ঘাটে উঠে আসে।

হরবাবুর অবশ্যই এই নিশুতরাতে পৌঁছোনোর কথা নয়। কিন্তু ট্রেনটা এমন লেট করল যে হরিণডাঙ্গা স্টেশনে নামলেনই তো রাত সাড়ে দশটায়। গরুর গাড়ির খোঁজ করে দেখলেন সব ভোঁ ভোঁ, এমনকি তার শ্বশুরবাড়ির গাঁ গোবিন্দপুরে যাওয়ার সঙ্গী সাথীও কেউ জুটলো না। গোবিন্দপুর না হোক দু-তিন মাইল রাস্তা। হরবাবুর ভয় ভয় করছিল। কিন্তু উপায়ও নেই। তার শালার বিয়ে। হরবাবুর স্ত্রী চার-পাঁচদিন আগেই ছেলেমেয়ে নিয়ে চলে এসেছেন। হরবাবুর জন্যে তারা সব পথ চেয়ে থাকবে।

সামনেই তুলসীপোতার জঙ্গল। একটু ভয়ের জায়গা, আধমাইলটাক খুবই নির্জন রাস্তা। আশেপাশে বসতি নেই। হরবাবু কালী-দুর্গা স্মরণ করতে করতে যাচ্ছেন। বুকটা একটু কাঁপছেও। এই বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগেও পৃথিবীটা যে কেন এত পেছিয়ে আছে, তা তিনি বুঝতে পারেন না।

ফিরিঙ্গির হাট ছাড়িয়ে ডাইনে মোড় নিতে হবে। কিন্তু এত জম্পেশ অন্ধকারে কিছুই ঠাহর হচ্ছে না, টর্চবাতির আলো চার-পাঁচ হাতের বেশি যাচ্ছেও না। বড়ই বিপদ।

হরবাবুর মুখ থেকে বেরিয়ে গেল,”ওঃ, আজ বেঘোরে প্রাণটা না যায়। ডান দিকে তুলসীপোতার রাস্তার মুখটা খুঁজে পেয়েও দমে গেলেন হরবাবু। এতক্ষণ যাইহোক শক্ত জমির ওপর হাঁটছিলেন। এবার একেবারে থকথকে কাদা।

–হরি হে, এই রাস্তায় মানুষ যেতে পারে! পৃথিবীটা আর বাসযোগ্য নেই।

হরবাবু আপনমনে কথাটা বলে ফেলতেই পিছন থেকে কে যেন বলে উঠল,–তা যা বলেছেন।

হরবাবু এমন আঁতকে উঠলেন যে আর একটু হলেই তার হার্ট ফেল হত। পিছনে তাকিয়ে দেখেন একটা রোগা আর লম্বাপানা লোক। হরবাবুর সঙ্গে শালার বউয়ের জন্য গড়ানো একছড়া হার আছে। কিছু পয়সাও। লোকটা ডাকাত নাকি? হরবাবু কাঁপা গলায় বললেন, আপনি কে?

–চিনবেন না। এদিক পানেই যাচ্ছিলাম।

–অ। তা ভাল।

–আপনি কোথায় যাচ্ছেন? গোবিন্দপুর নাকি? হরবাবু কাঁপা গলায় বললেন, হ্যাঁ, সেখানেই যাওয়ার কথা।

লোকটা একটু হাসল,–যেতে পারবেন কি? এখন তো এই কাদা দেখছেন, গোড়ালি অবধি। এরপর হাঁটু অবধি গেঁথে যাবে।

–তাহলে উপায়? আমার যে না গেলেই নয়।

লোকটা একটু হেসে বলে,–উপায় কাল সকাল অবধি বসে থাকা। তারপর ভোরবেলা ফিরিঙ্গির হাট থেকে গরুর গাড়ি ধরে শিয়াখালি আর চটের হাট হয়ে গোবিন্দপুর যাওয়া। তাতে অবশ্য রাস্তাটা বেশি পড়বে। প্রায় সাত-আট মাইল। কিন্তু বর্ষাকালে তুলসীপোতা দিয়ে যাতায়াত নেই।

–রাত এখানে কাটাবো? থাকব কোথায়?

–তার আর ভাবনা কি? একটু এগোলে ওই জঙ্গলের মধ্যে আমার দিব্যি ঘর আছে। আরামে থাকবেন।

হরবাবু খুব দোটানায় পড়লেন বটে, কিন্তু কী আর করেন। লোকটা যদি তার সব কেড়েকুড়েও নেয় তাহলে কিছু করার নেই বটে। কিন্তু গোবিন্দপুর যে পৌঁছোনো যাবে না তা বুঝতে পারছেন।

আমার পিছু পিছু আসুন।–বলে লোকটা একটু এগিয়ে গেল।

হরবাবু খুব ভয়ে ভয়ে আর সংকোচের সঙ্গে তার পিছু পিছু যেতে বললেন, আপনার বাড়ি বুঝি ফিরিঙ্গির হাটেই?

–তা বলতে পারেন। যখন যেখানে ডিউটি পড়ে সেখানেই যেতে হয়। আমার কাছে সব জায়গাই সমান। তবে আপনার এই পৃথিবীটা যে বাসযোগ্য নয় তা খুব ঠিক কথা। এখানে হরকিত, গুবজোর, সেরোষ্ট্র কিছুই পাওয়া যায় না। বড় অসুবিধে।

লোকটা পাগল নাকি! হরবাবু অবাক হয়ে বললেন, কী পাওয়া যায় না বললেন?

বলে লাভ কি? আপনি পারবেন জোগাড় করে দিতে? ওসব হচ্ছে খুব ভাল ভাল সব সবজি।

জন্মে যে নামও শুনিনি! এসব কি বিলেতে হয়?

না মশাই না। বিলেতের বাজারও চষে ফেলেছি।

খুবই আশ্চর্য হয়ে হরবাবু বললেন,–বিলেতেও গেছেন বুঝি?

–কোথায় যাইনি মশায়! ছোটো গ্রহ, এমুড়ো ওমুড়ো টহল দিতে কতক্ষণই বা লাগে!

হরবাবু হতভম্ব হয়ে গেলেন। এই দুর্যোগের রাতে শেষে কি পাগলের পাল্লায় পড়লেন?

লোকটা হাঁটতে হাঁটতে বলল,–নিতান্তই পেটের দায়ে পড়ে থাকা মশাই। নইলে এই অখাদ্য জায়গায় কেউ থাকে? এখানে ফোরঙ্গলিথুয়াম হয় না, কাঙ্গারাঙ্গা নেই, ফেজুয়া নেই–এ জায়গায় থাকা যায়?

হরবাবু গলাখাঁকারি দিয়ে বললেন,–এগুলো কি সবজি?

–আরে না। আপনাকে এসব বুঝিয়েই বা লাভ কি? আপনি এসব কখনও দেখেননি জানেনও না। ফোরঙ্গলিথুয়াম একটা ভারী আমোদ প্রমোদের ব্যাপার। কাঙ্গারাঙ্গা হল খেলা। ফেজুয়া হল–নাঃ, এটা বুঝবেন না।

হরবাবু মাথা নেড়ে বললেন,”আজ্ঞে না। আমার মাথায় ঠিক সেঁধোচ্ছে না। তা মশাইয়ের দেশ কি আফ্রিকা?

–হাসালেন মশাই। আফ্রিকা হলে চিন্তা কী ছিল! এ হল জরিভেলি লোকের ব্যাপার।

–জরিভেলি?

–শুধু জরিভেলি নয়, জরিভেলি লোক। এই আপনাদের মোটে নটি গ্রহ নয়, আমাদের ফুকনীকে ঘিরে পাঁচ হাজার গ্রহ ঘুরপাক খাচ্ছে। সবকটা নিয়ে জরিভেলি লোক। এলাহি কাণ্ড।

হরবাবু মূর্ছা গেলেন না। কারণ লোকটা পাগল। আবোলতাবোল বকছে।

কিন্তু কয়েক কদম যেতে না যেতেই হরবাবু যে জিনিসটা দেখতে পেলেন তাতে তাঁর চোখ ছানাবড়া। জঙ্গলের মধ্যে ছোটখাটো একটা বাড়ির মতো একখানা মহাকাশযান। আলোটালো জ্বলছে। ভারি ঝলমল করছে জিনিসটা।

–আসুন, ভিতরে আসুন। আমি একা মানুষ, আপনার আপ্যায়নের ত্রুটি ঘটবে।

ভিতরে ঢুকে হরবাবু যা দেখলেন, তাতে তার মূর্ছা যাওয়ারই জোগাড়। হাজার কলকজা, হাজার কিম্ভুত সব জিনিস। কোথাও আলো জ্বলছে নিবছে, কোথাও হুস্ করে শব্দ হল, কোথাও পি পি করে যেন বেজে গেল, কোথাও একটা যন্ত্র থেকে একটা গলার স্বর অচেনা ভাষায় নাগাড়ে কী যেন বলে চলেছে–লং পজং ঢাকাকাল লং পজং পাকালাব..

হরবাবুর মাথা ঘুরছিল। তিনি উবু হয়ে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন।

লোকটা তাড়াতাড়ি কোথা থেকে এক গেলাস কালোমতো কি একটা জিনিস এনে তার হাতে দিয়ে বলল,-খেয়ে ফেলুন।

হরবাবু বুক ঠুকে খেয়ে ফেললেন। একবারই তো মরবেন। তবে স্বাদটা ভারী অদ্ভুত। ভিতরটা যেন আরামে ভরে গেল।

–এসব কী হচ্ছে মশাই বলুন তো?

লম্বা লোকটা ব্যাজার মুখে বলল,–কী আর হবে? আমার এখানে পোস্টিং হয়েছে। পাক্কা তিনটি মাস–আপনাদের হিসেবে–এইখানেই পড়ে থাকতে হবে।

–কিসের পোস্টিং?

–আর বলবেন না মশাই। এতদিন জরিভেলির বাইরে আমরা কোথাও যেতাম না। এখন হুকুম হয়েছে, কাছেপিঠে যে কটা লোক আছে সেগুলো সম্পর্কে সব তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। সোজা কাজ নাকি মশাই? যেখানে পোস্টিং হবে, সেখানকার ভাষা শেখো রে, সেখানকার আদব কায়দা রপ্ত করো রে, সেখানকার অখাদ্য খেয়ে পেট ভরাও রে। নাঃ, চাকরিটা আর পোযাচ্ছে না।

হরবাবু একটু একটু বুঝতে পারছেন, লোকটা গুল মারছে না। তিনি উঠে একটা চেয়ারগগাছের জিনিসে বসে পড়ে বললেন,–আপনাদের জরিভেলি কতদূর?

–বেশি নয়। আপনাদের হিসেবে মাত্র একশো তেত্রিশ আলোকবর্ষ দূরে।

–আঁ?

–হ্যাঁ, তা আর বেশি কি? আমার এই গাড়িতে ঘণ্টা খানেক লাগে।

–অ্যাঁ।

–হ্যাঁ।

হরবাবু খানিকক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে বললেন,–তাহলে আর আমার শ্বশুরবাড়ি গোবিন্দপুর এমন কী দূর?

–কিছু না, কিছু না।

হরবাবু মহাকাশযান থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ি-কি-মরি করে ছুটতে লাগলেন।

# কালাচাঁদের দোকান

---

**কালাচাঁদের দোকান**

নবীনবাবু গরিব মানুষ। পোস্ট অফিসের সামান্য চাকরি। প্রায়ই এখানে সেখানে বদলি যেতে হয়। আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের ভাবসাব নেই। প্রায়ই ধারকর্জ হয়ে যায়। ঋণ শোধ দিতে নাভিশ্বাস ওঠে। নবীনবাবুর গিন্নি স্বামীর ওপর হাড়ে চটা। একে তো নবীনবাবুর ট্যাকের জোর নেই, তার ওপর লোকটা বড় মেনিমুখো আর মিনমিনে। এই যে যখন-তখন যেখানে-সেখানে বদলি করে দিচ্ছে, নবীনবাবু যদি রোখাচোখা মানুষ হতেন তবে পারত ওরকম বদলি করতে? বদলির ফলে ছেলেপুলেগুলোর লেখাপড়ার বারোটা বাজছে। আজ এ স্কুল কাল অন্য স্কুল করে বেড়ালে লেখাপড়া হবেই বা কী করে?

এবার নবীনবাবু নিত্যানন্দপুর বলে একটা জায়গায় বদলি হলেন। খবরটা পেয়েই গিন্নি বললেন, আমি যাব না, তুমি যাও। আমি এখানে বাসাভাড়া করে থাকব। আর বদলি আমার পোযাচ্ছে না বাবু!’

নবীনবাবু মাথা চুলকে বললেন, তাতে খরচ বাড়বে বই কমবে না। ওখানে আমারও তো আলাদা ব্যবস্থা করতে হবে। দুটো এস্টাব্লিশমেন্ট টানব কী করে?

গিন্নি বললেন, ঠিক আছে, যাব। কিন্তু তোমাকে প্রতিজ্ঞা করতে হবে এরপর বদলি করলে তুমি কিছুতেই বদলি হতে রাজি হবে না। সরকারকে পরিষ্কার জানিয়ে দিতে হবে যে, তুমি দরকার হলে মামলা করবে। তোমার মতো মেনিমুখো পুরুষদের পেয়েই তো নাকে দড়ি দিয়ে ওরা ঘোরায়।

নবীনবাবু মিনমিন করে বললেন, একখানা দরখাস্ত নিয়ে ওপর ওয়ালার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তা তিনি বললেন, নিত্যানন্দপুর থেকে আর বদলি করবে না।

দেখা যাক।

বাক্স-প্যাটরা গুছিয়ে সপরিবারে এক শীতের সন্ধ্যেবেলা নবীনবাবু নিত্যানন্দপুরে এসে পৌঁছলেন। বেশ ধকল গেল। ট্রেন থেকে নেমে অনেকটা পথ গোরুর গাড়িতে এসে তারপর আবার নদী পেরিয়ে আরও ক্রোশ দুই পেরোলে তবে নিত্যানন্দপুর। গঞ্জমতো জায়গা। তবে নিরিবিলি, কঁকা-ফাঁকা।

রাত্রিটা পোস্টমাস্টারের বাড়িতে কাটিয়ে পরদিন একখানা বাসা ভাড়া করলেন। পাকা বাড়ি, টিনের চাল। উঠোন আছে, কুয়ো আছে।

জায়গাটা ভালোও নয়, মন্দও নয়। ওই একরকম। তবে ভরসা এই যে, আর বারবার ঠাইনাড়া হতে হবে না : ওপরওয়ালা কথা দিয়েছে এখানেই বাকি চাকরির জীবনটা কাটাতে পারবেন নবীনবাবু।

তাঁর স্ত্রী অবশ্য নাক সিঁটকে বললেন, ‘কী অখেদ্দে জায়গা গো! এ যে ধাড়ধাড়া গোবিন্দপুর। অসুখ হলে ডাক্তারবদ্দি পাওয়া যাবে কি না খোঁজ নিয়ে দেখো। দোকানপাটও তো বিশেষ নেই দেখছি। বাজারহাট কোথায় করবে?

নবীনবাবু, বললেন, বাজার এখান থেকে এক ক্রোশ। তাও রোজ বসে না। হপ্তায় দুদিন হাট।

তবেই হয়েছে। এখানে ইস্কুলটা কেমন খোঁজ নিয়েছ?

ইস্কুল একটা আছে মাইলটাক দূরে। কেমন কে জানে।

জায়গাটা এমন বিচ্ছিরি বলেই এখান থেকে তোমাকে আর বদলি করতে ওপরওয়ালা সহজেই রাজি হয়ে গেছে। এখন মরি আমরা এখানে পচে।

নবীনবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, কী আর করা। নিত্যানন্দপুরেই মানিয়ে গুছিয়ে নিতে হবে।

প্রথমদিন বাজার করতে দু-ক্রোশ দূরে গিয়ে বেশ দমেই গেলেন তিনি। জিনিসপত্রের দাম বেশ চড়া। প্রত্যন্ত গাঁ, এখানে জিনিস আনতে ব্যাপারিদের অনেক খরচ হয়। জিনিসপত্র তেমন ভালোও নয়। পাওয়াও যায় না সবকিছু।

বাজারের হাল শুনে গিন্নি চটলেন। বললেন, ‘আবার দরখাস্ত করে অন্য জায়গায় বদলি নাও। এ জায়গায় মানুষে থাকে? মা গো!

নবীনবাবু ফাপড়ে পড়লেন। এখন কী করা যাবে তাই ভাবতে লাগলেন।

একদিন সন্ধ্যেবেলা গিন্নি এসে বললেন, ‘ওগো, খুকি তেলের শিশিটা ভেঙে ফেলেছে। একটি ফোঁটাও তেল নেই আর। রাতে রান্না হবে কী দিয়ে?

তেল পাব কোথায়?

দ্যাখো না একটু খুঁজে পেতে। অনেক গেরস্তবাড়িতে ছোটখাটো জিনিস পাওয়া যায় শুনেছি।

অগত্যা নবীনবাবু বেরোলেন। বেশি লোকের সঙ্গে চেনাজানা হয়নি এখনও। কার বাড়ি যাবেন ভাবছেন। ডান হাতি পথটা ধরে হাঁটছেন। ডান ধারে একটু জঙ্গলমতো আছে। হঠাৎ দেখতে পেলেন, জঙ্গলের একটু ভেতর দিকে একটা আলোই যেন জ্বলছে মনে হল। নবীনবাবু কয়েক পা এগিয়ে ঠাহর করে দেখলেন একখানা ঝাঁপতোলা দোকান বলেই যেন মনে হচ্ছে। নবীনবাবু এগিয়ে গিয়ে দেখলেন, দোকানঘরই বটে। দীনদরিদ্র চেহারা হলেও দোকানই। কালো রোগাপনা কণ্ঠিধারী একজন লোক দোকানে বসে আছে। বিনয়ী মানুষ। নবীনবাবুকে দেখেই টুল থেকে উঠে বলল, আজ্ঞে আসুন।

নবীনবাবু খুশি হলেন। আজকাল বিনয় জিনিসটা দেখাই যায় না। সরষের তেলের খোঁজ করতেই লোকটা বলল, আছে। ভালো ঘানির তেল।

কত দাম? লোকটা হেসে মাথা চুলকে বলল, দাম তো বেশ চড়া। তবে আপনার কাছ থেকে বেশি নেব না। ছটাকা করেই দেবেন।

নবীনবাবু খুবই অবাক হলেন, দু-ক্রোশ দূরের বাজারে তেল দশ টাকা। নবীনবাবু আড়াইশো গ্রাম তেল কিনে আনলেন। গিন্নি তেল পরীক্ষা করে বললেন, বাঃ এ তো দারুণ ভালো তেল দেখছি। কোথায় পেলে গো?

নবীনবাবু বললেন, আরে, কাছেই একটা বেশ দোকানের সন্ধান পেয়েছি। লোকটা বড় ভালো।

লোকটা যে সত্যিই ভালো তার প্রমাণ পাওয়া গেল দুদিন পরেই। ডাল ফুরিয়েছে। সন্ধ্যের পর সেই দোকানে গিয়ে হানা দিতেই বিনয়ী লোকটা প্রায় অর্ধেক দামে ডাল দিল। বলল, আপনাকে অত দাম দিতে হবে না।

নবীনবাবু ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নামই তো জানি না এখনও।

আজ্ঞে, কালাচাঁদ নন্দী। 'কালো' বলেই ডাকবেন।

আপনি কি সব জিনিসই রাখেন কালোবাবু?

যে আজ্ঞে । তবে সন্ধ্যের পর আসবেন। দিনমানে আমি দোকান খুলি না। ও সময়ে আমার চাষবাস দেখতে হয়।

দিন দুই পর গিন্নি হঠাৎ বললেন, ও গো, আজ একটু পোলাও খাওয়ার বায়না ধরেছে ছেলেমেয়েরা। ঘি আর গরম মশলা লাগবে। এনে দেবে নাকি একটু?"

কালোর দোকানে ঘি বা গরম মশলা পাওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছিল নবীনবাবুর। দোনামনা করে গেলেন।

কালাচঁদ বলল, হা-হা, কেন পাবেন না? এক নম্বর ঘি আছে, আর বাছাই গরম মশলা।

দাম?

দাম তো অনেক। তবে আপনাকে অত দিতে হবে না। দশ টাকা করেই দেবেন।

নবীনবাবুর হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল। খানিকক্ষণ কালাচাঁদের সঙ্গে সুখ-দুঃখের কথা বলে তিন ফিরে এলেন। গিন্নি ঘি আর গরম মশলা দেখে খুব খুশি। বললেন, "ওগো, দোকানটা খোকাকে চিনিয়ে দিয়ে তো! দরকার মতো ওকেও পাঠাতে পারব। তা হ্যাঁ গো, দোকানটা কি নতুন খুলেছে? আজ দাস বাড়ির গিন্নি গল্প করতে এসেছিল। কথায় কথায় তাকে কালাচাঁদের দোকানের কথা বললুম। কিন্তু সে তো আকাশ থেকে পড়ল, সাত জন্মে কালাচাঁদবাবুর দোকানের কথা শুনিনি।

হবে হয়তো, নতুনই খুলেছে। আমি খোঁজ নিয়ে বলবখন।

দুদিন পর ফের কালোজিরে আর ময়দা আনতে গিয়ে নবীনবাবু বললেন, তা হা কালাচাঁদবাবু, আপনার দোকানটা কতদিনের পুরোনো?

কালাচাঁদ ঘাড়টাড় চুলকে অনেক ভেবে বলল, তা কম হবে না। ধরুন, এ-গাঁয়ের পত্তন থেকেই আছে।

নবীনবাবুর একটু খটকা লাগল। দোকান যদি এত পুরোনোই হবে তাহলে দাস-গিন্নি এ দোকানের কথা শোনেনি কেন?

কালাচাঁদ যেন তার মনের কথা পড়ে নিয়েই বলল, এ-গাঁয়ে আমার অনেক শত্রু। লোকের কথায় কান দেবেন না।

আচ্ছা তাই হবে।

পরদিন নবীনবাবু দাস বাড়িতে নারায়ণপুজোর নেমন্তন্ন খেয়ে ফেরার পরই গিন্নি বললেন, হ্যাঁ গো তোমার কালাচাঁদের দোকানটা কোথায় বলো তো! খোকাকে কুয়োর দড়ি আনতে পাঠিয়েছিলাম, সে তো দোকানটা খুঁজেই পেল না। পোস্ট অফিসের পিয়ন বিলাস এসেছিল। সেও বলল, ওরকম দোকান এখানে থাকতেই পারে না। বলল নবীনবাবুর মাথাটাই গেছে।

নবীনবাবুর বুকের মধ্যে একটু যেন কেমন করল। মুখে বললেন, কালাচাঁদের সঙ্গে অনেকের শত্রুতা আছে কিনা, তাই ওরকম বলে।

পরদিন টর্চের ব্যাটারি আনতে গিয়ে নবীনবাবু এ-কথা সেকথার পর কালাচাঁদকে বললেন, তা কালাচাঁদবাবু আমার ছেলেও কাল আপনার দোকানটা খুঁজে পায়নি।

কালাচাঁদ বিনয়ের সঙ্গে বলল, আর কাউকে পাঠানোর দরকার কী? নিজেই আসবেন।

ইয়ে অন্যরা সব বলছে যে, কেউ নাকি এ-দোকানের কথা জানে না।

কালাচাঁদ তেমনই মৃদু-মৃদু হেসে বলে, জানার দরকারই বা কী? আপনার ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।

নবীনবাবুর বুকটা একটু দুরুদুরু করে উঠল। বললেন, হ্যাঁ, তা আমি তো আছিই। কিন্তু আমি ছাড়া দ্বিতীয় কোনও খদ্দের কখনও দেখি না। দোকানটা চলে কী করে?

কালাচাঁদ বিনীতভাবে বলল, একজনের জন্যই তো দোকান।

অ্যাঁ!' কালাচাঁদ হাসল, আসবেন।

নবীনবাবু চলে এলেন। কিন্তু তারপর আবার পরদিনই গেলেন। মাসের শেষ, হাতে টাকা নেই। খুব সঙ্কোচের সঙ্গে বললেন, কয়েকটা জিনিস নেব। ধারে দেবেন?

হ্যাঁ-হ্যাঁ, কেন নয়?

পরের মাসে মাইনে পেয়েই দিয়ে যাব।

তাড়া কীসের?

ধারে প্রচুর জিনিস নিয়ে এলেন নবীনবাবু। পরের মাসে ধার শোধ করতে গেলে কালাচাঁদ জিভ কেটে বলল, না না অত নয়। আমার হিসেব সব লেখা আছে। পাঁচটি টাকা মোটে পাওনা। তাও সেটা দুদিন পর হলেও চলবে। বসুন, সুখ-দুঃখের কথা কই। টাকা-পয়সার কথা থাক।

নবীনবাবু খুবই অবাক হলেন। পাঁচ টাকা পাওনা! বলে কী লোকটা! তিনি অন্তত দেড়শো টাকার জিনিস নিয়েছেন।

তা এভাবেই চলল। চাল, ডাল, মশলাপাতি, ঘি, তেল সবই কালাচাঁদের দোকান থেকে আনেন নবীনবাবু। মনোহারি জিনিস, বাচ্চাদের খেলনা, পোশাক, শাক-সবজিও ক্রমে-ক্রমে আনতে লাগলেন। মাছ মাংসও পাওয়া যেতে লাগল কালাচাঁদের আশ্চর্য দোকানে। গিন্নি খুশি। নবীনবাবুর মাইনে অর্ধেকের ওপর বেঁচে যাচ্ছে।

নবীনবাবু একদিন গিন্নিকে বললেন, ওগো নিত্যানন্দপুর থেকে বদলি হওয়ার দরখাস্তটা আর জমা দেওয়া হয়নি।

দিয়ো না। হ্যাঁ গো কালাচাঁদের দোকানটা ঠিক কোথায় বলো তো। আমাকে একদিন নিয়ে যাবে?

নবীনবাবু শশব্যস্তে বললেন, না-না, তোমাদের কারও যাওয়ার দরকার নেই। সকলের কি সব সয়?

গিন্নি চুপ করে গেলেন।

নবীনবাবু নিত্যানন্দপুরেই রয়ে গেলেন।

# কালীচরণের ভিটে

---

**কালীচরণের ভিটে**

কালীচরণ লোকটা একটু খ্যাপা গোছের। কখন যে কী করে বসবে, তার কোনও ঠিক নেই। কখনও সে জাহাজ কিনতে ছোটে, কখনও আদার ব্যবসায় নেমে পড়ে। আবার আদার ব্যবসা ছেড়ে কঁচকলার কারবারে নেমে পড়তেও তার দ্বিধা হয় না। লোকে বলে, কালীচরণের মাথায় ভূত আছে। সেকথা অবশ্য তার বউও বলে। রাত তিনটের সময় যদি কালীচরণের পোলাও খাওয়ার ইচ্ছে হয় তো, তা সে খাবেই।

তা, সেই কালীচরণের একবার বাই চাপল, শহরের ধুলো-ধোঁয়া ছেড়ে দেশের বাড়িতে প্রাকৃতিক পরিবেশে গিয়ে বসবাস করবে। শহরের পরিবেশ ক্রমে দূষিত হয়ে যাচ্ছে বলে রোজ খবরের কাগজে লেখা হচ্ছে। কলেরা, ম্যালেরিয়া, জণ্ডিস, যক্ষ্মা–শহরে কী নেই!

কিন্তু কালীচরণের এই দেশে গিয়ে বসবাসের প্রস্তাবে সবাই শিউরে উঠল। কারণ, যে গ্রামে কালীচরণের আদি পুরুষরা বাস করত, তা একরকম হেজেমজে গেছে। দু-চারঘর নাচার চাষাভুষো বাস করে। কালীচরণদের বাড়ি বলতে যা ছিল, তাও ভেঙেচুরে জঙ্গলে ঢেকে ধীরে ধীরে মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। সেই বাড়িতে গত পঞ্চাশ বছর কেউ বাস করেনি, সাপখোপ, ইঁদুর-ছুঁচো, চামচিকে পাচা ছাড়া।

কিন্তু কালীচরণের গোঁ সাঙ্ঘাতিক। সে যাবেই।

তার বউ বলল, থাকতে হয় তুমি একা থাক গে। আমরা যাব না।

বড় ছেলে মাথা নেড়ে বলল, গ্রাম! ও বাবা, গ্রাম খুব বিশ্রী জায়গা।

মেয়েও চোখ বড় বড় করে বলে, গ্রামে কি মানুষ থাকে?

ছোট ছেলে আর মেয়েও রাজি হল না।

রেগেমেগে কালীচরণ একাই তার সুটকেস গুছিয়ে নিয়ে একদিন বেরিয়ে পড়ল। বলে গেল, আজ থেকে আমি তোমাদের পরস্য পর। আর ফিরছি না।

কালীচরণ যখন গাঁয়ে পৌঁছল, তখন দুপুরবেলা। গ্রীষ্মকাল। স্টেশন থেকে রোদ মাথায় করে মাইলটাক হেঁটে সে গ্রামের চৌহদ্দিতে পৌঁছে গেল। লোকজন প্রায় দেখাই যায় না। চারদিক খাঁ-খাঁ করছে।

গোঁয়ার কালীচরণ নিজের ভিটের অবস্থা দেখে বুঝল যে, এ ভিটেয় আপাতত বাস করা অসম্ভব। চারদিকে নিচ্ছিদ্র জঙ্গলে বাড়িটা ঘেরা। আর বাড়ি বলতেও বিশেষ কিছু আর খাড়া নেই। তবু হার মানলে তো আর চলবে না।

একটা জিনিস এখনো বেশ ভালোই আছে। সেটা হল তাদের বাড়ির পুকুরটা। জল বেশ পরিষ্কার টলটলে, বাঁধানো ঘাট ভেঙে গেলেও ব্যবহার করা চলে। কালীচরণ পুকুরে নেমে হাতমুখ ভালো করে ধুয়ে নিল, ঘাড়ে মাথায় জল চাপড়াল। পুকুরের জলে চিড়ে ভিজিয়ে একড়েলা গুড় দিয়ে খেল। তারপর পুকুরপাড়ে কদমগাছের তলায় বসল জিবরাতে।

একটু ঢুলুনি এসে গিয়েছিল। হঠাৎ একটা পাখির ডাকে চটকা ভেঙে চাইতেই সে সোজা হয়ে বসল। তাই তো! চারদিক জঙ্গলে ঢাকা হলেও উত্তর দিকটায় জঙ্গলের মধ্যে একটা সঁড়ি পথ আছে যেন! মনে হয় লোকজনের যাতায়াত আছে। তাদের বাগানে অনেক ফলগাছ ছিল। হয়তো এখনো সেসব গাছে ফল ধরে, আর রাখাল ছেলেটেলে সেইসব ফল পাড়তে ভেতরে যায়। তাই ওই পথ।

কালীচরণ বাক্স হাতে উঠে পড়ল। তারপর কোলকুঁজো হয়ে বহুকালের পরিত্যক্ত ভিটের মধ্যে গুঁড়ি মেরে সেঁধোতে লাগল।

ভেতরে এসে স্তূপাকার ইট আর ভগ্নস্তূপের সামনে থমকে দাঁড়িয়ে গেল কালীচরণ। তারপর হাঁ করে দেখতে লাগল চারদিকে।

অবস্থা যাকে বলে গুরুচরণ। একখানা ঘরও আস্ত মনে হচ্ছিল না। এর মধ্যে কোথায় যে রাত্রিবাস করবে সেইটেই হল কথা। কালীচরণের সঙ্গে টর্চ, হ্যারিকেন,

লাঠি আছে। ছোট একটা বিছানাও এনেছে সে। রাতটা কাটিয়ে কাল থেকে লোক লাগিয়ে দিলে দিন-সাতেকের মধ্যে জঙ্গল আর আবর্জনা সাফ হয়ে যাবে। রাজমিস্ত্রি ডেকে একটু-আধটু মেরামত করাবে। ভালোই হবে।

কালীচরণ ঘুরে-ঘুরে বাড়িটা দেখতে লাগল। দক্ষিণ দিকে নীচের তলায় একখানা ঘর এখনও আস্ত আছে বলেই মনে হল কালীচরণের। স্তূপাকার ইট আর আবর্জনার ওপর সাবধানে পা ফেলে কালীচরণ এগিয়ে গেল।

বেজায় ধুলো, চামচিকের নাদি, আগাছা সত্ত্বেও ঘরখানা আস্ত ঘরই বটে। মাথার ওপর ছাদ আছে, চারদিকে দেওয়াল আছে। জানলা কপাট অবশ্য নেই। একটু সাফসুতরো করে নিলেই থাকা যায়। দরকার একখানা বঁটার।

তা ঝাঁটাও পাওয়া গেল খুঁজতেই। ঘরের কোণের দিকে পুরোনো একগাছা ঝটা দাঁড় করানো। পাশে একটা কোদাল। তাও বেশ পুরোনো। বোধহয় সেই পঞ্চাশ বছর আগেকার।

কালীচরণ ঘণ্টাখানেকের মেহনতেই ঘরখানা বেশ সাফ করে ফেলল। গা তেমন ঘামলও না। তারপর ঘরখানার ছিরি দেখে মনে হল, এক বালতি জল হলে হত। কিন্তু বালতি!

না, কপালটা ভালোই বলতে হবে। ঘর থেকে বেরোতেই ভাঙা সিঁড়ির নীচে চোখ পড়ল তার দু-খানা জংধরা বালতি উপুড় করা রয়েছে। কালীচরণ যেমন অবাক, তেমনি খুশি হল–যখন দেখল, একটা বালতিতে লম্বা দড়ি লাগানো রয়েছে।

উঠোনের পাতকুয়োটা হেজেমজে যাওয়ার কথা এতদিনে। কিন্তু কপালটা ভালোই কালীচরণের। মজেনি। সে জল তুলে এনে ঘরটা ভালো করে পরিষ্কার করল। তারপর ভাবল, একটা চৌকিটৌকি যদি পাওয়া যেত তো তোফা হতো। আর একটা জলের কলসি।

বলতে নেই, কালীচরণের মনে যা আসছে তাই হয়ে যাচ্ছে আজ। কলসি পাওয়া গেল পাশের ঘরটায়, মুখটা সরা দিয়ে ভালো করে ঢাকা ছিল বলে ভেতরটা এখনো পরিষ্কার। একটু মেজে নিলেই হবে। আর চৌকি নয়, খাটই পাওয়া গেল কোণের দিককার ঘরে। ভাঙা নয় আস্ত খাট। কালীচরণ খাটখানা খুলে আলাদা-আলাদা অংশ বয়ে নিয়ে এসে পেতে ফেলল।

চমৎকার ব্যবস্থা।

সন্ধ্যে হয়ে আসতেই কালীচরণ হ্যারিকেন জ্বেলে ফেলল। চিড়ে খেয়েই রাতটা কাটাবে ভেবেছিল। কিন্তু সন্ধ্যে হতেই প্রাণটা ভাতের জন্য আঁকুপাঁকু করছে। চাল, ডাল, আলু নুন, তেল, সব সঙ্গে আছে। কিন্তু উনুন, কয়লা কাঠ এসব জুটবে কোত্থেকে?

ভাবতে-ভাবতে কালীচরণ উঠল। সবই যখন জুটেছে, তখন এও বা জুটবে না কেন?

বাস্তবিকই তাই, ভেতরের বারান্দার শেষ মাথায় যেখানে রান্নাঘর ছিল, সেখানে এখনও একখানা উনুন অক্ষত রয়েছে। ঘরের কোণে কিছু কাঠ, মন দুয়েক কয়লা পড়ে আছে। আর আশ্চর্য, রান্নাঘরে যে বড় কাঠের বাক্স ছিল সেটা তো আছেই, তার মধ্যে কিছু বাসন-কোসনও রয়ে গেছে।

কালীচরণ দাঁত বের করে হাসল। তারপর গুনগুন করে রামপ্রসাদী গাইতে গাইতে রান্না চড়িয়ে দিল। গরম-গরম ডাল-ভাত আর আলুসেদ্ধ ভরপেট খেয়ে ঘুমে রাত কাবার করে দিল কালীচরণ।

সকালবেলা ঘুম ভেঙে বাইরে আসতেই তার মনে হল, বাড়িটা যেন ততটা ভাঙা আর নোংরা লাগছে না। ধ্বংসস্তূপটা যেন খানিক কমে গেছে, নাকি তার চোখের ভুল!

যাই হোক, কালীচরণ কিছু জঙ্গল পরিষ্কার করল। ভাবল, নিজেই করে ফেলবে, লোক লাগানোর দরকার নেই।

দুপুরবেলা কালীচরণ পুরোনো বাগান খুঁজে কিছু উচ্ছে, কাঁকরোল, ঝিঙে, পটল আর কুমড়ো পেয়ে গেল। দিব্যি ফলে আছে গাছে। পাকা আমও রয়েছে। সুতরাং দুপুরে কালীচরণ প্রায় ভোজ খেয়ে উঠল আজ। তারপর ঘুম।

বিকেলে চারদিক ঘুরে দেখে সে খুশিই হল। অনেকটা জঙ্গল সে নিজে সাফ করে ফেলেছিল। কিন্তু দেখে মনে হচ্ছে, আরও অনেক বেশি আপনা থেকেই সাফ হয়ে গেছে। আবর্জনার স্তূপ প্রায় নেই বললেই হয়। আশ্চর্যের কথা, বাড়িতে আরও কয়েকটা আস্ত ঘর খুঁজে পাওয়া গেল। সেসব ঘরের জানলা দরজাও অটুট। সুতরাং কালীচরণ খুব খুশি। এইরকমই চাই।

তবে সবটা এইরকমই আপনা-আপনি হয়ে উঠলে ভারি লজ্জার কথা। তাই পরদিন কালীচরণ বাজার থেকে গোরুর গাড়িতে করে কিছু চুন সুরকি, ইট আর কাঠ নিয়ে এল। যন্ত্রপাতি বাড়িতেই পেয়ে গেছে সে, টুকটুক করে বাড়িটা সারাতে শুরু করল।

মজা হল, বেশি কিছু তাকে করতে হল না। সে যদি খানিকটা দেয়াল গাঁথে আরও খানিকটা আপনি গাঁথা হয়ে যায়। সে এক দেয়ালের কলি ফেরালে, আরও চারটে দেয়ালের কলি আপনা থেকেই ফেরানো হয়ে যায়।

সুতরাং দেখ-না-দেখ কালীচরণের আদি ভিটের ওপর বাগানওয়ালা পুরোনো বাড়িটা আবার দিব্যি হেসে উঠল। যে দেখে, সে-ই অবাক হয়।

কিন্তু মুশকিল হল, এত বড় বাড়িতে কালীচরণ একা। সারাদিন কথা বলার লোক নেই।

কালীচরণ তাই গ্রাম থেকে গরিব বুড়ো একজন মানুষকে চাকর রাখল। বাগান দেখবে, জল তুলবে, কাপড় কাঁচবে, রান্না করবে। কালীচরণও কথা কইতে পেয়ে বাঁচবে।

লোকটা দিন-দুই পর একদিন রাতে ভয় খেয়ে ভীষণ চেঁচামেচি করতে লাগল। সে নাকি ভূত দেখেছে।

কালীচরণ খুব হাসল কাণ্ড দেখে। বলল, দূর বোকা, কোথায় ভূত?

কিন্তু লোকটা পরদিন সকালেই বিদেয় হয়ে গেল। বলল, সারাদিন জল খেয়ে থাকলেও এ বাড়িতে আর নয়।

কালীচরণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল মাত্র। কিছুদিন আবার একা। কিন্তু কঁহাতক ভালো লাগে। অগত্য কালীচরণ একদিন শহরে গিয়ে নিজের বউকে বলল, একবার চলো দেখে আসবে। সে বাড়ি দেখলে তোমার আর আসতে ইচ্ছে হবে না।

কালীচরণের বউয়ের কৌতূহল হল। বলল, ঠিক আছে চলল। একবার নিজের চোখে দেখে আসি কোন তাজমহল বানিয়েছ।

গায়ে এসে বাড়ির শ্রীছাঁদ দেখে কিন্তু বউ ভারি খুশি। ছেলেমেয়েদেরও আনন্দ ধরে না।

কিন্তু পয়লা রাত্তিরেই বিপত্তি বাধল। রাত বারটায় বড় মেয়ে ভূত দেখে চেঁচাল। রাত একটায় ছোট মেয়ে ভূতের দেখা পেয়ে মূর্ছা গেল। রাত দুটোয় দুই ছেলে কেঁদে উঠল ভূত দেখে। রাত তিনটেয় কালীচরণের বউয়ের দাঁতকপাটি লাগল ভূত দেখে।

পরদিন সকালেই সব ফরসা। বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে শহরে রওনা হওয়ার আগে বউ বলে গেল, আর কখনও এ বাড়ির ছায়া মাড়াচ্ছি না।

কালীচরণ আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারপর আপনমনে বলল, কোথায় যে ভূত, কীসের যে ভূত, সেটাই তো বুঝতে পারছি না।

# কুস্তির প্যাঁচ

## কুস্তির প্যাঁচ

যে লোকটা রোজ ভোররাতে উঠে দেড়শো বুকডন আর তিনশো বৈঠক দেয়, তারপর জিমনাস্টিকস করে, বালির বস্তায় ঘুষি মারে এবং কুংফু ক্যারেট জুডো অভ্যাস করে, তার আবার মর্নিংওয়াকের কি প্রয়োজন, এটা অনেকেরই প্রশ্ন। কিন্তু গোয়েন্দা বরদাচরণ এর জবাব দিতে পারবেন না। তবে এটা ঠিক যে, আজও প্রতিদিন সকালে তাকে দাদুর সঙ্গে প্রাতঃভ্রমণে যেতে হয়। যখন থেকে হাঁটতে শিখেছেন, সেই তখন থেকে আজ অবধি রোজ।

বরদাচরণের দাদুর বয়স পঁচাশি। যৌবনকালে নামকরা কুস্তিগির ছিলেন। অনেক মেডেল কাপ শিল্ড পেয়েছেন। এখনও শালগাছের মতো ঋজু ও প্রকাণ্ড শরীর। রোজ কুড়ুল চালিয়ে দু'মন করে কাঠ কাটেন। পুকুরে ঘণ্টাখানেক সাঁতরান। কুয়ো থেকে বিশ-ত্রিশ বালতি জল তোলেন। যৌবনে গোটা একটা খাসির মাংস খেয়ে ফেলতে পারতেন! ডিম খেতেন দু'ডজন করে। আধ সের ঘি। পাঁচ সের দুধ। এখন আর অত খান না। তবু যা খান, তা তিনটে লোকের খোরাক। সকালে উঠে পরিষ্কার বাতাসে শ্বাস নিয়ে

ফুসফুস পরিষ্কার করতে প্রাতঃভ্রমণ তাঁর নিত্যকর্ম। এখনও তার চুল পাকেনি। দাঁত পড়েনি, চামড়া কোচকায়নি। পঁচাশি বছরেও দিব্যি সুঠাম চেহারা অম্বিকাঁচরণের। তবে কিনা লোকটা একটু বাতিকগ্রস্ত। তাঁর কাছে সবকিছুই সেই আগের মতোই আছে, কিছুই পাল্টায়নি।

এই যে বরদাচরণ এখন পূর্ণযুবক, ইয়া দশাসই লম্বা-চওড়া চেহারা, তার ওপর নামকরা গোয়েন্দা, এসব অম্বিকাঁচরণের খেয়ালেই থাকে না। সকালে উঠেই তিনি দাঁতন করে, পুজোপাঠ সেরে থানকুনিপাতা আর কলি-ওঠা ছোলা খেয়ে হাঁক

দেন, "দাদুভাই ও দাদুভাই।" ডাক শুনে মনে হয় যেন তিন-চার বছর বয়সী নাতিকে ডাকছেন। সেই ডাক শুনে বরদাচরণ গুটিগুটি দাদুর কাছে এসে দাঁড়ান। তারপর দাদুর হাত ধরে পিছু পিছু বেরিয়ে আসেন। দাদু অম্বিকাঁচরণ যেভাবে বহুকাল আগে ছোট বরদাচরণকে সাবধানে নর্দমা পার করাতেন, এখনও তেমনি হাত ধরে নদর্মা পার করে দেন। গাড়িঘোড়া দেখলে বলেন, "সরে এসো দাদুভাই, চাপা দেবে যে!" কুকুর বা গোরু দেখলে হাঁ হাঁ করে ওঠেন, হাতের লাঠিটা আপসাতে আপসাতে বলেন, "যাঃ যাঃ, দাদুভাই ভয় পেয়ে কাঁদবে!"

বরদাচরণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন। কী আর করবেন! পরশুদিনও তিনি একজন ডাকাতকে ধরতে চলন্ত ট্রেন থেকে লাফিয়ে নেমেছেন। গত মাসেই তিনি খুনী রঘুবীর সিংয়ের পিস্তলের মুখে পড়েছিলেন। এই তত সেদিন কুখ্যাত একদল হাইজ্যাকারের পিছু নিয়ে ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের এক বোয়িং সাতশো সাঁইত্রিশ বিমানের একেবারে কেবিনের মধ্যে দুর্দান্ত ফাঁইট করে চারজন বিমান-ছিনতাইকারীকেই ঘায়েল করে এলেন। কিন্তু দাদুকে সে-কথা কে বোঝাবে?

দাদুর সঙ্গে বরদাচরণের এই মর্নিংওয়াক দেখে সবাই ভারী অবাক হয়।

হঠাৎই একদিন একখানা ঘটনা ঘটল। যাকে বলা যায় বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। প্রায় ষাট বছর আগে মুর্শিদাবাদের এক নবাবের বাড়িতে বিখ্যাত পাঞ্জাবী কুস্তিগীর শের সিংকে অম্বিকাঁচরণ হারিয়ে দেন। তাই নিয়ে খুব হৈ-চৈ হয়েছিল। নবাব খুশি হয়ে সোনায় বাঁধানো একখানা কাপ উপহার দিয়েছিলেন অম্বিকাঁচরণকে। এখনকার বাজারে সেই কাপটার দাম হেসেখেলে বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা তো হবেই। অম্বিকাঁচরণ একখানা কাঁচের বাক্সে যত্ন করে কাপটা রেখে দিয়েছিলেন। নিজ হাতে রোজ মোছেন, কেউ এলে দেখান। হঠাৎ একদিন দেখা গেল, কাপটা নেই। তার বদলে কাঁচের বাক্সে একটা চিরকুট পড়ে আছে। তাতে লেখা : "অম্বিকাভাই, লড়াইটায় জোচ্চুরি ছিল। তুমি আমাকে চিত করতে পারেনি। আমার কোমরটা মাটিতে লেগেছিল মাত্র। কিন্তু নবাবের ব্যাপার্টি তখন এমন জগঝম্প বাজনা শুরু করে দিল আর তাই শুনে তুমি জিতেছ ভেবে সব মেয়ে-বউরা এমন শাঁখ বাজাতে আর উলু দিতে লাগল যে, আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম। ওরকম আওয়াজ আমি জীবনে শুনিনি। তোমাকে কাঁধে নিয়ে লোকের সে কী নাচ! আমি নবাবকে অনেকবার বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম যে, লড়াইটা এখনও শেষ হয়নি, কিন্তু কে কার কথা শোনে? নবাব আমাকে আমলই দিলেন না। সেই থেকে মনের মধ্যে আগুন পুষে রেখেছি। ইচ্ছে ছিল তোমাকে

অনেক আগেই হারিয়ে দিয়ে প্রমাণ করি যে, তোমার চেয়ে আমি অনেক বড় কুস্তিগীর। কিন্তু সেই সুযোগ আর এতকালের মধ্যে ঘটে ওঠেনি। নানা ধান্ধায় আমাকে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। তবে সর্বদাই আমি তোমার খোঁজখবর রেখেছি। এতদিন বাদে ফের তোমার পাত্তা মিলেছে। তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসে তোমাকে পেলাম না। দেখলাম, সেই ট্রফিটা তোমার ঘরে আজও সাজানো আছে। দেখে পুরোনো স্মৃতিটা চাগিয়ে উঠল। রক্ত গরম হয়ে গেল, হাত পা নিশপিশ করতে লাগল। সামনে তোমাকে পেলে রদ্দা লাগাতাম। যাই হোক, এই ট্রফিটা আমি আমার বলেই মনে করি। তাই এটা চুপিচুপি নিয়ে যাচ্ছি। এতে যদি তোমার আপত্তি থাকে, তবে আগামীকাল বেলা বারোটার মধ্যে জেমিনি হোটেলের বারো নম্বর ঘরে এসো। ট্রফিটি যদি নিতান্তই ফেরত পেতে চাও, তাহলে আমার সঙ্গে আর-একবার তোমাকে কুস্তি লড়তে হবে। যদি তুমি জেতো, তাহলে তোমাকে ট্রফি তো ফেরত দেবই, ওস্তাদ বলেও মেনে নেব। আর যদি তুমি হারো, তাহলে আমাকে ওস্তাদ বলে সেলাম জানাবে। ইতি শের সিং।”

এই চিরকুট পেয়ে অম্বিকাঁচরণ তো মহা খাপ্পা। বাতাসে ঘুষি ছুঁড়তে ছুঁড়তে বলতে লাগলেন, “ব্যাটা শের সিংয়ের এত সাহস! সেদিন লড়াইতে যে ওর লেংটি খুলে নিইনি, তাই ওর সাত জন্মের ভাগ্যি! এমন প্যাঁচ মেরেছিলাম যে ব্যাটা একেবারে কুমড়ো গড়াগড়ি। আবার বলে কিনা সেদিন ওই নাকি জিতেছিল। আয় না ব্যাটা, এখনও এই বুড়ো বয়সে ভেলকি দেখিয়ে তোকে এরোপ্লেন-পাঁচ মেরে ধোবিপাটে আছড়ে মারতে পারি কি না, দেখে যা!”

বরদাচরণ তাড়াতাড়ি দাদুকে ধরে বসিয়ে পাখার বাতাস-টাতাস দিয়ে একটু ঠাণ্ডা করে বললেন, “সেদিন কী ঘটেছিল তা বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু এতদিন পরে লোকটা আবার কুস্তি লড়তে চায় কেন, সেটাই তো বুঝতে পারছি না। শের সিংয়ের বয়স এখন কত হবে বলো তো?”

অম্বিকাঁচরণ একটু চিন্তা করে বললেন, “আমার চেয়ে বছর পাঁচেকের বড় তো হবেই। তা তার এখন নব্বইয়ের কম না।”

চোখ কপালে তুলে বরদাচরণ বললেন, “নব্বই! এই বয়সেও লোকটা কুস্তি লড়তে চায়? নাঃ দাদু, লোকটা দেখছি সাঙ্ঘাতিক।”

অম্বিকাঁচরণ মাথা নেড়ে বললেন, “সাঙ্ঘাতিক তো বটেই। শের সিংয়ের নাম শের সিং হলো তো খালি হাতে একটা রয়েল বেঙ্গল বাঘ মেরে। আসামের জঙ্গলে বুনো

মোষের সঙ্গেও নাকি একবার হাতাহাতি করেছিল। এমন দাপট ছিল যে, সহজে তার সঙ্গে কেউ লড়তে রাজি হতো না।”

বরদাচরণ বললেন, “এ-রকম লোককে একবার চোখের দেখা দেখে আসার দরকার। চলো দাদু, কাল তোমার সঙ্গে আমিও যাব।”

পরদিন অম্বিকাঁচরণ নাতি বরদাচরণের হাত ধরে বেরিয়ে পড়লেন। জেমিনি হোটেল তাদের বাড়ি থেকে বেশি দূরেও নয়। দোতলায় উঠে বারো নম্বর ঘরের বন্ধ দরজায় ধাক্কা দিয়ে অম্বিকাঁচরণ বাজখাই গলায় চেঁচাতে লাগলেন, “কোথায় শের সিং? বেরিয়ে আয় ব্যাটা। অম্বিকাকে চিনিস না! আজ তোরই একদিন কী আমারই একদিন।”

ঘরের ভিতর থেকে একটা হুঙ্কার শোনা গেল। “এসেছিস? সিংহের গুহায় শেষে ঢুকবার মতো সাহস হলো তোর!”

বলতে বলতে দড়াম করে দরজা খুলে গেল!

শের সিংকে দেখে বরদাচরণের চোখ ছানাবড়া। পঁচাশি বছরেও তার দাদু অম্বিকাঁচরণের স্বাস্থ্য যথেষ্ট ভাল বটে, কিন্তু নব্বইতে শের সিং যেন প্রকৃতই সিংহ। ইয়া বুকের ছাতি, বিশাল দুটো শালখুটির মতো হাত, পাকানো মোচ, বাবরি চুল।

দুজনেই দুজনের দিকে কিছুক্ষণ রোষকষায়িত লোচনে চেয়ে রইলেন। পাছে এখানে দুজনেই লেগে যায়, সেই ভয়ে বরদাচরণ তাড়াতাড়ি দু’জনের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন।

শের সিং জিজ্ঞাসা করলেন, “এটি কে?”

অম্বিকা বললেন, “নাতি।”

শের সিং সঙ্গে সঙ্গে ভারী নরম হয়ে বললেন, “নাতি! তা আগে বলতে হয়। এসো খোকা, এসো, তোমার দাদুর সঙ্গে ঝগড়া আছে বটে, কিন্তু তোমার সঙ্গে তো নেই। তা ছাড়া শিশুরা হচ্ছে জগতের আনন্দ।”

"খোকা" |||||||||| "শিশু" এইসব বিশেষণ শুনে বরদাচরণ হাসবেন কি কাঁদবেন তা বুঝতে পারছেন না।

ঘরে ঢুকে বরদা দেখেন বেশ লম্বাচওড়া চেহারার এক যুবক বসে বসে একটা পেতলের গামলায় পুঁটুনি দিয়ে বাদামের শরবত বানাচ্ছে। শের সিং বললেন, 'অম্বিকা, এই দ্যাখো, এ হচ্ছে আমার নাতি। ও ভাবে, আমি বুড়ো হয়েছি, তাই সব সময়ে সঙ্গে সঙ্গে থাকে।"

অম্বিকাঁচরণ যুবকটির থুতনি নেড়ে দিয়ে বললেন, "বাঃ বাঃ দিব্যি দেখতে হয়েছে তো খোকাটিকে!"

শের সিং বললেন, "কাজিয়া পরে হবে। আগে শরবত খাও।"

অম্বিকা বললেন, "শরবত না হয় খাচ্ছি। কিন্তু আমার বাড়িতে এ কদিন যে দুটো ডালভাত খেতেই হবে শের সিং।"

এরপর দু'পক্ষের বেশ সদ্ভাব হয়ে গেল। অনেকক্ষণ বসে দু'জন নানা কথা কইলেন। হাসিঠাট্টাও হলো। গল্পগুজবে অনেকটা বেলা কাবার করে অম্বিকা উঠলেন। বরদাচরণ স্বস্তির শ্বাস ছাড়লেন, দুই বুড়োর কুস্তিটা বোধহয় এড়ানো গেল।

কিন্তু বিদায় দেওয়ার সময় শের সিং হঠাৎ বললেন, "তাহলে অম্বিকা, কুস্তিটা কবে হচ্ছে?"

অম্বিকাঁচরণ সতেজে বললেন, "যেদিন বলবে। কাল বললে কাল।"

"তাহলে কালই, ভাড়া পিটিয়ে দাও। ফুটবল মাঠে দু'জনে নেমে পড়ব।"

"তাই হবে।"

খবরটা বিদ্যুৎবেগে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। অতীতের বিখ্যাত পালোয়ান শের সিং যে এখনও বেঁচে আছেন তাই অনেকে জানত না, তার ওপর অম্বিকাঁচরণ যে একদা শের সিংকে হারিয়েছিলেন সে খবরও অনেকের অজ্ঞাত। সুতরাং তুমুল উত্তেজনা দেখা দিল। রাতারাতি ফুটবলমাঠের মাঝখানে কুস্তির মাটি তৈরি হয়ে গেল। চারদিকে চেয়ার বেঞ্চি সাজানো হতে লাগল। ভিড় সামলানোর জন্য

বাঁশের বেড়া তৈরি হলো। সকাল থেকে ছেলে-মেয়ে-বুড়ো-বাচ্চা কাতারে কাতারে এসে চারদিকে জায়গা দখল করতে লাগল। পঁচাশি বছরের একজন মানুষের সঙ্গে নব্বই বছর বয়সী আর-একজনের লড়াই। সোজা কথা তো নয়!

কিন্তু মুশকিল হল, অম্বিকাঁচরণের সকাল থেকেই শরীর খারাপ, সকাল থেকেই রোদে বসে বারবার বগলে থার্মোমিটার দিচ্ছেন। বরদাচরণকে ডেকে বলছেন, "দ্যাখ তো দাদু, কত উঠল।"

বরদাচরণ থার্মোমিটার দেখে বলেন, "সাড়ে সাতানব্বইতেই তো দাঁড়িয়ে আছে দেখছি।"

"থার্মোমিটারটা তাহলে একেবারেই গেছে। আমার তো মনে হয় এক শো এক-এর কম না। দে তো, আবার লাগিয়ে দেখি।"

বরদাচরণ দাদুর কপালে হাত দিয়ে বলেন, "রোদে বসে গা একটু গরম হয়েছে বটে, কিন্তু জ্বর বলে তো মনে হয় না।"

অম্বিকাঁচরণ খেঁকিয়ে উঠে বলেন, "তুই জ্বরের কী বুঝিস? এ হলো নাড়ির জ্বর। ভিতরে ভিতরে গুমরে-গুমরে ওঠে।"

বরদাচরণ বুঝলেন, দাদু লড়তে চান না, কিন্তু না লড়লেও নয়। চারদিকে খবর রটে গেছে। কাতারে কাতারে লোক আসছে লড়াই দেখতে।

বরদাচরণ বা অম্বিকাঁচরণ জানেন না যে, ওদিকে শের সিংয়ের শিবিরেও সমস্যা দেখা দিয়েছে। ভোররাত্রি থেকেই শের সিং তার নাতিকে বলছেন, "দ্যাখো ভাই, আমার পেটে খুব ব্যথা হয়েছে।"

নাতি বলল, "জীবনে তোমার কোনোদিন তো পেটে ব্যথা হয়নি দাদু!"

শের সিং খিঁচিয়ে ওঠেন, "হয়নি বলেই কি হতে নেই? আমার দারুণ ব্যথা হয়েছে, মনে হয় কলেরাই হলো বোধহয়।"

"কলেরা হলে তো ভেদবমি হয়।"

"তুই খুব বেশি জেনে গেছিস। কলেরা কতরকমের হয় জানিস? ভিতরে ভিতরে আমার ভেদবমি শুরু হয়ে গেছে।"

নাতি ফাঁপরে পড়ে গেল। লড়াই না হলে যে দাদুর সম্মান থাকবে না।

"বেলা বাড়তে লাগলো। অম্বিকাঁচরণ কম্বলমুড়ি দিয়ে সেই যে শুয়ে পড়েছেন, আর নড়াচড়ার নাম নেই। এদিকে শের সিং সেই যে বাথরুমে ঢুকে দরজা দিয়েছেন, আর বেরোনোর কোনো লক্ষণই দেখা যাচ্ছে না।

অগত্যা বরদাচরণ দাদুর অবস্থার কথা জানাতে শের সিংয়ের কাছে। রওনা হলো, আর শের সিংয়ের নাতিও নিজের দাদুর কথা জানিয়ে ট্রফিটা ফেরত দিয়ে আসতে রওনা হলো অম্বিকাঁচরণের বাড়ি।

বরদাচরণ যখন শের সিংয়ের ঘরে এসে হাজির হলেন, তখনও শের সিং বাথরুমে।

বরদাচরণ খুব বিনয়ী গলায় ডাকলেন, "শেরদাদু! ও শেরদাদু!"

বাথরুমের ভিতর থেকে খুব সতর্ক গলায় শের সিং সাড়া দিলেন, "কে রে? কী চাই?"

বরদাচরণ খুব কুণ্ঠিতভাবে বললেন, "শেরদাদু, আমি বরদাচরণ, আমার দাদু অম্বিকাঁচরণের সকাল থেকেই টাইফয়েড।"

"অ্যাঁ!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, ডাক্তাররা বলছে, ব্যামো খারাপের দিকে যেতে পারে।"

"সত্যি বলছ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

সঙ্গে সঙ্গে বাথরুমের ভিতরে একটা রণহুঙ্কার শোনা গেল। তারপর দড়াম করে দরজা খুলে বেরিয়ে এসে শের সিং হাঃ হাঃ করে অট্টহাস্য হেসে বললেন, "আরে এ তো আমি আগেই জানতাম। অম্বিকার মুরোদ কী তা সেই ষাট বছর আগেই

আমার জানা হয়ে গেছে। লড়াইয়ের নামে যার জ্বর আসে সে আবার মরদ! ছোঃ ছোঃ।”

ওদিকে শের সিংয়ের নাতি কাচুমাচু মুখে গিয়ে অম্বিকাঁচরণের বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে ডাকল, “অম্বিকাদাদু! ও অম্বিকাদাদু!”

“কে?” কম্বলের ভিতর থেকে অম্বিকাঁচরণ ক্ষীণস্বরে বললেন, “কে?”

“আমি শের সিংয়ের নাতি। দাদুর যে ভোর-রাত্রি থেকে খুব ভেদবমি হচ্ছে। ডাক্তার বলছে কলেরা।”

“সত্যি তো?”

“আজ্ঞে সত্যি। দাদু তো বাথরুম থেকে বেরোতেই পারছেন না।”

কম্বলটা এক ঝটকায় নামিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন অম্বিকা। তারপর হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে বললেন, “হবে না? ভয়ের চোটে পেটখারাপ হয়েছে। আমার আগেই জানা ছিল। মুর্শিদাবাদে সেই যে ওকে ধাবিপাটে আছাড় মেরেছিলাম, তা কি আর ও ভুলে গেছে?”

শের সিং আর অম্বিকাঁচরণ দু’জনেই ভাবলেন, লড়াইটা যখন হবেই না তখন ফুটবলমাঠে গিয়ে জনসাধারণের সামনে বুক ফুলিয়ে ওয়াকওভার নিয়ে আসবেন।

দু’জনেই তড়িঘড়ি রওনা হয়ে পড়েলেন আসরে। অম্বিকা জানেন শের সিংয়ের কলেরা। শের সিং জানেন অম্বিকার টাইফয়েড। দুজনেই তাই নিশ্চিন্ত।

ফুটবলমাঠ ভিড়ে ভিড়াক্কার। দুদিক থেকে দু’জনকে ঢুকতে দেখে লোকেরা হৈ-হৈ করে উঠল। অম্বিকা ভাবলেন, তাঁকে দেখেই লোকে হৈ চৈ করছে। শের সিং ভাবলেন, তাঁকে দেখে।

হুঙ্কার দিয়ে দু’জনেই লাফিয়ে পড়লেন দঙ্গলে। তারপরই দু’জনে নির্বাক হয়ে চেয়ে রইলেন পরস্পরের দিকে। কেউই নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

অম্বিকাঁচরণ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে একটা হাত শের সিংয়ের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলেন, “দ্যাখো তো নাড়িটা। জ্বর মনে হয় একশো এক ছাড়িয়ে গেল।”

শের সিং নাড়ি ধরে বললেন, “দুইয়ের কম না। এবার আমার পেটটা একটু টিপে দ্যাখো তো, বড় ব্যথা।”

অম্বিকা শের সিংয়ের পেট টিপে দেখে বললেন, “ও বাবা, কলেরার একেবারে মস্ত একটা ডেলা দেখছি যে!”

ব্যাপারটা বুঝতে জনসাধারণের একটু সময় লাগল বটে, তারপর হোঃ হোঃ করে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল সমস্ত মাঠ।

# কৃপণ

## কৃপণ

কদম্ববাবু মানুষটা যতটা না গরিব তার চেয়ে ঢের বেশি কৃপণ। তিনি চণ্ডীপাঠ করেন কিনা কে জানে, তবে জুতো সেলাই যে করেন সবাই জানে। আর করেন মুচির পয়সা বাঁচাতে। তবে আরও একটা কারণ আছে। একবার এক মুচি তার জুতো সেলাই করতে নারাজ হয়ে বলেছিল, এটা তো জুতো নয়, জুতোর ভূত। ফেলে দিন গে। বাস্তবিকই জুতো এত ভেঁড়া আর তাপ্পি মারা যে সেলাই করার আর জায়গাও ছিল না। কিন্তু কদম্ববাবু দমলেন না। একটা গুণচুঁচ আর খানিকটা সুতো জোগাড় করে নিজেই লেগে গেলেন সেলাই করতে।

জুতো সেলাই থেকেই তাঁর ঝোঁক গেল অন্যান্য দিকে। জুতো যদি পারা যায় তাহলে ছাতাই বা পারা যাবে না কেন? সুতরাং ছেঁড়া ভাঙা ছাতাটাও নিজেই সারাতে বসে গেলেন। এরপর ইলেকট্রিক মিস্ত্রির কাজ, ছুতোরের কাজ, ছুরি-কাঁচি ধার দেওয়া, শিল কাটানো, ফুটো কলসি ঝালাই করা, ছোটখাটো দর্জির কাজ সবই নিজে করতে লাগলেন। এর ফলে যে উনি বাড়ির লোকের কাছে খুব বাহবা পান তা মোটেই নয়। বরং তার বউ আর ছেলেমেয়েরা তার এই কৃপণতায় খুবই লজ্জায় থাকে। বাইরের লোকের কাছে তাদের মুখ দেখানো ভার হয়।

কিন্তু কদম্ববাবু নির্বিকার। পয়সা বাঁচানোর যতরকম পন্থা আছে সবই তার মাথায় খেলে যায়। তাঁর বাড়িতে ঝি-চাকর নেই। জমাদার আসে না। নর্দমা পরিষ্কার থেকে বাসন মাজা সবই কদম্ববাবু, তার বউ বা ছেলেমেয়েরাও করে নেয়।

ছোট ছেলে বায়না ধরল, ঘুড়ি লাটাই কিনে দিতে হবে। কদম্ববাবু একটুও না ঘাবড়ে বসে গেলেন ঘুড়ি বানাতে। পুরোনো খবরের কাগজ দিয়ে ঘুড়ি আর

কৌটো ছাদা করে তার মধ্যে একটা ডাণ্ডা গলিয়ে লাটাই হল। ঘুড়িটা উড়ল না বটে, কিন্তু কদম্ববাবুর পয়সা বেঁচে গেল।

এহেন কদম্ববাবু একদিন অফিস থেকে বাড়ি ফিরছেন। চার মাইল রাস্তা তিনি হেঁটেই যাতায়াত করেন। হাঁটতে-হাঁটতে হঠাৎ মাঝ রাস্তায় কেঁপে বৃষ্টি এল। সস্তা ফুটো ছাতায় জল আটকাল না। কদম্ববাবু ভিজে ভূত হয়ে যাচ্ছিলেন। তাড়াতাড়ি একটা পুরোনো বাড়ির রকে উঠে ঝুল বারান্দার তলায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টির ছাঁট থেকে আত্মরক্ষা করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

হঠাৎ পিছনে প্রকাণ্ড দরজাটা খুলে গেল। একজন বুড়ো মতন লোক মুখ বাড়িয়ে একগাল হেসে বলল, এই যে শ্যামবাবু! এসে গেছেন তাহলে? আসুন, আসুন, ভিতরে আসুন।

কদম্ববাবু তটস্থ হয়ে বললেন, আমি তো শ্যামবাবু নই।

না হলে বা শুনছে কে? কর্তাবাবু দাবার ছক সাজিয়ে বসে আছেন যে! দেরি হলে কুরুক্ষেত্তর করবেন। এই কি রঙ্গ-রসিকতার সময়? আসুন, আসুন।

কদম্ববাবু সভয়ে বললেন, আমি তো দাবা খেলতে জানি না।

লোকটা আর সহ্য করতে পারল না। কদম্ববাবুর হাতটা ধরে দরজার মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, আচ্ছা লোক যা হোক। আপনি রসিক লোক তা আমরা সবাই জানি। তা বলে সবসময়ে কি রসিকতা করতে হয়?

ভেতরে ঢুকে কদম্ববাবুর চোখ ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিল। এইসব পুরোনো বনেদি বাড়িতে তিনি কখনও ঢোকেননি। যেদিকে তাকান চোখ যেন ঝলসে যায়।

মার্বেল পাথরে বাঁধানো মেঝে থেকে শুরু করে ঝাড়বাতি অবধি সবই টাকার গন্ধ ছড়াচ্ছে।

তিনি যে শ্যামবাবু নন, তাঁকে যে ভুল লোক ভেবে এ বাড়িতে ঢোকানো হয়েছে এ কথাটা ভালো করে জোর দিয়ে বলার মতো অবস্থাও কদম্ববাবুর আর রইল না। তিনি চারদিকে চেয়ে মনে-মনে হিসেব করতে লাগলেন, এই মার্বেল পাথরের কত দাম, কত দাম ওই দেয়ালঘড়ির...ভেজা ছাতা থেকে জল ঝরে মেঝে ভিজে যাচ্ছিল। লোকটা হাত বাড়িয়ে ছাতাটা হাত থেকে একরকম কেড়ে নিয়ে বলল,

এঃ শ্যামবাবু, এই ছেঁড়া-তাপ্পি দেওয়া ছাতা কোথা থেকে পেলেন? আপনার সেই দামি জাপানি ছাতাখানার কী হল?

কদম্ববাবু শুধু হতভম্বের মতো বললেন, ‘জাপানি ছাতা?’

লোকটা হঠাৎ তার পেটে একটা চিমটি কেটে বলল, আপনার মতো শৌখিন মানুষ ক’টা আছে বলুন।

ছেঁড়া জুতোয় জল ঢুকে সপ-সপ করছিল। কদম্ববাবু জুতো জোড়া সন্তর্পণে ছেড়ে রাখলেন একধারে।

কিন্তু লোকটার চোখ এড়ানো গেল না। জুতো জোড়া দেখতে পেয়ে লোকটা আঁতকে উঠে বলল, সেই সোনালি সুতোর কাজ করা নাগরা জোড়া কোথায় গেল আপনার? তার বদলে এ কী?

কদম্ববাবু কৃপণ বটে, কিন্তু তিনি নিজেও জানেন যে, তিনি কৃপণ। সাধারণ কৃপণেরা টেরই পায় না যে, তারা কৃপণ। তারা ভাবে যা তারা করছে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কদম্ববাবু তাদের মতো নন। তাই লোকটার কথায় ভারী লজ্জা পেলেন তিনি। এমনকি তিনি যে শ্যামবাবু নন এ কথাটাও হঠাৎ ভুলে গিয়ে বলে ফেললেন, বর্ষাকাল বলে নাগরা জোড়া পরিনি।

লোকটা একটু তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে বলল, যার দেড়শো জোড়া জুতো সে আবার সামান্য নাগরার মায়া করবে এটা কি ভাবা যায়? শ্যামবাবু ভেঁড়া জুতো পরে বাবুর বাড়ি আসছেন, এ যে কলির শেষ হয়ে এল!

কদম্ববাবু এ কথা শুনে সভয়ে আড়চোখে নিজের পোশাকটাও দেখে নিলেন। পরনে মিলের মোটা ধুতি, গায়ে একটা সস্তা ছিটের শার্ট। শ্যামবাবু নিশ্চয়ই এই পোশাক পরেন না। যেন তার মনের কথাটি টের পেয়েই লোকটা হঠাৎ বলে উঠল, নাঃ আজ বোধহয় আপনি ছদ্মবেশ ধারণ করেই এসেছেন, শ্যামবাবু। তা ভালো। বড়লোকদেরও কি আর মাঝে-মাঝে গরিব সাজতে ইচ্ছে যায় না। নইলে শ্যামবাবুর গায়ে তালি মারা জামা, পরনে হেঁটে ধুতি হয় কী করে!

কদম্ববাবু বিগলিত হয়ে হাসলেন। বললেন, ঠিক ধরেছেন বটে।

হলঘরের পর দরদালান। আহা, দরদালানেরও কী শ্রী! দু-ধারে পাথরের সব মূর্তি, বিশাল-বিশাল অয়েল পেন্টিং, পায়ের নীচে নরম কার্পেট।

এসব জিনিস চর্মচক্ষে বড় একটা দেখেননি কদম্ববাবু। তা শুনেছেন। টাকার কতখানি অপচয় যে এতে হয়েছে তা ভেবে তার মাথা ঘুরতে লাগল।

দু-ধারে সারি-সারি ঘর। দরজায় ব্রোকেড বা ওই জাতীয় জিনিসের পর্দা ঝুলছে। দেয়ালগিরি আর ঝাড়লণ্ঠনের ছড়াছড়ি। এক-একটা ঝাড়ের দাম যদি হাজার টাকা করেও হয় কমপক্ষে।...

নাঃ কদম্ববাবু আর ভাবতে পারলেন না।

লোকটা দরদালানের শেষে একটা চওড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠতে-উঠতে বলল, কর্তাবাবুও আজ আপনাকে দেখে মজা পাবেন। যা একখানা ছদ্মবেশ লাগিয়ে এসেছেন আজ!

কদম্ববাবু হেঃ হেঃ করে অপ্রতিভ হাসি হাসলেন। সিঁড়ি যে এরকম বাহারি হয় তা কদম্ববাবুর কল্পনাতেও ছিল না। আগাগোড়া পাথরে বাঁধানো কার্পেটে মোড়া এ সিঁড়িতে পা রাখতেই তার লজ্জা করছিল।

দোতলায় উঠে কদম্ববাবু একেবারে বিমূঢ় হয়ে গেলেন। রাজদরবারের মতো বিশাল ঘর রুপোয় একেবারে রূপের হাট খুলে বসে আছে। যেদিকে তাকান সেদিকেই রুপো। রুপোর ফুলদানি, রুপোর ফুলের টব, রুপোর টেবিল, রুপোর চেয়ার, দেয়ালে রুপোয় বাঁধানো বড়-বড় ফটো।

কদম্ববাবু চোখ পিটপিট করতে লাগলেন।

লোকটা একটু ফিচকে হেসে বলল, হল কী শ্যামবাবুর অ্যাঁ। এ বাড়ি আপনার অচেনা? রুপোমহলে দাঁড়িয়ে থাকলেই কি চলবে? কর্তাবাবু যে সোনামহল্লায় আপনার জন্য বসে থেকে থেকে হেদিয়ে পড়লেন। আসুন তাড়াতাড়ি।

'সোনামহল্লা'! কদম্ববাবুর বেশ ঘাম হতে লাগল শুনে। রুপোমহলেই যে লাখো লাখো টাকা ছড়িয়ে আছে চারধারে।

কিংখাবের একটা পরদা সরিয়ে লোকটা বলল, যান, ঢুকে পড়ুন।

কদম্ববাবু কাঁপতে কাঁপতে সোনামহল্লায় ঢুকলেন। কিন্তু ঢুকেই যে কেন মূর্ছা গেলেন না সেটাই অবাক হয়ে ভাবতে লাগলেন তিনি।

সোনামহল্লার সব কিছুই সোনার। এমনকি পায়ের তলার কার্পেটটায় অবধি সোনার সুতোর কাজ। সোনার পায়াওয়ালা টেবিল, সোনার পাতে মোড়া চেয়ার, সোনার ফুলদানি, সোনার ঝাড়লণ্ঠন। এত সোনা যে পৃথিবীতে আছে তা-ই জানা ছিল না কদম্ববাবুর।

তিনি এমন হাঁ হয়ে গেলেন যে, ঘরের মাঝে একটা বিরাট সোনার টেবিলের ওপাশে যে গৌরবর্ণ পুরুষটি একটা সোনায় বাঁধানো আরাম কেদারায় বসে ছিলেন তাঁকে নজরেই পড়েনি তার।

হঠাৎ একটা গমগমে গলা কানে এল, এই যে শ্যামকান্ত এসো।

কদম্ববাবু ভীষণ চমকে উঠলেন।

চমকানোর আরও ছিল। কর্তাবাবুর সামনে যে দাবার ছকটি পাতা রয়েছে সেটা যে শুধু সোনা দিয়ে তৈরি তা-ই নয়, প্রত্যেকটি খোপে আবার হিরে, মুক্তো, চুনী আর পান্না বসানো। একধারে সোনার খুঁটি, অন্যধারে রুপোর।

প্রত্যেকটি খুঁটির মাথায় আবার এক কুচি করে হিরে বসানো।

বোসো, বোসো হে শ্যামকান্ত। আর সময় নষ্ট করা ঠিক হবে না। মনে আছে তো আজ আমাদের বাজি রেখে খেলা। এই হল আমার বাজি।

এই বলে কর্তাবাবু একটা নীল ভেলভেটে মোড়া বাক্সর ঢাকনা খুলে টেবিলের একপাশে রাখলেন।

কদম্ববাবু দেখলেন, বাক্সের মধ্যে মস্ত একটা মুক্তো। মুক্তো যে এত বড় হয় তা জানা ছিল না তার।

তুমি কি বাজি রাখবে শ্যামবাবু?

কদম্ববাবু আমতা-আমতা করে বললেন, আমি গরিব মানুষ, কী আর বাজি রাখব বলুন।

কর্তাবাবু ঘর ঝাঁপিয়ে হাঃহাঃ অট্টহাসি হেসে বললেন, গরিবই বটে। বছরে যার কুড়ি লাখ টাকা আয় সে আবার কেমন গরিব?

আজ্ঞে আপনার তুলনায় আমি আর কী বলুন!

কর্তাবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন, সে কথাটা সত্যি শ্যামবাবু। আমার মেলা টাকা। এত টাকা যে আজকাল আমার টাকার ওপর ঘেন্না হয়। খুব ঘেন্না হয়।

টাকার ওপর ঘেন্না! কদম্ববাবুর মুখটা হাঁ-হাঁ করে উঠল।

কর্তাবাবু গম্ভীর গলায় বললেন, আজ সকালে মনটা খারাপ ছিল। কিছুতেই ভালো হচ্ছিল না। কী করলুম জানো? দশ লক্ষ টাকার নোট

আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে দিলুম।

অ্যাঁ!

শুধু কি তাই? ছাদে উঠে মোহর ছুঁড়ে কাক তাড়ালুম। তাতে একটু মনটা ভালো হল। তারপর জুড়িগাড়ি করে হাওয়া খেতে বেরিয়ে এক হাজারটা হিরে আর মুক্তো রাস্তায় ছড়িয়ে দিয়ে এলুম।

কদম্ববাবু দাঁতে দাঁত চেপে কোনওরকমে নিজেকে সামাল দিলেন। লোকটা বলে কী!

কর্তাবাবু বললেন, এসো, চাল দাও। তুমি কী বাজি রাখবে বললে?

কদম্ববাবু মুখটা কঁচুমাচু করে ভাবতে লাগলেন। কর্তাবাবু নিজেই বললেন, টাকা-পয়সা হিরে-জহরত তো আমার দরকার নেই। তুমি বরং তোমার পকেটের ওই কলমটা বাজি ধরো।

কলম! কদম্ববাবু শিউরে উঠলেন! মাত্র আট আনায় ফুটপাথ থেকে কেনা। তবু কদম্ববাবু উপায়ান্তর না পেয়ে কলমটাই রাখলেন মুক্তোর উলটোদিকে।

কিন্তু চাল? দাবার যে কিছুই জানেন না কদম্ববাবু।

চোখ বুজে একটা খুঁটি এগিয়ে দিলেন কদম্ববাবু।

কর্তাবাবু বললেন, সাবাস!

কদম্ববাবু চোখ মেলে একটা শ্বাস ছাড়লেন। তারপর বুদ্ধি করে কদম্ববাবুর দেখাদেখি কয়েকটা চাল দিয়ে ফেললেন।

হঠাৎ কর্তাবাবু সবিস্ময়ে বলে উঠলেন, এ কী! তুমি যে কিস্তি দিয়ে বসেছ আমাকে। অ্যাঁ! এ কী কাণ্ড! আমি যে মাত!

তারপরেই কর্তাবাবু হঠাৎ ঘর কাঁপয়ে হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ করে অট্টহাসি হাসতে লাগলেন। সে এমন হাসি যে কদম্ববাবুর মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। ভয়ে চোখও বুজে ফেললেন।

যখন চোখ মেললেন তখন কদম্ববাবু হাঁ।

কোথায় সোনার ঘর? কোথায় রুপোর ঘর? কোথায় সেই ঝাড়বাতি আর দেয়ালগিরি? কোথায় আসবাবপত্র? এ যে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার ভাঙা সোঁদা একটা পোড়ো বাড়ির মধ্যে বসে আছেন তিনি। চারদিকে চুন-বালি খসে ভঁই হয়ে আছে। চতুর্দিকে মাকড়সার জাল। ইঁদুর দৌড়চ্ছে।

কদম্ববাবু আতঙ্কে একটা চিৎকার দিলেন। তারপর ছুটতে লাগলেন।

সেই বাড়িরই এমন দশা কে বিশ্বাস করবে? মেঝেয় পাথর সব উঠে গেছে, সিঁড়ি ভেঙে ঝুলে আছে, দরদালানের দেওয়াল ভেঙে পড়েছে।

কদম্ববাবু পড়ি কি মরি করে ধ্বংসস্তূপ পেরিয়ে কোনওরকমে বাইরের দরজায় পৌঁছলেন। দরজাটা অক্ষত আছে। কদম্ববাবু দরজাটার কড়া ধরে হ্যাঁচকা টান মারতে সেটি খুলে গেল।

কদম্ববাবু রাস্তায় নেমে ছুটতে লাগলেন। বৃষ্টি পড়ছে, তার ছাতা নেই, পায়ে জুতোও নেই। ভাঙা পোড়ো বাড়ির মধ্যে কোথায় পড়ে আছে।

কদম্ববাবু হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। তারপর ভাবতে লাগলেন সত্যিই তো টাকা বাঁচিয়ে হবেটা কী? শেষে তো ওই ভূতের বাড়ি।

বুক ফুলিয়ে কদম্ববাবু একটা দোকানে ঢুকে একটা বাহারি ছাতা কিনে ফেললেন। জুতোর দোকানে ঢুকে কিনলেন নতুন একজোড়া জুতো।

তারপর আবার ভাবতে লাগলেন। শুধু নিজের জন্যে কেনাকাটা করাটা ভালো দেখাচ্ছে না।

তিনি আবার দোকানে ঢুকে গিন্নির জন্য শাড়ি ও ছেলেমেয়েদের জন্য জামা-কাপড়ও কিনে ফেললেন।

মনটা বেশ ভালো হয়ে গেল তাঁর।

# কোগ্রামের মধু পণ্ডিত

### কোগ্রামের মধু পণ্ডিত

বিপদে পড়লে লোকে বলে ত্রাহি মধুসূদন। তা কোগ্রামের লোকেরাও তাই বলত। কিন্তু তারা কথাটা বলত মধুসূদন পণ্ডিতকে। বাস্তবিক মধুসূদন ছিল কোগ্রামের মানুষদের কাছে সাক্ষাৎ দেবতা। যেমনি বামনাই তেজ, তেমনি সর্ববিদ্যা বিশারদ। চিকিৎসা জানতেন, বিজ্ঞান জানতেন, চাষবাস জানতেন, মারণ উচাটন জানতেন, তার আমলে গাঁয়ের লোক মরত না।

সাঁঝের বেলা একদিন কোষ্ঠকাঠিন্যের রুগী কালাবাবু মধুসূদনের বাড়িতে পাঁচন আনতে গেছেন। গিয়ে দেখেন গোটা চারেক মুশকো চেহারার গোঁফওয়ালা লোক উঠানে হ্যারিকেনের আলোয় খেতে বসেছে আর মধুগিন্নী তাদের পরিবেশন করছে। লোকগুলোর চেহারা ডাকাতের মতো, চোখ চারদিকে ঘুরছে, পাশে পেল্লায় পেল্লায় চারটে কাঁটাওলা মুগুর রাখা।

মধু পণ্ডিত বগলাবাবুকে বলল, ওই চারজন অনেক দূর থেকে এসেছে তো, আবার এক্ষুণি ফিরে যাবে, অনেকটা রাস্তা, তাই খাইয়ে দিচ্ছি।

কথাটায় অবাক হওয়ার কিছু নেই। মধু পণ্ডিতের বাড়ির উনুনকে সবাই বলে রাবণের চিতা। জ্বলছে তো জ্বলছেই, অতিথিরও কামাই নেই, অতিথি সৎকারেরও বিরাম নেই। বগলাবাবু বললেন, তা ভাল, কিন্তু আমারও অনেকটা পথ যেতে হবে, পাঁচনটা করে দাও।

মধু পণ্ডিত বলে, আরে বোসো, হয়ে যাবে এক্ষুণি। ঐ চারজন বরং তোমাকে খানিকটা এগিয়ে যাবেখন। শীচনখুড়োকে নিতে এসেছিল, তা আমি বারণ করে দিয়েছি।

বগলাবাবু চমকে উঠে বললেন, শচীনখুড়োকে কোথায় নেবে! খুড়োর যে এখন তখন অবস্থা। এই তিনবার শ্বাস উঠল।

সেইজন্যেই তো নিতে এসেছিল।

বগলাবাবু ভাল বুঝলেন না। পাঁচন তৈরি হল, লোকগুলোও খাওয়া ছেড়ে উঠল।

মধু পণ্ডিত হুকুম করল, এই, তোরা বগলাদাদাকে একটু এগিয়ে দিয়ে যা।

বগলাবাবু কিন্তু কিন্তু করেও ওদের সঙ্গে চললেন। বাড়ির কাছাকাছি এসে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কারা বাবারা?

লোকগুলো পেন্নাম ঠুকে বলল, আজ্ঞে যমরাজার দূত, প্রায়ই আসি এদিক পানে। তবে সুবিধে করতে পারি না। ওদিকে যমমশাইকেও কৈফিয়ত দিতে হয়। কিন্তু মধু পণ্ডিত কাউকেই ছাড়ে না।

সেই কথা শুনে কালাবাবু ভিরমি খেলেন বটে, কিন্তু মধু পণ্ডিতের খ্যাতি আরও বাড়ল।

হরেন গোঁসাইয়ের টিনের চালে একদিন জ্যোৎস্না রাতে ঢিল পড়ল। হরেন গোঁসাই হচ্ছেন গাঁয়ের সবচেয়ে বুড়ো লোক, বয়স দেড়শো বছরের কিছু বেশি। ডাকাবুকো লোক। একদিন লাঠি হাতে বেরিয়ে এসে হাঁক দিলেন, কে রে?

মাথা চুলকোতে চুলকোতে একটা তালগাছের মতো লম্বা সুড়ঙ্গে চেহারার লোক এগিয়ে এসে বলল, আপনারা কী অশৈরী কাণ্ড শুরু করলেন বলুন তো! গাঁয়ের ভূত যে সব শেষ হয়ে গেল।

হরেন গোঁসাই হাঁ করে চেয়ে থেকে বললেন, তার মানে?

মানে আর কী বলব বলুন। ভূতরা হল আত্মা। চিরকাল ভূতগিরি তো তাদের পোয় না। ডাক পড়লেই আবার মানুষের ঘরে গিয়ে জন্ম নিতে হয়। মানুষ মরে আবার টাটকা ছানা-ভূতেরা আসে। তা মশাই এই কোগ্রামে আমরা মোট হাজার খানেক ভূত ছিলাম। কিন্তু গত দেড়শো বছর ধরে একটাও নতুন ভূত আসেনি। ওদিকে একটি একটি করে ভূত গিয়ে মানুষ হয়ে জন্মাচ্ছে। ইদানিং তো একেবারে জন্মের

মড়ক লেগেছে। আজ্ঞে। গত মাস খানেকে এক চোপাটে চুয়াল্লিশটা ভূত গায়েব হয়ে গেল। সর্দার রাগারাগি করবে।

তা আমি কী করব?

লজ্জায় মাথা খেয়ে বলি, আপনারা কি সব মরতে ভুলে গেছেন? আপনার দিকে তাকিয়ে ছিলাম বড় আশা নিয়ে। কিন্তু আপনিও বেশ ধড়িবাজ লোক আছেন মাইরি। তা মধু পণ্ডিতের ওষুধ না খেলেই কি নয়?

ভারী অসন্তুষ্ট হয়ে ভূতটা চলে গেল। কিন্তু কদিন পরই এক রাতে গাঁয়ের লোক সভয়ে ঘুম ভেঙে শুনল, রাস্তা দিয়ে এক অশরীরী মিছিল চলেছে। তাতে স্লোগান উঠছে, মধু পণ্ডিত নিপাত যাক্! নিপাত যাক্। নিপাত যাক্। এ তরুস্তি ঝুটা হ্যাঁয় ভুলো মৎ, ভুলো মৎ, এ এলার্জি ঝুটা হ্যাঁয়! ভুলো মৎ। ভুলো মৎ। মধুর নিদান মানছি না। মানছি না। মানব না।

কিন্তু মাস তিনেক পর একদিন সুড়ুঙ্গে ভূতটা খুব কঁচুমাচু হয়ে মধু পণ্ডিতের বাড়িতে হাজির হল সন্ধ্যে বেলায়।

মধু তামাক খাচ্ছিল, একটু হেসে বলল, কি হে শুনলাম আমার বিরুদ্ধে খুব লেগেছো তোমরা।

পেন্নাম হই পণ্ডিতমশাই, ঘাট হয়েছে।

কী হয়েছে বাপু?

আজ্ঞে একা আমি আর সর্দার ছিলাম গতকাল অবধি। আর সব জন্মের মড়কে গায়েব হয়ে গেছে। কিন্তু কাল রাতে একেবারে সাড়ে সর্বনাশ, আমাদের বুড়ো সর্দার পর্যন্ত মানুষের ঘরে গিয়ে জন্ম নিয়ে ফেলেছে। আমি একেবারে একা।

একা তো ভালই, চরে বরে খা গে। এখন তো তোরই একচ্ছত্র রাজত্ব।

জিব কেটে ভূতটা বলল, কী যে বলেন! একা হয়ে এক প্রাণে আর জল নেই। বড্ড ভয় ভয় করছে আজ্ঞে। খেতে পারছি না, শুতে পারছি না। রাতে শেয়াল ডাকে, প্যাচা ডাকে, আমি কেঁপে কেঁপে উঠি।

তা তোর ভয়টা কিসের?

আজ্ঞে, একা হওয়ার পর থেকে আমার ভূতের ভয়ই হয়েছে, যমরাজের পেয়াদাগুলোও ভীষণ ট্যাটন। একা পেয়ে যাতায়াতের পথে আমাকে ডাঙস মেরে যায়।

ঠিক আছে, তুই বরং আমার সঙ্গেই থাক।

সেই থেকে সুড়ঙ্গে ভূতটা মধু পণ্ডিতের বাড়িতে বহাল হল।

একদিন জমিদার কদম্বকেশরের ভাইপো কুন্দকেশর এসে হাজির। গম্ভীর গলায় বললেন, ওহে মধু, একটা কথা ছিল।

মধু তটস্থ হয়ে বলল, আজ্ঞে বলুন।

আমার বয়স কত জানো?

বেশি বলে তো মনে হয় না।

কুন্দকিশোর একটা শ্বাস ছেড়ে বলেন, পঁচানব্বই, বুঝলে? পঁচানব্বই। আমার কাকা কদম্বকেশরের বয়স জানো?

খুব বেশি আর কী হবে?

তোমার কাছে বেশি না লাগলেও, বেশিই। একশো পঁচিশ বছর।

তা হবে।

আমার কাকা নিঃসন্তান তা তো অত জানো।

মধু পণ্ডিত মাথা চুলকে বলে, তা জানি, উনি গত হলে আপনারই সব সম্পত্তি পাওয়ার কথা।

জানো তাহলে? বাঁচালে, তাহলে এও নিশ্চই জানো কাকার সম্পত্তি পাব এরকম একটা ভরসা পেয়েই আমি গত সত্তরটা বছর কাকার আশ্রয়ে আছি, জানো একদিন জমিদার হয়ে ছড়ি ঘোরাব বলে আমি ভাল করে লেখাপড়া করিনি

পর্যন্ত? একদিন জমিদারনী হবে এই আশায় আমার গিন্নী এখনো বুড়ো বয়সেও সে বাড়িতে ঝি-এর অধম খাটে, তা জানো, আমার বড় ছেলের বয়স পঁচাত্তর পেরিয়েছে। শোনো বাপু, কাকা মরুক এ আমি চাই না। কিন্তু হকের মরাই বা লোকে মরছে না কেন? মরলে আমি কান্নাকাটিও করব, কিন্তু মরবে কোথায়। আর নাই যদি মরে বাপু, তবে অন্তত সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে তো যেতে পারে। বৈরাগী হয়ে পথে পথে দিব্যি বাউল গান তো গেয়ে বেড়াতে পারে। তা তোমার ওষুধে কি সে সবেও বারণ নাকি? তোমার নামে লোকে যে কেন মামলা করে না সেইটেই বুঝি না।

মধু পণ্ডিত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, আপনার বয়স হয়েছে জানি, কিন্তু তাতে ভয় খাচ্ছেন কেন? বয়স তো একটা সংস্কার মাত্র, শরীর যদি সুস্থ সবল থাকে, মানসিকতা যদি স্বাভাবিক থাকে তবে আপনি একশো বছরেও যুবক। উল্টো হলে পঁচিশ বছরেও বুড়ো। এই আপনার কাকাকেই দেখুন না। মোটে তো সোয়া শো বছর বয়স, দেড়শো পেরিয়েও দিব্যি হাঁক ডাক করে বেঁচে থাকবেন।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কুন্দকেশর বললেন, বলছ?

নির্যস সত্যি কথা।

কুন্দকেশর চলে গেলেন। কিছুদিন পর শোনা গেল, তিনি বিরানব্বই বছরের স্ত্রী আর পঁচাত্তর বছরের বড় ছেলের হাত ধরে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেছেন।

সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, প্রচণ্ড বর্ষা নেমেছে আজ। মেঘ ডাকছে। ঝড়ের হাওয়া বইছে। এই দুর্যোগে হঠাৎ মধু পণ্ডিতের দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল। দরজা খুলে মধু একটু অবাক, বেশ দশাসই চেহারার একজন মানুষ দাঁড়িয়ে। গায়ে ঝলমলে জরির পোশাক। ইয়া গোঁপ, ইয়া বাবরি, ইয়া গালপাট্টা, মাথায় একটা ঝলমলে টুপি, তাতে ময়ূরের পালক, গায়ের রং মিশমিশে কালো বটে, কিন্তু তবু লোকটি ভারী সুপুরুষ।

মধু পণ্ডিত হাতজোড় করে বললেন, আজ্ঞে আসুন আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না।

আমি তোমার যম। জলদগম্ভীর স্বরে লোকটা বলল। শুনে মধু পণ্ডিত একটু চমকে উঠল। খুন করবে নাকি? কোমরে একটা ভোজালিও দেখা যাচ্ছে। কাঁপা

গলায় মধু বলল, আজ্ঞে।

লোকটা হেসে বলল, ভয় পেও না বাপু। আমি ভয় দেখাতে আসিনি। বরং বড় ভাইয়ের মত পরামর্শ দিতে এসেছি। তুমি এই গাঁ না ছাড়লে আমি কাজ করতে পারছি না। আমি যে সত্যিই যমরাজা তা বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই।

মধু দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম করে উঠে মাথা চুলকে বলে, আপনার আদেশ শিরোধার্য। কিন্তু শ্বশুরবাড়িটা কোথায় ছিল তা ঠিক মনে হচ্ছে না।

বলো কী! যমের চোখ কপালে উঠল, শ্বশুরবাড়ি লোকে ভোলে?

আজ্ঞে অনেক দিনের কথা তো, দাঁড়ান গিন্নীকে জিজ্ঞেস করে আসি, বলে মধু পণ্ডিত ভিতরবাড়ি থেকে ঘুরে এসে একগাল হেসে বলে, এই বর্ধমানের গোবিন্দপুর। কিন্তু গিয়ে লাভ নেই। আমার শ্বশুর শাশুড়ি গত হয়েছেন।

যমরাজ বলেন, তা শালা-শালীরা তো আছে।

ছিল, এখন আর নেই।

তাদের ছেলে মেয়েরা সব।

আজ্ঞে তারাও গত হয়েছে। তস্য পুত্র-পৌত্রাদিরা আছে বটে। কিন্তু তারাও খুব বুড়ো। গিয়ে হাজির হলে চিনতে পারবে না।

যমরাজ গম্ভীর হয়ে বললেন, তোমার বয়স কত মধু?

আজ্ঞে মনে নেই।

যমরাজ ডাকলেন, চিত্রগুপ্ত! মধুর হিসেবটা দেখ তো।

রোগা সুড়ুঙ্গে একটা লোক গলা বাড়িয়ে বলল, আজ্ঞে দুশো পঁচিশ।

ছিঃ ছিঃ মধু! যমরাজ অভিমানভরে বললেন, এতদিন বাঁচতে তোমার ঘেন্না হওয়া উচিত ছিল। থাকগে আমি তোমাকে কিছু বলব না। পৃথিবীর নিয়ম ভেঙে চলছ চলো। মজা টের পাবে।

যমরাজ চলে গেলেন। মধু কিছুদিনের মধ্যেই টের পেতে লাগলো।

হয়েছে কি, মধুর ওষুধ যে শুধু মানুষ খায় তা নয়। রোদে শুকুতে দিলে পাখিপক্ষী খায়, ঘরে রাখলে পিঁপড়ে ধেড়ে ইঁদুরেও ভাগ বসায়। তাদেরও হঠাৎ আয়ু বাড়তে লাগল। কোগ্রামের মশা মাছি পর্যন্ত মরত না। বরং দিন দিন মশা, মাছি, পিঁপড়ে, ইঁদুর ইত্যাদির দাপট বাড়তে লাগল। আরও মুস্কিল হল জীবাণুদের নিয়ে। কলেরা রুগীকে ওষুধ দিয়েছে মধু, তা সে ওষুধ কলেরার পোকাও খানিকটা খেয়ে নেয়। ফলে রুগীও মরে না, কিন্তু তার কলেরাও সারতে চায় না। সান্নিপাতিক রুগীরও সেই দশা, কোগ্রামে ঘরে ঘরে রুগী দেখা দিতে লাগল। তারা আর ওঠা হাঁটা চলা করতে পারে না। কিন্তু ওষুধের জোরে বেঁচে থাকে।

এক শীতের রাতে আবার যমরাজা এলেন।

মধু! কী ঠিক করলে?

আজ্ঞে লোকে বড় কষ্ট পাচ্ছে।

তা তো একটু পাবেই। এখনো বলো যমের সঙ্গে পাল্লা দিতে চাও কিনা।

শশব্যস্ত দণ্ডবত হয়ে মধু পণ্ডিত বলে, আজ্ঞে না। তবে এখন যদি ওষুধ বন্ধ করি তবে চোখের পলকে গাঁ শ্মশান হয়ে যাবে। একশ বছর বয়সের নীচে কোনো লোক নেই।

যমরাজা গম্ভীর হয়ে বলেন, তা একটা ভাববার কথা বটে। তোমার এত প্রিয় গাঁ তাকে শ্মশান করে দিতে কি আমারই ইচ্ছে? তবে একটা কথা বলি মধু। যেমন আছো থাকো সবাই। তবে গাঁয়ের বাইরে মাতব্বরি করতে কখনো যেও না। আমি গণ্ডি দিয়ে গেলাম। শুধু এই কোগ্রামের তোমরা যতদিন খুশি বেঁচে থাকো। অরুচি যতক্ষণ না হয়। তবে বাইরের কেউ এই গাঁয়ের সন্ধান পাবে না। কানাওলা ভূত চারদিকে পাহারা থাকবে। কোনো লোক এদিকে এসে পড়লে অন্য পথে তাদের ঘুরিয়ে দেবে।

মধু দণ্ডবত হয়ে বলে, যে আজ্ঞে ।

সেই থেকে আজও শোনা যায়, কোগ্রামের কেউ মরে না। কিন্তু কোথায় সেই গ্রাম তা খুঁজে খুঁজে লোকে হয়রান। আজও কেউ খোঁজ পায়নি।

# কৌটোর ভূত

**কৌটোর ভূত**

জয়তিলকবাবু যখনই আমাদের গাঁয়ের বাড়িতে আসতেন তখনই আমরা, অর্থাৎ ছোটরা ভারি খুশিয়াল হয়ে উঠতুম।

তখনকার, অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ বছর আগের পূর্ববঙ্গের গাঁ-গঞ্জ ছিল আলাদা রকম, মাঠ-ঘাট খাল-বিল, বন-জঙ্গল মিলে এক আদিম আরণ্যক পৃথিবী। সাপখোপ জন্তু-জানোয়ার তো ছিলই, ভূত-প্রেতেরও অভাব ছিল না। আর ছিল নির্জনতা।

তবে আমাদের বিশাল যৌথ পরিবারে মেলা লোকজন, মেলা কাচ্চাবাচ্চা। মেয়ের সংখ্যাই অবশ্য বেশি। কারণ বাড়ির পুরুষেরা বেশির ভাগই শহরে চাকরি করত, আসত কালেভদ্রে। বাড়ি সামাল দিত দাদু টাদু গোছের বয়স্করা। বাবা-কাকা-দাদাদের সঙ্গে বলতে কি আমাদের ভাল পরিচয়ই ছিল না, তারা প্রবাসে থাকার দরুন ।

বাচ্চারা মিলে আমরা বেশ হৈ-হুঁল্লোড়বাজিতে সময় কাটিয়ে দিতাম। তখন পড়াশুনার চাপ ছিল না। ভয়াবহ কোন শাসন ছিল না। যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু অভাব ছিল একটা জিনিসের। আমাদের কেউ যথেষ্ট পাত্তা বা মূল্য দিত না।

জয়তিলকবাবু দিতেন, আত্মীয় নন, মাঝে মধ্যে এসে হাজির হতেন। কয়েকদিন থেকে আবার কোথায় যেন উধাও হতেন। কিন্তু যে কয়েকটা দিন থাকতেন বাচ্চাদের গল্পে আর নানারকম মজার খেলায় মাতিয়ে রাখতেন।

মাথায় টাক, গায়ের রঙ কালো, বেঁটে, আঁটো গড়ন আর পাকা গোঁফ ছিল তার। ধুতি আর ফতুয়া ছিল বারোমেসে পোশাক, শীতে একটা মোটা চাদর। সর্বদাই একটা বড় বোঁচকা থাকত সঙ্গে। শুনতাম তার ফলাও কারবার। তিনি নাকি

সবকিছু কেনেন এবং বেচেন। যা পান তাই কেনেন, যাকে পান তাকেই বেচেন। কোনো বাছাবাছি নেই।

সেবার মাঘমাসের এক সকালে আমাদের বাড়ি এসে হাজির হলেন। এসেই দাদুকে বললেন, গাঙ্গুলিমশাই, এবার কিছু ভূত কিনে ফেললাম।

দাদু কানে কম শুনতেন, মাথা নেড়ে বললেন, খুব ভাল। এবার বেচে দাও।

জয়তিলক কাঁচুমাচু মুখ করে বললেন, সেটাই তো সমস্যা। ভূত কেনে কে? খদ্দের দিন না।

–খদ্দর? না বাপু ওসব আমি পরি না, স্বদেশীদের কাছে যাও।

–আহা, খদ্দর নয়, খদ্দের, মানে গ্রাহক।

–গায়ক। না বাপু, গান বাজনা আমার আসে না।

জয়তিলক অগত্যা ক্ষান্ত দিয়ে আমাদের সঙ্গে এসে জুটলেন। তিনি ভূত কিনেছেন শুনে আমাদের চোখ গোল্লা গোল্লা। ঘিরে ধরে 'ভূত দেখাও, ভূত দেখাও' বলে মহা সোরগোল তুলে ফেললুম।

প্রথমে কিছুতেই দেখাতে চান না। শেষে আমরা ঝুলোঝুলি করে তার গোঁফ আর জামা ছিঁড়ে ফেলার উপক্রম করায় বললেন, আচ্ছা আচ্ছা, দেখাচ্ছি। কিন্তু সব ঘুমন্ত ভূত, শুকিয়ে রাখা।

সে আবার কী?

আহা, যেমন মাছ শুকিয়ে শুঁটকি হয় বা আম শুকিয়ে আমসি হয় তেমনই আর কি। বহু পুরনো জিনিস।

জয়তিলক তার বোঁচকা খুলে একটা জংধরা টিনের কৌটো বের করলেন। তারপর খুব সাবধানে ভেতরে উঁকি মেরে দেখে নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, বেশি গোলমাল কোরো না, এক এক করে উঁকি মেরে দেখে নাও। ভূতেরা জেগে গেলেই মুস্কিল।

কী দেখলুম তা বলা একটা সমস্যা। মনে হল শুকনো পলতা পাতার মত চার-পাঁচটা কেলেকুষ্টি জিনিস কৌটোর নীচে পড়ে আছে। কৌটোর ভিতরটা অন্ধকার বলে ভাল বোঝা গেল না। জয়তিলক টপ করে কৌটোর মুখ এঁটে দিয়ে বললেন, আর না। এসব বিপজ্জনক জিনিস।

বলাবাহুল্য, ভূত দেখে আমরা আদপেই খুশি হইনি। আমরা সিদ্ধান্ত নিলুম যে, ওগুলো মোটেই ভূত নয়। জয়তিলকবাবুকে ভালমানুষ পেয়ে কেউ ঠকিয়েছে।

জয়তিলকবাবু মাথা নেড়ে বললেন, না হে, ঠকায়নি। চৌধুরী বাড়ির বহু পুরনো লোক হল গোলোক। সারাজীবন কেবল ভূত নিয়ে কারবার। তার তখন শেষ অবস্থা, মুখে জল দেওয়ার লোক নেই। সেই সময়টায় আমি গিয়ে পড়লাম। সেবাটেবা করলাম খানিক, কিন্তু তার তখন ডাক এসেছে। মরার আগে আমাকে কৌটোটা দিয়ে বলল, তোমাকে কিছু দিই এমন সাধ্য নেই। তবে কয়েকটা পুরোনো ভূত শুকিয়ে রেখেছি। এগুলো নিয়ে যাও, কাজ হতে পারে। ভূতগুলোর দাম হিসেব করলে অনেক। তা তোমার কাছ থেকে দাম নেবোই বা কি করে, আর নিয়ে হবেই বা কী। তুমি বরং আমাকে পাঁচ টাকার রসগোল্লা খাওয়াও। শেষ খাওয়া আমার।

এই বলে জয়তিলকবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

আমরা তবু বিশ্বাস করছিলুম না দেখে জয়তিলকবাবু বললেন, মরার সময় মানুষ বড় একটা মিছে কথা বলে না।

তবু আমাদের বিশ্বাস হল না। কিন্তু সেকথা আর বললুম না তাকে।

দুপুরবেলা যখন জয়তিলকবাবু খেয়ে দেয়ে খুঁড়ি ভাসিয়ে ঘুমোচ্ছেন ঠিক সেই সময়ে আমি আর বিশু তার ভূতের কৌটো চুরি করলুম। এক দৌড়ে আমবাগানে পৌঁছে কৌটো খুলে ফেললুম। উপুড় করতেই পাঁচটা শুকনো পাতার মত জিনিস পড়ল মাটিতে। হাতে নিয়ে দেখলুম, খুব হাল্কা। এত হাল্কা যে জিনিসগুলো আছে কি নেই তা বোঝা যায় না। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে মনে হল, এগুলো পাতা-টাতা নয়। অনেকটা ঝুল জাতীয় জিনিস, তবে পাক খাওয়ানো, বেশ ঠাণ্ডাও।

বিশু বলল, ভূত কিনা তা প্রমাণ হবে যদি ওগুলো জেগে ওঠে।

–তা জাগাবি কী করে?

—আগুনে দিলেই জাগবে। ছ্যাকার মত জিনিস নেই। আমরা শুকনো পাতা আর ডাল জোগাড় করে কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন জ্বেলে ফেললুম। আঁচ উঠতেই প্রথমে একটা ভূতকে আগুনের মধ্যে ফেলে দিলুম।

প্রথমে একটা উৎকট গন্ধ উঠল। তারপর আগুনটা হঠাৎ হাত দেড়েক লাফিয়ে উঠল। একটু কালো ধোঁয়া বেরিয়ে এল। তারপরই হড়াস করে অন্তত সাড়ে পাঁচ ফুট উঁচু একটা কেলে চেহারার বিকট ভূত আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। চোখ দুখানা কটমট করছে।

ওরে বাবা রে। বলে আমরা দৌড়তে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলুম। পড়ে গিয়ে দেখলুম জ্যান্ত ভূতটা আর চারটে ঘুমন্ত ভূতকে তুলে আগুনে ফেলে দিচ্ছে।

চোখের পলকে পাঁচ পাঁচটা ভূত বেরিয়ে এল। তারপর হাসতে হাসতে তারা আমবাগানের ভেতর দিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

ঘটনাটির কথা আমরা কাউকেই বলিনি। জয়তিলকবাবুর শূন্য কৌটোটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে এলুম।

সেই রাত্রি থেকে আমাদের বাড়িতে প্রবল ভূতের উপদ্রব শুরু হয়ে গেল।

রান্নাঘরে ভূত, গোয়ালে ভূত, শোয়ার ঘরে ভূত, পুকুরে ভূত, কুয়োপাড়ে ভূত। এই তারা হি হি করে হাসে, এই তারা মাছ চুরি করে খায়। এই ঝি-চাকরদের ভয় দেখায়। সে ভীষণ উপদ্রব। ভূতের দাপটে সকলেই তটস্থ।

জয়তিলকবাবু এইসব কাণ্ড দেখে নিজের কৌটো খুলে মাথায় হাত দিয়ে বসলেন, বললেন, এঃ হেঃ, ভূতগুলো পালিয়েছে তাহলে : ইস, কী দারুণ জাতের ভূত ছিল, বেচলে মেলা টাকা পাওয়া যেত। নাঃ ভূতগুলোকে ধরতেই হয় দেখছি।

এই বলে জয়তিলকবাবু মাছের জাল নিয়ে বেরোলেন। ভূত দেখলেই জাল ছুঁড়ে মারেন। কিন্তু জালে ভূত আটকায় না। জয়তিলকবাবু আঠাকাঠি দিয়ে চেষ্টা করে দেখলেন। কিন্তু ভূতের গায়ে আঠাও ধরে না। এরপর জাপটে ধরার চেষ্টাও যে না করেছেন তাও নয়। কিন্তু কিছুতেই ভূতদের ধরা গেল না।

দুঃখিত জয়তিলকবাবু কপাল চাপড়ে আবার শুঁটকি ভূতের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। পাঁচ পাঁচটা ভূত দাপটে আমাদের বাড়িতে রাজত্ব করতে লাগল।

# খবরের কাগজ

---

**খবরের কাগজ**

বলা হয় ট্রেন দুর্ঘটনার তদন্ত হবে। হয়। বলা হয়, বিমান দুর্ঘটনার তদন্ত হবে। হয়। হয়েও শেষ পর্যন্ত অবশ্য তাতে লাভ হয় না। শুধু জানা যায়, হয় যান্ত্রিক গোলযোগে নয়তো কারো অসাবধানতায় দুর্ঘটনা হয়েছিল। তাতে একটা মরা মানুষও বাঁচে না, একটা কাটা ঠ্যাংও জোড়া লাগে না। তবে মৃতের আত্মীয়-স্বজনরা কেউ কেউ হয়তো ফাঁকতালে ক্ষতিপূরণবাবদ কিছু টাকা পেয়ে যায়।

যেমন পেয়েছিল গৌরী।

বন্যা কেন হল? ঝড় কেন এল? ক্যানসারের ওষুধ কবে বেরোবে? মহামারি কেন? আগুন কি করে লাগল? ছাদ কেন ধসে পড়ল? ভূমিকম্প কেন ঘটছে? খুন হল কেন? এই সব ভাবতে ভাবতে প্রত্যেকদিন শ্যামাচরণ একটু একটু বুড়ো হয়ে যাচ্ছে। সকাল থেকে খবরের কাগজ তার বগলে। যখনই ফঁক পায় তখনই খুলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে।

নদীর ধারে বটতলায় সুশীতল গন্ধবণিক দোকান দিয়েছে। সেখানে গিয়ে বসলে নতুন ছাঁচবেড়ার গন্ধ নাকে আসে। মিষ্টি গন্ধটি। নদীর পাড়ে গায়ে গায়ে বাঁশ পুঁতে মাটি ফেলে কাঁচা বাঁধ দেওয়া হয়েছে। কাঠের পাটাতনের ঘাটে নৌকো এসে লাগে। বড় নৌকো, ছোটো নৌকো। মাল্লারা নৌকো ঘাটে বেঁধে উঠে আসে। মানুষজন মাল খালাস করে। আবার বোঝাইও হয়। ছোটো নৌকোয় দূর গ্রামগঞ্জের যাত্রীরা গিয়ে ওঠে। কারো মাথায় খোলা ছাতা। নদীর জলের আঁশটে গন্ধ আসে। হু-হু বাতাসও।

সুশীতলের দোকানে বসে খবরের কাগজটা ভাল করে পড়া যায় না। বাতাসের চোটে বড় বড় পাতা ওলটপালট খায়। তা ছাড়া আছে কিছু বেহায়া লোক, খবরের কাগজ দেখলেই যারা হাত বাড়িয়ে বলে কাগজটা একটু দেবেন, দেখব?

খবরের কাগজে শ্যামাচরণ যে কী খোঁজে তা সে নিজেও ভাল করে জানে না। কিন্তু প্রতিদিন আগাপস্তলা কাগজটা সে যখন খুঁটিয়ে পড়ে তখন তার মনটা যেন কিছু একটা খোঁজে।

.

গন্ধবণিকের দোকানে সাত গাঁয়ের লোক আসে। তাদের কেউ বা শ্যামাচরণের চেনা, কেউ আধচেনা, কেউ একেবারেই অচেনা। গঞ্জের বাজারে সকলের ট্যাকের টিকি বাঁধা। আলু সুপুরি ধান পাট যার যা আছে সব নৌকো বোঝাই করে নিয়ে আসে। ঘাটে খুব জটলা হয়। তারপর মানুষজন একটু দম নিতে ঘাটের দোকানে দোকানে গিয়ে বসে, চা খায়, গল্পসল্প করে, কাজকারবারের খবর আদান-প্রদান হয়।

ঘাটের ধারে বসে থাকতে শ্যামাচরণের বেশ লাগে। এই বসে থাকতে থাকতেই কত লোকের সঙ্গে চেনা-জানা হয়ে যায়, কত নতুন নতুন খবর শোনে, অচেনা জায়গার বিবরণ পেয়ে যায়, নতুন সব চরিত্রকে জানা হয়। গন্ধবণিকের পো খাতিরও করে খুব। শ্যামাচরণ যে একসময়ে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ছিল তা বেশ মনে রেখেছে সুশীতল।

তবে সে-সব কথা শ্যামাচরণ নিজেই ভুলে যায়। তার জীবনটা হল বসতি উঠে যাওয়া গায়ের মতো। সেখানে এককালে অনেক লোক গমগম করে বাস করত, এখন সব বাস-বসত তুলে নিয়ে গেছে। ফঁকা।

গৌরী হল শ্যামাচরণের বড় মেয়ে। প্রথম পক্ষের। আরো দুটো ছেলেমেয়ে আছে তার। তারা দ্বিতীয় পক্ষের। রেবন্ত হল তার সন্থান ও একমাত্র ছেলে, ফরাসডাঙ্গা কলেজের লেকচারার। ছেলে সেখানে বৌ নিয়ে থাকে, কালেভদ্রে আসে, মাসান্তে পঁচাত্তরটা টাকা পাঠিয়ে খালাস। ছোটো মেয়ে পার্বতী তার স্বামীর সঙ্গে নবাবগঞ্জে থাকে। চিঠিটাও লেখে না।

বড় মেয়ে গৌরীরই যা একটু টান ছিল বাপের ওপর বরাবর। সে শ্বশুরবাড়ি থেকে যখন তখন চলে আসত বাপকে দেখতে। বরকে লুকিয়ে টাকা পাঠাত বাবাকে। তিন সন্তানের মধ্যে গৌরীর ওপরে শ্যামাচরণের টান ছিল সবচেয়ে বেশি।

গৌরীর বর সোমনাথ ছিল পুলিশের এ. এস. আই.। ছেলে হিসেবে ভালই। অতি সুপুরুষ, সাহসী, সৎ। প্রাণে দয়ামায়া ছিল, ভক্তি ছিল। খড়গপুর লাইনের এক রাত্রে গাড়ি লাইন ছেড়ে মাঠে নেমে গেল। ছখানা বগি উল্টে বিশজন মানুষ দলা পাকিয়ে একশা। সেই দলা পাকানো মানুষের মধ্যে একজন ছিল সোমনাথ।

কিন্তু সোমনাথই কি? শ্যামাচরণের এই সন্দেহটা আজও যায়নি। সে ট্রেনে সোমনাথ ছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু তার লাশ শেষপর্যন্ত কেউ শনাক্ত করতে পারেনি। একটা ভাঙাচোরা থ্যাঁতলানো লাশ তাদের হাতে সকারের জন্য তুলে দেওয়া হয়েছিল বটে কিন্তু সেই লাশটার নাকের বাঁ পাশে কোনো আঁচিল ছিল না। অথচ সোমনাথ হলে আঁচিলটা থাকার কথা।

গৌরীকে কথাটা ভেঙে কোনোদিনই বলেনি শ্যামাচরণ। বলে দিলে গৌরী হয়তো খুব আশায় আবার বুক বাঁধবে। আসলে সে লাশটা না হোক, সেই দুর্ঘটনায় দলা পাকানো অন্য লাশগুলোর মধ্যে একটা

একটা সোমনাথের হবেই। কারণ, বেঁচে থাকলে সে নিশ্চয়ই ফিরে আসত এতদিনে। মরেই গেছে, তাই আর আঁচিলটার কথা শ্যামাচরণ তোলেনি।

গৌরী কিছু টাকা পেয়ে গেল। থোক কয়েক হাজার টাকা। সেই টাকা পেয়ে সোজা বাপের বাড়িতে উঠল এসে। সেই বছরই শ্যামাচরণের চাকরির এক্সটেনশন শেষ হয়ে গেল। নদীর ধারে এই বড় গঞ্জে চাকরির শেষ পাঁচ-ছ বছর কেটেছে। তাই এখানেই ছোটো মতো একটা বাড়ি সস্তায় পেয়ে কিনে ফেলেছিল সে। শেষ জীবনটা নিঝঞ্ঝাটে কাটাবে ইচ্ছে ছিল। কিন্তু ঠিক শ্যামাচরণের অবসরের জীবন শুরুর মুখে পাহাড় প্রমাণ ঝাট বুকে করে গৌরী এল।

শ্যামাচরণের স্ত্রী গৌরীকে খুব ভাল চোখে দেখে না। দুই ছেলে-মেয়ে নিয়ে গৌরী বাপের ঘাড়ে ভর করেছে দেখে শ্যামাচরণের স্ত্রী ক্ষমা বড় মনমরা হয়ে গেল। সেই থেকে সংসারে শান্তি নেই। সজ্ঞাকে ভয় খাওয়ার মেয়ে তো আর গৌরী নয়। সে পাঁচ কথা শোনাতে জানে। ক্ষমারও গলায় তেজ আছে।

তাই শ্যামাচরণ শোক ভুলে এখন বাড়ির বাইরেই থাকে বেশি। বাড়িতে যেটুকু সময় থাকে নাতি-নাতনি নিয়ে কেটে যায়। আর জীবনের বড় সময়টা কাটে কী যেন একটা খুঁজে।

আজকাল অশান্তির ভরা তার পরিপূর্ণ হয়েছে। গৌরীর বয়স বেশি নয়। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বড় জোর। চেহারাটা এখনো ঢলঢলে। এক নজরে তেইশ-চব্বিশের বেশি মনে হয় না। একে বয়সটা খুব নিরাপদ নয়, তার ওপরে সম্মায়ের সঙ্গে ঝগড়া। দুইয়ে মিলিয়ে মেয়েটার মধ্যে একটা খারাপ রোগ চেপেছে। রাজ্যের ছেলে-ছোকরাকে টলায়। তাদের মধ্যে একজন আছে কাদাপাড়ার ভূষির পাইকার বিনয় হালদারের মেজ ছেলে। ডান হাতে ঘড়ি বেঁধে মোটরবাইক হাঁকিয়ে যখন তখন আসে, গৌরীর সঙ্গে হি হি হো হো আড্ডা মারে, ক্যারিয়ারে চাপিয়ে নিয়ে যায় এধার ওধার। গঞ্জে ঢিঢ়ি।

শ্যামাচরণ আজকাল নিজের সঙ্গেই কথা বলে বেশি, যখন কথা বলার আর লোক পায় না। বুড়ো মানুষের কথা শোনবার জন্য কে-ই বা কাজ কারবার ফেলে বসে থাকবে?

গঞ্জের ঘাটটা সেদিক দিয়ে বড় ভাল। নদীতে স্রোত আছে, জীবনটাও এখানে বেশ বয়ে যায়। কিছু গড়ায় না, থেমে থাকে।

গোবিন্দনগর থেকে বেগুনের চাষী মফিজুল মাল গস্ত করতে এসেছে। চা খেতে খেতে বলল–এবার একদম জল হল না। পোকায় পোকায় সাড়ে সর্বনাশ।

সাড়ে সর্বনাশ কথাটা মফিজুলের নিজের। সর্বনাশের ওপর আরো কিছু বোঝায়।

সে জলের জন্য নয়। তুমিও যেমন, বাসন্তীর মাস্টারমশাই হরিপদ বলে–এ হল কেমিক্যাল সারের গুণ। যত সার তত পোকার উৎপাত। আবার পোকা মারতে ওষুধ কেনো। এসব হচ্ছে বড় ব্যবসাদারদের কৌশল বুঝলে! সার দিয়ে পোকা জন্মাচ্ছে, আর সেই পোকা মারতে বিষও কেনা করাচ্ছে। দুমুখো লাভ।

মফিজুল শ্যামাচরণের দিকে চেয়ে বলে-হাকিম সাহেব, কি বলেন?

শ্যামাচরণ কী আর বলবে? জগৎ-সংসারের খবর এখন আর সে তেমন রাখে না। যে যা বলে তাই হক কথা বলে মনে হয়। এমন কি আজকাল ভূতের গল্প শুনে ‘হু’

দেয়, মনটা ওই একরকম ধারা হয়ে গেছে। সেই লাশটার মুখে আঁচিল ছিল না–এ কথাটা আজকাল বড় মনে পড়ে।

শ্যামাচরণ বসে চাষী সঙ্গীদের কথা শোনে, দু'চারটে কথা নিজেও বলে। বাদবাকি সময় খবরের কাগজ দেখে। তার বড় মনে হয়, কগজে কী একটা খবর যেন বেরোবার কথা। মনে মনে সে কতকাল ধরে সে খবরটার জন্য অপেক্ষা করছে। খবরটা বেরোচ্ছে না।

গন্ধবণিকের দোকান থেকে ভরদুপুরে ফিরছিল শ্যামাচরণ। চৌপথীতে কদমতলায় একপাল কেষ্ট দাঁড়িয়ে ফষ্টিনষ্টি করছে। তারা শ্যামাচরণকে দেখে গলাখাকারি দেয়। একটা বদমাশ ছেলে আওয়াজ দিল–গঙ্গারামকে পাত্র পেলে?

বিনয় হালদারের ছেলের নাম গঙ্গাপ্রসাদ। শ্যামাচরণ মাথাটা নামিয়ে জায়গাটা পার হয়ে যায়।

বাজারের মুখে বুড়ো নীলমণি দাসের সঙ্গে দেখা। নীলমণি লোকটা খুব আদর্শবাদী, স্বদেশী করত, একবার এম.এল.এ.-ও হয়েছিল, শ্যামাচরণ হাকিম থাকবার সময় থেকে ভাব।

নীলমণি দাঁড়িয়ে পড়ে বলল-শ্যামা যে! কোন দিকে?

–বাড়িই যাই।

–সে যাবে। বাড়ি পালাবে না, কথা আছে।

শ্যামাচরণ কথা শুনতে উৎসাহ পায় না আজকাল। ভাল কথা তো কেউ বলে না। তাই নিরাসক্ত গলায় বলে–কিসের কথা?

নীলমণি গলা নামিয়ে বলে–আজও ওদের দেখলাম। ভটভটিয়ায় জোড়া বেঁধে কুঠিঘাটের দিকে যাচ্ছে। এই একটু আগে। ওদের যে কারো পরোয়া নেই দেখায়।

ওরা বলতে কারা তা শ্যামাচরণ জানে। তাই উদাসভাবে নীল আকাশের দিকে চেয়ে বলে–তা তো দেখছই। আমার আর কী করার আছে বলো? চাও তো বলো, গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলে পড়ি একদিন।

–আরে রাম রাম! তুমি ঝুলবে কেন? কিন্তু বিহিতের কথা ভেবেছো কিছু?

–আমার মাথায় আজকাল কিছু আসে না।

–আমি বিয়ের কথাও ভেবে দেখেছি বুঝলে? কিন্তু তোমার মেয়ে তো বয়সেও ছোঁড়াটার চেয়ে বড়। তাছাড়া হালদারমশাই তো ক্ষেপে আগুন হয়ে আছেই।

শ্যামাচরণ শ্বাস ফেলে বলে–সবই অদৃষ্ট। অকালে জামাইটা যে কেন–

বলেই শ্যামাচরণ ফের চমকে ওঠে। মনে পড়ে, লাশের মুখে সেই আঁচিলটা ছিল না। কথাটা আজও বলা হয়নি গৌরীকে। না বলাটা ঠিক হচ্ছে না।

কবে মরেটরে যাবে শ্যামাচরণ, একটা সত্য কথা তার সঙ্গেই হাপিস হয়ে যাবে তাহলে।

নীলমণি কথা বলতে বলতে খানিক এগিয়ে দিল। সাবধানে রেল লাইন পার হয়ে শ্যামাচরণ বাড়িমুখো হাঁটতে থাকে। বগলে ভাজকরা খবরের কাগজটা, বেশ কী একটা বলি বলি করে। কিন্তু কোনোদিনই বলে না, দুপুরে খাওয়ার পর আজ আবার খবরের কাগজটা তন্ন তন্ন করে খুঁজবে শ্যামাচরণ। খবরটা থাকার কথা।

বাড়ি ফিরে স্নান খাওয়া সারতে বেলা চলে গেল। মেয়েটা এখন বাড়ি ফেরেনি। নাতি-নাতনি দুটো স্কুল থেকে আসবে এখন। বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করে শ্যামাচরণ। বৌ ক্ষমা এঁটোকাটা সেরে এসে বিছানার একপাশে বসে বলে–আর তো মুখ দেখানো যাচ্ছে না।

ক্ষমার বয়স হয়েছে, সাধ-আহ্লাদ বড় একটা করেনি জীবনে। সংসারে জান বেটে দিচ্ছে বিয়ের পর থেকে। আজকাল শ্যামাচরণের বড় মায়া হয়।

ঘড়ি দেখে শ্যামাচরণ উঠে বসে বলে–হরিদ্বার যাবে?

–যাহোক কোথাও চলে যাই। তোমার আদরের মেয়ে সুখে থাক।

–কে দেখবে ওকে?

–আহা! দেখার ভাবনা! কাড়ি কাড়ি টাকা আছে ওর। জামাই মরে গিয়েও তো টাকা হাতে এসেছে।

–তা বটে। বলেই ফের সেই লাশের ভাঙাচোরা বিকৃত মুখ মনে পড়ে। আঁচিলটা ছিল না সেই মুখে। তবে কি?

অনেক রাতে গৌরী পাশ ফিরতে গিয়ে জেগে ওঠে। কে যেন চাপাস্বরে ডাকল।

–কে?

শ্যামাচরণ জানলার বাইরে জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে। চাপা গলায় বলল আমি তোর বাবা। শোন।

–বাবা! অবাক হয়ে বিছানা ছেড়ে গৌরী উঠে আসে, ওমা, তুমি বাইরে কেন? কী হয়েছে?

শ্যামাচরণের মুখচোখ জ্যোৎস্নায় অন্যরকম দেখায়। চোখের বসা কোল বাটির মতো, তাতে টুপটুপে ভরা অন্ধকার। চোখের তারা থেকে জ্যোৎস্নার প্রতিবিম্ব ঝিকমিক করে।

শ্যামাচরণ বলে–তার মুখে সেই আঁচিলটা ছিল না।

–কে? কার কথা বলছো?

শ্যামাচরণ বলে, বহুকাল ধরে চেপে রাখা গোপন কথাটা বুক থেকে বেরিয়ে যায়।

গৌরী জানলার শিকটা চেপে ধরে। তারপর আস্তে আস্তে পাথর হয়ে যায়।

পরদিন শ্যামাচরণ আবার গন্ধবণিকের দোকানে গিয়ে বসে। বিশাল নদীর ওপর ফুরফুর করে নীল আকাশ। নৌকা আসে, নৌকা যায়। ব্যাপারীদের হট্টরোল ওঠে চারধারে।

শ্যামাচরণ খবরের কাগজ খুলে তন্ন তন্ন করে খবরটা খোজো পায় না। ব্যাপারীরা এসে গল্প রাঙিয়ে তোলে। হাওয়া দেয়। চায়ের গন্ধের সঙ্গে নদীর আঁশটে গন্ধ গুলিয়ে ওঠে।

আজ সারাদিন গৌরী বেরোয়নি। কারো সঙ্গে দেখা করে নি। কথা বলেনি। সারাদিন শুধু ঘরে বসে কেঁদেছে।

দুপুরে বাড়ি ফিরে শ্যামাচরণ একই খবর পেল। গৌরী নিজের ঘরে শুয়ে কাঁদছে।

শ্যামাচরণ কাউকে কিছু বলল না। ক্ষমা প্রশ্ন করে বসে হাঁপিয়ে যায়।

খেয়ে উঠে শ্যামাচরণ খবরের কাগজটা গৌরীর ঘরের জানালা গলিয়ে ভিতরে ফেলে দিয়ে চাপা গলায় বলে–সব খবর তো কাগজেই থাকে। রোজ দেখিস তো।

গৌরী প্রথমে কথা বলে না। কিন্তু অনেকক্ষণ বাদে উঠে চোখ মুছে খবরের কাগজটা পড়তে থাকে। কেন পড়ে তা বুঝতে পারে না। জগৎটা সম্পর্কে আবার তার ভীষণ আগ্রহ জেগেছে।

শ্যামাচরণ বিকেলে ঘুম থেকে উঠে ক্ষমাকে বলে-কাল থেকে একটা ইংরিজি খবরের কাগজও দিতে বোলো তো কাগজের ছেলেটাকে। কত খবর থাকে। একটা কাগজে সব পাওয়া যায় না।

# গগন চাকি ও পবন দূত

**গগন চাকি ও পবন দূত**

কুখ্যাত ডাকাত গগন চাকিকে তাড়া করেছে বিখ্যাত পুলিশের গোয়েন্দা সুবল দত্ত। ধরো ধরো অবস্থা। গগনকে ধরতে পারলেই পেল্লায় পুরস্কার, কারণ এযাবৎ গগনকে শত চেষ্টাতেও ধরা যায়নি। তার কারণ গগন চাকিরও আবার একটি গগন চাকি আছে। অর্থাৎ কিনা গগনের গগাড়ি। যেটা এত জোরে ছোটে যে তার সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার সাধ্যি পুলিশের কোনও গাড়ির নেই। গগন শুধু ডাকাতই নয় মস্ত বৈজ্ঞানিকও। গোটা নেপচুন গ্রহটা দখল করে সে বিশাল গবেষণাগার বানিয়েছে মাটির তলায়। কেউ এটার ধারে কাছে যেতে পারে না, এমন এক রশ্মিবর্ম দিয়ে তার চারধারে বলয় তৈরি করা হয়েছে। সরকারি সব রকম চেষ্টা ব্যর্থ করে গগন সুযোগ বুঝে পৃথিবীতে হানা দেয় এবং ইচ্ছেমতো ডাকাতি করে পালিয়ে যায়। টাকাপয়সা অবশ্য সে ছোঁয়ও না, সে ডাকাতি করে রাসায়নিক অতিযন্ত্র বা নতুন কোনও গবেষণালব্ধ জিনিস। সর্বত্র তার চর আছে। তারাই খবর দেয় গগনকে।

নিউইয়র্কের বৈজ্ঞানিক রাসেল সাহেব এই তো মাত্র এক সপ্তাহ আগে একজোড়া হাওয়াই চটি আবিষ্কার করে সবাইকে স্তম্ভিত করে দিয়েছেন। হাওয়াই চটি শুনে নাক সিটকোবার কিছু নেই। এ চটি পরে ইচ্ছেমতো শূন্যে উঠে ঘুরে বেড়ানো যায়। দু আড়াই মিটার শূন্যে যে কোথাও মানুষকে তুলে রাখার ক্ষমতা আছে এই হাওয়াই চপ্পল জোড়ার, প্রায় পাঁচশ বছর ধরে রাসেল সাহেবের নিরলস সাধনার ফলে এই আবিষ্কার। গগন যে এটা চুরি করতে পারে সেই ভয়ে আগে থাকতেই ব্যবস্থা করা ছিল, চারদিকে রোবো পাহারা দিয়েও নানারকম যন্ত্র, রশ্মি, চোরদ্ধ রনিক মোতায়েন। ঘন্টাখানেক আগে এসব বাধাকে কঁকি দিয়ে গগন যে কিভাবে চপ্পল জোড়া বাগিয়ে নিয়ে চলে গেল সেইটেই রহস্য। রহস্য অবশ্য তেমন কিছু নয়। গগন এসেছিল তার গগন চাকিতে করে। এই গগন চাকির একটা অদ্ভুত

ক্ষমতা হলো, যখন-তখন অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। নিজের শরীরের পরমাণু প্রক্রিয়া বদল করে যে-কোনও মনিটরকে ফাঁকি দিতে পারে। আর গগন নিজেও চালাক কম নয়। সে হুবহু রাসেল সাহেবের রূপ ধরে এসে সবাইকে ফাঁকি দিয়ে নিউইয়র্কের ইয়র্ক টাওয়ারের দুশো একান্ন তলার স্ট্রং রুম থেকে জিনিসটা বের করে নিয়ে সেই হাওয়াই চপ্পল পায়ে দিয়েই আকাশে তিনশো গজ দূরে তার গগন চাকিতে চেপে পালাচ্ছিল। সুবল দত্ত তার পুলিশী গাড়ি পবনদুতে বসে পাহারা দিচ্ছিল মাত্র পাঁচশ গজ দূরে। একটা লোককে হন হন করে শূন্যে হাঁটতে দেখেই তার সন্দেহ হয়। চোখে ভেদক দূরবিন লাগাতেই সে রাসেলের ছদ্মবেশের আড়ালে গগনকে চিনতে পারে। তারপরই তাড়া।

কিন্তু তাড়া করলেও একটা বাধা আছে। গগন চাকি হলো মহাকাশযান। পৃথিবীর সীমানা ডিঙিয়ে দূর-দূরান্তে চলে যেতে পারে। পবনদূত ততদূর পারবে না। তবে এক-দেড় লক্ষ মাইল অবধি পবনদূত বড় সাঙ্ঘাতিক। নানা ক্ষেপণাস্ত্র ও রশ্মি তো আছেই, পবনের গতিও দুর্দান্ত, এটাও একটা নতুন আবিষ্কার, খুব সম্প্রতি তৈরি হয়েছে।

পবনদূত যে তাকে তাড়া করেছে এটা গগন টের পায়নি, সে নিশ্চিত মনে নেপচুনকে লক্ষ্য করে চড়ে যাচ্ছিল, সুবল দত্ত স্পষ্ট দেখতেও পাচ্ছিল গগনকে। কারণ গগন চাকির দুর্ভেদ্য শরীরকে ভেদ করছিল সুবলের দূরবিন ভেদক। সুবল দেখল গগন খই আর কলা খাচ্ছে, ডানহাতে ঘাড় চুলকোচ্ছে। খুব নিশ্চিন্ত।

আচমকাই সুবলের কানে ইয়ার ফোনটা একটা গম্ভীর আওয়াজে যেন ফেটে পড়ল, কে রে তুই? আঁ?

গগনের গলা, সুবল দত্ত দাঁতে দাঁত পিষে, তোমার যম!

গগন হাঃ হাঃ করে হেসে বলল, তাই নাকি? চোর চোর খেলছিস বুঝি? যা দুধের ছেলে, ঘরে ফিরে যা, নইলে কঠিন অবস্থায় পড়ে যাবি।

আমি ভয় খাই না, আজ তোমারই একদিন কি আমারই একদিন। বটে! বটে! তাহলে আয় তোকে একটু কায়দা দেখাই।

বলেই গগন চাকি একটু থেমে উল্টো দিকে ধেয়ে আসতে লাগল, সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড, সোজা তার দিকেই আসছে যে। সুবল দত্ত দুটো ক্ষেপণাস্ত্র আর একটা

রশ্মি ছুঁড়ল। গগন চাকি অদৃশ্য হয়ে গেল।

সুবল দত্ত নিশ্চিন্ত হলো না। আঁতিপাঁতি করে মনিটর খুঁজতে লাগল। পেল না। কিন্তু আচমকাই পেছন থেকে কি যেন তার পবনদূতকে প্রচণ্ড বেগে ঠেলতে শুরু করল।

সুবল চেঁচাল, এই এই! কী হচ্ছে?

গগন হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে বলল, কেন খোকা ভয় পেলে? দুধের বাছা তুমি, গগনের সঙ্গে পাল্লা নিতে এসেছো?

সুবল দত্ত দেখল, সামনে ঘোর বিপদ। তার পবনদূতের পাল্লা মাত্র দেড় লক্ষ মাইল। তারা ইতিমধ্যেই এক লক্ষ পঁচিশ হাজার মাইল পেরিয়ে এসেছে, দেড় লক্ষ মাইল পেরিয়ে গেলে পবনদূত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলবে। তাকে ফিরিয়ে নেওয়াই হবে কঠিন।

সুবল নানা কায়দায় পবনদূতকে থামানোর চেষ্টা করল। কিন্তু থামা কি সহজ! পিছন থেকে গগন চাকির প্রবল ঠেলায় তাকে নিয়ন্ত্রণ সীমার বাইরে নিয়ে যাবেই। সুবল ঘামছে।

কী খোকা, কেমন লাগছে?

ছেড়ে দিন আমাকে।

কেন, আমাকে ধরবে না?

আজ্ঞে না।

ধরলে যে পেল্লায় পুরস্কার।

আমার পুরস্কার চাই না।

তবে প্রাণটা চাই তো?

যে আজ্ঞে।

হাঃ হাঃ। তবে কান ধরো।

ধরেছি।

বলো আর কখনও এরকম করব না।

বলছি।

হাঃ হাঃ।

পবনদূতের পিছন থেকে চাপটা অদৃশ্য হলো। সুবল দত্ত দেখতে পেল, গগন চাকি সামনে দূর-দূরান্তে মহাকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে।

সুবল দত্ত পবনদূতের মুখ পৃথিবীর দিকে ফিরিয়ে কপালের ঘাম মুছে বলল, খুব বেঁচে গেছি বাপ।

# গগন পার্ক

## গগন পার্ক

গগন পার্কে বাচ্চারা খেলা করছে আর বুড়ো মালি হরিহর বসে বসে দেখছে। মালি বলতে গাছপালার তদারককারী নয়। হরিহর গগন পার্কের সব কিছুই নজরে রাখে। গগন পার্কে তো গাছপালা নেই। তবে আছে কৃত্রিম উপগ্রহ, ভাসমান সুইমিং পুল, খাওয়ার জায়গা, বেলুন-বিহার, রকেট চরকি, হাওয়াই সার্কাস, কত কী! পৃথিবী থেকে বাচ্চারা দলে দলে আকাশে আসে বিকেলবেলাটা কাটিয়ে যেতে। বাচ্চাদের পরনে মহাকাশের আলাদা পোশাকের দরকার হয় না। গগন পার্ক আকাশের অনেকটা জায়গা জুড়ে চমৎকার একটা পৃথিবীর মতো আবহমণ্ডল তৈরি করেছে। বাচ্চারা শ্বাস নিতে পারে, আবহমণ্ডলের যথাযথ চাপও বজায় থাকে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। বাচ্চারা ইচ্ছেমতো আকাশে পরীর মতো উড়ে উড়ে খেলা করে। ফুটবল, বাস্কেটবল, ক্রিকেট ছাড়াও আকাশে আরও নানা নতুন ধরনের খেলা চালু হয়েছে। হরিহর ঘুরে ঘুরে সব দিকে নজর রাখে।

গগন পার্কের এক কোণে তার ছোট্ট একখানা ভাসমান বাড়ি আছে। হরিহর একাই থাকে। রান্নাবান্না করে, খায় ঘুমোয়। মজা হলো গগন পার্কে সূর্য অস্ত যায় না। পৃথিবীর মতো এখানে দিন রাত নেই। সারাক্ষণ কটকটে আলো। সারাদিনই বাচ্চাদের গাড়ি লেগে থাকে। কারণ ভারতে বিকেল ফুরোলে ইউরোপে বিকেল হয়, তারপর আমেরিকায় হয়। সুতরাং একদল বাচ্চা ফিরে যেতে না যেতেই আর একদল এসে হাজির হয়। হরিহরের সুতরাং ছুটি নেই। তবে ওরই ফাঁকে ফাঁকে একটু করে ঘুমিয়ে নেওয়া, টুক করে রান্না চাপানো এবং এক ফাঁকে খেয়ে নেওয়া। আকাশে থাকার একটা সুবিধে, মেঘ বৃষ্টি নেই। সূর্যরশ্মি থেকেই রান্নাবান্না সব হয়। বিজলীর ব্যবস্থাও আছে। এই চাকরিটার আরও একজন উমেদার ছিল। তার নাম নিশিকান্ত। নিশিকান্তের বয়সও হরিহরের কাছাকাছি। হরিহরের এখন একশো আটান্ন চলছে, নিশিকান্তের একশো আটচল্লিশ। সরকারি

দফতরখানায় চৌকিদারের কাজ করে। হরিহরকে সরিয়ে চাকরিটায় বহাল হওয়ার জন্য সে কম মেহনত করছে না। তাই হরিহর একটু ভয়ে ভয়েই থাকে। গগন পার্কের এত ভাল চাকরি ছেড়ে যেতে তার একটুও ইচ্ছে করে না। পৃথিবীতে নানা ভেজাল, নানা ঝঞ্ঝাট।

পার্কের কোণে নিজের ভাসন্ত জলচৌকিখানায় বসে নানা কথা ভাবতে ভাবতে হরিহর বাচ্চাদের ফুটবল খেলা দেখছিল। পৃথিবীর ফুটবলের চেয়ে ঢের অন্যরকম। ওপর দিয়ে নীচ দিয়ে বল নিয়ে যাওয়া, ডিগবাজি খাওয়া, কিন্তু পড়া নেই, চোট-টোটও কেউ পায় না। বেশ খেলা।

এই যে হরিহর! তা কেমন আছো ভায়া?

হরিহর চমকে চেয়ে দেখে, নিশিকান্ত। একখানা এয়ার ট্যাক্সি থেকে নেমে এলো। মুখে একটু হাসি।

হরিহর বলল, এই আছি আর কি, তা কী মনে করে?

তোমার কাছেই আসা, কথা ছিল।

এখানেই বসবে? নাকি ঘরে যাবে?

তা ঘরেই চলো।

কাছেই হরিহরের বাড়ি। দুখানা ঘর, রান্নাঘর, বাথরুম, সব আছে। নিশিকান্ত বসবার ঘরে বসে চারদিকে চেয়ে দেখে বলল, বেশ খাসা আছো কিন্তু। ভাবনা নেই, চিন্তা নেই।

ওরকম মনে হয়। কাজে বিস্তর খাটুনি।

খাটুনি হলেও এ চাকরির আরামটাও তো দেখবে, যাকগে যাক।

বলে কাঁধের শান্তিনিকেতনী থলি থেকে একটা থারমাল কৌটো বের করে নিশিকান্ত বলে, এখন পৃথিবীতে কোন্ ঋতু চলছে তা জানো?

হরিহর একটু লজ্জিত হয়ে বলে, না, ওসব আর কে হিসেব রাখে! এখানে তো ঋতুচক্র নেই!

সেই জন্যই জিজ্ঞেস করলাম। এখন আমাদের ভাদ্রমাস চলছে। গাছে ইয়া বড় বড় তাল হয়েছিল। আমার ছেলের বউ তালনবমীতে ঠাকুরকে তালের বড়া ভোগ দিয়েছে। তোমার জন্য নিয়ে এসেছি কয়েকটা, রেখে দাও সময় মতো খেও।

হরিহর সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। হঠাৎ শত্রুপক্ষ এত খাতির করে কেন? মতলব নেই তো!

নিশিকান্ত হেসে বলল, আরে নাও, নাও, বিষ মিশিয়ে দিইনি। খেও। আমার পুত্রবধূটি বড্ড ভাল রাঁধে। যাতে হাত দেয় তাই অমৃত।

হরিহর লজ্জিত হয়ে নিল কৌটোটা। হট বক্সে রেখে দিয়ে বলল, তা খাবোখন, তালের বড়া আমিও খুব ভালবাসি। এখানে তো ওসব মেলে না। সপ্তাহে একদিন বাজার ফেরি আসে, শাকসবজি দিয়ে যায়।

নিজেই রাঁধো?

আর কে আছে! সেদ্ধ পোড়া করে খেয়ে নিই। সময়ও হয় না।

নিশিকান্ত একখানা শ্বাস ফেলে বলল, তোমার আর ভয় নেই। তোমার চাকরি কেড়ে নেওয়ার জন্য আর আমি কলকাঠি নাড়ব না।

তাই নাকি?

কী হলো জানো! ছেলের বিয়ে দেওয়ার পর যখন বউমাটি এলেন তখন ভারী খাওয়ার মুখ হতে লাগল আমার। কত্তকাল এমন রান্না খাইনি। মুড়ি ঘন্ট, ছ্যাচড়া, চচ্চড়ি, পায়েস, ক্ষীর, সরভাজা–সে এলাহি কাণ্ড। খেতে বড় ভালবাসি আমি। হঠাৎ বুঝতে পারলুম গগন পার্কে চাকরি পেলে এরকম খাট আর হবে না। বউমা অভ্যাস খারাপ করে দিয়েছে। ক দিনই বা আর বাঁচব বলো! আর ধরো বড়ো জোর চার পাঁচশো বছর। তা এই কটা বছর একটু মনের সুখে খেয়ে নিই। কী বলো!

হরিহর তাকিয়ে রইল।

নিশিকান্ত একগাল হেসে বলল, সত্যিই বলছি হে। তোমার চাকরির ওপর আর আমার লোভ নেই। নিশ্চিন্তে থাকো, সেদ্ধ-পোড়া খেয়ে বেঁচে থাকা আমার

পোষাবে না।

হরিহর একটা শ্বাস ছাড়ল। নিশ্চিন্তির না হতাশার তা সে নিজেও বুঝতে পারল না।

# গন্ধটা সন্দেহজনক

**গন্ধটা সন্দেহজনক**

সেবার আমার দিদিমা পড়লেন ভারী বিপদে।

দাদামশাই রেল কোম্পানিতে চাকরি করতেন, সে আজ পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। আমার মা তখনও ছোট্ট ইজের-পরা খুকী। তখন এত সব শহর নগর ছিল না, লোকজনও এত দেখা যেত না। চারধারে কিছু গাছগাছালি জঙ্গল টঙ্গল ছিল। সেই রকমই এক নির্জন জঙ্গুলে জায়গায় দাদামশাই বদলি হলেন। উত্তর বাংলার দোমোহানীতে। মালগাড়ির গার্ড ছিলেন, তাই প্রায় সময়েই তাকে বাড়ির বাইরে থাকতে হতো। কখনো একনাগাড়ে তিন চার কিম্বা সাতদিন। তারপর ফিরে এসে হয়তো একদিন মাত্র বাসায় থাকতেন, ফের মালগাড়ি করে চলে যেতেন। আমার মায়েরা পাঁচ বোন আর চার ভাই। দিদিমা এই মোট ন'জন ছেলেমেয়ে নিয়ে বাসায় থাকতেন। ছেলেমেয়েরা সবাই তখন ছোটোছোটো, কাজেই দিদিমার ঝামেলার অন্ত নেই।

এমনিতে দোমোহানী জায়গাটা ভারী সুন্দর আর নির্জন স্থান। বেঁটে বেঁটে লিচু গাছে ছাওয়া, পাথরকুচি ছড়ানো রাস্তা, সবুজ মাঠ, কিছু জঙ্গল ছিল। লোকজন বেশি নয়! একধারে রেলের সাহেবদের পাকা কোয়ার্টার, আর অন্যধারে রেলের বাবুদের জন্য আধপাকা কোয়ার্টার, একটা ইস্কুল ছিল ক্লাস এইট পর্যন্ত। একটা রেলের ইনস্টিটিউট ছিল, যেখানে প্রতি বছর দু তিনবার কেদার রায় বা টিপু সুলতান নাটক হতো। রেলের বাবুরা দল বেঁধে গ্রীষ্মকালে ফুটবল খেলতেন, শীতকালে ক্রিকেট। বড় সাহেবরা সে-খেলা দেখতে আসতেন। মাঝে মাঝে সবাই দল বেঁধে তিস্তা নদীর ধারে বা জয়ন্তিয়া পাহাড়ে চড়ুইভাতিতেও যাওয়া হতো। ছোটো আর নির্জন হলেও বেশ আমুদে জায়গা ছিল দোমোহানী।

দোমোহানীতে যাওয়ার পরই কিন্তু সেখানকার পুরোনো লোকজনেরা এসে প্রায়ই দাদামশাই আর দিদিমাকে একটা বিষয়ে খুব হুঁশিয়ার করে দিয়ে যেতেন। কেউ কিছু ভেঙে বলতেন না। যেমন স্টোরকীপার অক্ষয় সরকার দাদামশাইকে একদিন বলেন, "এ জায়গাটা কিন্তু তেমন ভাল নয় চাটুজ্যে। লোকজন সব বাজিয়ে নেবেন। হুটহাট যাকে তাকে ঘরে দোরে ঢুকতে দেবেন না।" কিম্বা আর একদিন পাশের বাড়ির পালিত গিন্নী এসে দিদিমাকে হেসে হেসে বলে গেলেন, "নতুন এসেছেন, বুঝবেন সব আস্তে আস্তে। চোখ কান নাক সব খোলা রাখবেন কিন্তু। ছেলে পুলেদের সামলে রাখবেন। এখানে কারা সব আছে, তারা ভাল নয়।"

দিদিমা ভয় খেয়ে বলেন, "কাদের কথা বলছেন দিদি?"

পালিত-গিন্নী শুধু বললেন, "সে আছে, বুঝবেনখন।"

তারপর থেকে দিদিমা একটু ভয়ে ভয়েই থাকতে লাগলেন।

একদিন হলো কী, পুরোনো ঝি সুখীয়ার দেশ থেকে চিঠি এল যে, তার ভাসুরপোর খুব বেমার হয়েছে, তাই তাকে যেতে হবে। একমাসের ছুটি নিয়ে সুখীয়া চলে গেল। দিদিমা নতুন ঝি খুঁজছেন, তা হঠাৎ করে পরদিন সকালেই একটা আধবয়সী বউ এসে বলল, "ঝি রাখবেন?"

দিদিমা দোনোমোনো করে তাকে রাখলেন। সে দিব্যি কাজকর্ম করে, খায়দায়, বাচ্চাদের গল্প বলে ভোলায়। দিন দুই পর পালিত-গিন্নী একদিন সকালে এসে বললেন, "নতুন ঝি রাখলেন নাকি দিদি? কই দেখি তাকে?"

দিদিমা ডাকতে গিয়ে দেখেন কলতলায় এঁটো বাসন ফেলে রেখে ঝি কোথায় হাওয়া হয়েছে। অনেক ডাকাডাকিতেও পাওয়া গেল না। পালিত-গিন্নী মিচকি হাসি হেসে বললেন, "ওদের সব ওরকমই ধারা। ঝিটার নাম কী বলুন তো?"

দিদিমা বললেন, "কমলা।"

পালিত-গিন্নী মাথা নেড়ে বললেন, "চিনি, হালদার-বাড়িতেও ওকে রেখেছিল।"

দিদিমা অতিষ্ঠ হয়ে বললেন, "কী ব্যাপার বলুন তো?"

পালিত-গিন্নী শুধু শ্বাস ফেলে বললেন, "সব কি খুলে বলা যায়? এখানে এই হচ্ছে ধারা। কোন্টা মানুষ আর কোন্টা মানুষ নয় তা চেনা ভারী মুশকিল। এবার দেখেশুনে একটা মানুষ ঝি রাখুন।

এই বলে চলে গেলেন পালিত-গিন্নী, আর দিদিমা আকাশপাতাল ভাবতে লাগলেন।

কমলা অবশ্য একটু বাদেই ফিরে এল। দিদিমা তাকে ধমক দিয়ে বললেন, "কোথায় গিয়েছিলে?"

সে মাথা নীচু করে বলল, "মা, লোকজন এলে আমাকে সামনে ডাকবেন না, আমি বড় লজ্জা পাই।"

কমলা থেকে গেল। কিন্তু দিদিমার মনের খটকা-ভাবটা গেল না।

ওদিকে দাদামশাইয়েরও এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা হলো। একদিন লাইনে গেছেন। নিশুতিরাতে মালগাড়ি যাচ্ছে ডুয়ার্সের গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। দাদামশাই ব্রেকভ্যানে বসে ঝিমোচ্ছেন। হঠাৎ গাড়িটা দাঁড়িয়ে গেল! তা মালগাড়ি যেখানে-সেখানে দাঁড়ায়। স্টেশনের পয়েন্টসম্যান আর অ্যাসিসট্যান্ট স্টেশন মাস্টাররা অনেক সময়ে রাতবিরেতে ঘুমিয়ে পড়ে, সিগন্যাল দিতে ভুলে যায়। সে-আমলে এরকম হামেশা হতো। সেরকমই কিছু হয়েছে ভেবে দাদামশাই বাক্স থেকে পঞ্জিকা বের করে পড়তে লাগলেন, পঞ্জিকা পড়তে তিনি বড় ভালবাসতেন। গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই! হঠাৎ দাদামশাই শুনতে পেলেন, ব্রেকভ্যানের পিছনে লোহার সিঁড়ি বেয়ে কে যেন গাড়ির ছাদে উঠছে। দাদামশাই মুখ বার করে কাউকে দেখতে পেলেন না। ফের শুনলেন, একটু দূরে কে যেন ওয়াগনের পাল্লা খোলার চেষ্টা করছে। খুব চিন্তায় পড়লেন দাদামশাই। ডাকাতরা আনেক সময় সাঁট করে সিগন্যাল বিগড়ে দিয়ে গাড়ি থামায়, মালপত্র চুরি করে। তাই তিনি সরেজমিনে দেখার জন্য গাড়ি থেকে হাতবাতিটা নিয়ে নেমে পড়লেন। লম্বা ট্রেন, তার একদম ডগায় ইঞ্জিন। হাঁটতে হাঁটতে এসে দেখেন, লাল সিগন্যাল ইতিমধ্যে সবুজ হয়ে গেছে, কিন্তু ড্রাইভার আর ফায়ারম্যান কয়লার ঢিপির ওপর গামছা পেতে শুয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ওদেরও দোষ নেই, অনেকক্ষণ নাগাড়ে ডিউটি দিচ্ছে, একটু ফাঁকা পেয়েছে কি ঘুমিয়ে পড়েছে। বহু ঠেলাঠেলি করে তাদের তুললেন দাদামশাই। তারপর ফের লম্বা গাড়ি পার হয়ে ব্রেকভ্যানের দিকে ফিরে আসতে লাগলেন। মাঝামাঝি এসেছেন, হঠাৎ শোনেন ইঞ্জিন হুইশেল দিল,

গাড়িও কঁাচ কোঁচ করে চলতে শুরু করল। তিনি তো অবাক। ব্রেকভ্যানে ফিরে গিয়ে তিনি সবুজ বাতি দেখালে তবে ট্রেন ছাড়ার কথা। তাই দাদামশাই হাঁ করে চেয়ে রইলেন। অবাক হয়ে দেখেন, ব্রেকভ্যান থেকে অবিকল গার্ডের পোশাক পরা একটা লোক হাতবাতি তুলে সবুজ আলো দেখাচ্ছে ড্রাইভারকে। ব্রেকভ্যানটা যখন দাদামশাইকে পার হয়ে যাচ্ছে তখন লোকটা তার দিকে চেয়ে ফিক করে হেসে গেল।

বহু কষ্টে দাদামশাই সেবার ফিরে এসেছিলেন।

সেবার ম্যাজিশিয়ান প্রফেসার ভট্টাচার্য চা-বাগানগুলোতে ঘুরে ঘুরে ম্যাজিক দেখিয়ে দোমোহানীতে এসে পৌঁছোলেন। তিনি এলে-বেলে খেলা দেখাতেন। দড়িকাটার খেলা, তাসের খেলা, আগুন খাওয়ার খেলা। তা দোমোহানীর মতো গঞ্জ জায়গায় সেই খেলা দেখতেই লোক ভেঙে পড়ল। ভট্টাচার্য স্টেজের ওপর দাঁড়িয়ে প্রথম দৃশ্যে একটু বক্তৃতা করছিলেন, হাতে ম্যাজিকের ছোট্ট কালো একটা লাঠি। বলছিলেন, ম্যাজিক মানেই হচ্ছে হাতের কৌশল, মন্ত্র তন্ত্র নয়, আপনারা যদি কৌশল ধরে ফেলেন তাহলে দয়া করে চুপ করে থাকবেন। কেউ যেন স্টেজে টর্চের আলো ফেলবেন না..ইত্যাদি। এইসব বলছেন, ম্যাজিক তখনো শুরু হয়নি, হঠাৎ দেখা গেল তার হাতের লাঠিটা হঠাৎ হাত থেকে শূন্যে উঠে ডিগবাজি খেল তারপর আবার আস্তে আস্তে ফিরে গেল ম্যাজিশিয়ানের হাতে। প্রথমেই আশ্চর্য খেলা দেখে সবাই প্রচণ্ড হাততালি দিল। কিন্তু প্রফেসর ভট্টচার্য খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। এর পরের খেলা– ব্ল্যাকবোর্ডে দর্শকেরা চক দিয়ে যা খুশি লিখবেন, আর প্রফেসর ভট্টাচার্য চোখবাঁধা অবস্থায় তা বলে দেবেন। কিন্তু আশ্চর্য প্রফেসর ভট্টাচার্যের এই খেলাটা মোটেই সেরকম হলো না। দর্শকরা কে গিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডে লিখবেন এই নিয়ে এ ওকে ঠেলছেন, প্রফেসর ভট্টাচার্য চোখের ওপর ময়দার নেচী আর কালো কাপড় বেঁধে দাঁড়িয়ে সবাইকে বলছেন–চলে আসুন সঙ্কোচের কিছু নেই, আমি বাঘভাল্লুক নই…ইত্যাদি। সে সময়ে হঠাৎ দেখা গেল টেবিলের ওপর রাখা চকের টুকরোটা নিজে থেকেই লাফিয়ে উঠল এবং শূন্যে ভেসে গিয়ে ব্ল্যাকবোর্ডের ওপর লিখতে লাগল, প্রফেসর ভট্টাচার্য ইজ দি বেস্ট ম্যাজিশিয়ান অফ দি ওয়ার্ল্ড। এই অসাধারণ খেলা দেখে দর্শকরা ফেটে পড়ল উল্লাসে, আর ভট্টাচার্য কাঁদো কাঁদো হয়ে চোখ-বাঁধা অবস্থায় বলতে লাগলেন কী হয়েছে। আঁ কী হয়েছে। তারপর তিনি আরো গম্ভীর হয়ে গেলেন। আগুন খাওয়ার খেলাতেও আশ্চর্য ঘটালেন তিনি। কথা ছিল, মশাল জ্বেলে সেই মশালটা মুখে পুরে আগুনটা খেয়ে ফেলবেন। তাই করলেন। কিন্তু তারপরই দেখা

গেল ভট্টাচার্য হাঁ করতেই তার মুখ থেকে সাপের জিভের মতো আগুনের হলকা বেরিয়ে আসছে। পরের তাসের খেলা যখন দেখাচ্ছেন, তখনো দেখা গেল, কথা বলতে গেলেই আগুনের হলকা বেরোয়। দর্শকরা দাঁড়িয়ে উঠে সাধুবাদ দিতে লাগল। কিন্তু ভট্টাচার্য খুব কঁদো-কাঁদো মুখে চার-পাঁচ-সাত গ্লাস জল খেতে লাগলেন স্টেজে দাঁড়িয়েই। তবু হাঁ করলেই আগুনের হলকা বেরোয়।

তখনকার মফস্বল শহরের নিয়ম ছিল বাইরে থেকে কেউ এরকম খেলাটেলা দেখাতে এলে তাকে কিংবা তাঁর দলকে বিভিন্ন বাসায় সবাই আশ্রয় দিতেন। প্রফেসর ভট্টাচার্য আমার মামারবাড়িতে উঠেছিলেন। রাতে খেতে বসে দাদামশাই তাকে বললেন, "আপনার খেলা গণপতির চেয়েও ভাল। অতি আশ্চর্য খেলা।"

ভট্টাচার্যও বললেন, "হ্যাঁ, অতি আশ্চর্য খেলা। আমিও এরকম আর দেখিনি!"

দাদামশাই অবাক হয়ে বলেন, "সে কী! এ তো আপনিই দেখালেন!"

ভট্টাচার্য আমতা আমতা করে বললেন, "তা বটে। আমিই তো দেখালাম! আশ্চর্য!"

তাকে খুবই বিস্মিত মনে হচ্ছিল।

দাদামশাইয়ের বাবা সেবার বেড়াতে এলেন দোমোহানীতে। বাসায় পা দিয়েই বললেন, "তোদের ঘরদোরে একটা আঁশটে গন্ধ কেন রে?"

সবাই বলল, "আঁশটে গন্ধ! কৈ, আমরা তো পাচ্ছি না।"

দাদামশাইয়ের বাবা ধার্মিক মানুষ, খুব পণ্ডিত লোক, মাথা নেড়ে বললেন, "আলবাৎ আঁশটে গন্ধ। শুধু তোদের বাসাতেই নয়, স্টেশনে নেমেও গন্ধটা পেয়েছিলাম। পুরো এলাকাতেই যেন আঁশটে-আঁশটে গন্ধ একটা।"

কমলা দাদামশাইয়ের বাবাকে দেখেই গা ঢাকা দিয়েছিল, অনেক ডাকাডাকিতেও সামনে এলো না। দিদিমার তখন ভারী মুশকিল। একা হাতে সব করতে কম্মাতে হচ্ছে। দাদামশাইয়ের বাবা সব দেখে শুনে খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, "এসব ভাল কথা নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক।"

সেদিনই বিকেলে স্টেশনমাস্টার হরেন সমাদ্দারের মা এসে দিদিমাকে আড়ালে ডেকে বললেন, "কমলা আমাদের বাড়িতে গিয়ে বসে আছে। তা বলি বাছা, তোমার শ্বশুর ধার্মিক লোক, সে ভাল। কিন্তু উনি যদি জপতপ বেশি করেন, ঠাকুরদেবতার নাম ধরে ডাকাডাকি করেন, তাহলে কমলা এ-বাড়িতে থাকে কী করে?"

দিদিমা অবাক হয়ে বলেন, "এসব কী কথা বলছেন মাসীমা? আমার শশুর জপতপ করলে কমলার অসুবিধে কী?"

সমাদ্দারের মা তখন দিদিমার থুতনি নেড়ে দিয়ে বললেন, "ও হরি, তুমি বুঝি জানো না? তাই বলি বাছা, দোমোহানীর সবাই জানে যে, এ হচ্ছে ঐ দলের রাজত্ব। ঘরে ঘরে ওরাই সব ঝি-চাকর খাটছে। বাইরে থেকে চেহারা দেখে কিছু বুঝবে না, তবে ওরা হচ্ছে সেই তারা।"

"কারা?" দিদিমা তবু অবাক।

"বুঝবে বাপু, রোসো।" বলে সমাদ্দারের মা চলে গেলেন।

তা কথাটা মিথ্যে নয়। দোমোহানীতে তখন ঝি-চাকর কিংবা কাজের লোকের বড় অভাব। ডুয়ার্সের ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, মশা আর বাঘের ভয়ে কোনো লোক সেখানে যেতে চায় না। যাদের না গিয়ে উপায় নেই তারাই যায়। আর গিয়েই পালাই-পালাই করে। তবু ঠিক দেখা যেত, কারো বাসায় ঝি-চাকর বা কাজের লোকের অভাব হলেই ঠিক লোক জুটে যেত। স্টেশনমাস্টার সমাদ্দারের ঘরে একবার দাদামশাই বসে গল্প করছিলেন। সমাদ্দার একটা চিঠি লিখছিলেন, সেটা শেষ করেই ডাকলেন, "ওরে, কে আছিস?" বলামাত্র একটা ছোকরামতো লোক এসে হাজির। সমাদ্দার তার হাতে চিঠিটা দিয়ে বললেন, "যা, এটা ডাকে দিয়ে আয়।" দাদামশাই তখন জিজ্ঞেস করলেন, "লোকটাকে নতুন রেখেছেন নাকি? সমাদ্দার মাথা নেড়ে বলেন, "না না, ফাঁইফরমাশ খেটে দিয়ে যায় আর কি। খুব ভাল ওরা ডাকলেই আসে। লোকটোক নয় ওরা ওরাই।"

তো তাই। মামাদের বাড়িতে প্রাইভেট পড়াতেন ধর্মদাস নামে একজন বেঁটে আর ফর্সা ভদ্রলোক। তিনি থিয়েটারে মেয়ে সেজে এমন মিনি গলায় মেয়েলী পার্ট করতেন যে, বোঝাই যেত না তিনি মেয়ে না ছেলে। সেবার সিরাজদ্দৌলা নাটকে তিনি লুৎফা। গিরীশ ঘোষের নাটক। কিন্তু নাটকের দিনই তার ম্যালেরিয়া চাগিয়ে

উঠল। লেপচাপ হয়ে কোঁ-কোঁ করছেন। নাটক প্রায় শিকেয় ওঠে। কিন্তু ঠিক দেখা গেল, নাটকের সময়ে লুফার অভাব হয়নি। একেবারে ধর্মদাস মাস্টারমশাই যেন গোঁফ কামিয়ে আগাগোড়া নিখুঁত অভিনয় করে গেলেন। কেউ কিছু টের পেল না। কিন্তু ভিতরকার কয়েকজন ঠিকই জানত, যে, সেদিন ধর্মদাস মাস্টারমশাই স্টেজে নামেননি। নাটকের শেষে সমাদ্দার দাদামশাইয়ের সঙ্গে ফিরে আসছিলেন, বললেন, "দেখলেন, কেমন কার্যোদ্ধার হয়ে গেল, একটু খোনাসুরও কেউ টের পায়নি।

দাদামশাই তখন চেপে ধরলেন সমাদ্দারকে "মশাই, রহস্যটা কী একটু খুলে বলবেন?"

সমাদ্দার হেসে শতখান হয়ে বললেন, "সবই তো বোঝেন মশাই। একটা নীতিকথা বলে রাখি, সদ্ভাব রাখলে সকলের কাছ থেকেই কাজ পাওয়া যায়। কথাটা খেয়াল রাখবেন।"

মামাদের মধ্যে যারা একটু বড়, তারা বাইরে খেলে বেড়াত। মা আর বড়মাসী তখন কিছু বড় হয়েছে। অন্য মামা-মাসীরা নাবালক নাবালিকা। মার বড় লুডো খেলার নেশা ছিল। তো মা আর মাসী রোজ দুপুরে লুডো পেড়ে বসত, তারপর ডাক দিত, "আয় রে। অমনি টুক করে কোথা থেকে মায়ের বয়সীই দুটো মেয়ে হাসিমুখে লুডো খেলতে বসে যেত। মামাদের মধ্যে যারা বড় হয়েছে সেই বড় আর মেজো মামা যেত বল খেলতে। দুটো পার্টিতে প্রায়ই ছেলে কম পড়ত। ছোটো জায়গা তো, বেশি লোকজন ছিল না। কিন্তু কম পড়লেই মামারা ডাক দিত, "কে খেলবি আয়"। অমনি চার-পাঁচজন এসে হাজির হতো, মামাদের বয়সীই সব ছেলে। খুব খেলা জমিয়ে দিত।

এই খেলা নিয়েই আর একটা কাণ্ড হলো একবার। দোমোহানীর ফুটবল টিমের সঙ্গে এক চা-বাগানের টিমের ম্যাচ। চা-বাগান থেকে সাঁওতাল আর আদিবাসী দুর্দান্ত চেহারার খেলোয়াড় সব এসেছে। দোমোহানীর বাঙালী টিম জুত করতে পারছে না, হঠাৎ দোমোহানীর টিম খুব ভাল খেলা শুরু করল, দুটো গোল শোধ দিয়ে আরো একখানা দিয়েছে। এমন সময়ে চা-বাগান টিমের ক্যাপ্টেন খেলা থামিয়ে রেফারীকে বলল, "ওরা বারোজন খেলছে।" রেফারী গুনে দেখলেন, না, এগারোজনই। ফের খেলা শুরু হতে একটু পরে রেফারীই খেলা থামিয়ে দোমোহানীর ক্যাপ্টেনকে ডেকে বললেন, "তোমাদের টিমে চার পাঁচজন একস্ট্রা লোক খেলছে!"

দুর্দান্ত সাহেব-রেফারী, সবাই ভয় পায়। দোমোহানীর ক্যাপ্টেন বুক ফুলিয়ে বলল, “গুনে দেখুন। রেফারী গুনে দেখে আহাম্মক। এগারোজনই।

দোমোহানীর টিম আরো তিনটে গোল দিয়ে দিয়েছে। রেফারী আবার খেলা থামিয়ে ভীষণ রেগে চেঁচিয়ে বললেন, “দেয়ার আর অ্যাট লীসট টেন একস্ট্রা মেন ইন দিস টিম।”

দর্শকদেরও তাই মনে হয়েছে। গুনে দেখা যায় এগারোজন’, কিন্তু খেলা শুরু হতেই যেন ঘাসের বুকে লুকিয়ে থাকা, কিংবা বাতাসের মধ্যে মিলিয়ে থাকা সব খেলোয়াড় পিলপিল করে নেমে পড়ে মাঠের মধ্যে। রেফারী দোমোহানীর টিমকে লাইন আপ করিয়ে সকলের মুখ ভাল করে দেখে বললেন, “শেষ তিনটে গোল যারা করেছে তারা কই? তাদের তো দেখছি না। একটা কালো ঢ্যাঙা ছেলে, একটা বেঁটে আর ফর্সা, আর একটা ষাঁড়ের মতো, তারা কই?”

দোমোহানীর ক্যাপ্টেন মিন মিন করে যে সাফাই গাইল, তাতে রেফারী আরো রেগে টং। চা-বাগানের টিমও ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হাসে পড়েছে। কিন্তু কেউ কিছু বুঝতে পারছে না।

খেলা অবশ্য বন্ধ হয়ে গেল। দাদামশাইয়ের বাবা লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে খেলার হালচাল দেখে বললেন, আবার সেই গন্ধ। এখানেও একটা রহস্য আছে বুঝলে সমাদ্দার?”

স্টেশনমাস্টার সমাদ্দার পাশেই ছিলেন, বললেন, “ব্যাটারা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।”

“কে কাদের কথা বলছো।”

সমাদ্দার এড়িয়ে গেলেন। দাদামশাইয়ের বাবা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, “গন্ধটা খুব সন্দেহজনক।”

দাদামশাইয়ের বাবা সবই লক্ষ্য করতেন, আর বলতেন, “এসব ভাল কথা নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক। ও বৌমা, এসব কী দেখছি তোমাদের এখানে? হুট বলতেই সব মানুষজন এসে পড়ে কোত্থেকে, আবার হুশ করে মিলিয়ে যায়। কাল মাঝরাতে উঠে একটু তামাক খাওয়ার ইচ্ছে হলো, উঠে বসে কেবল মাত্র আপনমনে বলেছি একটু তামাক খাই। অমনি একটা কে যেন বলে উঠল, এই যে

বাবামশাই, তামাক সেজে দিচ্ছি। অবাক হয়ে দেখি, সত্যিই একটা লোক কল্কে ধরিয়ে এনে হুঁকোয় বসিয়ে দিয়ে গেল। এরা সব কারা?”

দিদিমা আর কী উত্তর দেবেন? চুপ করে থাকেন। দাদামশাইও বেশি উচ্চবাচ্য করেন না। বোঝেন সবই। কিন্তু দাদামশাইয়ের বাবা কেবলই চারধারে বাতাস শুঁকে শুঁকে বেড়ান, আর বলেন, “এ ভাল কথা নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক।”

মা প্রায়ই তাঁর দাদুর সঙ্গে বেড়াতে বেরোতেন। রাস্তায়ঘাটে লোকজন কারো সঙ্গে দেখা হলে তারা সব প্রণাম বা নমস্কার করে সম্মান দেখাত দাদামশাইয়ের বাবাকে, কুশল প্রশ্ন করত। কিন্তু দাদামশাইয়ের বাবা বলতেন, “রোসো বাপু, আগে তোমাকে ছুঁয়ে দেখি, গায়ের গন্ধ শুকি তারপর কথাবার্তা।” এই বলে তিনি যাদের সঙ্গে দেখা হতো তাদের গা টিপে দেখতেন, শুঁকতেন, নিশ্চিন্ত হলে কথাবার্তা বলতেন। তা তার দোষ দেওয়া যায় না। সেই সময়ে দোমোহানীতে রাস্তায়ঘাটে বা হাটেবাজারে যে সব মানুষ দেখা যেত তাদের বারো আনাই নাকি সত্যিকারের মানুষ নয়। তা নিয়ে অবশ্য কেউ মাথা ঘামাত না। সকলেরই অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল।

অভ্যাস জিনিসটাই ভারী অদ্ভুত। যেমন বড়মামার কথা বলি। দোমোহানীতে আসবার অনেক আগে থেকেই তাঁর ভারী ভূতের ভয় ছিল। তাঁরও দোষ দেওয়া যায় না। ঐ বয়সে ভূতের ভয় কারই বা না থাকে। তার কিছু বেশি ছিল। সন্ধ্যের পর ঘরের বার হতে হলেই তার সঙ্গে কাউকে যেতে হতো। দোমোহানীতে আসার অনেক পরেও সে অভ্যাস যায়নি। একদিন সন্ধ্যেবেলা বসে ধর্মদাস মাস্টার মশাইয়ের কাছে পড়ছেন একা, বাড়ির সবাই পাড়া-বেড়াতে গেছে। ঠিক সেই সময়ে তার বাথরুমে যাওয়ার দরকার হলো। মাস্টার মশাইকে তো আর বলতে পারেন না–আপনি আমার সঙ্গে দাঁড়ান। তাই বাধ্য হয়ে ভিতর বাড়িতে এসে অন্ধকারকে উদ্দেশ্য করে বললেন “এই শুনছিস?”

অমনি একটা সমবয়সী ছেলে এসে দাঁড়াল, “কী বলছো?”

“আমি একটু বাথরুমে যাবো, আমার সঙ্গে একটু দাঁড়াবি চল তো।”

সেই শুনে ছেলেটা তো হেসে কুটিপাটি, বলল, “দাঁড়াবো কেন? তোমার কিসের ভয়?”

বড়মামা ধমক দিয়ে বলেন, "বেশি ফ্যা ফ্যা করিস না। দাঁড়াতে বলছি দাঁড়াবি।"

ছেলেটা অবশ্য দাঁড়াল। বড়মামা বাথরুমের কাজ সেরে এলে ছেলেটা বলল, "কিসের ভয় বললে না?"

বড়মামা গম্ভীর হয়ে বললেন, "ভূতের।"

ছেলেটা হাসতে হাসতেই বাতাসে মিলিয়ে গেল। বড়মামা রেগে গিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, "খুব ফাজিল হয়েছে তোমরা।"

তা এই রকম সব হতো দোমোহানীতে। কেউ গা করত না। কেবল দাদামশাইয়ের বাবা বাতাস শুঁকতেন, লোকের গা শুঁকতেন। একদিন বাজার থেকে ফেরার পথে তার হাতে মাছের ছোট্ট খালুই, তাতে সিঙ্গি মাছ নিয়ে আসছিলেন, তো একটা মাছ মাঝপথে খালুই বেয়ে উঠে রাস্তায় পড়ে পালাচ্ছে। দাদামশাইয়ের বাবা সেই মাছ ধরতে হিমসিম খাচ্ছেন, ধরলেই কাটা দেয় যদি। এমন সময়ে একটা লোক খুব সহৃদয় ভাবে এসে মাছটাকে ধরে খালুইতে ভরে নিয়ে চলে যাচ্ছিল। দাদামশাইয়ের বাবা তাকে থামিয়ে গা শুঁকেই বললেন, "এ তো ভাল কথা নয়। গন্ধটা খুব সন্দেহজনক! তুমি কে হে! অ্যাঁ! কারা তোমরা।"

এই বলে দাদামশাইয়ের বাবা তার পথ আটকে দাঁড়ালেন। লোকটা কিন্তু ঘাবড়াল না। হঠাৎ একটু ঝুঁকে দাদামশাইয়ের বাবার গা এঁকে সেও বলল, "এ তো ভাল কথা নয়! গন্ধটা বেশ সন্দেহজনক! আপনি কে বলুন তো! অ্যাঁ! কে?"

এই বলে লোকটা হাসতে হাসতে বাতাসে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দাদামশাইয়ের বাবা আর গন্ধের কথা বলতেন না! একটু গম্ভীর হয়ে থাকতেন ঠিকই, ভূতের অপমানটা তার প্রেস্টিজে খুব লেগেছিল। একটা ভূত তার গা এঁকে ঐ কথা বলে গেছে ভাবা যায়!

# গয়াপতির বিপদ

---

**গয়াপতির বিপদ**

দারোগা গয়াপতির ভারী ফ্যাসাদ। কিছুতেই তিনি ডাকাত ঝালুরামকে ধরতে পারছেন না। ধরা দূরে থাকুক, ঝালুরামের চেহারাটা কেমন, সে কালো না ফর্সা, লম্বা না বেঁটে, হাসিখুশি না গোমড়ামুখো, তাও তিনি জানেন না। অথচ সরকার জোর তাগাদা দিচ্ছেন, ঝালুরামকে ধরতে না পারলে গয়াপতির বদলি অবধারিত।

তা ঝলুরামকে ধরাও সোজা কথা নয়। তার বন্দুক-পিস্তল আছে, হাতি-ঘোড়া-মোটরগাড়ি আছে, ছদ্মবেশ ধরতেও সে খুব ওস্তাদ লোক। যাদের বাড়িতে ঝালুরাম ডাকাতি করেছে, তারা কেউ সঠিকভাবে ঝালুরামের চেহারার বর্ণনা দিতে পারে না। কেউ বলে লম্বা, কারো মতে বেঁটে, কেউ বলে ফর্সা, কারো দাবি কালো। এ পর্যন্ত পনেরোজন ঝালুরামের বিবরণ পাওয়া গেছে। কিন্তু গয়াপতি জানেন, ঝালুরাম এক এবং অদ্বিতীয়। গত দুবছর ধরে এই শান্তির এলাকাকে ঝালুরাম ভারী সমস্যাসংকুল করে তুলেছে। বাড়ি লুটছে, দোকান লুটছে, আড়ত সাফ করে নিয়ে যাচ্ছে, রাস্তায়-ঘাটে লোকের সর্বস্ব কেড়ে নিচ্ছে। এখন ঝালুরামের নাম শুনলে কেউ অজ্ঞান হয়ে পড়ে, কেউ চোখ বুজে ফেলে, কেউ ঘামতে থাকে, কেউ বা ঠাণ্ডা মেরে যায়।

ঝালুরামের আবির্ভাব হওয়ার আগে গয়াপতি সুখেই ছিলেন। মাছ দুধ-ফল-সবজি-মাংস-ডিমের অভাব হত না। খাওয়া-দাওয়াটা বেশ হত। রাতে ঘুমোতেন, দিনে ঘুমোতেন, প্রায় সারাক্ষণই একটা ঘুম-ঘুম ভাব লেগে থাকত তার মনটা খুব প্রশান্ত থাকত, চারদিকটা ভারী শান্তিময় ও সুন্দর ছিল। গয়াপতির বেশ একটা বড়সড় ভুড়ি হয়েছে, গায়ে-গতরে থলথল করছে চর্বি। ওঠা, হাঁটা কাজকর্ম করা বা খাটা-খাটুনির অভ্যাসটাই মরে গেছে। ঠিক এই সময়ে একদিন দুম করে দুর্দান্ত

ঝালুরাম তার এলাকায় ঝাঁপিয়ে পড়ে সব তছনছ করে দিল। প্রতিদিন কোথাও-না কোথাও ঝালুরাম কিছুনা-কিছু করছেই। দুবছরে মোট সাতশ ত্রিশ দিনে সে এগারো শো বাহান্ন রকমের লুটপাট, ছিনতাই, জখম ইত্যাদি করেছে।

গয়াপতির খিদে ক্রমশ কমে আসছে। রাতে একটু আধটু ঘুম এখনো হয় বটে, কিন্তু দিনের ঘুমটা আর আসতে চায় না আজকাল। ঘুম-ঘুম ভাবটাও আর নেই। গয়াপতির বুড়ি মা আজকাল প্রায়ই দুঃখ করে বলেন, "বড্ড রোগা হয়ে গেছিস গয়া। চোখের তলায় কালি পড়েছে, হাঁটার সময় তোর পেটটা আর আগের মতো দোল খায় না, জুতোর শব্দটাও তেমন দুমদাম করে হয় না।"

গয়াপতির গিন্নি আগে মোটা-মোটা সোনার বালা, চুড়ি, এগারো ভরির বিছে-হার পরে থাকতেন সবসময়। একদিন গয়াপতি দেখলেন, তার গিন্নি সব গয়না খুলে রেখে শুধু দু গাছি করে সরু চুড়ি আর সুতোর মতো সরু হার পরে আছেন। গয়াপতি হুংকার দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "গয়না খুলে ফেলেছ যে?"।

গিন্নি আমতা-আমতা করে বললেন, "সবাই বলছে চারদিকে খুব চোর ডাকাতের উপদ্রব, গয়না দেখানোটা নাকি ঠিক নয়।"

শুনে গয়াপতি গুম মেরে গেলেন। দারোগার বউ চোরডাকাতের ভয় খাচ্ছে। তার মানে, গয়াপতির যোগ্যতায় তার নিজের বউয়েরও বিশ্বাস নেই!

সেইদিন থেকে গয়াপতি মরিয়া হয়ে উঠলেন। ঝালুরামের যে-কোনো খবর পেলেই ছুটে যান। কিন্তু কিছুতেই শেষ পর্যন্ত হদিশ করে উঠতে পারেন না। সবাই আড়ালে দুয়ো দেয়।

সেবার সোনাগড়ের হাটের কাছে ঝালুরাম তার স্যাঙাতদের নিয়ে জড়ো হয়েছে বলে এক আড়কাঠির কাছে খবর পেয়ে গয়াপতি সদলবলে ছুটলেন। গিয়ে দেখেন নির্দিষ্ট জায়গায় এক খুনখুনে বুড়ি ঘরের মাটির দেয়ালে খুঁটে দিচ্ছে। আড়কাঠি মাথা চুলকে বলল, "এই বুড়িটাই ঝালুরাম। ছদ্মবেশে রয়েছে বোধহয়।"

গয়াপতি সন্দেহের শেষ রাখলেন না। বুড়িকে ধরে তুলে নিয়ে এলেন থানায়। বুড়ি পরিত্রাহি শাপশাপান্ত করতে থাকে। খবর পেয়ে শহর থেকে ম্যাজিস্ট্রেট এসে কাণ্ড দেখে হাসির ছররায় গয়াপতিকে ঘায়েল করে চলে গেলেন।

আবার আর-এক চরের কাছে খবর পেয়ে গয়াপতি চুপিসাড়ে কলসিপোতা গায়ের চাকলাদারদের নারকোলবাগানে হাজির হলেন! খবর ছিল, মরা নারকোলগাছের নীচে ঝালুরাম সাধু সেজে বসে আছে। গয়াপতি সাধুর লেংটিরও সন্ধান পেলেন না, তবে সেখানে ধুনির ছাই খানিকটা ছিল বটে। যে লোকটা খবর এনেছিল, সে বলল, "এই নারকোলগাছটাই আজ্ঞে ঝালুরাম। এটাকে গ্রেফতার করুন।"

শুনে গয়াপতির মাথায় রক্ত চড়ে গেল। লোকটাকে কান ধরে কয়েকটা চড়-চাপড় দিলেন। পরে কিন্তু খবর পেয়েছিলেন যে, লোকটা মিথ্যে বলেনি। মরা নারকোলগাছের ফাঁপা খোলের মধ্যেই নাকি ঝালুরাম গা ঢাকা দিয়েছিল। কদিন বাদে গিয়ে দেখলেন, বাস্তবিকই নারকোলগাছের গায়ে একটা চৌকো দরজা। সেটা খুললে ভিতরে দিব্যি একজন সেঁধোতে পারে। ফলে গয়াপতির এক গাল মাছি।

হরগঞ্জের শ্রীপতি হাজরা এসে একদিন বলল, "হুজুর, আমার কেলে গরুটা পাচ্ছি না। তার জায়গায় গোয়ালে একটা রাঙা গাই কে বেঁধে রেখে গেছে। বড় সন্দেহ হয়, রাঙা গাইটার ভাবগতিক দেখে। গরুর মতো ডাকে না, খোল ভুষি ঘাস এসব খেতে চায় না। ভাত দিলে খায়। মনে হচ্ছে গরুর ছদ্মবেশেই না আবার ঝালুরাম এসে ঘাপটি মেরে বসে থাকে।

ছুটলেন গয়াপতি। গরুটার ওপর অনেক খোঁচাখুঁচি চলল। শেষে পাশের গাঁ হরবল্লভপুরের রহমত খবর পেয়ে ধেয়ে এসে গয়াপতির পায়ে পড়ে বলল, "হুজুর, ওটা ঝালুরাম নয়, নির্ঘ গরুই বটে। ও হল আমার দুলালি। শ্রীপতিদার কেলে গাই আমার গোয়ালে বাঁধা রয়েছে।"

গয়াপতি দমে গিয়ে বললেন, "হুম!"

ঝালুরামের পিছনে দৌড়ঝাঁপ করতে-করতে গয়াপতি বাস্তবিকই টসকে গেছেন। জীপগাড়িতে চড়ে তাঁর গায়ে-গতরে প্রচণ্ড ব্যথা। ইদানীং দুর্গম জায়গায় যেতে হয় বলে ঘোড়াতেও চড়তে হচ্ছে। তার ফলে মাজায় বিষফোঁড়ার যন্ত্রণা। ঝালুরামের কথা ভাবতে ভাবতে সবসময়ে এমন দাঁত কিড়মিড় করেন যে, দুটো বুড়ো দাঁত নড়ে গেল। আজকাল এমন সন্দেহবাই হয়েছে যে, থানার সেপাই, বাড়ির চাকর, এমন কী নিজের মা বা বউকে পর্যন্ত বিশ্বাস করেন না। এরা যে-কেউই ঝালুরাম হতে পারে বলে আজকাল তার সন্দেহ হয়। হাতে সবসময়ে খোলা রিভলভার।

খেতে, শুতে, স্নান করতে বা বাথরুমে যেতেও হাতে সেটা থাকে। ফলে কেউ ভয়ে তার কাছে ঘেঁষে না।

কাণ্ড দেখে গয়াপতির মা ঝালুরামকে উদ্দেশ করে শাপশাপান্ত করতে লাগলেন, "কেন রে খ্যাংরাফো, পালিয়ে বেড়াচ্ছিস? তোকে সাপে বাঘে খায় না রে? না খায় তো আমার সুমুখে একবার আয় দেখি বুক চিতিয়ে, ঝাটা দিয়ে তোর বিষ ঝেড়ে দিই। বদমাশ কোথাকার, আমার বাছা খুঁজে-খুঁজে হেদিয়ে পড়ল, আর কোন্ আকেলে তুই তার চোখে ধুলো দিয়ে বেড়াচ্ছিস? বাছা আমার যেমন না-খেয়ে না-ঘুমিয়ে রোগা হয়ে গেল, তোরও তাই হোক। শুকিয়ে আমসি হয়ে যা, না খেয়ে উপোসি থেকে তোর পেট-পিঠের চামড়ায় ঘষাঘষি হোক।"

গয়াপতির গিন্নি গিয়ে হেকমতপুরের জাগ্রত কালীবাড়িতে জোড়া পাঠা মানত করে এলেন। শুনে গয়াপতির মা বললেন, "জোড়া পাঁঠা কি গো, ঝালুরাম ধরা পড়লে আমি জোড়া মোষ দেব। তাতেও না হলে জোড়া হাতি দেব, এই বলে রাখলাম।"

গয়াপতি সবই শুনেছেন এবং বুঝেছেন। তিনি যে ঝালুরামকে ধরতে পারবেন এ বিশ্বাস কারো নেই। সেটা বুঝতে পেরে তিনি আরও গুম হয়ে যান। রিভলভারটা বাগিয়ে ধরে গভীরভাবে ভাবতে থাকেন।

একদিন সকালে থানায় নিজের অফিসঘরে বসে যখন এমনি ভাবেই ভাবছিলেন, তখন হঠাৎ একটা লম্বা-চওড়া লোক ঘরে ঢুকেই তার বুকের দিকে পিস্তল বাগিয়ে ধরে বলল, "হাত তুলুন।"

গয়াপতি রিভলভার সুষ্ঠু হাত ওপরে তুলে সভয়ে বললেন, "মেরো না বাবা ঝালুরাম!"

লোকটা গম্ভীর হয়ে বলল, "আমি ঝালুরাম নই, আর আপনাকে মারার ইচ্ছেও নেই। তবে আমি শুনেছি যে, আজকাল আপনি সবসময়ে রিভলভার বাগিয়ে থাকেন আর সবাইকে সন্দেহ করেন। তাই প্রাণের ভয়ে একটু ভয় দেখাতে হল। এখন আপনি যদি আপনার রিভলভারটা খাপে ভরেন, আমিও পকেটে পুরব।"

গয়াপতি হাঁফ ছেড়ে রিভলভার খাপে ঢোকালেন। লোকটাও কথামতো কাজ করল। তারপর বসে এক গাল হেসে বলল, " আমি গোয়েন্দা বরদাচরণ। নরনাথ

চাটুজ্যে আমাকে ভাড়া করে এনেছেন তাদের বাড়ির সোনার হংসেশ্বরীর মূর্তি পাহারা দেওয়ার জন্য। তাদের ভয়, ডাকাত ঝালুরাম মূর্তিটা লুট করবে।”

গয়াপতি নাক সিঁটকোলেন। প্রাইভেট গোয়েন্দা বরদাচরণের নাম তিনি শুনেছেন। লোকটা লাউঁচুরি বা বড় জোর ছেলেচুরির কেস করে। তাই গয়াপতি খুবতাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, “ঝালুরামের ব্যবস্থা আমিই করব। আর কারো এখানে নাক গলাতে হবে না।”

বরদাচরণ মৃদু হেসে বললেন, “আপনি কী ভাবছেন তা আমি জানি। তবে এটুকু বলতে পারি, আমি আজকাল লাউঁচুরি, গরুচুরির মতো ছোটোখাটো কেস নিই না। মাত্র দু মাস আগে আমি একটা পুকুরচুরি ধরেছি।”

গয়াপতি চমকে গিয়ে বললেন, “বটে?”

“তবে আর বলছি কী? গয়েরকাটার রাম সিংয়ের বাড়ির ঈশান কোণের মস্ত পুকুর রাতারাতি চুরি হয়ে গেল। রাতেও টলটলে জল ছিল তাতে। সকালে দেখা গেল বিশাল গর্ত পড়ে আছে। জল তো নেই-ই, অন্তত বিশ মন মাছও সেই সঙ্গে উধাও। তিন দিনের মধ্যে ধরে ফেললাম, রাম সিংয়ের এক জ্ঞাতি ভাই রাবণ সিং বাড়ির সবাইকে সিদ্ধির সঙ্গে ঘুমের ওষুধ খাওয়ায় তারপর রাতে ডিজেল পাম্প চালিয়ে পুকুরের সব জল নিজের একটা মজা দিঘিতে চালান করে এবং বিশ মন মাছ নিয়ে গিয়ে শহরে বেচে দেয়। আরো শুনবেন? মাত্র একমাস আগে আমি দুটো আন্তর্জাতিক চোরাই চালানের দলকে ধরি। আমেরিকার বড়লোকেরা বায়না ধরেছে তাজমহল এবং এভারেস্ট চাই। বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার দেবে তার জন্য। মাসখানেক আগে এক অমাবস্যার রাত্রে চারটে লোক আমেরিকায় চালান দেওয়ার জন্য তাজমহলের ভিত খুঁড়ছিল। তক্কেতক্কে আমি গিয়ে পালের গোদাকে চেপে ধরি। বাকি তিনজন পালায় বটে, কিন্তু হাতের ছাপ সহ শাবল ফেলে যায়। সেবারের মতো তাজমহল আমেরিকায় চালান হওয়ার হাত থেকে বেঁচে যায় এবং পুরো দলটাই ধরা পড়ে। তার কিছুদিনের মধ্যেই নেপাল গভরমেণ্টের ডাকে নেপালে গিয়ে আমি এভারেস্ট চুরিও আটকাই। চোরেরা এভারেস্ট শৃঙ্গ ভেঙে টুকরো করে সাধারণ পাথর হিসেবে আমেরিকায় চালান দিচ্ছিল। আমেরিকায় পাথরের চালান যাচ্ছে শুনেই আমার সন্দেহ হয়। আমেরিকায় তো পাথরের অভাব নেই। তাই চালানের পাথর পরীক্ষা করেই আমি বুঝতে পারলাম, এ সাধারণ পাথর নয়। সেগুলোর গায়ে তখনো বরফ লেগে আছে। অনুসন্ধানে পুরো দলটাই ধরা পড়ল। নেপাল গভরমেন্ট গোপনে জাপান

থেকে ইনজিনীয়ার আনিয়ে টুকরো পাথর সিমেন্টে জুড়ে ফের এভারেস্ট শৃঙ্গ রাতারাতি মেরামত করে ফেলল। সুতরাং...”

গয়াপতি বহুদিন বাদে এই প্রথম একটু হাসলেন। বললেন, “আপনি কি ঘনাদার কেউ হন?”

গোয়েন্দা বরদাচরণ ঘনাদার গল্প পড়েননি। আসলে গোয়েন্দাগিরি করে পড়াশুনোর সময়ও পান না। তবু ভাবলেন, ঘনাদা বোধহয় একজন কেওকেটা হবে। তাই পিছপা না হয়ে বললেন, “দূর সম্পর্কের মাসতুতো ভাই।”

যাই হোক, এরপর গয়াপতি আর বরদাচরণের মধ্যে খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল। দুজনে গোপনে নানারকম পরামর্শ আঁটতে লাগলেন।

কিছুদিনের মধ্যে খবর রটে গেল যে, দারোগা গয়াপতি নিখোঁজ হয়েছেন। ওদিকে চাটুজ্যে-বাড়ির সোনার হংসেশ্বরী মূর্তি পাহারা দেওয়ার জন্য শহর থেকে যে গোয়েন্দাকে আনানো হয়েছিল, সেও বেপাত্তা। ফলে চারদিকে খুব হৈ-চৈ পড়ে গেল। সবাই বুঝল, এ হচ্ছে ঝালুরামের কাজ। স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব পর্যন্ত ভাবনায় পড়ে গেলেন।

ওদিকে ভাবনায় পড়েছে স্বয়ং ঝালুরামও। এতকাল এ এলাকায় সে-ই ছিল এক ডাকাত-সম্রাট। কিন্তু দিন সাতেক হল সে এমন তিন চারটে ডাকাতির খবর পেয়েছে, যেগুলো তার দলের কাজ নয়। ঝালুরামের এলাকায় তার অনুমতি না নিয়ে ডাকাতি করবে, এত সাহস কার! ঝালুরামের খাওয়া কমে গেছে, ঘুম ছুটে গেছে। চারদিকে তার চোরেরা নতুন ডাকাতদের খোঁজ নিচ্ছে।

মনসাপোতার গভীর জঙ্গলের ভিতর এক ভাঙা মন্দিরে ঝালুরামের আস্তানায় এক রাত্রে দুজন লোককে ধরে আনা হল। একজন মোটাসোটা, থলথলে। অন্যজন বেশ লম্বা-চওড়া। ঝালুরাম মশালের আলোয় চোখ দিয়ে দুজনকে ভাল করে মেপে দেখল। তারপর হুংকার দিয়ে বলে উঠল, “তোরাই ডাকাত?”

ঝালুরাম দেখতে রোগা। ল্যকপ্যাক সিং। মাথায় তেমন উঁচুও নয়। কিন্তু তার হুংকার শুনলে মালুম হয়, যন্ত্রটা ছোট হলেও বিপজ্জনক।

লোক দুটো কেঁপে কেঁপে বলল, “আজ্ঞে।”

ঝালুরাম অট্টহাসি হেসে ওঠে। লম্বা লোকটা ভয়েভয়ে বলে, “হুজুর, আমাদের কেউ দলে নেয়নি বলে দুজনে মিলে ছোটোখাটো কাজ করি। কিন্তু আপনার মতো মহান ডাকাত যদি আমাদের দলে ভর্তি করে নেন, তবে আমরা আলাদা কাজ কারবার ছেড়ে দেব।”

ঝালুরাম অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বলে, “আমার দলে ডাকাতি করবি? দেখি তোদের এলাম! দুজনে পঞ্চাশটা করে ডিগবাজি খা।”

ডিগবাজি খেতে খেতে লোকদুটো হেদিয়ে জিভ বার করে হ্যাঁ-হ্যাঁ করে হাঁফাতে লাগল। ঝালুরাম হেসে লুটোপুটি, সেই সঙ্গে তার পঞ্চাশজন স্যাঙাতও।

এরপর ঝালুরাম হুকুম দেয়, “রণপায়ে চড়ে পাঁচ ক্রোশ পথ হেঁটে আয়…দু মাইল দৌড় দে…স্রোতের নদী সাঁতরে পার হ…সুপুরি গাছ বেয়ে ওঠ…বিশ হাত ওপর থেকে নীচে লাফিয়ে পড়…লাঠি তরোয়াল আর রাম-দা চালিয়ে দেখা…বন্দুকের নিশানা দেখা…অমাবস্যার রাতে একলা শ্মশানে মড়ার খুলি কোলে নিয়ে বসে থাক্..”

আর এই সব হুকুম তামিল করতে করতে লোক দুটোর জান কয়লা। প্রাণপাখি খাঁচা-ছাড়া হওয়ার উপক্রম। আড়ালে মোটা লোকটা রাগে দাঁত কিড়মিড় করে বলে ওঠে, ‘ইচ্ছে করে, দৌড়ে গিয়ে বেটার টুটি ধরি।” লম্বা লোকটা তখন তার হাত চেপে ধরে চুপি-চুপি বলে, “না গয়াবাবু, এখন নয়। সব প্ল্যান ভেস্তে যাবে। অপেক্ষা করুন।”

সব কিছুরই শেষ আছে। লোকদুটোর ট্রেনিংও একদিন শেষ হল। ঝালুরাম তাদের ডেকে বললে, “তোদের দিয়ে কোনরকমে কাজ চলতে পারে। আজ আমরা চাটুজ্যে-বাড়ির হংসেশ্বরীর সোনার মূর্তি লুট করতে যাচ্ছি। তোরাও থাকবি দলে। আজ তোদের পরীক্ষা।”

শুনে ছদ্মবেশী গয়াবাবু আবার দাঁত কিড়মিড় করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বরদাচরণ ঠিক সময়ে কনুইয়ের গুতো দিয়ে তাকে সতর্ক করে দিলেন।

নিশুত রাতে ঝালুরামের দল চাটুজ্যে-বাড়ি ঘিরে ফেলল। ‘রে রে’ করে চেঁচাচ্ছে ডাকাতরা। আর সে চেঁচানি এমন সাঙ্ঘাতিক যে, মাটি সুদ্ধু কাঁপতে থাকে। চাটুজ্যে-বাড়ির ভিতরে ছেলে-বুড়ো-মেয়েরা মড়াকান্না জুড়ে দিয়েছে। ঝালুরাম

নাক সিঁটকে বলল, “এ বড় ছোট ডাকাতি। ছোটলোকদের কাজ। ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করা। নতুন দুটোকে ডাক তো।”

নতুন দুজন এগিয়ে এলে ঝালুরাম বলল, “আজ আর আমরা হাত লাগাচ্ছি না। আমার দলবল বাড়ি ঘিরে রইল। আমি ওদিকের বটগাছতলায় মাদুর পেতে ঘুমোতে যাচ্ছি। তোরা দুজনে বাড়িতে ঢুকে সব চেঁছে-পুঁছে নিয়ে আয় গে যা। মনে রাখিস, হংসেশ্বরীর মূর্তিটা আনতে যেন ভুল না হয়। আধঘণ্টার বেশি সময় দেব না কিন্তু। চটপট যা।”

হুকুম পেয়ে দুজনে গিয়ে পাঁচিল টপকে ভিতরে ঢুকল। ঢুকেই গয়াপতি বললেন, “বরদাবাবু! এখন উপায়?”

বরদাচরণ ভ্রূ কুঁচকে ভাবিত মুখে বললেন, “হুকুম-মতো কাজ করে যান। অন্য উপায় তো দেখছি না।”

“কিন্তু আমি যে কখনো সত্যিকারের ডাকাতি করিনি! বাধোবাধো ঠেকছে যে!”

বরদাচরণ দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, “আর আমিই বুঝি করেছি!”

গয়াপতি বিরসমুখে বলেন, “তা সত্যি কথা বলতে কী, ডাকাতির ট্রেনিং নেওয়ার সময় আপনার ভাবগতিক দেখে মনে হচ্ছিল এ-ব্যাপারে আপনার কিছু পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে। আমার চেয়ে সব বিষয়েই আপনি বেশি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। তার ওপর এখন আবার ডাকাতিতেও বেশ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে।”

বরদাচরণ শ্লেষের হাসি হেসে বলেন, “গয়াবাবু ডাকাতরা তো রাতে ডাকাতি করে, কিন্তু এখানকার লোক জানে যে, আপনি এখানে দিনে ডাকাতি করতেন। রোজ মাছ দুধ পাঠা মুর্গি ভেট নিতেন, প্রতি মাসে নগদ টাকায় নিয়মিত ঘুষ খেয়েছেন। কাজেই এই ছোটখাটো একটা ডাকাতিতে আপনার লজ্জার কারণ দেখছি না।”

গয়াপতি প্রচণ্ড রেগে গিয়ে বলেন, “একটা প্রাইভেট গুলবাজ টিকটিকির এত বড় আস্পদ্দা! কালই তোমাকে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে এই এলাকা থেকে বের করে দেব।”

বরদাচরণ সমান তেজে বলেন, “বেশি চালাকি করো না হে গয়াপতি, বাইরে ঝালুরাম মোতায়েন আছে। যদি বলে দিই যে, তুমি আসলে অপদার্থ দারোগা গয়াপতি, তবে সে হেঁসো দিয়ে তোমার পেট ফাসাবে।”

ঝালুরামের উল্লেখে গয়াপতি কিছু মিইয়ে গেলেন। সত্যি বটে, ঝালুরামের দল এখন ঘিরে আছে চারদিক। গড়বড় করলে বিপদ হতে পারে।

গয়াপতি শ্বাস ছেড়ে বলেন, "ঝালুরামকে আমিও বলে দেব যে তুমি প্রাইভেট গোয়েন্দা বরদাচরণ। তোমারও গর্দান যাবে।"

এইভাবে দুজনের মধ্যে একটা ঝগড়া পাকিয়ে উঠল। হঠাৎ চাটুজ্যে বাড়ির বড় ঘড়িতে একটা বাজার টং শব্দ হতেই দুজনে সচেতন হলেন। সময় বেশি নেই। ঝালুরাম মোটে আধঘণ্টা সময় দিয়েছে।

বরদাচরণ বললেন, "ঝগড়াটা এখন মুলতুবি থাক গয়াবাবু। হাতে কাজ রয়েছে, বাইরে ঝালুরাম।"

গয়াপতিও মাথা নেড়ে বলেন, "থাকল। কিন্তু আপনাকে এই বলে রাখলাম, এসব ঝামেলা মিটে গেলে একদিন আপনার সঙ্গে আমার কুস্তি হবে। দেখব তখন কার কত ক্ষমতা!"

"আমিও দেখব। আমি জুডোর ব্ল্যাক বেল্ট।"

"বেল্ট আমারও আছে।" বরদাচরণ হেসে বলেন, "সে বেল্ট তো ঝোলা ভুঁড়ি বাঁধার জন্যে। জুডোর ব্ল্যাক বেল্ট তা নয়। অনেক প্যাঁচ পয়জার শেখার পর ব্ল্যাক ব্লেট দেওয়া হয়। ওটা একটা মস্ত সম্মান।"

"রাখো রাখো। সম্মান দেখিও না। এলাকায় আমি রাস্তায় বেরোলে লোকে পথ ছেড়ে দেয় জানো?"

"জানি। পাছে তোমার ছায়া মাড়াতে হয় সেই ঘেন্নায় লোকে পথ ছেড়ে দাঁড়ায়।" বরদাচরণ বলেন।

ঝগড়াটা ফের পাকিয়ে উঠেছিল, কিন্তু বাইরে ঝালুরামের একটা হুংকার শোনা গেল এই সময়ে, 'কই রে! হল তোদের?"

কেঁপে উঠে দুজনে দুজনকে জড়িয়ে ধরল।

গয়াপতি বলেন, "বরদাবাবু! আর দেরি নয়।"

বরদাবাবুও বলেন, "না। আর দেরি করা মোটেই ঠিক নয়।" কঁপতে কাঁপতে গয়াপতি চলেন, তার দু-পা আগে বরদাচরণ। বরদাচরণ কঁপছেন

বটে, কিন্তু একটু ঘামছেন। বাগান পার হয়ে সদর দরজায় পৌঁছে দুজনে মুশকিলে পড়লেন। সদর দরজা বন্ধ। কী করে বন্ধ দরজা বাইরে থেকে খুলতে হয় তা ঝালুরাম তাদের শিখিয়ে দেয়নি।

"এখন উপায়?" গয়াপতি বলেন।

"তাই তো!" বরদাচরণও ভাবিত হলেন। তারপর একটু হেসে বললেন, "আরে দূর! খুব সোজা ব্যাপার। আমি তো গোয়েন্দা বরদাচরণ। চাটুজ্যে বাড়ির সবাই আমাকে জানে।"

"আমাকেও।" গয়াপতি হার মানেন না।

"তাহলে আর মুশকিল কিসের? পরিচয় দিলেই দরজা খুলে দেবে।"

তাই হল। ধুতির খুঁটে মুখের কালি মুছে, ছদ্মবেশের পরচুলা, নকল গোঁফ, লম্বা জুলপি খুলে ফেললেন দুজনে। গয়াপতি একটা নকল আঁচিল গালে লাগিয়েছিলেন, সেটা খুঁটে তুলে ফেললেন। বরদাচরণ খানিকটা প্লাস্টার দিয়ে নিজের নাকটাকে বড় বানিয়েছিলেন, প্লাস্টারটুকু তিনিও টান মেরে খুলে ফেললেন। তারপর দুজনে দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকাডাকি করে নিজেদের পরিচয় দিতে লাগলেন। তাঁদের গলার স্বর কারো অচেনা নয়। খানিক বাদে নরনাথ চাটুজ্যে দরজা খুলে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বললেন, "যাক, আপনারা এসে গেছেন তাহলে?"

গয়াপতি সঙ্গে-সঙ্গে চাটুজ্যের বুকে বল্লম ধরেন। আর বরদাচরণ চাটুজ্যেকে বেঁধে ফেলেন চটপট। চাটুজ্যে শুধু করুণ চোখে চেয়ে বললেন, "কাউকে বিশ্বাস করতে নেই। আমার ঠাকুর্দা কথাটা বলতেন।"

এরপর লুটতরাজ খুবই সহজ হয়ে গেল। বাধা দেওয়ার কেউই ছিল না। যে যার প্রাণভয়ে ব্যস্ত। আধণ্টার মাথায় বমাল সমেত গয়াপতি আর বরদাচরণ হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলেন। বেরোবার আগে দুজনেই অবশ্য তাদের ছদ্মবেশ পরে নিয়েছেন।

বরদাচরণের হাতে সোনার মূর্তিটা দেখে ঝালুরাম তার পিঠ চাপড়ে বলে, "সাবাস!"

গয়াপতি একটু তেতো গলায় বলেন, "হুঁঃ! ও ওটা আনতে পারত নাকি? মূর্তিটা শানের ভিতে গাঁথা ছিল। আমি টেনে হিঁচড়ে না নড়ালে ওর একার সাধ্য ছিল না।"

ঝালুরাম গয়াপতিরও পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, "তোরও এলেম কম নয়। কতগুলো সোনার গয়না এনেছিস?"

শুনে বরদাচরণ বললেন, "গয়না খুঁজে বের করার মতো বুদ্ধি যদি ওর পেটে থাকত! ডাকাত পড়ার খবর পেয়েই মেয়েরা সব কচুবনে গয়না ফেলে দিয়েছিল। আমিই বুদ্ধি করে বের করি।"

ঝালুরাম তখন আবার বরদাচরণের পিঠ চাপড়ায়। তাতে গয়াপতি ফুঁসে উঠে বলেন, "চাটুজ্যের বুকে বল্লম ধরেছিল কে শুনি! তোমার সাহস হত?"

বরদাচরণ বলেন, "আর চাটুজ্যেকে বাঁধল কে? সেটাও জোর গলায় বলো।"

এইভাবেই দুজনে প্রচণ্ড ঝগড়ায় লেগে পড়েন। ডাকাতরা চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে দুজনের ঝগড়া দেখে। ঝালুরাম দুজনেরই পিঠ চাপড়ে একবার একে আর একবার ওকে সাবাস দিতে থাকে। কিন্তু ঝগড়া তাতে বাড়ে বই কমে না। একে সাবাস দিলেও চটে ওঠে, ওকে দিলে এ ফুঁসে ওঠে। চেঁচানির চোটেসারা গঞ্জের ঘুম ছুটে যায়। আর কখন যে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব পুলিস নিয়ে এসে গোটা দলটাকে ঘিরে ফেলেছেন তাও ডাকাতরা ভালমতো টের পায় না।

গয়াপতির মা দু-দুটো মানত করেছিলেন। ঝালুরাম ধরা পড়লে জোড়া হাতি দেবেন, আর নিরুদ্দেশ গয়াপতি ফিরে এলে জোড়া উট।

কিন্তু সস্তায় হাতি বা উট পাওয়া যাচ্ছে না কিছুতেই।

# গুপ্তধন

---

**গুপ্তধন**

ভূতনাথবাবু অনেক ধার-দেনা করে, কষ্টে জমানো যা-কিছু টাকা-পয়সা ছিল সব দিয়ে যে পুরোনো বাড়িখানা কিনলেন তা তার বাড়ির কারোর পছন্দ হল না। পছন্দ হওয়ার মতো বাড়িও নয়, তিন-চারখানা ঘর আছে বটে কিন্তু সেগুলোর অবস্থা খুবই খারাপ। দেয়ালে শ্যাওলা, অশ্বথের চারা জন্মেছে। দেয়ালের চাপড়া বেশির ভাগই খসে পড়েছে, ছাদে বিস্তর ফুটো-টুটো। মেঝের অবস্থাও ভালো নয়, অজস্র ফাটল। ভূতনাথবাবুর গিন্নি নাক সিঁটকে বলেই ফেললেন, ‘এ তো মানুষের বাসযোগ্য নয়। ভূতনাথবাবুর দুই ছেলে আর তিন মেয়েরও মুখ বেশ ভার-ভার। ভূতনাথবাবু সবই বুঝলেন। দুঃখ করে বললেন, আমার সামান্য মাস্টারির চাকরি থেকে যা আয় হয় তাতে তো এটাই আমার তাজমহল। তাও গঙ্গারামবাবুর ছেলেকে প্রাইভেট পড়াই বলে তিনি দাম একটু কম করেই নিলেন। পঁয়ত্রিশ হাজার টাকায় এ বাজারে কি বাড়ি কেনা যায়। তবে তোমরা যতটা খারাপ ভাবছ ততটা হয়তো নয়। এ বাড়িতে বহুদিন ধরে কেউ বাস করত না বলে অযত্নে এরকম দুরবস্থা, টুকটাক মেরামত করে নিলে খারাপ হবে না। শত হলেও নিজেদের বাড়ি।

কথাটা ঠিক। এই মহীগঞ্জের মতো ছোট গঞ্জেও বাড়ি ভাড়া বেশ চড়া। ভূতনাথবাবু যে বাড়িতে ছিলেন সে বাড়ির বাড়িওলা নিতাই তাকে তুলে দেওয়ার জন্য নানা ফন্দিফিকির করত। মরিয়া হয়েই বাড়ি কেনার জন্য উঠেপড়ে লেগেছিলেন তিনি।

যাই হোক, বাক্স-প্যাটরা নিয়ে, গিন্নি ও পাঁচ ছেলেমেয়ে নিয়ে একদিন ভোরবেলা ভূতনাথবাবু বাড়িটায় ঢুকে পড়লেন। অপছন্দ হলেও বাড়িটা নিজের বলে সকলেরই খুশি-খুশি ভাব। সবাই মিলে বাড়িটা ঝাড়পোঁছ করতে আর ঘর

সাজাতে লেগে গেল। ভূতনাথবাবুর ছাত্ররা এসে বাড়ির সামনের বাগানটাও সাফসুতরো করে দিল। কয়েকদিন আগে ভূতনাথবাবু নিজের হাতে গোলা চুন দিয়ে গোটা বাড়িটা চুনকাম করেছেন। তাতেও যে খুব একটা দেখনসই হয়েছে তা নয়, তবে বাড়িতে মানুষ থাকলে ধীরে-ধীরে বাড়ির একটা লক্ষ্মীশ্রীও এসে যায়।

আজ আর রান্নাবান্না হয়নি, সবাই দুধ-চিড়ের ফলার খেয়ে ক্লান্ত হয়ে একটু গড়িয়ে নিতে শুয়েছে, এমন সময় একটা লোক এল। বেঁটেখাটো, কালো, রোগাটে চেহারা, পরনে হেঁটো ধুতি আর গেঞ্জি। গলায় তুলসির মালা। ভূতনাথবাবু বারান্দায় মাদুর পেতে শুতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় লোকটা এসে হাতজোড় করে বলল, ‘পেন্নাম হই বাবু, বাড়িটা কিনলেন বুঝি?

হ্যাঁ, তা আপনি কে?

আজ্ঞে আমি হলুম পরাণচন্দ্র দাস। চকবেড়ে থেকে আসছি। চকবেড়ের কাছেই গোবিন্দপুরে নিবাস।

অ। তা কাকে খুঁজছেন?

আমাকে আপনি-আজ্ঞে করবেন না। নিতান্তই তুচ্ছ লোক। আপনি বিদ্বান মানুষ। পুরোনো বাড়ি খোঁজা আমার খুব নেশা।

তাই নাকি?

আজ্ঞে, তা বাবু কিছু পেলেন টেলেন? সোনাদানা বা হীরে-জহরত কিছু?

ভূতনাথবাবু হেসে ফেললেন, তাই বলো! এইজন্য পুরোনো বাড়ি খুঁজে বেড়াও? না হে বাপু, আমার কপাল অত সরেস নয়, ধুলোবালি ছাড়া আর কিছু বেরোয়নি।

ভালো করে খুঁজলে বেরোতেও পারে। মেঝেগুলো একটু ঠুকে-ঠুকে দেখবেন কোথাও ফাপা বলে মনে হয় কিনা।

বাড়িতে গুপ্তধন থাকলে গঙ্গারামবাবু কি আর টের পেতেন না? তিনি ঝানু বিষয়ী লোক।

পরাণ তবু হাল না ছেড়ে বলল, তবু একটু খুঁজে দেখবেন। কিছু বলা যায় না। এ তো মনে হচ্ছে একশো বছরের পুরোনো বাড়ি।

তা হতে পারে।

আর একটা কথা বাবু তেনারা আছেন কিনা বলতে পারেন?

কে? কাদের কথা বলছ?

ওই ইয়ে আর কী–ওই যে রাম নাম করলে যারা পালায়।

ভূতনাথবাবু ফের হেসে ফেললেন, না হে বাপু, ভূতপ্রেতের সাক্ষাৎ এখনও পাইনি। আমার নাম ভূতনাথ হলেও ভূতপ্রেত আমি মানি না।

না বাবু অমন কথা কবেন না, পুরোনো বাড়িতেই তেনাদের আস্তানা কিনা। আপনি আসাতে তারা কুপিত হলেই মুশকিল।

তা আর কী করা যাবে বলো! থাকলে তারাও থাকবেন, আমিও থাকব।

একটু বসব বাবু? অনেক দূর থেকে হেঁটে আসছি।

ভূতনাথবাবু তাড়াতাড়ি বললেন, বোসো-বোসো। দাওয়া পরিষ্কারই আছে।

লোকটা সসঙ্কোচে বারান্দার ধারে বসে বলল, তা বাবু বাড়িটা কতয় কিনলেন?

তা বাপু অনেক টাকাই লেগে গেল। পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা। ধারকর্জও হয়ে গেল মেলা।

উরিব্বাস! সে তো অনেক টাকা।

গরিবের কাছে অনেকই বটে, ধার শোধ করতে জিভ বেরিয়ে যাবে। তা তুমি বরং বোসো, আমি একটু গড়িয়ে নিই। বড্ড ধকল গেছে।

আচ্ছা বাবু, আমি একটু বসে থাকি।

ভূতনাথবাবু একটু চোখ বুজতেই ঘুম চলে এল। যখন চটকা ভাঙল তখন সন্ধে হয়-হয়। অবাক হয়ে দেখলেন, পরাণ দাসও বারান্দার কোণে শুয়ে দিব্যি ঘুমোচ্ছে।

ভূতনাথবাবুর একটু মায়া হল। লোকটাকে ডেকে তুলে বললেন, তা পরাণ, তুমি এখন কোথায় যাবে?

পরাণ একটা হাই তুলে বলল, তাই ভাবছি।

ভাবছ মানে! তোমার বাড়ি নেই?

আছে, তবে সেখানে তো কেউ নেই। তাই বাড়ি যেতে ইচ্ছে যায় না। যা বললুম তা একটু খেয়াল রাখবেন বাবু। পুরোনো বাড়ি অনেক সময় ভারি পয়মন্ত হয়।

লোকটা উঠতে যাচ্ছিল। ভূতনাথবাবু বাধা দিয়ে বললেন, ‘আহা, এই সন্ধেবেলা রওনা হলে বাড়ি যেতে তো তোমার রাত পুইয়ে যাবে বাপু। আজ নতুন বাড়িতে ঢুলুম, তুমিও অতিথি। থেকেও যেতে পারো। তিন চারখানা ঘর আছে। বস্তা-টস্তা পেতে শুতে পারবে না?

পরাণ দাস আর দ্বিরুক্তি করল না, রয়ে গেল। সরল-সোজা গাঁয়ের লোক দেখে ভূতনাথবাবুর গিন্নি বেশি আপত্তি করলেন না। শুধু বললেন, ‘চোরটোর নয় তো!

ভূতনাথবাবু ম্লান হেসে বললেন, হলেই বা আমাদের চিন্তার কী? আমাদের তো দীনদরিদ্র অবস্থা, চোরের নেওয়ার মতো জিনিস বা টাকা পয়সা কোথা?

পরাণ দাস কাজের লোক। কুয়ো থেকে জল তুলল, বাচ্চাদের সঙ্গে খেলল, রাতে মশলা পিষে দিল। তারপর একখানা খেটে লাঠি নিয়ে সারা বাড়ির মেঝেতে ঠুকঠুক করে ঠুকে ফাঁপা আছে কিনা দেখতে লাগল। কাণ্ড দেখে ভূতনাথবাবুর মায়াই হল। পাগল আর কাকে বলে?

খেয়েদেয়ে সবাই ঘুমোলো। শুধু পরাণ দাস বলল, আমি একটু চারদিক ঘুরেটুরে দেখি। রাতের বেলাতেই সব অশৈলী কাণ্ড ঘটে কিনা।

মাঝরাতে নাড়া খেয়ে ভূতনাথবাবু উঠে বসলেন, কে?

সামনে হ্যারিকেন হাতে পরাণ দাস। চাপা গলায় বলল, পেয়েছি বাবু।

অবাক হয়ে ভূতনাথবাবু বললেন, কী পেয়েছ?

যা খুঁজতে আসা। তবে বুড়োকর্তা দেখিয়ে না দিলে ও জায়গা খুঁজে বের করার সাধ্যি আমার ছিল না।

ভূতনাথবাবুর মাথা ঘুমে ডোম্বল হয়ে আছে। তাই আরও অবাক হয়ে বললেন, বুড়োকর্তাটা আবার কে?

একশো বছর আগে এ বাড়িটা তো তারই ছিল কিনা। বড্ড ভালো মানুষ। সাদা ধবধবে দাড়ি, সাদা চুল, হেঁটো ধুতি পরা, আদুর গা, রং যেন দুধে-আলতা। খুঁজে-খুঁজে যখন হয়রান হচ্ছি তখনই যেন দেয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে এলেন।

একটা হাই তুলে ভূতনাথবাবু বললেন, তুমি নিজে তো পাগল বটেই এবার আমাকে পাগল বানিয়ে ছাড়বে দেখছি। যাও গিয়ে শুয়ে একটু ঘুমোও বাপু।

বিশ্বাস হল না তো বাবু। আসুন তাহলে, নিজের চোখেই দেখবেন।

বিরক্ত হলেও ভূতনাথবাবুর একটু কৌতূহলও হল।

পরাণ দাসের পিছু পিছু বাড়ির পিছন দিকে রান্নাঘরের পাশের এঁদো ঘরখানায় ঢুকে থমকে গেলেন। মেঝের ওপর স্তূপাকার ইট, মাটি ছড়িয়ে আছে, তার মাঝখানে একটা গর্ত।

এসব কী করেছ হে পরাণ? মেঝেটা যে ভেঙে ফেলেছ।

যে আজ্ঞে, এবার গর্তে একটু উঁকি মেরে দেখুন।

হ্যারিকেনের ম্লান আলোয় ভূতনাথবাবু গর্তের মধ্যে উঁকি মেরে দেখলেন একটা কালোমতো কলসি জাতীয় কিছু।

আসুন বাবু, নেমে পড়ুন। বড্ড ভারী। দুজন না হলে টেনে তোলা যাবে না।

ভূতনাথবাবুর হাত-পা কাঁপতে লাগল উত্তেজনায়।

বললেন, কী আছে ওতে?

তুললেই দেখতে পাবেন। আসুন বাবু, একটু হাত লাগান।

ভূতনাথবাবু নামলেন। তারপর মুখ ঢাকা ভারী কলসিটা দুজনে মিলে হাতি কষ্টে তুললেন ওপরে। পরাণ একগাল হেসে বলল, এবার খুলে দেখুন বাবু আপনার জিনিস।

বেশ বড় পিতলের কলসি। মুখটায় একটা ঢাকনা খুব আঁট করে বসানো। শাবলের চাড় দিয়ে ঢাকনা খুলতেই চকচকে সোনার টাকা এই হ্যারিকেনের আলোতেও ঝকমক করে উঠল।

বলেছিলুম কিনা বাবু! এখন দেখলেন তো, যান আপনার আর কোনও দুঃখ থাকল না। দু-তিন পুরুষ হেসে খেলে চলে যাবে।

ভূতনাথবাবু নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এরকমও হয়! পরাণের দিকে চেয়ে বললেন, এসব সত্যি তো-স্বপ্ন নয় তো!

না বাবু, স্বপ্ন নয়। বুড়ো কর্তার সবকিছু এর মধ্যে! এত দিনে গতি হল।

ভূতনাথবাবু পরাণকে জড়িয়ে ধরে বললেন, পাগল হলেও তুমি খুব ভালো লোক। এর অর্ধেক তোমার।

পরাণ সভয়ে পিছিয়ে গিয়ে বলল, ওরে বাবা, ও কথা শুনলেও পাপ। টাকা-পয়সায় আমার কী হবে বাবু?

তার মানে? এত মোহর পেয়েও নেবে না?

না বাবু, আমার আছেটা কে যে ভোগ করবে? একা বোকা মানুষ, ঘুরে-ঘুরে বেড়াই, বেশ আছি। টাকা-পয়সা হলেই বাঁধা পড়ে যেতে হবে।

ভূতনাথবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, তাহলে গুপ্তধন খুঁজে বেড়াও কেন?

আজ্ঞে, ওইটেই আমার নেশা। খুঁজে বেড়ানোতেই আনন্দ। লুকোচুরি খেলতে যেমন আনন্দ হয় এও তেমনি। আচ্ছা আসি বাবু। ভোর হয়ে আসছে, অনেকটা পথ যেতে হবে।

পরাণ দাস চলে যাওয়ার পর ভূতনাথবাবু অনেকক্ষণ বজ্রাহতের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর ভাবলেন, একটা সামান্য লোকের কাছে হেরে যাব? ভেবে কলসিটা আবার গর্তে নামিয়ে মাটি চাপা দিলেন। ওপরে ইটগুলো খানিক সাজিয়ে রাখলেন। তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে একটু হাসলেন।

# গোয়েন্দা বরদাচরণ

---

**গোয়েন্দা বরদাচরণ**

গোয়েন্দা বরদাচরণ একটা লাউ চুরির কেস নিয়ে খুবই চিন্তিত ছিলেন। কে বা কারা পরশু দিন ন'পাড়ার মোক্ষদা দিদিমার ঘরের চাল থেকে একটি নধর লাউ চুরি করে নিয়ে গেছে। মোক্ষদা দিদিমার নাতি নাড়ুগোপাল বাইরে চাকরি করে, সে বড় লাউয়ের ডাল ভালবাসে। নাতির জন্য লাউটা খুব যত্নে রেখেছিলেন দিদিমা। আজকালের মধ্যে নাড়ুগোপালের আসার কথা। কিন্তু এর মধ্যেই পরশুদিন লাউটা চুরি গেছে। দিদিমা কেঁদে কেটে এসে পড়লেন বরদাচরণের কাছে, "ও বাবা বরদা, আমার লাউ উদ্ধার করে এনে দাও।"

সেই থেকে বরদাচরণের ঘুম নেই, খাওয়া নেই। সঙ্গে অ্যাসিস্ট্যান্ট আর কুকুর নিয়ে সারাদিন আতসকাঁচ হাতে করে মোক্ষদা দিদিমার সারা বাড়ি, ঘরের চাল, পাড়া-প্রতিবেশীদের আনাচ-কানাচে তন্নতন্ন করে কু খুঁজেছেন। তারপর বাড়ি এসে সারাদিন বসে ভেবেছেন, কাগজ কলমে কী যেন লিখেছেন আর মাঝেমাঝে "হুঁ হুঁ বাবা! নাঃ, হচ্ছে না!" গোছের কথা বলেছেন আপনমনে।

বরদাচরণের বয়স ত্রিশ-বত্রিশ হবে। বাড়িতে বুড়ী মা আছেন, আর আছে তাঁর অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাগ্নে চাক্কু, আর পোষা নেড়ী কুকুর ডঙ্কি। বরদাচরণ কিছু মোটাসোটা মানুষ, ডন-বৈঠক করা শরীর। ভাগ্নে চাক্কু রোগা হলেও জুডো জানে। ডঙ্কি খুবই ভাল ঘেউ-ঘেউ করতে পারে।

চাক্কু এসে বারবার খোঁজ করে যাচ্ছে, "মামা, কিছু ভেবে পেলে?"

বরদা খুবই অন্যমনস্কভাবে বলেন, "বোঁটা দেখে তো মনে হয় লাউটা বেশ বড়সড়ই ছিল।"

"তা ছিল।"

"লাউটা বোঁটা কেটে নেওয়া হয়নি, মুচড়ে ছিঁড়ে নেওয়া হয়েছে।"

"হুঁ, ঠিক ধরেছ।"

"টিনের চালের ওপর একটা বড় লাউকে মুচড়ে বোঁটা ছিঁড়ে নেওয়া হল, অথচ কোনো শব্দ হয়নি। মোক্ষদা দিদিমার ছেঁড়া মশারির মধ্যে প্রচুর মশা ঢুকে পড়েছিল বলে দিদিমার সে-রাতে ভাল ঘুম হয়নি, শব্দ হলে তার টের পাওয়ার কথা।"

চাক্কু চিন্তিতভাবে বলে, "সে ঠিক, তবে মোক্ষদা দিদিমা আবার কানে একটু খাটো কিনা।"

এই সময় বাইরে ডঙ্কি ঘেউ-ঘেউ করে উঠল, কে একজন চেঁচিয়ে বলল, "কুকুর সামলান!"

চাক্কু ছুটে বাইরে গেল। একটু বাদে একজন বেশ ভাল চেহারার লোক ঘরে ঢুকেই বললেন, "বরদাবাবু, একটা মার্ডার কেস।"

বরদাচরণ গম্ভীরভাবে তাকে বসতে বলে কেস ডায়েরির খাতাটা টেনে নিয়ে কলম বাগিয়ে বললেন, "ডিটেলস বলুন।"

"আমার পোষা কাকাতুয়াটাকে আজ সকালে তার দাঁড় থেকে মৃত অবস্থায় ঝুলে থাকতে দেখা গেছে।"

বরদাচরণ ভ্রূ কুঁচকে বললেন, "এটা যে অস্বাভাবিক মৃত্যু তা কী করে বুঝলেন?"

"খুবই স্বাভাবিকভাবে।" ভদ্রলোক উদভ্রান্ত মুখে বললেন, "পাখিটার প্রতি আমার প্রতিবেশী রামচন্দ্রের অনেকদিনের লোভ। সে প্রায়ই বলত, অম্বুজাক্ষ, তোমার কাকাতুয়াটা বড় চমৎকার হরির নাম করে হে! তখন থেকেই ওর মতলব আমার ভাল ঠেকেনি। আজ সকালে পাখিটাকে ঝুলতে দেখে আমি দাঁড়ে-রাখা জল আর পাখির খাবার পরীক্ষা করি। আমার মনে হচ্ছে, জলে বা খাবারে বিষ মেশানো আছে।"

বরদাচরণ ডায়েরি বন্ধ করে উঠলেন, পিস্তলটা ড্রয়ার থেকে বের করে পকেটে ভরলেন। আতসকাঁচ, দড়ি, ক্যামেরা, এবং কী ভেবে টেপ রেকর্ডারটাও সঙ্গে নিলেন। চাক্কু এবং ডঙ্কিকেও তৈরি হতে বললেন। তারপর ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে বললেন, "অম্বুজাক্ষবাবু, কেসটা অত সরল নাও হতে পারে। রামচন্দ্রবাবুর যেমন মোটিভ থাকতে পারে, আবার কাকাতুয়াটা সুইসাইডও করতে পারে, কিংবা এর পেছনে হয়তো আরও অনেক গভীর চক্রান্ত হয়েছে।"

বেরোবার সময়ে বরদাচরণের মা ডেকে বললেন, "বরদা, দুটি পান্তাভাত খেয়ে যাবি না?"

কে শোনে কার কথা! বরদাচরণ বেরিয়ে পড়লেন।

অম্বুজাক্ষবাবুর বাড়িটা বেশ বড়। পিছনে একটা ঢাকা দরদালানে অনেকগুলো খাঁচা, আর দাঁড়ে বিস্তর পাখি চেঁচামেচি করছে।

বরদাচরণ কাকাতুয়ার দাঁড়টা ভাল করে দেখলেন। পাখিটা পায়ে বাঁধা শিকলি থেকে তখনো ঝুলছে। দাঁড়ের দুদিকে দুটি বাটিতে জল আর কাবলি ছোলা। একটা ছোলা তুলে নিয়ে পিছনের উঠানে ছুঁড়ে দিলেন বরদাচরণ, একটা কাক সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসে সেটা খেয়ে ফেলল। কিছুক্ষণ বরদাচরণ কাকটাকে লক্ষ করলেন। না, কাকটা মরল না। তার অর্থ, ছোলায় বিষ নেই। জল থেকে খানিকটা ড্রপারে তুলে নিয়ে বরদাচরণ এদিক ওদিক তাকিয়ে অম্বুজাক্ষবাবুদের পোষা কাবলি বেড়ালটাকে একটা কাঠের বাক্সের ওপর বসে থাকতে দেখে এগিয়ে গিয়ে আচমকা চেপে ধরলেন সেটাকে। অম্বুজাক্ষ হাঁ-হাঁ করে এগিয়ে এসে বাধা দেওয়ার আগেই বরদাচরণ বেড়ালকে অদ্ভুত কৌশলে হাঁ করিয়ে ড্রপারের জল তার মুখগহ্বরে ফেলে দিলেন। বেড়ালটা বার'কয় খুব আপত্তিকর শব্দ করল বটে, কিন্তু মরল না।

বরদাচরণ গম্ভীরভাবে বললেন, "হুঁ।"

ওদিকে অম্বুজাক্ষবাবু একটা হোমিওপ্যাথি ওষুধের শিশি থেকে কয়েকটা বড়ি খেয়ে আপনমনেই বললেন, "গায়ে হাতে বড্ড ব্যথা।" ।

ওদিকে চাক্কু ডঙ্কির বকলস ধরে বাড়ির চারদিক ঘুরে ঘুরে কু খুঁজছিল। হঠাৎ সে দৌড়ে এসে বরদাচরণের কানে-কানে বলে গেল, "লাউয়ের খোসা! রামচন্দ্রবাবুর

বাড়ির পিছন দিকে লাউয়ের খোসা পড়ে আছে, মামা।"

বরদাচরণ বিদ্যুৎবেগে উঠে পড়লেন।

বুড়ো মানুষ রামচন্দ্রবাবু ঘরে বসে রামায়ণ পড়ছিলেন। বরদাচরণকে দেখে যেন একটু চমকে উঠে বললেন, "আরে, আসুন আসুন বরদাবাবু! বিখ্যাত লোকদের দেখা পাওয়া এক মস্ত সৌভাগ্য।"

বরদাচরণ বসলেন। স্থির চোখে কিছুক্ষণ রামচন্দ্রবাবুকে স্টাডি করে দেখলেন তিনি।

রামচন্দ্রবাবু রামায়ণ বন্ধ করে বললেন, "ভাবছিলাম, আজই আপনার কাছে একবার যাব। আমার উঠোনের নারকোল গাছ থেকে কাল রাতে ছটা নারকেল কে বা কারা চুরি করে নিয়ে গেছে। খুবই রহস্যময় ব্যাপার। বাইরে থেকে কারো পক্ষে উঠোনে আসা খুবই শক্ত। তবে

বলে রামচন্দ্রবাবু খুবই ইংগিতপূর্ণভাবে চুপ করে গেলেন।

বরদাচরণ ডায়েরিতে সেটা লিখে নিতে-নিতে বললেন–"কিছু গোপন করবেন না রামচন্দ্রবাবু।"

রামচন্দ্রবাবু লাজুক হাসি হেসে বললেন, "না, গোপন করে লাভ নেই। আপনার চোখকে কি ফাঁকি দেওয়া সম্ভব! বলেই ফেলি।" বলে গলাটা নিচু করে বললেন, "পাশের বাড়ির অম্বুজটা মহা নারকোল-খোর। দুবেলা নারকোল খায়। বড়া করে খাচ্ছে, নাড় বানিয়ে খাচ্ছে, মুড়ি দিয়ে খাচ্ছে, অমন নারকোল খেতে কাউকে দেখিনি। প্রায় সময়েই আমাকে বলে, রামচন্দ্রবাবু, আপনার গাছে বিস্তর নারকোল হয়েছে দেখছি! আমার সন্দেহ, কাল রাতে"

'হুঁ।" বরদাচরণ খুবই গম্ভীর হয়ে গেলেন। একটু আগেই তিনি অম্বুজাক্ষবাবুকে গায়ের ব্যথার জন্য হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খেতে দেখেছেন। গায়ের ব্যথা তো হবেই। এই বয়সে যদি অত উঁচু নারকোল গাছে কেউ ওঠে তবে ব্যথা হওয়াই তো স্বাভাবিক।

কিন্তু খুঁজেপেতেও অম্বুজাক্ষবাবুর বাড়িতে নারকোল বা নারকোলের ছোবড়া পাওয়া গেল না। এটাও রহস্যজনক। কারণ, নারকোল খাওয়া যার নেশা, তার

বাড়িতে নারকোলের চিহ্নও খুঁজে না-পাওয়াটা খুবই অস্বাভাবিক।

কিন্তু রামচন্দ্রবাবুর বাড়ির পিছনে চাক্কুর কথামত লাউয়ের খোসা ঠিকই পাওয়া গেল। পরিষ্কার ক্লু।

কিন্তু বরদাচরণ চট করে কিছু করেন না। অপরাধীকে সময় দেন। তাকে যে সন্দেহ করা হচ্ছে, তা টেরও পেতে দেন না।

মোক্ষদা দিদিমাকে লাউয়ের ব্যাপারে আরও কয়েকটা প্রশ্ন করবেন বলে বরদাচরণ ভরদপুরে দিদিমার বাড়ি এলেন। প্রশ্নগুলো এরকম, লাউয়ের রংটা কীরকম ছিল, গাঢ় সবুজ না সাদাটে? লাউয়ের গায়ে এক জায়গায় একটা পোকার গর্ত ছিল কিনা! বোঁটার কাছে এক জায়গায় একটা নখ বসানোর দাগও পাওয়া যাচ্ছে। রামচন্দ্রবাবুর বাড়ির পিছনের আস্তাকুঁড় থেকে সবকটা লাউয়ের খোসা কুড়িয়ে এনে বরদাচরণ তার মধ্যে এইসব অকাট্য চিহ্ন দেখতে পেয়েছেন।

যখন মোক্ষদা-দিদিমাকে জেরা করছিলেন বরদাচরণ, তখনই হঠাৎ চাক্কু এসে চুপিচুপি কানে কানে খবর দিয়ে গেল, "মামা, মোক্ষদা দিদিমার ভঁড়ার ঘরে এক বস্তা নারকোলের ছোবড়া। আর ছ'টা খোসা-ছাড়ানো নারকোল।"

মাথাটা ঘুরে গেল বরদাচরণের। কেসগুলো খুবই জড়িয়ে যাচ্ছে, অসম্ভব জটিল হয়ে উঠছে। মোক্ষদা-দিদিমার বাড়িতে নারকোল গাছ নেই, তবে ছোবড়া বা নারকোল আসে কোত্থেকে? ওদিকে রামচন্দ্রবাবুর বাড়ির চুরি-যাওয়া নারকোল অম্বুজাক্ষবাবুর বাড়িতেও পাওয়া যায়নি। নারকোলের সংখ্যাটাও আশ্চর্যজনকভাবে মিলে যাচ্ছে।

ভাবতে ভাবতে বরদাচরণ উঠে পড়েন। পকেট থেকে পিস্তলটা বের করে দেখে নেন ছ'টা চেম্বারেই গুলি ভর্তি আছে কিনা। আছে।

রাস্তায় পা দিতেই একটা গাড়ি সামনে ঘাস করে থামল। গাড়ির ভিতরে এক সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। তিনি হাতজোড় করে বললেন, "আসুন, বিখ্যাত গোয়েন্দাকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে ধন্য হই।"

বরদাচরণ উঠলেন। চাক্কু আর ডঙ্কিও উঠল সামনের সীটে। অচেনা ভদ্রলোক গলা নিচু করে বরদাচরণকে বললেন, একটা খুবই রহস্যময় কাণ্ড ঘটে গেছে। কাল আমার একটা বুড়ো কাকাতুয়া মারা গেছে। খুবই প্রিয় পাখি ছিল আমার।

ঠিক করেছিলাম পাখিটার মৃতদেহ একটা ভাল জায়গায় কবর দিয়ে ওপরে একটা চমৎকার সমাধি তৈরি করে দেব। কিন্তু বিপদ হল, কাকাতুয়াটার মরদেহ একটা নাইলনের ব্যাগে ভরে বাইরের বারান্দায় রেখে গতকাল আমি ড্রাইভারকে গাড়ি বের করার কথা বলতে গিয়ে ফিরে এসে দেখি, ব্যাগটা নেই। কী সাংঘাতিক কাণ্ড বলুন! কেটা যদি আপনি নেন!"

বরদাচরণ সবই টুকে নেন ডায়েরিতে। গম্ভীরভাবে বলেন, "হু, কাকাতুয়ার কেস দুটো হল তা হলে! আশ্চর্য!"

বলে দুশ্চিন্তিত বরদাচরণ বাড়ির সামনে নেমে গেলেন।

দুপুরে খুবই অন্যমনস্কভাবে খেতে বসেছেন বরদাচরণ। কী খাচ্ছেন তা বুঝতেই পারছেন না। লাউ, কাকাতুয়া, নারকোল, সব জট পাকিয়ে আছে মাথায়। তার মা বললেন, "ও বরদা, লাউঘণ্ট দিয়ে আর দুটো ভাত মাখ।"

লাউঘণ্ট কথাটা বরদাচরণের মাথার মধ্যে দু-একবার টংটং শব্দ করল। প্রায়ই তিনি লাউঘণ্ট খান, কাজেই বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই।

হঠাৎ বরদাচরণ চমকে উঠে বললেন, 'লাউঘণ্ট! লাউ এল কোথা থেকে? আমি তো আজ বাজার থেকে লাউ আনিনি!"

মা বলেন, "তুই আনবি কেন? কাল চাক্কু লাউটা হাতে করে এনেছে, ওর কোন্ বন্ধুর বাড়িতে নাকি অনেক লাউ হয়েছে, তারা দিল।"

নিজের পাতের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখলেন বরদাচরণ। লাউঘণ্টের পাশে দুটো বড়া পড়ে আছে। উঠে গিয়ে আতসকাঁচ নিয়ে এসে বড়াটা নিবিষ্টভাবে দেখছেন, মা বললেন "দেখছিস কী! ও তো নারকোলের বড়া। ছটা নারকোল এনেছিল চাক্কু, কোন্ গাছ থেকে নাকি পড়ে গিয়েছিল বাতাসে। তার দুটো ভেঙে ঐ বড়া করেছি।"

বরদাচরণ বাকি সময়টা ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করে উঠে পড়লেন। চাক্কু অনেক আগেই খেয়ে-দেয়ে কোন্ মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে পড়া বুঝতে গেছে।

বরদাচরণ পিস্তল আর আতসকাঁচ নিয়ে ডঙ্কির শেকল ধরে ঘর থেকে বেরোলেন। তন্নতন্ন করে খুঁজতে লাগলেন চারদিক। অবশেষে ডঙ্কি ইংগিত বুঝতে পেরে

তাঁকে গোয়ালঘরে টেনে আনল। সেখানে একটা সদ্য–কেনা দাঁড়ে জলজ্যান্ত একটা কাকাতুয়া বসে আছে। বরদাচরণকে দেখেই বলে উঠল "হরি বল, হরি বল ভাই, হরি ছাড়া গতি নাই।"

বরদাচরণ টেপ-রেকডার নিয়ে এসে পাখিটার কথা টেপ করতে লাগলেন।

তারপর সারা দুপুর আর সন্ধে, আর্কিমিডিস যেমন স্নানের চৌবাচ্চায় ডুব দিয়ে স্পেসিফিক গ্র্যাভিটির চিন্তা করেছিলেন, তেমনি এক চিন্তার চৌবাচ্চায় ডুবে থেকে বরদাচরণও লাউ, কাকাতুয়া আর নারকোলের রহস্যে মগ্ন রইলেন। তারপর আর্কিমিডিস যেমন ইউরেকা' বলে লাফিয়ে উঠেছিলেন, ঠিক তেমনি তিনিও লাফিয়ে উঠলেন। সমস্ত রহস্যটাই তাঁর কাছে জল হয়ে গেছে।

বস্তুত তিনি এখন বুঝতে পেরেছেন, যে-লোকটা মোক্ষদা দিদিমার লাউ চুরি করেছে, সেই একই লোক গতকাল গাড়িওলা ভদ্রলোকের মৃত কাকাতুয়াটা হাতসাফাই করে অম্বুজাক্ষবাবুর জ্যান্ত কাকাতুয়ার দাঁড়ে ঝুলিয়ে রেখে হরিনামপরায়ণ জ্যান্ত কাকাতুয়াটাকে সরিয়ে ফেলে। আবার সেই লোকটাই কোনো এক অজ্ঞাত কারণে রামভক্ত রামচন্দ্রবাবুর নারকোল গাছের ছটা নারকোলও গোপনে নামিয়ে নেয়। এবং ঐ একই অপরাধী প্রমাণ লোপের চেষ্টায় এবং তদন্তকে বিভ্রান্ত করার জন্য বরদাচরণকে রামচন্দ্রবাবুর বাড়ির পিছনে লাউয়ের খোসার সন্ধান দেয়, এবং মোক্ষদাদিদিমার বাড়িতে নারকোল-ছোবড়ার অস্তিত্বের কথা ফাঁস করে দেয়।

বেশ রাত হয়ে গেছে। সবাই গভীর ঘুমে। বরদাচরণ পিস্তল হাতে নিয়ে চুপিসাড়ে পাশের ঘরে এসে অন্ধকারে চেয়ে রইলেন। আবছা দেখা যাচ্ছে, দিদিমার বুক ঘেঁষে শুয়ে চাক্কু ঘুমোচ্ছে।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন গোয়েন্দা বরদাচরণ। না, এক্ষুনি তিনি কিছু করবেন না। অপরাধীকে তিনি সবসময়ে আরও সুযোগ দেন। তাতে অপরাধীকে যে সন্দেহ করা হচ্ছে, তা সে বুঝতে পারে না। এবং এইভাবেই সে একদিন নিজের অপরাধের জালে ধরা পড়ে যায়।

পিস্তল নামিয়ে গোয়েন্দা বরদাচরণ ফিরে এলেন নিজের ঘরে। তিনি এখন নিশ্চিন্তভাবে জেনে গেছেন, কে অপরাধী। অপরাধী আর কেউ নয়, অপরাধী হল…?

# ঘুড়ি ও বৈদবাণী

**ঘুড়ি ও বৈদবাণী**

অঘোরবাবু নিরীহ মানুষ। বড়ই রোগা-ভোগা। তার হার্ট খারাপ, মাজায় সায়াটিকার ব্যথা, পেটে এগারো রকমের অসুখ। অফিসে তার উন্নতি হয় না। কেউ পাত্তা দেয় না তাকে।

অঘোরবাবু ঘুড়ি ওড়াতে খুবই ভালবাসেন। তার শখ-শৌখিনতা বলতে ওই একটাই। ঘুড়ি তিনি নিজেই তৈরি করেন। মস্ত মস্ত ঘুড়ি। মোটা সুতো আর মস্ত লাটাই দিয়ে অনেক ওপরে ঘুড়ি ভাসিয়ে দেন তিনি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাটাই ধরে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে বসে থাকেন।

সেদিন একটা কাণ্ড হলো। বিকেল বেলা ঘণ্টা দুয়েক ঘুড়ি ওড়ানোর পর অন্ধকার হয়ে আসায় লাটাই গুটিয়ে যখন ঘুড়িটা ছাদ থেকে কুড়িয়ে নিচ্ছেন তখন মনে হলো ঘুড়ির গায়ে একটা কিছু যেন লেখা আছে। ঘরে এসে আলো জ্বেলে দেখলেন, সাদা ঘুড়িতে পরিষ্কার গোটা গোটা অক্ষরে বাংলায় লেখা, আগামী সতেরো তারিখে আপনার মৃত্যু হবে, যদি না একখানা আস্ত গায়ে-মাখা সাবান খেয়ে ফেলেন।

অঘোরবাবু ঘোরতর অবাক। প্রায় আধ কিলোমিটার উপরে উড়ন্ত ঘুড়ির গায়ে এই বিদকুটে কথাটা লিখল কে? ভৌতিক কাণ্ড নাকি? মহা ভাবিত হয়ে পড়লেন তিনি। পাশের বাড়িতেই পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক পরঞ্জয় প্রামাণিক থাকেন। অঘোরবাবুর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাকে ডেকে ঘুড়ির গায়ে কথাটা দেখিয়ে বললেন, এটা কী করে সম্ভব হলো?

রঞ্জয় গম্ভীর হয়ে বললেন, কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে সাবানটা খেও না, সাবান খেলে পেট খারাপ হয়। মনে হচ্ছে কেউ রসিকতা করেছে।

অঘোরবাবু বললেন, কিন্তু আকাশের অত ওপরে কোনও রসিকের তো থাকার কথা নয়। রসিকদের কি আজকাল ডানা গজাচ্ছে?

পরঞ্জয় এ প্রশ্নের কোনও সদুত্তর দিতে পারলেন না।

অঘোরবাবু হিসেব করে দেখলেন সতেরো তারিখের আর মোটে সাতদিন বাকি। অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে তিনি বাড়ির কাউকে কিছু না বলে বাথরুমে গিয়ে একখানা গায়ে-মাখা সাবান অত্যন্ত কষ্ট করে খেয়ে ফেললেন। সাবান যে খেতে এত বিচ্ছিরি তা তার জানা ছিল না।

পরঞ্জয়ের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। পরদিন অঘোরবাবু পেটের গোলমালে একেবারে কাহিল হয়ে পড়লেন। দুদিন লাগল বিছানা ছেড়ে উঠতে। বিকেলে তিনি আবার ঘুড়ি ওড়াতে ছাদে উঠলেন। এবং যথারীতি লাটাই গোটানোর পর দেখলেন ঘুড়ির গায়ে লেখা রয়েছে, আগামী সতেরো তারিখে আপনি মারা যাবেন, যদি না কৃষ্ণ কুণ্ডুর কান মলে দেন।

কৃষ্ণ কুণ্ডুর কান মলা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কারণ, সে হলো এ পাড়ার কুখ্যাত গুণ্ডা। তার ভয়ে সবাই থরহরি কম্পমান। গায়ে যেমন জোর তেমনি বদমেজাজ। অঘোরবাবু ঘাবড়ে গেলেন। কিন্তু এই অনৈসর্গিক আদেশ অমান্য করতেও তার সাহস হচ্ছে না। সতেরো তারিখের আর দেরিও নেই। আজ চোদ্দ তারিখ।

সন্ধ্যের পর তিনি সোজা গিয়ে কৃষ্ণ কুণ্ডুর বাড়িতে হাজির হলেন। কৃষ্ণ কুণ্ডু তখন একটা মস্ত বড় ছোরা ধার দিচ্ছিল। তাকে দেখে রক্তচক্ষুতে তাকিয়ে বলল, কী চাই?

অঘোরবাবু কাঁপতে কাঁপতে সামনে গিয়ে আচমকা ডান হাত বাড়িয়ে কৃষ্ণ কুণ্ডুর বাঁ কানটা মলে দিয়েই দৌড় লাগালেন।

কিন্তু দৌড়ে পারবেন কেন? কৃষ্ণ কুণ্ডু ছুটে এসে কাঁক করে তার ঘাড়টা ধরে নেংটি ইঁদুরের মতো শূন্যে তুলে উঠোনে এনে ফেলল। তারপর মুগুরের মতো দুখানা হাতে গদাম গদাম করে ঘুষি মারতে লাগল। তিনি ঘুষি খেয়ে উপুড় হয়ে পড়ায় পিঠের ওপর একেবারে তবলা লহরার মতো কিল-চড়-ঘুষি পড়তে লাগল।

জীবনে এরকম সাঙ্ঘাতিক মার কখনও খাননি অঘোরবাবু। যখন ধুঁকতে ধুঁকতে বাড়ি ফিরলেন তখন তার মনে হচ্ছিল, শরীরের একটি হাড়ও আস্ত নেই। মাথা ভো ভো করছে। চোখে অন্ধকার দেখছেন। কানেও কিছু শুনতে পাচ্ছেন না।

ফের দুদিন বিছানায় পড়ে থাকতে হলো। তারপর অঘোরবাবু ফের একদিন বিকেলে ঘুড়ি ওড়ালেন। আজও ঘুড়ি নামিয়ে দেখলেন তাতে লেখা, সতেরো তারিখে মৃত্যু অবধারিত, যদি না বড় সাহেবের মাথায় ঘোল ঢালতে পারেন। বড় সাহেবের মাথায় ঘোল ঢালার আদেশের চেয়ে মৃত্যুদণ্ডই বোধহয় ভাল। কারণ, অঘোরবাবুর অফিসের বড় সাহেব খোদ আমেরিকার রাঙামুখো সাহেব। যেমন রাশভারি, তেমনি শৃঙ্খলাপরায়ণ। পান থেকে চুন খসতে দেন না। তাছাড়া বড় সাহেবের নাগাল পাওয়া কঠিন। আলাদা ঘরে বসেন, বাইরে আর্দালিরা পাহারা থাকে।

কিন্তু ঘুড়ির আদেশ অমান্য করতে সাহস হলো না তার। দোকান থেকে দৈ আনিয়ে গেলাসভর্তি ঘোল তৈরি করে একটা ফ্লাস্কে ভরে অফিসে গেলেন অঘোরবাবু। খুবই অন্যমনস্ক, বুকটা দুরদুর করছে। বড়বাবুকে গিয়ে একবার বললেন, বড় সাহেবের সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই, ব্যবস্থা করে দেবেন?

বড়বাবু অবাক হয়ে বললেন, তুমি আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবর নিচ্ছো কেন? বড় সাহেব কি হেঁজিপেঁজির সঙ্গে দেখা করেন! আর করেই লাভ কী? সাহেবের আমেরিকান ইংরিজি কি তুমি বুঝবে? বকুনি শুনলে ভড়কে যাবে যে।

বেজার মুখে ফিরে এলেন বটে অঘোরবাবু, কিন্তু হাল ছাড়লেন না। টিফিনের সময় ফঁক বুঝে বেরিয়ে করিডোর ঘুরে সোজা বড় সাহেবের খাস কামরার সামনে হাজির হলেন। দেখলেন বড় সাহেবের ঘর থেকে কয়েকটা লালমুখো সাহেব বেরিয়ে আসছে। আর্দালি দুটো তাদের নিয়েই ব্যস্ত।

অঘোরবাবু সুট করে ঘরে ঢুকে পড়লেন। বিশাল চেহারার বড় সাহেব মন দিয়ে একটা কাজ করছিলেন। মাথায় মস্ত গোলাপী রঙের টাক। অঘোরবাবুকে দেখে অবাক হয়ে বজ্রগম্ভীর গলায় বললেন, হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট বাবু?

অঘোরবাবু ফ্লাস্কটা খুলে সাহেবের মাথায় হড়হড় করে খোলটা ঢেলে দিলেন। তারপর দৌড়ে বেরিয়ে একেবারে সোজা রাস্তায় নেমে একটা বাসে উঠে পড়লেন।

চাকরি তো যাবেই, পুলিশেও ধরতে পারে। তা হোক, তবু অনৈসর্গিক ওই আদেশ লঙ্ঘন করেনই বা কী করে?

সতেরো তারিখ এগিয়ে আসছে। আগামীকালই সতেরো তারিখ। বিকেলে অঘোরবাবু ফের ঘুড়ি ওড়ালেন। অনেকক্ষণ ঘুড়ি ওড়াতে ওড়াতে নানা কথা ভাবছিলেন। বুকটাও দুরদুর করছে। তারপর ধীরে ধীরে লাটাই গোটাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে ঘুড়িটা নেমে এল। ঘুড়িটা হাতে নিয়ে দেখলেন, তাতে লেখা, আগামী সতেরো তারিখে মৃত্যু কেউ ঠেকাতে পারবে না, যদি না এক্ষুণি তিনতলার ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়েন।

অঘোরবাবুর হাত-পা কাঁপতে লাগল ভয়ে। তিনতলা থেকে লাফ দিলে যে মৃত্যুর জন্য আর সতেরো তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে না। কিন্তু করেনই বা কী? ঘুড়ি মারফত দৈববাণীই হচ্ছে বলে তার স্থির প্রত্যয় হয়েছে দৈববাণীর আদেশ না মানলে যদি ভগবান চটে যান?

অঘোরবাবু চোখ বুজে ভগবানকে স্মরণ করলেন। শেষবারের মতো চারদিকটা জল-ভরা চোখে একবার দেখে নিলেন! এইসব কাজে বেশি দেরি করতে নেই। দেরি করলেই মন দুর্বল হয়ে পড়ে, দ্বিধা আসে। অঘোরবাবু ধুতির কেঁচা এঁটে ছাদের রেলিঙের ওপর উঠে দুর্গা বলে নীচে লাফিয়ে পড়লেন।

পড়ে মাজার ব্যথায়, ঘাড়ের ঝনঝনিতে, কনুইয়ের খটাং-এ, মাথার কটাং-এ চোখে সর্ষে ফুল দেখতে দেখতে মূর্ছা গেলেন। পাড়ার লোক, বাড়ির লোক সব দৌড়ে এল, কান্নাকাটি পড়ে গেল। ধরাধরি করে তাকে নিয়ে যাওয়া হলো হাসপাতালে। প্রায় পনেরো দিন সেখানে পড়ে থাকতে হলো। তারপর বাড়িতে এনে ফের কিছুদিন চিকিৎসা চলল তার। পারিবারিক ডাক্তার অভয়বাবু তার বন্ধুও বটে। অভয়বাবু কয়েকদিন ধরে নানারকম পরীক্ষা করার পর একদিন বললেন, বুঝলে অঘোর, একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে। অঘোরবাবু ভয় খেয়ে বললেন, কী ঘটেছে ভাই?

তোমার হার্ট একদম ভাল হয়ে গেছে।

সে কী! কী করে হলো?

ওই যে কেষ্ট গুণ্ডার কাছে মার খেয়েছিলে, মনে হচ্ছে সেই শক থেরাপীতেই হার্টটা ঠিকঠাক চলতে শুরু করেছে। হার্টের একটা ভালভ কাজই করছিল না। এখন করছে। আরও একটা ব্যাপার!

আবার কী?

তোমার পেটে এগারো রকমের অসুখ ছিল। এখন একটাও নেই।

বলো কী হে!

হ্যাঁ। ওই যে সাবান খেয়েছিলে, ওর ঠেলাতেই পেটের সব রোগ জীবাণু বেরিয়ে গেছে। এখন লোহা খেলেও তোমার হজম হবে। আরও একটা ব্যাপার।

অঘোরবাবু অবাকের পর আরও অবাক হয়ে বললেন, আরও?

হ্যাঁ। তোমার সায়াটিকা সেরে গেছে।

অ্যাঁ!

হ্যাঁ, ওই যে ছাদ থেকে লাফ দিয়েছিলে তারই চোটে সায়াটিকা উধাও হয়ে গেছে।

আশ্চর্য ব্যাপার!

হ্যাঁ, খুবই আশ্চর্য ব্যাপার।

কিন্তু সব হলেও চাকরিটা তো আর থাকছে না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে অঘোরবাবুর খুব দুঃখ হয়। দিব্যি বাঁধা চাকরি ছিল। বড় সাহেবের মাথায় ঘোল ঢালার পর আর কোনও আশা নেই।

অঘোরবাবু যখন একটু সুস্থ হয়ে উঠে বসেছেন, একটু পায়চারি টায়চারি করতে পারছেন তখন একদিন সকালবেলা তার বাড়ির সামনে মস্ত একটা গাড়ি এসে থামল। গাড়ি থেকে এক লালমুখো বিশাল সাহেব নেমে এলেন।

অঘোরবাবু বেজায় ঘাবড়ে গেলেন।

কিন্তু অল্পবয়সী সাহেবটা এসে তাকে জড়িয়ে ধরে এমন আনন্দ করতে লাগল যে সেই ভীম আলিঙ্গনে অঘোরবাবুর প্রাণ যায় আর কী।

তারপর তাকে ছেড়ে দিয়ে সাহেব বলল, তোমাকে যে কী বলে ধন্যবাদ দেব তা বুঝতে পারছি না। যাকগে, আপাতত তোমাকে তিন গুণ প্রমোশন দিয়ে আমার অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার করে নিচ্ছি। তোমার দু হাজার টাকা বেতন বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। অফিসে যাতায়াতের জন্য গাড়িও দেওয়া হবে।

অঘোরবাবু স্বপ্ন দেখছেন কিনা বুঝতে পারছিলেন না। নিজের গায়ে একটা চিমটি কেটে দেখলেন, জেগেই আছেন। তাহলে এসব কী হচ্ছে?

সাহেব নিজে থেকেই বলল, তোমার মতো গুণী মানুষ দেখিনি। টাক নিয়ে আমার খুব দুঃখ ছিল। টাকের জন্য কত ওষুধ খেয়েছি, কত চিকিৎসা করেছি, কিছুতেই কিছু হয়নি। কিন্তু তুমি সেদিন আমার মাথায় কী একটা ওষুধ ঢেলে দিয়ে এলে, এই দেখ এখন আমার মাথাভর্তি সোনালি চুল।

তাই বটে। ইনি তো বড় সাহেবই বটে। মাথাভর্তি চুল হওয়ায় এতক্ষণ চিনতে পারেননি অঘোরবাবু। গদগদ হয়ে বললেন, থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ।

# চোর

**চোর**

পটাশের বাবা নব এবং নবর বাবা ভব দুজনেই ছিল বিখ্যাত চোর। অর্থাৎ পটাশকে নিয়ে তিন পুরুষ ধরে তারা চোর। ভব চোরের নাম ডাক ছিল সাঙ্ঘাতিক। লোকে বলে, ভব নাকি বাজি রেখে এক দুপুরে তার পিসির আহ্নিক করার কম্বলের আসন চুরি করেছিল। কাজটা শুনতে যত সহজ, আসলে তত সহজ নয়। কারণ পিসি তখন স্বয়ং ওই আসনে বসে কঁথা সেলাই করছিলেন। সেই অবস্থায় আসন চুরি যাওয়ায় পিসি আনন্দাশ্রু বিসর্জন করতে করতে ভবকে আশীর্বাদ করেছিলেন, "ওরে আমার ভব, তোর ওপর স্বয়ং ভগবানের ভর আছে, এ বিদ্যে ছাড়িসনি।"

পিসির আশীর্বাদে ভব বিদ্যে ছাড়েনি। বয়সকালে নিজের ছেলে নবকে তালিম দিয়ে সব বিদ্যে শিখিয়ে গেল। তা নবও কিছু কম গেল না। চোরের তালিম কিছু সহজ কাজ নয়। ভাল দৌড়তে পারা চাই, উঁচু বা লম্বা লাফে দড় হওয়া চাই, বাঁশের ওপর ভর দিয়ে ভল্ট খেয়ে উঁচু দেওয়াল ডিঙোতে পারা চাই, রণপায়ে চলতে জানা চাই। এছাড়া গায়ে যথেষ্ট জোর না থাকলে দু'দশ জন মানুষের সঙ্গে মোকাবিলা করা তো সহজ নয়। এরপর ভাল অভিনয়, বিনয়ী ব্যবহার ইত্যাদি তো আছেই। চোর বলে যদি সবাই চিনে ফেলে তো চিত্তির। নবর এসব গুণ তো ছিলই তা ছাড়া ছিল দুর্জয় সাহস। সে দু মন লোহা তুলত, কুস্তিতে যে-কোনো পালোয়ানকে হটিয়ে দিতে পারত, যন্ত্রবিদ্যা, মন্ত্রতন্ত্রও ছিল তার নখদর্পণে। এমন ঘুমপাড়ানি মন্ত্র জানত যে গেরস্তের কুকুর পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকত, টু শব্দ করত না। জমিদার তারিণী রায়ের বাড়ি থেকে এক খিলি পান চুরি করেছিল সে। শুনতে যত সহজ, কাজটা মোটেই তত সহজ ছিল না। রায়মশাইয়ের নাতির অন্নপ্রাশনে বাড়িতে সেদিন লোক গিজগিজ করছে। খাওয়াটাও হয়েছিল বেজায় রকমের। সকলের আইঢাই অবস্থা। রায়মশাইয়ের খুড়ো বিপিনচন্দ্র এক খিলি বেনারসি

পাত্তির স্পেশাল পান নিজের রূপোর বাটা থেকে বের করে মুখে ফেলতে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময়ে পানটা চুরি যায়। অবিশ্বাস্য ব্যাপার। খুড়োমশাই নিজেও কিছুক্ষণ বুঝতে পারেননি যে, তার দু আঙুলে ধরা পানটি হাঁ করা মুখের মধ্যে যেতে যেতে কীভাবে হাওয়া হলো। কিছুক্ষণ চিবুবার পর তিনি খেয়াল করলেন, যা চিবোচ্ছেন তা পান নয়, নিজের জিবখানা। বেনারসি পান ততক্ষণে নবর গালে জমে বসেছে।

নবর এই হাতসাফাই দেখে তারিণী রায় তাকে সভাচোর করতে চেয়েছিলেন। ঠিক যেমন পুরনো আমলে রাজারাজড়াদের সভাকবি, সভাগায়ক থাকত। নব অবশ্য সভাচোর হয়নি। হাতজোড় করে রায়মশাইকে বলেছিল, "আজ্ঞে, এ হলো বাপ দাদার বিদ্যে, এ ছাড়তে পারব না।"

"ছাড়বি কেন? বৃত্তি ছাড়ার জন্য কি তোকে রাখছি? চুরিই করবি, তবে মজার জন্য।"

নব শেষ অবধি রাজি না হওয়ায় তারিণী রায় তাকে আর পীড়াপীড়ি করেননি। তবে একখানা সোনার মেডেল দিয়েছিলেন। বরাবর স্নেহও করতেন খুব।

সেই নবর ছেলে হলো পটাশ। ছেলে না বলে অকালকুষ্মাণ্ডই বলা ভাল। সব থেকেও তার কী যেন নেই! অথচ এই ছেলেকে এইটুকুন বেলা থেকে নিজে তালিম দিয়েছে নব। ছেলে তৈরিও কিছু কম হয়নি। হরিণের মতো দৌড়াতে পারে, বানরের মতো লাফাতে পারে, গায়ে হাতির জোর, বুদ্ধিও খুব। তবু চুরিতে একেবারেই মন নেই। নব শেখায়, সেও শেখে, তবে গা লাগায় না, মন দেয় না।

একদিন হলো কী, হাত মকশো করতে নব তার ছেলেকে সুদখোর অক্ষয় হাজরার বাড়ি চুরি করতে পাঠাল। পটাশ গেল বটে, কিন্তু চোরের যা যা করতে নেই তার সবকিছুই করতে লাগল। হাজরার চারটে কুকুরই তাকে চেনে, সুতরাং তেড়ে এল না। দু'একবার ভুক-ভুক করে চুপ মেরে গেল। পটাশের সেটা পছন্দ হলো না। ঢিল মেরে মেরে সেগুলোকে খেপিয়ে দিয়ে শোরগোল তুলে ফেলল সে। তারপর দরজা ভাঙতে এমন সব বিকট শব্দ তুলল, যাতে মড়া অবধি উঠে বসে। তাতেও খুশি না হয়ে গুনগুন করে গান গাইতে লাগল।

অক্ষয় হাজরা সর্বদা ভয়ে ভয়ে থাকে। ঘরে নগদ টাকা, সোনাদানা তো কম নেই। জেগে গিয়ে সে হেঁকে উঠল, "কে, কে রে?"

“আমি পটাশ।”

“পটাশ? তা কী মনে করে? এই রাত-বিরেতে আমি দোর খুলতে পারব না। বাধা দিতে এসেছিস তো! জানালা দিয়ে দে। এই হাত বাড়াচ্ছি।”

“হাত বাড়াতে হবে না। আমি দরজা ভেঙে ফেলেছি।”

“ভেঙে ফেলেছিস মানে? করছিসটা কী বল তো?”

“আজ্ঞে চুরি করছি!”

“চুরি করছিস! ইয়ার্কি হচ্ছে, আঁ? এভাবে কেউ চুরি করে? বেরো, বেরো বলছি।”

পরদিন অক্ষয় হাজরা এসে নবকে সব বৃত্তান্ত জানিয়ে বলল, “ও কেমনধারা ছেলে তোর? চুরি তো তুইও করতিস, কখনও তো সাড়াশব্দ করিসনি, আস্পদ্দাও দেখাসনি। আর তোর ছেলের আস্পদ্দা দ্যাখ। গেরস্থ জিজ্ঞেস করছে কি করছিস, আর বুক ফুলিয়ে চোর বলছে, চুরি করছি। তার ওপর আবার গুনগুন করে গানও গাইছিল। দিনটি কী পড়ল বল তো নব!”

নব সেদিন পটাশকে জুতোপেটা করল খুব। কিন্তু পেটাতে পেটাতেই নব বুঝতে পারছিল, পটাশকে দিয়ে হবে না। বাপ-দাদার বিদ্যে এর হাতেই নষ্ট হবে।

পটাশ নির্বিকার। খায়-দায়, ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে বাপের সঙ্গে শাগরেদি করতে বেরোয় বটে কিন্তু কাজের চেয়ে অকাজই করে বেশি। কখনো দুম করে হাত থেকে তার সিঁদকাঠি পড়ে যায়। একদিন সাপ সাপ’ বলে চেঁচিয়ে উঠে কেলেঙ্কারি করল। আর একদিন একজনের ঘরে ঢুকে নব যখন সিন্দুক বাক্স আলমারি খুলে ফেলছে; তখন পটাশ এক ফাঁকা বিছানা দেখতে পেয়ে সোজা গিয়ে তার ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুমন্ত মানুষজনের মধ্যে যে পটাশও থাকতে পারে, তা নব আন্দাজ করতে পারেনি। তাই ছেলেকে খুঁজে না পেয়ে একাই ফিরে এসে ভাবতে বসল। সকালবেলা হাই তুলতে তুলতে পটাশ ফিরে এলে তাকে একখানা চড় কষিয়ে বলল, “কোথায় ছিলি?”

“ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।”

“পাজি নচ্ছার, ঘুমিয়ে পড়লি চোরের ছেলে হয়ে?”

“তা কী করব? ঘুম পেয়ে গেল যে বেজায়।”

“তোকে ওরা ঠেঙায়নি?” ‘না। সব বলে দিলাম যে।”

“বললি! কী বললি?”

“বললাম বাবার সঙ্গে চুরি করতে এসে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বাবার নাম নব চোর। তখন বসিয়ে দুধ চিড়ে ফলার করাল।”

“ফলার করাল?”

“করাবে না? অত বড় চুরির হদিস দিয়ে দিলাম। তারা সব দল বেঁধে লাঠিসোটা নিয়ে আসছে।”

নব মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল।

সেইদিনই নব তার বাড়ি থেকে পটাশকে তাড়িয়ে দিল। সবাইকে জানিয়ে দিল, “ওকে ত্যাজ্যপুত্তর করলাম।”

পটাশ কোথায় গেল তার খোঁজ আর কেউ রাখল না।

এদিকে নব ধীরে ধীরে বুড়ো হতে লাগল। দাঁত পড়ল, চুল পাকল, শরীরের জোর বল চোখের দৃষ্টি সবই কমতে লাগল, বুদ্ধি একটু ঘোলাটে হলো। বেপরোয়া ভাবখানাও তেমন রইল না। পৈতৃক বৃত্তি বজায় রাখা ভারী শক্ত হয়ে উঠল। আগে প্রতি রাতে চুরি করতে বেরোত, আজকাল আর তা পেরে ওঠে না। ফলে সে সঞ্চয়ে মন দিল। একটু-আধটু সুদের কারবার করতে শুরু করল। তাতে আয় মন্দ হলো না। স্বভাবটা ভারী কৃপণের মতো হয়ে গেল তার।

ওদিকে বাপের তাড়া খেয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পটাশ পড়ল অথৈ জলে! চুরি ছাড়া তার বাবা তাকে আর কিছুই শেখাইনি বলে কাজ কর্মেরও যোগাড় হলো না। না খেয়ে চেহারা পাকিয়ে যেতে লাগল। এক বাড়িতে চাকরের কাজ পেয়েছিল কিছু দিন। বাসন মাজত, জল তুলত, ঝটপাট দিত। বেশ ছিল। একদিন হঠাৎ মাঝরাত্রে যেন নিশির ডাক শুনে উঠে পড়ল। তারপর ভারী অবাক হয়ে দেখল তার দুটো হাত আপনা থেকেই বাক্স প্যাটরা হাতড়াচ্ছে।

এই কাণ্ড দেখে পটাশ এমন আতঙ্কিত হয়ে পড়ল যে, তার “চোর! চোর!” বলে চেঁচিয়ে উঠতে ইচ্ছে হয়েছিল। ভাগ্যিস চেঁচায়নি। তবে সে অবাক হয়ে দেখল, বিনা আয়াসেই সে তালাচাবি খুলে ফেলছে এবং নিঃশব্দে জিনিসপত্র বের করছে। বাপ-দাদার স্বভাব যাবে কোথায়? রক্তেই বিজবিজ করছে যে!

পটাশ পালাল। আবার আর-এক বাড়িতে কাজ নিল। কিছুদিন পর সেখানেও সেই কাণ্ড। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে পটাশ বুঝল, এটা থেকে তার আর নিস্তার নেই। বাপ নব তাকে চুরিতে নামাতে পারেনি বটে, কিন্তু তার ভিতরে একটা চোরকে ঢুকিয়ে দিয়েছে। এতকাল সেটা ঘুমিয়ে ছিল, এখন তার ঘুম ভেঙেছে।

তা পটাশ সেয়ানা চোর। এক জায়গায় বেশি দিন থাকে না। ঘন ঘন এলাকা বদলায়। চুরির ধরনও সে পালটে ফেলে। পয়সাকড়ি সোনাদানা যা পায় উড়িয়ে দেয়। চুরি তো শুধু তার রোজগার নয়, একটা নেশাও।

একদিন রাত্রিবেলা একটা গাঁয়ে ঢুকল পটাশ। বেশ সম্পন্ন গ্রাম। অনেক বাড়িঘর। ঘরবাড়ির চেহারা দেখেই তার অভ্যস্ত চোখ বুঝতে পারে, কোন্ বাড়িতে জিনিসপত্র আছে।

বেছে বেছে একাট বাড়ি তার পছন্দ হলো। বাড়ি তো নয়, যেন দুর্গ। মোটা গরাদ, পুরু মজবুত একপাটা কাঠের পাল্লা দেওয়া জানালা কপাট, চারধারে উঁচু পাঁচিল। পাহারাদার কুকুর। দেখে খুশিই হলো পটাশ। যেখানে চুরি করা শক্ত, সেখানেই চুরির আনন্দ।

পাঁচিল ডিঙিয়ে কুকুরটার মুখ বেঁধে জানালা খুলে ঘরে ঢুকতে সে বেশি সময় নিল না। কিন্তু ঘরে পা দিয়েই তার মনে হলো, এ বাড়ি, এই ঘর তার চেনা।

ওদিকে নবরও ঘুম ভেঙেছে। ইঁদুরের শব্দ, বেড়ালের শব্দ, শব্দ সব সে চেনে। কিন্তু এ শব্দটা অন্যরকম। নব বাতাস শুকল। একটা গন্ধ পেল। তারপর খুব অবাক হয়ে বুঝতে পারল, তার ঘরে চোর ঢুকেছে। নবচোরের ঘরে চোর ঢুকেছে! আশ্চর্য কথা!

লাঠিসোটা অন্ধকারে খুঁজে পেল না নব। গায়ে তেমন জোরও নেই যে, চোরকে জাপটে ধরবে। বাঁ পায়ে বাতের সাতিক ব্যথা। অথচ ঘরে প্রচুর সোনাদানা,

টাকাপয়সা। চোর সব নিয়ে যাবে। নব বিকট স্বরে চেঁচাতে লাগল, “চোর! চোর! চোর!”

# চোরে ও ডাকাতে

**চোরে ও ডাকাতে**

সে আমলে আমাদের পরগনায় বিখ্যাত চোর ছিল সিধু। তার হাত খুব সাফ ছিল, মাথা ছিল ঠাণ্ডা, আর তুখোর বুদ্ধি। দিনের বেলা সিধু গৃহস্থের মতো চালচলন বজায় রাখত, আমাদের বাড়িতেও বেড়াতে-টেড়াতে আসত সে। আর পাঁচজনের মতোই ঠাকুমা তাকেও ফল-টল খাওয়াতেন, মুড়ি মেখে দিতেন। কেবল সে চলে যাওয়ার পর ঠাকুরমা গেলাস বাটি গুনে দেখতেন সব ঠিকঠাক আছে কিনা। সিধু সব বাড়িতে যেত খবর করতে, কার বাড়িতে নতুন লোক এল, কী নতুন কাপড়চোপড় এল দোল দুর্গোৎসবে, কোন বাড়িতে টাকা-পয়সার আমদানি হচ্ছে, ইত্যাদি। খবর বুঝে রাত-বিরেতে হানা দিত সেই বাড়িতে। এমন সব মন্ত্র জানা ছিল তার যে, সেই মন্ত্রের জোরে বাড়ির সবাই নিঃসাড়ে ঘুমোতো, সিধু হাসতে হাসতে চুরি করে নিয়ে যেত সব। এমন কি যাওয়ার আগে গেরস্তের ঘরে বসে দু দণ্ড জিরিয়ে তামাক-টামাক খেয়ে যেত। আমরা ছেলেবেলায় যখন তাকে দেখেছি তখন সে বেশ বুড়ো। পরনে ফরাসডাঙার ধুতি, গিলে-করা পাঞ্জাবি, পায়ে নিউকাট, মুখে পান, আর গলায় গান। বুড়ো বয়সেও বেশ শৌখিন ছিল সে। চার আঙুলে চারটে করে আংটি পরত। বাজার করতে গিয়ে দরাদরি করত না। চুরি করে প্রচুর পয়সা করেছিল সে। বাড়িতে দশ-বারোটা গরু, সাত-আটজন ঝি-চাকর, জুড়িগাড়ি সবই ছিল তার। বুড়ো বয়সে তার ভীমরতি হয়েছিল খানিকটা। তখন তার চোখে ছানি আসছে, বাত-ব্যাধিতেও কষ্ট পায়। খুব দরকার না পড়লে চুরি করতে যেত না। এদিকে তার ছোটো মেয়ে বিবাহযোগ্যা হয়েছে। একটা ভাল সম্বন্ধও পেয়ে গেল। মেয়ের বিয়ে, তার খরচ কম নয়। তার বৌ তখন তাকে প্রায়ই খোঁচাত, "মেয়ের বিয়ে আষাঢ়ে, তোমার তো গরজই নেই দেখছি, অত বড় ব্যাপার, তার খরচাপাতি আসবে কোত্থেকে? রাতের দিকে একটু-আধটু বেরোলে তো হয়।" সিধু তখন তার কাঁকালের ব্যথার কথা বলত, চোখের ছানির কথা

বলত, কিন্তু তার বৌ সে-সব শুনত না। শোনা যায়, বুড়ো বয়সে সিধুর কিছু ভূতের ভয়ও হয়েছিল। নিশুত রাতে বেরোতে সাহস পেত না।

আমাদের পরগনায় আর একজন বিখ্যাত লোক ছিল। তার নাম হালিম। লোকে বলত হালুম মিঞা। তা হালিম ছিল সাঙ্ঘাতিক ডাকাত। যেমন তার বিরাট চেহারা, তেমনি তার সাহস। যে-বাড়িতে ডাকাতি করবে, সে বাড়িতে সাতদিন আগে গিয়ে তার সাকরেদ চিঠি দিয়ে আসত যে, অমুক দিন হালিম সে বাড়িতে ডাকাতি করতে আসবে। সে-আমলে পূর্ববঙ্গের গ্রামে-গঞ্জে দারোগা পুলিশ খুব বেশি ছিল না। তাছাড়া খালবিল জঙ্গলের দেশ বলে অধিকাংশ জায়গাই ছিল দুর্গম। সেসব জায়গায় চোর ডাকাতদের ভারী সুবিধে। হালিম বা হালুম মিঞাকে তাই কেউ কখনো জব্দ করতে পারেনি। সে ছিল দারুণ লাঠিয়াল, অসম্ভব সাহসী। দরকার না পড়লে খুন-টুন করত না। জমিদার বা ধনীরা সাধারণত হালিম মিঞা ডাকাতি করতে এলে খাতির টাতির করত। শোনা যায়, হালিম যে বাড়িতে ডাকাতি করতে যেত, সে-বাড়ি আগে থেকেই বিয়েবাড়ির মতো সাজানো হত, রোশনাই দেওয়া হতো, ভাল খাবারদাবারের বন্দোবস্ত থাকত। হালিম উপস্থিত হলে বাড়ির মালিক হাতজোড় করে ‘আসুন আসুন’ করত। হালিম বিনা বাধায় ডাকাতি করে চলে আসত, কিংবা ঠিক ডাকাতি তাকে করতে হতো না, বাড়ির লোকেরা তাকে সিন্দুকের চাবি-টাবি খুলে সব গুনে গেঁথে দিয়ে দিত। কিন্তু সকলের তো দিন সমান যায় না। আমাদের ছেলেবয়সে সেই কিংবদন্তীর ডাকাত হালিমও বুড়ো হয়েছে। গোরস্থানের কাছে তার বেশ বড় বাড়ি। তারও দাসী চাকর, ধানের মরাই, জোত জমি-গরু সবই আছে। আমরা হালিমকে দেখতাম কানে আতরের তুলো গুঁজে, চোখে সুর্মা দিয়ে, চমৎকার চেক-কাটা সিল্কের লুঙ্গি আর মখমলের পাঞ্জাবি পরে জমিদারের পুকুরে ছিপে মাছ মারছে। খুব গম্ভীর ছিল সে, চোখ দুখানা সবসময়ে লাল টকটকে। ডাকাতি করা তখন ছেড়েই দিয়েছে, তবে শিক্ষানবিশ ডাকাতরা তার কাছে তালিম নিতে আসত। সিধুর কথা যা বলছিলাম। বৌয়ের তাড়নায় অবশেষে সে একদিন রাতে চুরি করতে বেরোলো। চোখের ছানির জন্য রাস্তাঘাট ভাল ঠাহর হয় না, তাই সঙ্গে হ্যারিকেন নিল। একা যেতে ভূতের ভয়, তাই একজন চাকরকেও ডেকে নিল সঙ্গে। রাস্তায় সাপখোপের গায়ে পা পড়তে পারে ভেবে হাততালি দিয়ে দিয়ে পথ হাঁটতে লাগল। আর ভূতপ্রেত তাড়ানোর জন্য তারস্বরে রামনাম করতে লাগল। সেই হাততালি আর রামনামের চোটে এত বিকট শব্দ হচ্ছিল যে, রাস্তার দুপাশের বাড়ি ঘরে লোকজনের ঘুম ভেঙে যেতে লাগল। তারা সব উঁকি মেরে দেখছে, ব্যাপারখানা কী! অনেকেরই ধারণা হলো, সিধু চোর ধার্মিক হয়ে গেছে, তাই রাত থাকতে উঠে

ঠাকুরের নাম নিতে নিতে প্রাতঃস্নান করতে যাচ্ছে নদীতে। এদিকে সিধুর হলো বিপদ, যে-বাড়িতেই ঢুকতে যায় সে-বাড়িতেই দেখে গৃহস্থ সজাগ রয়েছে। ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে গেল সে। কত ঘুমপাড়ানী মন্ত্র পাঠ করল, কিন্তু বুড়ো বয়সে মন্ত্রের জোরও কমে এসেছে, তেমন কাজ হয় না।

ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে গোরস্থানের কাছ-বরাবর এসে এক গাছতলায় বসে জিরিয়ে নিচ্ছিল সিধু। খুব ঠাহর করে সমুখপানে দেখে বলল,"ঐ মস্ত বাড়ি, ওটা কার রে?"

চাকর উত্তর দিল, "ও হালুম মিঞার বাড়ি।"

"বটে বটে!" বলে খুব খুশির ভাব দেখাল সিধু, "তা হালিম দু-পয়সা করেছে বটে। এতকাল তো খেয়াল হয়নি।"

এই বলে সিধু সিঁদকাঠি বের করল।

পরদিন গঞ্জে হৈ-চৈ পড়ে গেল। হালুম মিঞার বাড়িতে মস্ত চুরি হয়ে গেছে। সকালে হালিমের বউ পা ছড়িয়ে পড়া জানান দিয়ে কাঁদতে বসেছে–"ওগো, আমার কী হলো গো? আমার সব চেঁছে পুঁছে নিয়ে গেছে গো। বলি ও বুড়ো হালিম, তোর শরম নেই? যার দাপে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খেত তার বাড়িতে চুরি? বলি ও মুখপোড়া হালিমবুড়ো, সাতসকালে গাঁজা টানতে বসেছিস। কচু গাছের সঙ্গে দড়ি বেঁধে ফাঁসি দে, থুথু ফেলে তাতে ডুবে মর…"

দাওয়ায় বসে গাঁজা খেতে খেতে হালিম কেবল রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে তার বিবিকে ধমক দিয়ে বলে, "চুপ র, চুপ র বাঁদী। যে ব্যাটা চুরি করেছে তার গর্দানের জিম্মা আমার। দেখিস।"

তা শুনে বিবি আরো ডুকরে কেঁদে ওঠে।

হালিম দুটো কাজ করল। সিধুর নামে তিন ক্রোশ দূরের থানায় গিয়ে একটা নালিশ ঠুকে দিয়ে এল, আর সিধুর মেয়ের বিয়ের ঠিক সাত দিন আগে একটা চিঠি পাঠাল তার কাছে "তোমার কন্যার বিবাহের রাত্রে আমি সদলবলে উপস্থিত হইতেছি। আমাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিও…" ইত্যাদি।

চিঠি পেয়ে সিধু বলল, "ফুঃ।"

তারপর সেও গিয়ে তিন ক্রোশ দূরের থানায় দারোগাবাবুকে মুরগি আর মাছ ভেট দিয়ে মেয়ের বিয়েতে নেমন্তন্ন করে এসে দাওয়ায় বসে ফিক ফিক করে হাসতে আর তামাক খেতে লাগল।

সিধুর মেয়ের বিয়েতে আমাদেরও নেমন্তন্ন ছিল, ছোটোকাকা সমেত আমরা সব ঝেটিয়ে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি, হালুম মিঞা ডাকাতি করতে আসবে শুনে যাদের নেমন্তন্ন হয়নি তারাও সব এসেছে গঞ্জ সাফ করে। বিয়েবাড়ি গিসগিস করছে লোকে। দারোগাবাবুও এসে গেছেন। সিধু তাঁকে বিবাহ বাসরের মাঝখানে বরাসনে বসিয়ে দিয়েছে। আর বর তার পাশে একটা মোড়ায় বসে নিজের হাতে হাতপাখার বাতাস খেতে খেতে ঘামছে।

তখনকার নিমন্ত্রণে চার পাঁচ রকমের ডাল খাওয়ান হতো, তারপর মাছ মাংস, দৈ মিষ্টি বা পায়েস দেওয়া হতো। আমরা সবে তিন নম্বর ডাল খেয়ে চার নম্বর ডালের জন্য তৈরি হচ্ছি এমন সময়ে উত্তরের মাঠ থেকে "রে রে" চিৎকার উঠল আর মশাল দেখা গেল। পাত ছেড়ে আমরা সব ডাকাতি দেখতে দৌড়ে গেলাম।

কী করুণ দৃশ্য! ষাট সত্তরজন সাকরেদ নিয়ে হালিম এসে গেছে। সকলের হাতেই বিশাল লাঠি, বল্লম, দা, টাঙ্গি। কপালে সিঁদুরের টিপ। খালি গা, মালকোচা করে ধুতি পরা। কিন্তু সব কজনই বুড়োসড়ো মানুষ। এতদূর জোর পায়ে এসে আর হাল্লাচিল্লা করে সকলেরই দম ফুরিয়ে গেছে। হালিমের হাঁপের টান উঠেছে, তাই সিধু তাকে ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে বারান্দায় বসাল। কয়েকজন ডাকাত উবু হয়ে বসে কাশতে কাশতে বুকের শ্লেষ্ম তুলছে। একজনকে দেখলাম, হাতের ভারী কুড়ুলটা আর বইতে না পেরে একজন বরযাত্রীর হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিজের ভেরে যাওয়া হাতটাকে ঝেড়েঝুড়ে ঠিকঠাক করে নিচ্ছে।

সিধু অনেকক্ষণ হালিমের বুক মালিশ করে দেওয়ার পর হালিমের হাঁপের টানটা কমল। তখন হাতের খাঁড়াটা তুলে নিয়ে বলল, "এবার কাজের কথা হোক।"

সিধু হাতজোড় করে বলল, "তোমার মান মর্যাদা ভুলে যাইনি হে। এই নাও সিন্দুকের চাবি, দরজা টরজা সব খোলা আছে। চলে যাও ভিতর বাড়িতে।"

তো তাই হলো। হুঙ্কার দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল হালিম, সঙ্গে সঙ্গে তার দলবলও হুঙ্কার দিল। অবশ্য হুঙ্কারের সঙ্গে-সঙ্গেই খক্ খক্ করে কাশিও শুরু হয়ে গেল। কিন্তু বেশ দাপটের সঙ্গেই হালিম ভিতরে ঢুকে লুটপাট করতে লাগল। নিজের বাড়ির

যে সব জিনিস চুরি গিয়েছিল সে সবই উদ্ধার করল হালিম। সিধু আগাগোড়া সঙ্গে রইল হাতজোড় করে। হালিম কোনো জিনিস নিতে ভুল করলে সিধু আবার সেটা দেখিয়ে দেয়, "ঐ কাঁসার বাটিটা নিলে না। বুড়ো বয়সে ভীমরতি ধরেছে নাকি, এ দেয়ালঘড়িটা যে তোমার, চিনতে পারছো না?"

এইভাবে ডাকাতি নির্বিঘ্নে এবং সাফল্যের সঙ্গে শেষ হলো। সারাক্ষণ দারোগাবাবু পা ছড়িয়ে বসে তামাক টানলেন। সবাই তার হাফপ্যান্টের নীচে বিশাল মোটা পা, মোটা বেল্ট আর ক্রসবেল্টে বেঁধে-রাখা প্রকাণ্ড উঁড়ি এবং চোমড়ানো গোঁফের খুব তারিফ করতে লাগল। তিনি কাউকে গ্রাহ্য করলেন না। বর বেচারা নিজেকে বাতাস করতে করতে ক্লান্ত হয়ে বসে ঢুলছে। বরযাত্রী সমেত সবাই ডাকাতি দেখছে ঘুরে ঘুরে।

ব্যাপারটা শেষ হলে হালিম আর সিধু এসে দারোগাবাবুর সামনে করজোড়ে দাঁড়াল। দারোগাবাবু হুঙ্কার দিলেন, "ঘটনাটা কি হলো বুঝিয়ে বলো। এই বুড়ো বয়সে চুরি ডাকাতি করতে যাস, একদিন মরবি।"

সিধু কাঁচুমাচু হয়ে বলে, "বড়বাবু, চুরি কি আর নিজের ইচ্ছায় করতে গেলাম! বৌয়ের কাছে ইজ্জৎ থাকে না, সে-ই ঠেলেঠুলে পাঠায়।"

হালিমও বলল, "আমারও ঐ কথা।"

দারোগাবাবু হাতের নল ফেলে খুব হাসলেন। তার হাসিরও সবাই প্রশংসা করল। তারপর বারান্দায় ঠাই করে হালিমের দলকে খেতে বসানো হলো। হালিমের অবস্থা ভালো, কিন্তু তার সাকরেদরা সবাই হাঘরে। ডাল আর বেগুনভাজা দিয়েই তারা পাত লোপাট করতে লাগল।

সেই দেখে আমাদেরও মনে পড়ল, আমাদের পাতে এবার চারনম্বর ডাল পড়বার কথা। আমরা সব দৌড়োদৌড়ি করে ফিরে এলাম খাওয়ার জায়গায়। এবং তারপরই গণ্ডগোল শুরু হয়ে গেল। অর্ধেক খেয়ে উঠে গেছি, ফিরে এসে হুটপাট করে বসে পড়বার কিছুক্ষণ পরেই সবাই টের পেতে লাগলাম, পাতের গণ্ডগোল হয়ে গেছে। কে কার পাতে বসেছি তার ঠিক পাচ্ছি না। যেমন, আমার ডানপাশে ছোটোকাকা বসেছিল, বাঁয়ে সুবল। পাতে দেড়খানা বেগুনভাজা ছিল, মুড়িঘন্টের একটা কানকো। এখন দেখছি, ছোটোকাকা উল্টোদিকের সারিতে বসে আছে, বাঁ পাশে বিপিন পণ্ডিত, পাতে আধখানা মোটে বেগুনভাজা, মুড়িঘণ্টের কানকোটা

নেই, একটা পোকা পড়ে আছে। সবাই চেঁচামেচি করতে লাগল, “এই তুই আমার পাতে বসেছিস চোর কোথাকার…ও মশাই, আপনি তো আমার বাঁ ধারে ছিলেন. একি, আমার কুমড়োভাজা কোথায় গেল..” ইত্যাদি।

তবু খাওয়াটা সেদিন খুব জমেছিল।

# জন্মান্তর

**জন্মান্তর**

তুলসীদাস গোঁসাই তার ক্যাপসুলের মধ্যে খুবই দুঃখিতভাবে বসে আছে। ক্যাপসুলের স্বচ্ছ কাঁচের আবরণ দিয়ে বাইরের বিশ্বজগৎ দেখা যাচ্ছে। ক্যাপসুলের চারদিকেই কালো গহন আকাশ। উজ্জ্বল সব নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে। সৌরমণ্ডল থেকে অনেকটা দূরে হলেও এখান থেকে মটরদানার আকারে সূর্যকেও দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু দেখছে কে? এই একঘেয়ে দৃশ্য দেখতে দেখতে চোখ পচে গেল তুলসীদাসের।

ক্যাপসুলের ভিতরটা বেশ আরামদায়ক। গরম বা ঠাণ্ডা কিছুই নেই। যে আসনটিতে তুলসী বসে আছে তার নাম ইচ্ছাসন। অর্থাৎ ইচ্ছামতো আসনটি চেয়ার, ইজিচেয়ার, বিছানা সব কিছু হয়ে যায়। শরীর যেমন অবস্থায় থাকতে চাইবে আসনটি তেমনই হয়ে যাবে। ক্যাপসুলের মধ্যে বিশেষ যন্ত্রপাতি কিছু নেই। কয়েকটা লিভার আর বোম রয়েছে। একটা টেলিফোনও আছে। সেই টেলিফোনে অনেকক্ষণ ধরে কেউ তাকে কিছু বলতে চাইছে। কাজের কথাই হবে। তুলসীর আজ কাজে মন নেই। তার সামনে একখানা পঞ্জিকা খোলা রয়েছে। আগামীকাল ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। যতবার পঞ্জিকার দিকে চোখ যাচ্ছে ততবার বুকখানা ছাঁত ছাঁত করে উঠছে। তুলসীদাসের কোনও বোন নেই।

গত দশ বছর যাবৎ মহাজাগতিক অতিকায় ভাসমান গবেষণাকেন্দ্রে তুলসী কাজ করছে। তার গবেষণার বিষয়বস্তু ও শক্তির রূপান্তর ও পুনর্গঠন। এ কাজ করতে গিয়ে বস্তুর অন্তর্নিহিত কম্পন বিশ্লেষণ করতে করতে সে আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করে ফেলে যে, মানুষ মরে আবার জন্মগ্রহণ করতে পারে এবং করেও। গত দু'বছর সময়ের বাধা ভেদ করা নিয়ে যে সব গবেষণা হয়েছে তার ফলে অতীত বা ভবিষ্যতে সময়ের গাড়ি করে যাতায়াত আর শক্ত নয়। মুস্কিল হচ্ছে,

এসব অত্যন্ত গোপনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তরে আছে। তুলসী চেয়েছিল সে তার পূর্ব জন্মে ফিরে গিয়ে তার কোনও বোন ছিল কিনা তা খুঁজে দেখবে এবং তার হাতে ভাইফোঁটা নিয়ে আসবে। কিন্তু গবেষণাগারের প্রধান প্রজ্ঞাসুন্দর কেন যেন কিছুতেই তাকে ওই বিপজ্জনক কাজের অনুমতি দিচ্ছেন না।

টেলিফোনটা বার বার সংকেত দিচ্ছে। অগত্যা যন্ত্রটা চালু করে তুলসী রাগের গলায় বলে, কী চাই?

প্রজ্ঞাসুন্দর বলল, তোর হয়েছেটা কী বল তো! সকাল থেকে কোথায় গিয়ে বসে আছিস? এখানে কত কাজ পড়ে আছে! মহাকাশে কতগুলো

গুরুতর পরিবর্তন হয়ে গেল, তথ্যগুলো রেকর্ড করে রাখা দরকার। পৃথিবী থেকে তাগাদা আসছে।

আমার মন ভাল নেই প্রজ্ঞাদা। তোমরা তোমাদের মহাকাশ নিয়ে থাকো। আজকের দিনটা আমাকে ছুটি দাও।

তাই কি হয়? তুই ছাড়া একাজ আর কে করতে পারে? মাত্র একাত্তর লাইট ইয়ার দূরে একটা নক্ষত্র কিছুক্ষণ আগে ফেটে গেল বলে আমাদের যন্ত্রে ধরা পড়েছে।

ধুস, নক্ষত্রটা ফেটেছে তো মিনিমাম একাত্তর বছর আগে। ওরকম কতই ফাটছে। আমার ভাল লাগছে না এসব আকাশী ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে।

লক্ষ্মী ভাইটি! একবার আয়। মহাজাগতিক কম্পন তুই ছাড়া আর যে কেউ বিশ্লেষণ করতে পারে না। তোর মিমিক যন্ত্র তো আর কারও পক্ষে অপারেট করা সম্ভব নয়।

বেজার মুখে তুলসী একটা বোম টিপল। তার ক্যাপসুল ছুটতে শুরু করল এবং একটু বাদেই বিশাল মহাকাশ স্টেশনের একটি প্ল্যাটফর্মে এসে নামল।

মহাকাশ স্টেশনটি একটি সূক্ষ্ম কিন্তু ঘাতসহ আবরণ দিয়ে ঢাকা। মহাজাগতিক রশ্মি বা উল্কাপিণ্ড কোনটাই একে আঘাত করতে পারে না। একশ মাইল চওড়া ও দেড়শ মাইল লম্বা এই মহাকাশ স্টেশনে গবেষণাগার থেকে শুরু করে শস্যক্ষেত্র, পুকুর থেকে শুরু করে ফুটবলের মাঠ সবই আছে। প্রচুর গাছপালা, পাখি,

প্রজাপতি, পতঙ্গ, একেবারে প্রাকৃতিক পরিবেশ রচনা করে রেখেছে। থিয়েটার হল, অপেরা, পার্ক, জিমনাসিয়াম কিছুরই অভাব নেই।

তুলসী তার গবেষণাগারে পৌঁছে মিমিক যন্ত্র দিয়ে বিস্ফোরক নক্ষত্রটির খোঁজখবর নিল এবং তথ্য রেকর্ড করে রাখল। তারপর প্রজ্ঞাকে টেলিফোন করে বলল, আমি ছুটি চাই।

ও বাবা! ছুটি চাস কেন?

আর ভাল লাগছে না, কালই আমি পৃথিবীতে ফিরে যাবো।

প্রজ্ঞা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, বুঝেছি, তুই ওই ভাইফেঁটা ভুলতে পারছিস না তো! ঠিক আছে, তোকে একদিনের জন্য জন্মান্তরে যাওয়ার অনুমতি দিচ্ছি। কিন্তু যন্ত্রটা এখনও এক্সপেরিমেন্টাল স্তরে আছে। তুই-ই ওটা আবিষ্কার করেছিস বলে তোকে একটা অগ্রাধিকার দিলাম। পরশু ফিরে আসবি কথা দিয়ে যা।

কথা দিচ্ছি।

তুলসী মহানন্দে তার গবেষণাগারের ভূগর্ভে অত্যন্ত গোপনীয় আর একটা প্রকোষ্ঠে ঢুকল। সেখানে টাইম ক্যাপসুল এবং ডাটা ব্যাংক রয়েছে। তুলসী অনেকক্ষণ ধরে নানা তথ্য বিশ্লেষণ করতে লাগল। নিজের দেহে নানা কম্পন ও তরঙ্গ বিশ্লেষণ করে ঢুকিয়ে দিতে লাগল ডাটা ব্যাংকে। প্রায় চার পাঁচ ঘণ্টা পর কম্পিউটার একটা তথ্য দিল। ২০১৬ খ্রীস্টাব্দে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে বনগ্রামে অমিত চ্যাটার্জি বলে একজন লোক ছিল। সম্ভবত সে-ই তুলসী, আগের জন্মের তুলসীদাস গোঁসাই।

টাইম ক্যাপসুলে ঢুকে নিজেকে পাঁচ শতাব্দী পিছনে নিক্ষেপ করল তুলসী। অভিজ্ঞতাটা নতুন। হুহু করে শরীর বিধানে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সব বিবর্তন আবর্তন হয়ে যাচ্ছে। তুলসী হয়ে যাচ্ছে অমিত।

টাইম ক্যাপসুলকে তুলসী চালনা করল পৃথিবীতে। মহাকাশ স্টেশন থেকে এক লহমায় যন্ত্রটি তাকে নামিয়ে আনল পৃথিবীর আকাশে। তবে পাঁচশো বছর আগেকার পৃথিবী, সবুজ, গরিব, মন্থর পৃথিবী।

বনগ্রাম বা বনগাঁ। খুঁজে পেতে দেরি হল না তার। তারিখটাও ঠিক করে নিল।

যন্ত্র থেকে বাইরে এসে যন্ত্রটাকে ভিন্ন কম্পনে অদৃশ্য করে রেখে সে নেমে এল। সে যদি অমিত চ্যাটার্জি হয়ে থাকে তবে আর মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তার তুলসী সত্তা বিলুপ্ত হয়ে সে পুরোপুরি অমিত চ্যাটার্জির মধ্যে ঢুকে যাবে। তখন শুধু একটা নম্বর মনে থাকবে তার। ওই নম্বরটা তাকে আবার তুলসীদাসে পরিণত করতে এবং পাঁচশো বছর পরবর্তী ভবিষ্যতে ফিরে যেতে সাহায্য করবে।

মাটিতে পা রাখার আগে প্রকম্পিত বুকে কয়েক সেকেন্ড অপেক্ষা করল সে। তারপর মাটিতে পা রাখল।

সঙ্গে সঙ্গে শরীরটা ভীষণ কেঁপে উঠল তুলসীর। প্রবল একটা ঝাঁকুনি।

তারপরই সে দেখল, সে একটা আসনে বসে আছে! সামনে ধান দূর্বা প্রদীপে সাজানো থালা। কে যেন শাঁখ বাজাচ্ছে, একটি কিশোরী মেয়ে বলে উঠল, এই দাদা! ঘুমোচ্ছিস নাকি? মুখটা তোল।

তুলসী ওরফে অমিত একগাল হাসল। হ্যাঁ, এই তো তার বোন শুভ্রা। আজ ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, ওই তো মা দাঁড়িয়ে আছে।

তুলসী ওরফে অমিত মুখ তুলল, শুভ্রা কী সুন্দর করে যমদুয়ারে কাটা দিয়ে ভাইয়ের কপালে ফোঁটা পরিয়ে দিল। এগিয়ে দিল নাড়ু মোয়া মিষ্টির রেকাবি। পাঞ্জাবির কাপড় আর ধুতি।

.

মহাকাশ স্টেশনে পাঁচশো বছর পরে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু সে কথা পরে। তুলসী মহানন্দে হাসতে লাগল আপাতত। তার সব গবেষণা দারুণভাবে সার্থক। জন্মান্তর এবং সময় সীমা দুইয়েরই রহস্য ভেদ হয়ে গেছে।

# জয়রামবাবু

**জয়রামবাবু**

জয়রাম বোস নস্যির ডিবেটা মঙ্গলগ্রহে ফেলে এসেছেন। কিন্তু ফেরার উপায় নেই। তাড়াহুড়োয় পৃথিবীতে ফিরে আসার জন্য যে-রকেটটা ভাড়া করেছেন, সেটা আন্তঃ নক্ষত্রমণ্ডল খেয়া পারাপারের। সৌরমণ্ডলের জন্য আলাদা ধীরগতির রকেট পাওয়া যায়। কিন্তু ফেরার সময় এটাকেই কাছেপিঠে দেখতে পেয়ে হাতঘড়িতে লাগানো ট্রানরিসিভারের সংকেতে নামিয়ে এনেছিলেন। পাইলট ফাঁকতালে ছোট খেপের সওয়ারী পেয়ে কিছু বাড়তি লাভের আশায় আপত্তি করেনি বটে, তবে সে নস্যির ডিবের জন্য এখন ফিরে যেতেও নারাজ। জয়রাম কথাটা তুলতেই লোকটা বলল, "ও বাবা, আমাকে আর সাত মিনিটের মধ্যে নেবুলার ওধারে রওনা হতে হবে। আমার এ রকেট সেকেন্ডে মাত্র দু কোটি মাইল যায়। সৌরমণ্ডল বলে আরো আস্তে চালাচ্ছি। দেরি করতে পারব না।"

জয়রাম খিঁচিয়ে উঠতে গিয়েও সামলে নিলেন। মেজাজ খারাপ করে লাভ নেই। আন্তঃ নক্ষত্রমণ্ডল খেয়ার মাঝিরা একটু উঁটিয়াল হয়েই থাকে। তবে নস্যির ডিবের জন্য জয়রামের একটু উশখুশ রয়েই গেল।

জয়রামের বাড়ি একটি ভাসমান বাসগৃহ। পৃথিবীতে আর বাড়ি করার জায়গা নেই। মাটির তলাতেও আধমাইল গভীরতা পর্যন্ত গিজগিজ করছে বাড়িঘর। অবশেষে একবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে মাধ্যাকর্ষণ-নিরোধী বাড়ি তৈরি করে আকাশে ছাড়া হয়েছে। তা বলে বাড়িগুলো ভেসে বেড়ায় না, শূন্যের একটি নির্দিষ্ট জায়গায় একদম স্থির হয়ে থাকে। এইসব বাড়িতে বাতাস থেকে জল এবং সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ভাল ব্যবস্থা আছে। শুধু মাঝে-মাঝে হাটবাজার করতে পৃথিবীতে নামতে হয়।

জয়রামের বাড়ির সামনে একটা ভোলা রক। তার ওপর দাগ কেটে জয়রামের ছোটো মেয়ে কুঁচি এক্কাদোক্কা খেলছে। রকেটটা সেই রকের পাশ ঘেঁসে দাঁড়াতেই জয়রাম ভাড়া মিটিয়ে লাফ দিয়ে নামলেন। কুঁচি 'বাবা' বলে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল গায়ে।

মেয়ে আচমকা ঝাঁপিয়ে পড়ায় জয়রাম টাল সামলাতে না পেরে পড়ো-পড়ো হয়ে পড়েই গেলেন নীচে। নীচে বলতে যদি সত্যিই পৃথিবীর বুকে গিয়ে পড়তে হয়, তবে সে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ফুট। কিন্তু আকাশবাড়িতে যারা থাকে তাদের সকলকেই মাধ্যাকর্ষণ-নিরোধী পোশাক পরতে হয়। জয়রাম তাই পড়েও পড়লেন না। শূন্যে একটু ভেসে সাঁতরে আবার বাড়ির রকে এসে উঠলেন। মেয়ের মাথায় একটু হাত বুলিয়ে ঘরে ঢুকে মহাকাশের বিশেষ পোশাক ছেড়ে একটা লুঙ্গি পরে দেয়ালজোড়া টেলিভিশনের পর্দার সামনে বসে বললেন, আমি এখন টেলিভিশন দেখব। চ্যানেল চার, ব্যান্ড সাত। বলার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিপ্রতিক্রিয়ায় টেলিভিশনে ছবি ভেসে উঠল। জোর খেলা চলছে। বৈজ্ঞানিক রাখোহরির টিমের সঙ্গে যন্ত্রবিদ ফল্টারের টিমের ফুটবল ক্যালকুলেশন ম্যাচ। দু'দলে এগারো জন করে বাইশ জন বাঘা কমপিউটার রয়েছে। তারা বলটাকে এক বিশাল আয়তক্ষেত্রের বিভিন্ন জায়গায় চালনা করছে। রাখোহরির লেফট উইং বেঁটে কমপিউটার গদাই বলটাকে নিউট্রাল জোনে ঠেলে দিতেই ফসটারের গোল কমপিউটার ব্যারেল সেটাকে ধরে লেফট হাফ মজবুত-গড়নের গরডনের কাছে পাঠাল। রাখোহরির চকিত-চিন্তা কমপিউটার বলটাকে ধরে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির কোণে নিখুঁত ঠেলে দিতেই ফসটারের পাগলা কমপিউটার মুনস্ট্রাক আর রাখোহরির ঠাণ্ডা মাথার কমপিউটার শীতলচন্দ্রের জোর সংঘর্ষ।

জমে উঠেছিল খেলাটা। কিন্তু জয়রামের গিন্নি সৌরচুল্লিতে কয়েক সেকেন্ডের ভিতর এক বাটি সুজি করে এনে দিয়ে বললেন, "এক ছিটে আনাজপাতি নেই। বাজারে যাবে না?"

জয়রাম উঠলেন! অতিবেগুনি রশ্মি ও অন্যান্য রশ্মি দিয়ে হাতমুখ পরিষ্কার করে সুজি খেয়ে পোশাক পরে বেরিয়ে পড়লেন। আসল সুজি নয়, কৃত্রিম সুজি, তাই মুখটা বিস্বাদ ঠেকছিল।

গ্যারেজে ঢুকে ছোট ভারটিকাল বিমানটি বের করে নিয়ে পৃথিবীর বুকে রওনা হলেন। তাড়া নেই। আস্তে-আস্তে যাচ্ছেন। আশেপাশে আরো অনেক বাড়ি ভাসছে। দত্তগিন্নি একটা মহাজাগতিক রশ্মি আটকানোর ছাতা মাথায় দিয়ে

বাড়ির ছাদে উঠে ডালের বড়ি শুকোতে দিচ্ছেন। বুড়ো চাটুজ্যের বড় বদভ্যাস। রকে দাঁড়িয়ে নাকঝাড়ল নীচে। পড়শি খলিলভাই বাজার করে ছেলেমেয়ে নিয়ে একটা কাঁচের হেলিপ্লেনে ফিরছিলেন। তাকে বেতারে জয়রাম চাটুজ্যে বুড়োর বদভ্যাসের কথাটা জানিয়ে দিয়ে বললেন, "এইভাবেই একদিন দেখো আকাশবাসী আর পৃথিবীবাসীর মধ্যে একটা ঝগড়া পাকিয়ে উঠবে। এখনই সাবধান না হলে–"।

নস্যির জন্য নাকটা উশখুশ করছে তখন থেকে। কিন্তু কিছু করার নেই। দুঃখিত মনে জয়রাম প্লেন নিয়ে নিউ ইয়র্কের সুপার মারকেটে নামলেন। নামে সুপার মারকেট হলেও সবজি বা আনাজ বলতে প্রায় কিছুই পাওয়া যায় না। পৃথিবীতে জনসংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় চাষের জমিতে টান পড়েছে। তাই টাটকা সবজির বদলে আজকাল সিনথেটিক খাবারেরই বেশি চলন, সবজি যা-ও বা কিছু পাওয়া যায়, তা আসে নীহারিকা পুঞ্জের প্রথম পর্যায়ের এক সৌরমণ্ডলের দুটি বাসযোগ্য বড় গ্রহ থেকে। কিন্তু তাতে খরচও কম পড়ে না আর পরিমাণেও তা পৃথিবীর কোটি কোটি লোকের তুলনায় নেহাতই তুচ্ছ।

জয়রাম ভিড়ে থিকথিক-করা বাজারে ঢুকে দেখলেন এক জায়গায় কিছু টাটকা মানকচু বিক্রি হচ্ছে। তার সামনে বিশাল লাইন। জয়রাম ঘণ্টাখানেক লাইনে দাঁড়ালেন। কিন্তু অর্ধেক পথেই কচু ফুরিয়ে গেল। ছুটলেন অন্য জায়গায়, সেখানে কিছু তেলাকুচোর চালান এসেছে। কিন্তু তেলাকুচোও কপালে জুটল না। নস্যির জন্য নাকটা সুড়সুড় করছে কখন থেকে। মঙ্গলগ্রহে হাজার হাজার মাইল খাল খোঁড়ার কাজ তদারক করতে করতে অন্য সব কথা খেয়াল থাকে না। অথচ খাঁটি নস্যি এখানে কিনতে পাওয়া যায় না। নীহারিকাপুঞ্জের সবুজ গ্রহে কিছু তামাকের চাষ হয়। সেখান থেকে তার বন্ধু পাডুরাম বড় একটা ডিবে এনে দিয়েছিল। দামও পড়ে যায় বিস্তর।

কাঁচা সবজি না পেয়ে জয়রাম টিনের সিল-করা প্যাকে কৃত্রিম খাবার কিনলেন। গিন্নি ভারী রেগে যাবেন। কিন্তু কী আর করা!

ছাদের দিকে এসকেলেটরে উঠছেন এমন সময় দোকলবাবুর সঙ্গে দেখা।

"কী খবর হে? বাসা কোথায় করলে?" দোকলবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

"আজ্ঞে আকাশপুরীর তায়েবগঞ্জে। উত্তর রাশিয়ার ঠিক ওপরেই!"

“বাঃ, সে তো খুব ভাল জায়গা শুনেছি। এখন সেখানে জায়গার দাম কত করে বলো তো? আমার মেজো জামাই একটা জায়গা খুঁজছে।”

“আজ্ঞে তায়েবগঞ্জে আর জায়গা নেই। পাশে নতুন একটা কলোনি হচ্ছে। নাম চিউ মিং স্যাটেলাইট টাউনশিপ, সেখানে জায়গা পেয়ে যাবেন। তবে প্রতি ঘনফুট বোধ হয় এক লক্ষ ডলার করে পড়বে।”

“তা পড়ুক। জায়গা পাওয়া গেলেই হল।” বলতে বলতে দোকলবাবু পকেট থেকে একটা রুপোর কৌটো বের করে এক টিপ নস্যি নিয়ে ‘আঃ’ বলে আরামের একটা আওয়াজ করলেন।

ডিবেটার দিকে অবিশ্বাসের চোখে চেয়েছিলেন জয়রামবাবু। এ যে নিজের চোখকে বিশ্বাস করা যায় না। নস্যি, নস্যি!

“একটু দেবেন? ঐ নস্যিটা?”

দোকলবাবু বললেন, “হ্যাঁ, হ্যাঁ, নাও না। আমার বড় জামাই তো সবুজ গ্রহে বাস করে, সে আমাকে পিপে-পিপে নস্যি পাঠায়। যত খুশি নাও।” বলে দোকবাবু উঁকি মেরে জয়রামের থলিটা দেখে বললেন,

“শাকসবজি কিছু পেলে না দেখছি!”

জয়রাম পরপর দুটিপ নস্যি টেনে আরামে নাকের জলে চোখের জলে হয়ে এক গাল হাসলেন। বললেন, “নাঃ। গিন্নির কাছে আজও বকুনি খেতে হবে।”

ছাদে এসে যে যার যানবাহন খুঁজতে যাবেন, তখন দোকলবাবু বললেন, “এখনো ঢের সময় আছে। আমার বাড়ি তো কাছেই গ্রিসে। চলো একটু বিশ্রাম করে যাবে।”

নিউইয়র্ক থেকে গ্রিসের দূরত্ব এয়ার কারে মাত্র আধ মিনিট। তাই জয়রামবাবু আপত্তি করলেন না। দোকলবাবু তার এয়ার কারের দরজা খুলে বললেন, “উঠে পড়ো।”

পুরোনো অ্যাথেন্সের বাইরে দোকলবাবুর ছোট বাড়ি। তবে খুব বড়লোক ছাড়া বাড়িতে কারো বাড়তি জমি থাকে না। দোকলবাবুর আছে। কাজটা বেআইনিও

বটে। দোকবাবু খুব লুকিয়ে পাঁচিল ঘিরে দশ হাত বাই দশ হাত একটু জমি রেখেছিলেন বাড়ির পিছনে।

জয়রামকে কফি খাইয়ে দোকলবাবু বললেন, "এসো, তোমাকে তাজ্জব জিনিস দেখাব একটা।" বলে প্রায় হাত ধরে টেনে পিছনের ফালি জমিটায় নিয়ে এলেন জয়রামকে।

জয়রাম থমকে দাঁড়ালেন। বিস্ময়ে থ তিনি।

পৃথিবীতে অতীত কালের মানুষরা মাটিতে কেমিক্যাল সার দিয়ে মাটিকে পাথরের মতো শক্ত আর জমাট করে দিয়ে গেছে। তাতে আর চাষ হয় না, সেচ চলে না, লাঙলই ঢুকতে চায় না। গাছপালা বলে কিছুই প্রায় নেই। ফালতু জমিও নেই যে গাছ লাগানো যাবে। তবে এ কী? দশ বাই দশ হাত জায়গাটায় কচিকচি ভেঁকিশাকের মাথা জেগে রয়েছে। কী সবুজ! কী সরস! কী অদ্ভুত!

"ঢেঁকিশাক!" জয়রাম চেঁচিয়ে উঠলেন।

দোকলবাবু তৎক্ষণাৎ তার মুখ চেপে ধরে বললেন, "উঁহু, শব্দ কোরো না। টের পেলেই বারোটা বাজিয়ে দেবে।"

জয়রাম এবার চাপা স্বরে প্রচণ্ড উত্তেজনায় বলে উঠলেন, "এ যে ঢেঁকিশাক!"

"ঢেঁকিশাকই বটে। অনেক কষ্টে দশ বছরের চেষ্টায় ফলিয়েছি। নেবে কটা? নাও। দাঁড়াও, আমি তুলে দিচ্ছি। খবর্দার, কাউকে বোলো না কিন্তু!"

"আজ্ঞে না না।" বিগলিত জয়রাম বললেন।

"আর শোনো, ওই চিউ মিং স্যাটেলাইট টাউনশিপে আমার জামাইয়ের জন্যে শ পাঁচেক ঘনফুট জায়গা যোগাড় করে দিতে হবে।"

ঢেঁকিশাকের দিকে চেয়ে জয়রাম মন্ত্রমুগ্ধের মতো বললেন, "নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।"

বারোগাছি ঢেঁকিশাক নিয়ে জয়রাম যখন বাড়িতে ফিরলেন তখন তার চোখমুখ অস্বাভাবিক সম্মোহিত। বিড়বিড় করে কেবল বলছেন, "ঢেঁকিশাক! ঢেঁকিশাক!"

# টেলিফোনে

## টেলিফোনে

টেলিফোন তুললেই একটা গম্ভীর গলা শোনা যাচ্ছে, "সিক্স ফোর নাইন ওয়ান... সিক্স ফোর নাইন ওয়ান...সিক্স ফোর নাইন ওয়ান...।"

সকাল থেকে ডায়াল-টোন নেই। টেলিফোনের হরেক গণ্ডগোল থাকে বটে, কিন্তু এ-অভিজ্ঞতা নূতন। গলাটা খুবই যান্ত্রিক এবং গম্ভীর। খুব উদাসীনও।

প্রদীপের কয়েকটা জরুরি টেলিফোন করার ছিল। করতে পারল না। কিন্তু কথা হল, একটা অদ্ভুত কণ্ঠস্বর কেবল বারবার চারটে সংখ্যা উচ্চারণ করে যাচ্ছে কেন? এর কারণ কী? ঘড়ির সময় জানার জন্য বিশেষ নম্বর ডায়াল করলে একটা যান্ত্রিক কণ্ঠে সময়ের ঘোষণা শোনা যায় বটে, কিন্তু এ তো তা নয়। মিনিটে মিনিটে সময়ের ঘোষণা বদলে যায়, কিন্তু এই ঘোষণা বদলাচ্ছে না।

অফিসে এসে সে তার স্টেনোগ্রাফারকে ডেকে টেলিফোনের ত্রুটিটা এক্সচেঞ্জে জানাতে বলেছিল। তারপর কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সে একটা মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির বড় অফিসার। বহু বছর দিল্লিতে ছিল, সম্প্রতি কলকাতায় বদলি হয়ে এসেছে। কোম্পানিই তাকে বাড়ি, গাড়ি ও টেলিফোন দিয়েছে। তার আগে এই পদে ছিলেন কুরুষ্টু নামে দক্ষিণ ভারতের একজন লোক। তিনি রিটায়ার করে দেশে ফিরে গিয়ে ফুলের চাষ করছেন বলে শুনেছে প্রদীপ। খুবই দক্ষ ও অভিজ্ঞ মানুষ ছিলেন তিনি। রিটায়ার করার বয়স হলেও কোম্পানি তাকে ছাড়তে চায়নি। বরং আরও বড় পোস্ট দিয়ে ধরে রাখতে চেয়েছিল। কুরুপ্প কিছুতেই রাজি হয়নি।

দুপুরে লাঞ্চের আগে সে একটি পার্টিকে একটা বকেয়া বিলের জন্য তাগাদা করতে টেলিফোন তুলে ডায়ালের প্রথম নম্বরটার বোম টিপতেই আচমকা সেই উদাসীন, গম্ভীর, যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শুনতে পেল, সিক্স ফোর নাইন ওয়ান... তারপরই অবশ্য কণ্ঠস্বর থেমে গেল।

প্রদীপ খুব অবাক হয়েছিল। সামলে নিয়ে বাকি নম্বর ডায়াল করতে রিং বাজল এবং ওপাশে একজন ফোনও ধরল। প্রয়োজনীয় কথা সেরে নিয়ে প্রদীপ খুব চিন্তিতভাবে অফিসের ইলেকট্রনিক টেলিফোনটার দিকে চেয়ে রইল। এই ফোনেও কণ্ঠস্বরটা এল কী করে? এসব হচ্ছেটা কী?

কলকাতার বাড়িতে প্রদীপের আত্মীয়স্বজন কেউ নেই। তার মা, বাবা, বোন ভাই সব দিল্লিতে। সে বিয়ে করেনি। একা থাকে। একজন রান্নার ঠিকে তোক বেঁধে দিয়ে যায়। আর ঘরদোর সাফ করা, বাসন মাজা ও কাপড় কাঁচার জন্য ঠিকে একজন কাজের মেয়ে আছে। তারা কেউ বাড়িতে থাকে না। আলিপুরের নির্জন অভিজাত পাড়ায় তিনতলার মস্ত ফ্ল্যাটে প্রদীপ সম্পূর্ণ একা। তবু প্রদীপ হঠাৎ ফ্ল্যাটের নম্বর ডায়াল করল এবং শুনতে পেল ওপাশে রিং হচ্ছে। মাত্র তিনবার রিং বাজতেই কে যেন ফোনটা ওঠাল। কিন্তু কথা বলল না।

প্রদীপ বলল, “হ্যালো! হ্যালো!”

কেউ জবাব দিল না। কিছুক্ষণ পর ফোনটা কেউ আস্তে নামিয়ে রাখল।

দুপুরবেলাতেও প্রদীপের শরীর হিম হয়ে এল। এসব হচ্ছেটা কী? যদি রং নম্বরই হয়ে থাকে তা হলেও তো ওপাশ থেকে কেউ না কেউ সাড়া দেবে।

বিকেলে পার্টি ছিল, ফ্ল্যাটে ফিরতে একটু রাতই হয়ে গেল তার। আর ফেরার সময় মাথায় দুশ্চিন্তাটা দেখা দিল। সে অলৌকিকে বিশ্বাসী নয়, কিন্তু কোনও ব্যাখ্যাও তো পাওয়া যাচ্ছে না।

দরজা খুলে ফ্ল্যাটে ঢোকার পর একটু গা-ছমছম করছিল। তবে আলো জ্বেলে ঝলমলে আধুনিক ফ্ল্যাটটার দিকে চেয়ে তার ভয়-ভয় ভাবটা কেটে গেল। তবে ফোনটার ধারেকাছে সে আর গেল না।

প্রদীপের গভীর ঘুম ভাঙল রাত দুটো নাগাদ। হলঘরে ফোন বাজছে। ঘুমচোখে সে তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। দিল্লিতে মা বাবার শরীর খারাপ হল না তো!

ফোন ধরতেই শিউরে উঠল সে। সেই যান্ত্রিক উদাসীন গম্ভীর গলা বলতে লাগল, “সিক্স ফোর নাইন ওয়ান..সিক্স ফোর নাইন ওয়ান....সিক্স ফোর নাইন ওয়ান....।”

ফোনটা রেখে দিল সে। বাকি রাতটা আর ঘুম হল না। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করে কাটিয়ে দিল।

কলকাতার টেলিফোন-ব্যবস্থা যে খুব খারাপ, তা প্রদীপ জানত। তবু সকালে ব্রেকফাস্টের সময় টেলিফোন বেজে উঠতেই প্রদীপ যখন কম্পিত বক্ষে গিয়ে টেলিফোন ধরল, তখন একটি অমায়িক কণ্ঠস্বর বলল, “সার আপনি টেলিফোন খারাপ বলে কমপ্লেন করেছিলেন কাল। কিন্তু আমরা টেস্ট করে দেখেছি আপনার লাইনে তো কোনও গণ্ডগোল নেই। লাইন তো চালু আছে কিন্তু আমি যে টেলিফোনে একটা অদ্ভুত গলা শুনতে পাচ্ছি।”

“হয়তো ক্রস কানেকশন হয়ে গিয়েছিল। আমাদের যন্ত্রপাতি সব বহু পুরোনো, তাই মাঝে মাঝে ওরকম হয়। আপনি ডায়াল করে দেখুন এখন, লাইন ঠিক আছে।”

বাস্তবিকই লোকটা কানেকশন কেটে দেওয়ার পর ডায়াল-টোন চলে এল এবং অফিসের নম্বর ডায়াল করতেই লাইনও পেয়ে গেল প্রদীপ।

ফোন স্বাভাবিক হল বটে, কিন্তু প্রদীপের মাথা থেকে সিক্স ফোর নাইন ওয়ান...’ গেল না। কাজকর্মের ব্যস্ততার ফাঁকে-ফাঁকে নম্বরটা মনে পড়তে লাগল। এক-আধবার প্যাডে নম্বরটা লিখেও ফেলল।

বিকেলের দিকে কয়েকটা চিঠি সই করতে গিয়ে হঠাৎ চিঠির ওপরে টাইপ-করা তারিখটা দেখে সে একটু সচকিত হল। টু ফোর নাইন্টি ওয়ান। অর্থাৎ একানব্বই সালের দোসরা এপ্রিল। সিক্স ফোর নাইন ওয়ান মানে কি এপ্রিলের ছয় তারিখ?

কথাটা টিকটিক করতে লাগল মাথার মধ্যে। অফিস থেকে বেরিয়ে সে গেল একটা ক্লাবে টেনিস খেলতে। তারপর একটা হোটেলে রাতে খাবার খেয়ে ফ্ল্যাটে ফিরে এল। টেনিস খেলার ফলে ক্লান্ত শরীরে খুব ঘুম পাচ্ছিল। শোওয়ার আগে সে সভয়ে টেলিফোনটার দিকে চেয়ে রইল। দিল্লিতে ফোন করে মা-বাবার একটা খবর নেওয়া দরকার। ফোন করাটা উচিত হবে কি? যদি আবার...?

না, ফোন তুলে ডায়াল-টোনই পাওয়া গেল। দিল্লির লাইনও পাওয়া গেল একবারেই। মা, বাবা, ভাই ও বোনের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথা বলে মনটা হালকা লাগল। আজ শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ল।

তিন-চারদিন আর কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটল না। টেলিফোন স্বাভাবিক। দুশ্চিন্তা বা উদ্বেগটাও আস্তে-আস্তে সরে যেতে লাগল মন থেকে।

কিন্তু রবিবার সকালে গলফ খেলতে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিল প্রদীপ। হঠাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। প্রদীপ অন্যমনস্কভাবে টেলিফোন তুলতেই সেই অবিস্মরণীয় যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর শোনা গেল, দিস ইজ দ্য ডে…দিস ইজ দ্য ডে… দিস ইজ দ্য ডে.দিস ইজ দ্য ডে…।

সকালের আলোর মধ্যেও ভয়ে হঠাৎ হিম হয়ে গেল প্রদীপ। চিৎকার করে বলল,

"হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অব ইট?"

অবিচলিত কণ্ঠস্বর একইভাবে বলে যেতে লাগল, "দিস ইজ দ্য ডে…দিস ইজ দ্য ডে.."

প্রদীপ চিৎকার করে ধমকাল, দু-একটা নির্দোষ গালাগালও দিল, কাকুতি-মিনতি করল। কিন্তু কণ্ঠস্বরের অধিকারী ওই একটা বাক্যই উচ্চারণ করে গেল।

এপ্রিলে কলকাতা এমনিতেই গরম। ফোনে চেঁচামেচির পর আরও ঘেমে উঠল সে। ফোনটা রেখে কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে রইল। এর মানে কী?

হঠাৎ খেয়াল হল, আজ এপ্রিলের ছয় তারিখ। সিক্স ফোর নাইন ওয়ান। আজকের দিনটা সম্পর্কে কেউ তাকে কিছু বলতে চাইছে কি? কী বিশেষত্ব এই দিনটার?

আজ তো চমৎকার একটা দিন। আজ সারাদিন তার দারুণ প্রোগ্রাম। তাদের অফিসের সবচেয়ে বড় ক্লায়েন্ট মান্টু সিং সরখেরিয়ার আমন্ত্রণে তারা আজ যাচ্ছে কলকাতার বাইরে দিল্লি হাইওয়ের কাছে সরখেরিয়ার বিশাল বাগানবাড়িতে। সকালে সেখানে গল আর টেনিসের আয়োজন, দুপুরে বিশাল লাঞ্চ, সন্ধেবেলায় হাই টি। তারপরও গানবাজনা হবে। একেবারে ডিনার সেরে ফেরার কথা। এমন চমৎকার মজায় ভরা দিনটা নিয়ে চিন্তা করার কী আছে?

ফুরফুরে হাওয়ায় হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে দিল্লি রোড হয়ে সরখেরিয়ার বাগানবাড়িতে পৌঁছনোর সময় দুশ্চিন্তাটা কখন উবে গেল। অনেক অতিথি জড়ো হয়েছে, হাসি-হট্টগোল চলছে। গল কিট নিয়ে বেরিয়ে পড়ল প্রদীপ, এক কাপ কফি খেয়ে নিয়েই।

সরখেরিয়ার খামারের পাশেই গল্‌ফের বিশাল মাঠ। মাঝে-মধ্যে ঝোঁপ-জঙ্গল, জলা। অনেক গলফ-খেলোয়াড় জড়ো হয়েছেন। খেলতে খেলতে সব দুশ্চিন্তা সরে গেল মাথা থেকে।

বলটা একটা ঝোঁপ-জঙ্গলের মধ্যে গিয়ে পড়েছিল। প্রদীপ বল খুঁজতে সেখানে ঢুকল। জায়গাটা যেন অন্ধকার এবং দুর্গম। কিন্তু জঙ্গলটা এমন জায়গায় যে, গর্ত পর্যন্ত যেতে হলে এই জঙ্গলটি পেরোতেই হবে।

সেই জঙ্গলে নীচু হয়ে বলটা খুঁজবার সময়ে আচমকাই একটা দুরাগত কণ্ঠ যান্ত্রিকভাবে হঠাৎ বলে উঠল, "দিস ইজ দ্য ডে...."

একটা ক্লিক করে শব্দ হল কোথাও। সন্দেহজনক কিছু নয়। কিন্তু হঠাৎ প্রদীপের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ই যেন কিছু জানান দিল। সে বিদ্যুৎ-গতিতে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গেই বজ্রপাতের মতো একটা বন্দুকের শব্দ হল। গাছের গোটা কয়েক ডাল প্রচণ্ড শক্তিশালী বুলেটের ঘায়ে ভেঙে পড়ল। তারপরই এক জোড়া পায়ের দ্রুত পালানোর শব্দ।

প্রদীপ যখন উঠে বসল তখন খানিকটা হতভম্ব হয়ে চারদিক দেখল সে। কেউ তাকে মারার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু খুবই সামান্যর জন্য সে বেঁচে গেছে।

উঠে গায়ের ধুলোটুলো ঝেড়ে চারদিকটা দেখল সে। কে তাকে মারতে চায়? কেনই বা?

বন্দুকের শব্দ শুনে কেউ ছুটে আসেনি। তার কারণ আশপাশে অনেকেই শিকারে বেরিয়েছে। বন্দুকের শব্দ হচ্ছেও আশপাশে।

সারাদিনটা খুব অন্যমনস্কতার মধ্যে কেটে গেল প্রদীপের। ঘটনাটার কথা সে কারও কাছে প্রকাশ করল না। রাতে বাড়ি ফিরে সে টেলিফোনটার দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, টেলিফোনে এই দিনটার পূর্বাভাস দেওয়া হচ্ছিল তাকে। কিন্তু কেন? কে দিচ্ছিল?

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ টেলিফোন বেজে উঠল। সভয়ে টেলিফোন ধরল প্রদীপ।

“হ্যালো।”

ওপাশ থেকে একটি ভরাট গলা তার নম্বরটা উচ্চারণ করে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, “এই নম্বর তো!”

“হ্যা! আপনি কে?”

“আমি কুরুন্নু। আপনি কে?”

“প্রদীপ রায়।”

“ওঃ হ্যাঁ। আমি আপনার নাম জানি। দিল্লিতে ছিলেন। শুনুন, জরুরি একটা কথা আছে। সরখেরিয়ার এক কোটি চব্বিশ লাখ টাকার একটা বিল আছে। আপনি কি সেটা পাস করে দিয়েছেন?”

“না। বিলটা একটু ইররেগুলার। ক্ল্যারিফাই করার জন্য ডিপার্টমেন্টকে বলেছি।”

“খুব ভাল। ওই বিলটা একদম জালি। কিন্তু বিলটা আটকালে আপনার বিপদ হতে পারে। সরখেরিয়া বিপজ্জনক লোক।”

“বোধ হয় আপনি ঠিকই বলেছেন। আজ কেউ আমাকে খুন করার চেষ্টা করেছিল।”

“হ্যাঁ, এরকম ঘটনা আরও ঘটতে পারে। কিন্তু ভয় পাবেন না, টেলিফোনটার দিকে মনোযোগী থাকবেন।” এইবার প্রদীপ চমকে উঠে বলে, “হ্যাঁ, টেলিফোনেও একটা অদ্ভুত কাণ্ড হচ্ছে…”

কুরুপ্পু স্নিগ্ধ গলায় বললেন, “জানি মিস্টার রায়, ভূত মাত্রই কিন্তু খারাপ নয়। অন্তত ওই ফ্ল্যাটটায় যে থাকে সে খুবই বন্ধু-ভূত। তাকে অবহেলা বা উপেক্ষা করবেন না, ভয়ও পাবেন না। তা হলেই নিরাপদে থাকতে পারবেন। বিপদের আগেই সে সাবধান করে দেবে। আমাকেও দিত। তার পরামর্শেই আমি রিটায়ার করে ফুলের চাষে মন দিয়েছি। আচ্ছা। গুড নাইট।”

প্রদীপ হাতের স্তব্ধ টেলিফোনটার দিকে হাঁ করে চেয়ে রইল।

# ডবল পশুপতি

**ডবল পশুপতি**

পশুপতিবাবু নিতান্তই ভালমানুষ। তবে দোষের মধ্যে তার মনটা বড় ভুলো। তিনি সর্বদা এতই আনমনা যে, আচমকা যদি কেউ তাঁকে তাঁর নামটা জিজ্ঞেস করে, তা হলেও তিনি চট করে সেটা মনে করতে পারবেন না। একটু ভেবে বলতে হয়। পশুপতিবাবুদের অবস্থা একসময়ে বেশ ভালই ছিল। তার ঠাকুর্দা পুরোনো জিনিস কেনাবেচার কারবার করে খুব পয়সা করেছিলেন। বিশাল দো-মহলা বাড়ি, গাড়ি, জমিজমা, দাসদাসীর অভাব ছিল না। তবে এখন আর তার বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। বাড়িটা আছে, তবে সংস্কার আর মেরামতির অভাবে সেটার অবস্থা বেশ করুণ। বিশাল বাগানটা এখন আগাছায় ভরা। বহু লোক বাড়িটা ভাড়া নিতে চায়, কিনতে চায়।

এই বিশাল বাড়িতে পশুপতিবাবু একা থাকেন। সকালে উঠে তিনি ডন-বৈঠক দেন, কল-ওঠা ভেজা ছোলা আর আদা খান, নিজেই রান্না করেন। একা মানুষ বলে তার বিশেষ টাকা-পয়সার দরকার হয় না। তার একটা ছোট লোহালক্কড়ের দোকান আছে। সামান্য আয় হয়, তবে পশুপতিবাবুর চলে যায়।

দেখতে গেলে পশুপতিবাবু ভালই আছেন। তবে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, এই যে পশুপতিবাবু, নমস্কার। কেমন আছেন? তখন পশুপতিবাবুর ভারি সমস্যা হয়। আসলে কেমন আছেন তা পশুপতিবাবু আকাশ-পাতাল ভেবেও ঠাহর করতে পারেন না। তাই অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে বলেন, বোধহয় ভালই। কিংবা, মন্দ নয়। খারাপও হতে পারে। অবশ্য এই জবাব দিতে পশুপতিবাবুর এত দেরি হয় যে, প্রশ্নকর্তা হয় ততক্ষণে স্থানত্যাগ করেছেন, নয়তো জবাব শোনার ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছেন।

একদিন সকালবেলা পশুপতিবাবু যখন ডনবৈঠক করছেন, ঠিক সেই সময় একটা লোক বাইরে থেকে হেঁড়ে গলায় বোধহয় ডাকতে লাগল, ‘পশুবাবু আছেন নাকি? পশুবাবু?

ব্যায়ামের সময় কেউ বাধা দিলে পশুপতিবাবু ভয়ানক চটে যান। আজও গেলেন। মাঝপথে ব্যায়াম বন্ধ করা যায় না, আবার জবাব না দিলেও অস্বস্তি। তাই প্রাণপণে বুকডন দিতে দিতে, পশুপতিবাবু শুধু হুম্ হু, হুম্ শব্দ করতে লাগলেন।

লোকটা বুদ্ধিমান। দরজার বাইরে থেকে শব্দটা অনুধাবন করে সন্তর্পণে ভিতরে ঢুকল। তারপর ব্যায়ামরত পশুপতিকে দেখে একগাল হেসে বলল, ব্যায়াম করছেন? খুব ভাল। ব্যায়ামের মতো জিনিস হয় না। হজম হয়, খিদে পায়, জোর বাড়ে, গুণ্ডাবদমাশদের ভয় খেতে হয় না। ব্যায়ামের যে কত উপকার।

পশুপতিবাবু ব্যায়াম করতে করতে লোকটাকে একটু দেখে নিলেন। বেশ সেয়ানা চেহারার মাঝবয়সী রোগা একটা লোক। চেনা নয়।

পশুপতিবাবু বুকডন শেষ করে মুগুর ভঁজতে লাগলেন। লোকটা সভয়ে একটু কোণের দিকে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর আপনমনেই বলতে লাগল, ‘লোকে বলে বটে, পশুপতিবাবু লোকটা সুবিধের নয়, মহাকেপ্পন, হাড়বজ্জাত, অহঙ্কারী, দাম্ভিক। আমি বলি, তা সবাই যে সমান হবে এমন কোনও কথা নেই। আর পশুপতিবাবুর খারাপটাই তো শুধু দেখলে হবে না। তার ভাল দিকটাও দেখতে হবে। লোকটা স্বাস্থ্যবান, সাহসী, উদার।

পশুপতিবাবু রাগবেন কি খুশি হবেন তা বুঝতে পারলেন না। তবে হাতের মুগুরদুটো খুব বাঁই-বাঁই করে ঘুরতে লাগল। ব্যায়ামের সময় কথা বলতে নেই।

লোকটা ঘুরন্ত মুগুরদুটোর দিকে সভয়ে চেয়ে থেকে বলল, তা মহেন্দ্র তবু, বলে বসল, ও হে নিতাই, তোমার পুরনো স্বভাবটা আর বদলাল না। তুমি কেবল লোকের ভালটাই দেখে গেলে। কিন্তু দুনিয়াটা যে খারাপ লোকে ভরে গেছে, সেটা আর তোমার চোখে পড়ল না। পশুপতির আবার গুণটা কিসের? বাপ-পিতেমোর অত বড় বাড়িটা ভূতের বাড়ি করে ফেলে রেখেছে। অথচ কত লোক বাড়ি না পেয়ে কত কত কষ্টে এখানে-সেখানে মাথা গোঁজার ঠাঁই খুঁজে বেড়াচ্ছে।

পশুপতিবাবু মুগুর নামিয়ে রাখলেন। হাপরের মতো হাঁফাচ্ছিলেন তিনি। লোকটার দিকে একবার গম্ভীর চোখে তাকানোর চেষ্টা করলেন। কী বলবেন ভেবে পেলেন না। আরও ভাবতে হবে। অনেক ভেবে তবেই তিনি কথা বলতে পারেন।

পশুপতিবাবু মাথাটাকে চাঙ্গা করার জন্য বিছানার ওপর শীর্ষাসন করতে লাগলেন।

লোকটা বলল, আমিও ছেড়ে কথা কইনি। মহেন্দ্রকে আমিও দু'কথা বেশ করে শুনিয়ে দিয়েছি। ওহে মহেন্দ্র, পশুপতিবাবুর বাইরেটাই দেখলি, ভিতরটা দেখলি না। পশুপতিবাবুর কাছে গিয়ে ধানাই-পানাই করলে তো চলবে না। তিনি অল্প কথার মানুষ। দিনরাত লোক গিয়ে তার কাছে ঘ্যানর ঘ্যানর করে মাথা ধরিয়ে দেয়। কাকে ছেড়ে কাকে দেবেন ঠিক করতে পারেন না। তবে এই আমি যদি যাই, তা হলে আমার মুখের দিকে চেয়েই পশুপতিবাবু বুঝতে পেরে যাবেন, এই হচ্ছে খাঁটি লোক। বাড়িতে যদি ভাড়াটে বসাতেই হয় তো একে। কী জানিস মহেন্দ্র, পশুপতিবাবু কথা কম বলেন বটে, কিন্তু মানুষ চেনেন।

পশুপতি ধনুরাসন শেষ করলেন। ময়ূরাসন করতে লাগলেন। এবং লোকটাকে কী বলবেন ভাবতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতে ভুজঙ্গাসনে এসে তিনি ফের উৎকর্ণ হলেন।

লোকটা আপনমনেই হেসে বলছিল, আমি বলি কি, পশুপতিবাবু কি আর আমার প্রস্তাব ফেলতে পারবেন? তিনি তেমন লোকই নন। লোকে তার বাড়িটা কিনতে চায়, ভাড়া নিতে চায়। পশুপতিবাবু তাদের সবাইকে বলেন, ভেবে দেখি। তা ভাবতে পশুপতিবাবুর একটু সময় লাগে বইকি। ভগবান তো আর সবাইকে একরকম মগজ দেননি। তাই মহেন্দ্র যখন বলে বসল, তুমি পারবে না হে নিতাই', তখন আমিও বললুম, ওহে মহেন্দ্র, পশুপতিবাবুর ভাবনাগুলো যদি তোরা ভেবে দিতিস তবে কাজটা কত সহজ হত। পশুপতি ছেলেমানুষ, বুদ্ধিটাও ঘোলাটে, মগজেও কিছু খাটো, ও আর কত ভাববে। আসল কথা হল, পশুপতিকে ভাববার সময় দিতে নেই। তাই আমি আর দেরি করিনি। একেবারে ঠেলাগাড়ি বোঝাই করে মালপত্র আর তিনটে টানা-রিকশায় পুরো ফ্যামিলিকে চাপিয়ে এনে হাজির করেছি। জানি, পশুপতি ফেলতে পারবেন না। আমিও ফিরে যাবার নই, আর ভাড়া? পশুপতিবাবু টাকার কাঙাল নন জানি, তবু আমিই বা অধর্ম করতে যাব কোন দুঃখে? গুনে গুনে পঞ্চাশটা করে টাকা ফেলে দেব মাসে। আর পুরো

বাড়িটাও তো নিচ্ছি না। শুধু দোতলার পূর্ব-দক্ষিণ কোণের চারখানা ঘর আর দরদালানটুকু।

পশুপতির ব্যায়াম যখন শেষ হল, তখনও ভাবা শেষ হয়নি। তিনি লোকটার দিকে করুণ নয়নে চেয়ে রইলেন।

লোকটা তাড়াতাড়ি বলল, না, না, আপনাকে ভাবতে হবে না। মালপত্র ঠেলাওলারাই নামিয়ে ঘরে তুলে দিয়ে যাবে। শুধু চাবিটা কোথায় সেটা কষ্ট করে বললেই হবে। আমার বাচ্চারা বড্ড ধৈর্য হারিয়ে ফেলেছে। গিন্নিও আবার রগচটা মানুষ।

পশুপতি বুঝতে পারলেন, দুনিয়াতে ভালমানুষ হওয়াটা কোনও কাজের কথা নয়। এ-লোকটা তাকে কোনও প্রশ্ন করেনি, মতামতও চায়নি। বরং তার হয়ে নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। পশুপতিবাবু এখন করেন কী?

বাইরে এসে তিনি দেখলেন, বাস্তবিকই তিন-চারটে ঠেলার ওপর থেকে পাহাড়প্রমাণ মালপত্র কুলিরা ধীরেসুস্থে নামাচ্ছে। গোটাপাঁচেক নানা বয়সের বাচ্চা বাগানে নিরুদ্বেগ হুটোহুটি করছে। একজন মোটাসোটা বদরাগী চেহারার ভদ্রমহিলা কুলিদের ধমকাচ্ছেন, তিনি পশুপতিকে দেখে চোখ পাকিয়ে বললেন, ‘ঘরদোর সব পরিষ্কার আছে তো! আর জল টল তুলে রেখেছেন তো কলঘরে?

এর কী জবাব দেওয়া যায় পশুপতিবাবু তা ভাবতে শুরু করলেন।

ভাবতে ভাবতেই দেখলেন, তার চোখের সামনে দিয়ে মালপত্র ওপরে উঠতে লাগল। দুমদাম শব্দ, চেঁচামেচি, হই হট্টগোল।

পশুপতি সভয়ে নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলেন। রান্নাবান্না মাথায় উঠল। তিনি তাড়াতাড়ি পোশাক পরে দোকানে রওনা হয়ে গেলেন। ঘটনার আকস্মিকতায় এত হতবুদ্ধি হয়ে গেছেন যে, মাথাটা আর ভাবতে পারছে না কিছু।

সন্ধ্যেবেলা যখন পশুপতি বাড়ি ফিরে এলেন, তখন গোটা বাড়িটাই প্রায় নিতাইয়ের দখলে। একতলায় বারান্দায় শতরঞ্চি পেতে বন্ধুবান্ধব জুটিয়ে সে তাসের আসর বসিয়েছে। দোতলায় কে যেন গলা সাধছে। গোটাপাঁচেক বাচ্চা চেঁচিয়ে পড়া করছে।

পশুপতিবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, দিন-সাতেক আগেও একজন বাড়িটা দশ লাখ টাকায় কিনতে চেয়েছিল। আর দুজন লোক ভাড়া নিতে চেয়েছিল মাসে দু'হাজার টাকায়। পশুপতিবাবু ভাববার জন্য সময় চেয়েছিলেন।

তাকে দেখে নিতাই তাসের আসর থেকে একেবারে আপনজনের মতো চেঁচিয়ে উঠল, পশুপতি, এসে গেছ! বাঃ, আমি তো তোমার জন্য ভেবে মরছিলুম। পশুপতি তো ফিরতে এত রাত করে না। তা হয়েছিল কী জানো, চায়ের চিনি আর দুধ ছিল না। তা আমি গিন্নিকে বললুম, সে কী কথা, দুধ চিনি নেই তো কী হয়েছে? আমার পশুপতিভায়ার ঘরেই তো রয়েছে। সে তো আর আমার পর নয়। তাই দরজাটা খুলতে হয়েছিল ভায়া, কিন্তু কিছু মনে কোরো না।'

পশুপতি ঘরে তালা দিয়ে গিয়েছিলেন। দেখলেন, তালা ভাঙা। ঘর হাঁহ করছে, খোলা। এর জন্য কী বলা যায় তা পশুপতি শত ভেবেও ঠিক করতে পারলেন না। অন্ধকার ঘরে বসে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলেন। ওপরে ধুপধাপ শব্দ, কান্না, চিৎকার, ঝগড়া, বাসন ফেলার আওয়াজ, সবই তার কানে গরম সিসে ঢেলে দিচ্ছিল। ভারি শান্তিতে ছিলেন এতদিন। এবার না নিজের ভিটে থেকে বাস তুলতে হয়।

একটু বাদেই নিতাইয়ের বড় মেয়ে হলুদ আর নুন চাইতে এল। তারপর মেজো ছেলে এসে দেশলাই ধার নিয়ে গেল। রাত দশটা নাগাদ নিতাই এসে দশটা টাকা ধার চাইল, মাসের শেষেই দেবে।

পশুপতিবাবু কষে ভাবতে লাগলেন। ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হয়ে, না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন।

মাঝরাতে দরজায় ঘা পড়ল। পশুপতি উঠে দরজা খুলে দেখল, ভারি অভিমানী মুখ করে নিতাই দাঁড়িয়ে।

কাজটা কি ঠিক করলে পশুপতি-ভায়া?

পশুপতি অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, কোন্ কাজের কথা হচ্ছে। নিতাই মাথা নেড়ে বলল, ভাড়া না হয় আরও দশ টাকা বাড়িয়েই দিচ্ছি। তা কথাটা তো মুখে বললেই পারতে। বাথরুমের দরজার আড়ালে ঘাপটি মেরে থেকে লাথি মারার কোনও দরকার ছিল কি? কাজটা কি ঠিক হল হে পশুপতি?

পশুপতি খুব ভাবছিলেন, কিন্তু কিছু বুঝে উঠতে পারছিলেন না।

নিতাই দুঃখের সঙ্গে বলল, আর খুব আস্তেও মারোনি। আমার কাকালে বেশ লেগেছে। যা হোক, ওই ষাটই দেব, মনে রাগ পুষে রেখো না ভাই।

পশুপতিবাবু কী বলা উচিত ভাবতে লাগলেন। নিতাই চলে গেল।

পশুপতিবাবু যখন ডনবৈঠক করছিলেন, এই সময়ে হঠাৎ নিতাইয়ের বউ একটা খুন্তি হাতে দরজায় এসে দাঁড়াল।

বলি পশুপতিবাবু, আপনার আক্কেলখানা কী বলুন তো! ঢের-ঢের বাড়িওয়ালা দেখেছি বাপু, আপনার মতো তো দেখিনি? কোন্ আক্কেলে আপনি আমগাছে উঠে রান্নাঘরে ঢিল ছুঁড়ছিলেন? তাও ছোটখাটো ঢিল নয়, অত বড় বড় পাথর। তার দু'খানা আমার ভাতের হাঁড়িতে পড়ে গরম ফ্যান চলকে আমার হাতে ফোঁসকা ধরিয়েছে। চারখানা কাঁচের গেলাস ভেঙেছে। একটা চেলা পড়েছে ডালের বাটিতে। বলি এসব কী হচ্ছে? আপনি কি পাগল না পাজি?

পশুপতি একবারও সদুত্তর দিতে পারলেন না, তবে ভাবতে লাগলেন।

নিতাইয়ের বউ চোখ পাকিয়ে বলল, আমিও দুর্গা-দারোগার মেয়ে। এই বলে দিলুম, ফের ঢিল মারলে আমিও দেখে নেব।

পশুপতি শুকনো মুখে কাজে বেরোলেন। রান্নাবান্না আর করলেন না। হোটেলেই খেয়ে নেবেন দুপুরবেলাটায়।

সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরতেই দেখেন, নিতাইয়ের তাসের আড্ডা নেই। নিতাই একা শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে আছে।

পশুপতি কাছে যেতেই নিতাই কাঁদো-কাঁদো মুখে বলল, গায়ের জোর থাকলেই কি গুণ্ডামি করতে হবে ভাই?

পশুপতি ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন।

নিতাই বলল, না হয় তাসের আড্ডায় একটু গোলমাল হয়েইছিল। তাস নিয়ে বসলে ওরকম হয়, তা বলে লাঠিসোটা নিয়ে ভদ্দরলোকের ছেলেদের ওপর

চড়াও হওয়াটা কি ঠিক? তাস খেলা তুমি যে পছন্দ করো না, এটা আমাকে বলে দিলেই তো হত।

পশুপতি মাথা চুলকোতে লাগলেন।

নিতাই ধরা ধলায় বলল, আমি অফিস থেকে এসে শুনি, তাঁসুড়েরা সব বসে ছিল আসর জমিয়ে আর হঠাৎ নাকি তুমি একেবারে প্রলয় নাচন লাগিয়ে দেওয়ায়, তারা সব পিঠ বাঁচাতে সরে পড়ে। আর তা ছাড়া শিবুর কান ওভাবে মলাও তোমার ঠিক হয়নি। আমার সেজো ছেলে দুষ্টু ঠিকই, কিন্তু সেও তোমার ছেলের মতই ভাই, কানটা শুধু ছিঁড়ে নিতে বাকি রেখেছো, ক্যানেস্তারা বাজানো তুমি যে পছন্দ করো

তা তো আর বেচারা জানত না। পশুপতি খুবই অবাক হলেন এবং ভাবতে লাগলেন।

একটু রাতের দিকে পশুপতি রান্না করতে বসে হঠাৎ শুনতে পেলেন, ওপরে একটা তুমুল চেঁচামেচি আর দৌড়ঝাঁপ হচ্ছে। কে একজন চেঁচাল, বাবা রে, মেরে ফেললে। আর একজন বলে উঠল, এসব ঠিক কাজ হচ্ছে? আর একজন, ও কী, পড়ে যাব যে খাট থেকে! আর একজন, আমার বিনুনিটা যে কেটে দিল, ও মা! সিঁড়ি দিয়ে কে যেন দৌড়ে নামতে নামতে বলল, ছেড়ে দাও ভাই, মাপ করে দাও ভাই, ঘাট হয়েছে। কালই সকালবেলায় তোমার বাড়ি ছেড়ে চলে যাব আর জীবনে এ মুখো হব না।

পশুপতি ভাবতে ভাবতেই খেলেন, ঘুমোলেন।

সকালবেলা উঠে দেখলেন, বাড়ি ফাঁকা, নিতাই কাকভোরেই বাড়ি ছেড়ে সপরিবারে চলে গেছে। পশুপতি অনেকক্ষণ ভাবলেন। ভেবে যদিও তিনি কোনও কূলকিনারা করতে পারছিলেন না, তবু ব্যায়াম করতে করতে তিনি মাঝে মাঝে ফিক ফিক করে হেসে ফেলছিলেন।

# টেঁকুর

## টেঁকুর

প্রায় চৌদ্দ পুরুষের বসতবাড়িটা দারুব্রহ্মবাবুকে বিক্রি করে দিতে হচ্ছে। বাড়ি না বলে প্রাসাদ বলাই ভাল। একে তো এত বড় বাড়ি কেনার খদ্দের নেই, তার ওপর যদি বা খদ্দের জোটে তারা ভাল দাম দিতে চায় না। বলে, এই অজ পাড়াগাঁয়ে ও বাড়ি কিনে হবেটা কী? কথাটা সত্যি। তবে বহুকাল আগে এ গ্রাম ছিল পুরোদস্তুর একখানা শহর। এই বাড়িতে দারুব্রহ্মের যে ঊর্ধ্বতন চতুর্দশ পুরুষ বাস করতেন তিনিই ছিলেন এই অঞ্চলের রাজা। তখনকার আস্তাবল, দ্বাদশ শিবের মন্দির, পদ্মদিঘি, দেওয়ান ই আম, দেওয়ান ই খাস, নহবতখানা, শিশমহল সবই এখনো ভগ্নদশায় আছে। ফটকের দুধারে মরচে পড়া দু'দুটো কামানও। এতদিনে খদ্দের পাওয়া গেছে।

দারুব্রহ্মের অবস্থা খুবই খারাপ। এবেলা ভাত জুটলে ওবেলা খুদও জুটতে চায় না। নিজে বিয়ে করেনি। বাপের একমাত্র সন্তান। বাপ গত হয়েছেন, সুতরাং বুড়ি মা আর তার দুমুঠো জুটে যাওয়ার কথা, কিন্তু বংশের নিয়ম মানতে হয় বলে এক পাল অপোগণ্ড নিষ্কর্মা আত্মীয় স্বজনকে ঠাঁই দিতে হয়েছে। তারা দিন-রাত চেঁচামেচি করে মাথা ধরিয়ে দেয়। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সেই দারুব্রহ্মের চুল পাকতে লেগেছে, আশা ভরসা গেছে। বুড়ি-মা বিয়ের জন্য মেয়ে দেখে রেখেছেন। কিন্তু মেয়ের বাপ এই হাড়-হাভাতের হাতে মেয়ে দিতে রাজি নন। অপমানটা খুব লেগেছে দারুব্রহ্মের। বাড়ি কেনার খদ্দের জুটে যাওয়ায় খানিকটা নিশ্চিন্ত। হাজার পঞ্চাশেক টাকা পেলে মায়ে পোয়ে কাশীবাসী হবে, ঠিক করেই রেখেছে।

শেষবার চৌদ্দ পুরুষের বসতবাড়িটা ঘুরে-ঘুরে দেখছিল দারুব্রহ্ম। উধ্বর্তন ষষ্ঠ পুরুষ সত্যব্রহ্ম ছিলেন দারুণ মেজাজি। একটা মশা সেবার তার নাকে হুল ফোঁটানোয় রেগে গিয়ে তিনি মশা মারতে কামান দাগার হুকুম দেন। কিন্তু

তোপদার এসে খবর দিল, কামানের মশলা নেই। সত্যব্রহ্ম তখন বলেন, কুছ পরোয়া নেই। বন্দুক আনো। শোনা যায়, কম-সেকম শতখানেক গুলি চালানোর পর মশাটা বাস্তবিকই মরেছিল। এখনো দরবার ঘরের দেয়ালে সেইসব গুলির জখম রয়েছে। দারুব্রহ্ম সেগুলোর ওপর হাত বুলিয়ে একটা দুটো তিনটে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ফেলল।

উধ্বর্তন নবম পুরুষ পূর্ণব্রহ্মের খুব শিকারের শখ ছিল। তাই বলে জঙ্গলে-টঙ্গলে গিয়ে ঘোড়ার পিঠে বা মাচানে বসে শিকার করতেন না। খুব আমুদে অলস লোক। দোতলা থেকে নীচে নামতে হলেই গায়ে জ্বর আসত। তিনি দোতলায় একটা আলাদা ছাদ তৈরি করে মাটি ফেলে জঙ্গল বানিয়ে নিয়েছিলেন। সেখানে আগে থেকে শিখিয়ে পড়িয়ে রাখা শেকলে-বাঁধা বাঘ থাকত। তিনি জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে বাঘের দেখা পেলেই গুলি করতেন। আর বাঘটাও লুটিয়ে পড়ত। অবশ্য সবাই জানত বন্দুকে ভরা গুলিটা আসলে কঁকা গুলি। আর বাঘটা ছিল পোষা। সেই এক বাঘই কত বাঘের মরণ মরেছে। দোতলায় উঠে দারুব্রহ্ম সেই জঙ্গলের ধ্বংসাবশেষের দিকে চেয়ে থাকে। দীর্ঘশ্বাসের ঝড় বইতে থাকে।

ঊর্ধ্বতন তৃতীয় পুরুষ কৃষ্ণব্রহ্ম ছিলেন পালোয়ান। দুহাতে দু'মন ওজনের দুটো মুগুর ঘুরিয়ে রোজ দুবেলা ব্যায়াম করতেন। সেই মুগুর দুটো দোতলার সিঁড়ির মুখেই রাখা। দারুব্রহ্ম মায়াভরে সে দুটোকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে চোখ বুজে রইল কিছুক্ষণ।

তিনতলার সব ঘর বহুকাল হল তালাবন্ধ। ছাদ ফেটেছে, জানালার শিক আছে তো পাল্লা নেই। পাল্লা থাকলে শিক নেই। বাদুড় চামচিকের বাসা। যত রাজ্যের পুরনো জিনিসের আবর্জনা উঁই করে রাখা। শেষবারের মতো সবকিছু দেখে নেওয়ার জন্য দারুব্রহ্ম তালা খুলে ঢুকে পড়ল। কাঠের সিন্দুক দেয়াল আলমারি, ভাঙা ঝাড়লণ্ঠন, পুরনো নাগরা, ভাঙা খাট, কত কী চারদিকে ছড়ানো।

কাঠের সিন্দুক খুলে এটা-সেটা নাড়াচাড়া করছিল দারুব্রহ্ম আর এটা সেটা ভাবছিল। এমন সময় হাত ফসকে কী একটা যেন মেঝেয় পড়ে গেল। একটু চমকে উঠল দারুব্রহ্ম। চমকাবারই কথা। জিনিসটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই একটা ঝলকানি আর সেই সঙ্গে খানিক ধোঁয়া বেরোলো। দারুব্রহ্ম জিনিসটা কুড়িয়ে নিতে গিয়ে দেখে, সেটা একটা প্রদীপ। প্রদীপটা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে ভাবছে, চোখে পড়ল ধোঁয়ার কুণ্ডলীটা সামনেই পাকিয়ে পাকিয়ে একটা লম্বা রোগা সুটকো লোকের চেহারা নিচ্ছে।

"কে রে?" দারুব্রহ্ম চেঁচিয়ে ওঠে।

লোকটা গোটা চারেক হাই তুলে তুড়ি দিয়ে বলল, "আমি? আমি হচ্ছি প্রদীপের দৈত্য।"

দারুব্রহ্ম হাঁ। ব্যাটা বলে কী? সে বলল, "ইয়ার্কির জায়গা পাওনি? দিনে-দুপুরে ব্যাটা চুরির মতলবে বাড়িতে ঢুকে বসে আছ।"

লোকটা ভয় খেয়ে বলে, "সত্যি না। অনেককাল কেউ ডাকাডাকি করেনি বলে বেশ হাজার দেড়েক বছর একটানা ঘুমিয়ে এই উঠলাম। চুরি-টুরি কিছু হয়ে থাকলে আমি কিন্তু জানি না।"

দারুব্রহ্ম সাহসী বংশের লোক। সহজে ভয় খায় না। তবে সে বুঝল, লোকটা গুল দিচ্ছে না। প্রদীপটাও আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ হতে পারে। তার বংশের অনেকেরই নানা বিদঘুঁটে জিনিস সংগ্রহের বাতিক ছিল। সে বলল, "বটে? তা তোর কাজটা কী?"

আবার গোটা কয়েক হাই তুলে বিশুদ্ধ বাংলাতেই লোকটা বিরস মুখে বলল, "আমার আবার কাজ কী? দেড় হাজার বছর পরে ঝুটমুট কঁচা ঘুমটা ভাঙালেন, এখন যা করতে বলবেন তাই করতে হবে। কিন্তু আগে থেকেই বলে রাখছি, প্রথমেই শক্ত কাজ দেবেন না, আমার এখনো ঘুমের রেশ কাটেনি। গা ম্যাজ ম্যাজ করছে।"

দারুব্রহ্ম বুঝল, এ ব্যাটা আলাদীনের সেই দৈত্যই বটে, তবে ফাঁকি মারার তাল করছে। সে বলল, "বাপু হে, অত রোয়াব দেখালে কি চলে? বরাবর অনেক বড়-বড় কাজ করে এসেছ, সব খবর রাখি। এখন পিছোলে চলবে কেন?"

লোকটা ব্যাজার হয়ে বলে, "সে করেছি, কিন্তু বহুকাল অভ্যাস নেই কিনা। তাছাড়া ঘুমোলে হবে কী, খাওয়া তো আর জোটেনি। দেড় হাজার বছর টানা উপোস। শরীরটা দেখুন না কেমন শুকিয়ে গেছে। আগে বরং কিছু খাবার-দাবার দিন।"

"তারপর?"

"তারপর যা বলবেন একটু-আধটু করে দেব।"

দারুব্রহ্ম লোক খারাপ নয়। দৈত্যটার সুড়ঙ্গে চেহারা দেখে তার কষ্টও হল। বলল, "চলো, দেখি মুড়িটুড়ি কিছু পাওয়া যায় কিনা।" বলে লোকটাকে সঙ্গে নিয়ে নীচে নামল দারুব্রহ্ম। বাড়ির কেউই লোকটাকে দেখে তেমন গা করল না। গা করার মতো কিছু নেই। দারুব্রহ্ম তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে ধামা ভরে মুড়ি আর বাতাসা খাওয়াল। সব শেষে দেড় ঘটি জল খেয়ে লোকটা বলল, "এ যা খাওয়ালেন এতে তো একটা সেঁকুরও উঠবে না। যাকগে, ওবেলা কী রান্না হবে?"

দারুব্রহ্ম একটা শাস ফেলে বলল, "একদিন এ বাড়ির অতিথিরা মাংস-পোলাও খেয়ে একটা করে মোহর দক্ষিণা নিয়ে যেত। সেদিন তো আর নেই। ওবেলা যদি হাঁড়ি চড়ে তবে দুটো ডাল-ভাত জুটতে পারে।"

লোকটা মন খারাপ করে বলল, "ডাল-ভাত। ছোঃ।"

দারুব্রহ্ম হেসে ফেলে বলল, "তুমি দেখি উলটো কথা বলতে লেগেছ। প্রদীপের দৈত্যই কোথায় খাবার-দাবার জোগাড় করে আনবে, তা তুমিই উলটে চাইতে লাগলে।"

লোকটা জবাব দিল না। ধোঁয়া হয়ে প্রদীপের মধ্যে মিলিয়ে গেল। রাত্রে সকলের খাওয়া হয়ে গেলে দারুব্রহ্ম প্রদীপটা ঠুকে আবার দৈত্যটাকে জাগায়। দৈত্যটা চারজনের খোরাক একা খেয়ে গম্ভীর হয়ে বলল, "আমার খোরাকটা একটু বেশিই। তা ভরপেট না হলেও ক্ষতি নেই কিন্তু একটা চেঁকুর তো উঠবে। এতে তো একটা সেঁকুরও উঠল না।" একটা হাই তুলে "যাই ঘুমোই গিয়ে বলে দৈত্যটা আবার প্রদীপের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল।

পরদিন দেখা গেল, দৈত্যকে একবেলা খাওয়াতে গিয়েই চালের ডোল ফাঁকা হয়ে গেছে। দারুব্রহ্ম ভাবল, আহা বেচারা। কতকাল খায়নি। একদিন তো ব্যাটার কাছ থেকে সুদে-আসলে সবই উশুল করব, কদিন বরং পেট ভরে খাক।

দারুব্রহ্ম পুরোনো সব দলিল-দস্তাবেজ বের করে খুঁজতে-খুঁজতে সন্ধান পেল, চৌমারির চরে তাদের কিছু জমি বহুকাল ধরে আছে, কিন্তু খাজনা বা ফসল আদায় হয়নি। একটা তেলকলের অংশীদারিরও সন্ধান পেল। খুঁজে পেতে দেখল, পুরো একটা তহসিলের খবরও সে এতকাল রাখত না। ছেঁড়া ছাতা মাথায় দিয়ে বেরিয়ে পড়ল দারুব্রহ্ম। দাগ-নম্বর ধরে-ধরে খুঁজে-পেতে জমির সন্ধান পেল। প্রজারা তাকে দেখে প্রথমে একটু বেগড়বাঁই করলেও স্বীকার করল যে বহুকাল

তারা খাজনা বা ফসল দেয়নি। বাবা-বাছা বলে তুতিয়ে-পাতিয়ে তাদের কাছ থেকে দারুব্রহ্ম কিছু আদায় করার চেষ্টা করছিল। এমন সময় মোড়ল চোখ মুছতে-মুছতে এসে বলল, “জমির মালিককে বঞ্চিত করেছি বলেই আমাদের ঘরে লক্ষ্মী নেই। আপনি যান। আমরা নিজে থেকেই পৌঁছে দেব যা দেওয়ার।”

দারুব্রহ্ম তেলকলে গিয়ে দেখল সেটা বেশ রমরম করে চলছে। দারুব্রহ্ম কাগজপত্র বের করে দাবি-দাওয়া জানাতেই তেলকলের মালিক মুছা গেল। জেগে উঠে বলল, “দলিলে দেখছি আপনি দশ আনার মালিক। তবে আমার থাকবে কী?” যাকগে, এসব তো জানা ছিল না। কবেকার কথা সব। এখন একটা বন্দোবস্ত করা যাবে। আপনি যান।”

তহসিলটাও দারুব্রহ্মকে হতাশ করল না। প্রজারা বলল, আমরা কি জানি ছাই যে, এ-জমিরও মালিক আছে। তবে আমরা নিমকহারাম নই, বঞ্চিত করব না।

দিন দুই বাদে দারুব্রহ্ম বাড়িতে ফিরে দেখে চারটে গরুর গাড়ি বোঝাই ধান, দু কলসি কাঁচা টাকা আর আনাজপাতি, তেল মশলা সব এসেছে। সেদিন দারুব্রহ্ম বাড়তি দশজনের রান্না রাঁধিয়ে প্রদীপ ঠুকে দৈত্যকে বের করে বলল, “খাও বাপু, পেট ভরে খাও। এ-বাড়িতে অতিথির সেঁকুর ওঠে না, এ-কথা শুনলে আমার পূর্বপুরুষরা স্বর্গ থেকে অভিশাপ দেবে।”

কিন্তু উঠল কই? দশজনের ভাত সাবাড় করে দৈত্য করুণ মুখে বলল, “বটে?”

দারুব্রহ্ম হাঁ হয়ে গেল।

রাত্রিবেলা বিশজনের খোরাক শেষ করেও কিন্তু দৈত্য ঢেঁকুর তুলল না। সাতদিনে চার গরুর গাড়ির চাল শেষ। বাড়িসুদ্ধ লোক জেনে গেছে যে, এত খেয়েও দৈত্যটার ঢেঁকুর উঠছে না। তারা রোজ দুবেলা এসে খাওয়ার সময় দৈত্যকে ঘিরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করে, কবে কখন ঢেঁকুর ওঠে। কিন্তু উঠল না! কিন্তু ঢেঁকুর না উঠলেও পাহাড়-প্রমাণ খাওয়ার ফলে কদিনের মধ্যেই সুড়ঙ্গে দৈত্যটার চেহারা পুরোপুরি ঘটোৎকচের মতো হয়ে উঠল। মুগুরের মতো হাত, পাটাতনের মতো বুক, মুলোর মতো দাঁত, তালগাছের মতো লম্বা।

দারুব্রহ্মেরও জেদ চেপেছে। তাদের এত বড় রাজবংশে একটা পুঁচকে দৈত্য এসে খেয়ে ঢেঁকুর তুলছে না–এ কেমন কথা! এ বাড়িতে ভোজ খেয়ে লোকে পাক্কা

দেড়দিন মেঝেয় পড়ে থাকত। দুচারজন ভোজ খেয়ে গঙ্গাযাত্রায় পর্যন্ত গেছে। সেই বাড়ির এই অপমান?

দারুব্রহ্ম নাওয়া-খাওয়া ভুলে আদায় উশুল করতে লাগল । তেলকলের ভার নিজে নিল। আরও সব নতুন নতুন কারবার খুলতে লাগল। গাড়ি গাড়ি চাল আসছে বাড়িতে, বস্তা-বস্তা আনাজ, ঘি, দুধ, দৈ। এ সবই একদিন দৈত্যের ওপর দিয়ে উশুল হবে। আগে ব্যাটা ঢেঁকুরটা তো তুলুক।

এর মধ্যেই একদিন বাড়ির খদ্দের এসে হানা দিয়েছিল। তখন দুপুরবেলা, দারুব্রহ্ম প্রদীপ ঠুকে দৈত্যকে মাত্র খেতে ডেকেছে। দৃশ্যটা দেখে খদ্দের চেয়ারশুদ্ধ উলটে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। তারপর থেকে আর আসেনি। কিন্তু বাড়ি বিক্রি এখন মাথায় উঠেছে দারুব্রহ্মের। বিক্রির মানেও হয় না। আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপটা যখন হাতে পেয়েছে তখন আর অভাবও থাকবে না। খামোখা পূর্বপুরুষের ভিটে বিক্রি করবে কেন? সে তাই মিস্ত্রি ডেকে বাড়িটা মেরামত করাতে লাগল। সব খরচই উশুল হবে।

মৌরসি পাট্টায় আরও কিছু জমি নিল দারুব্রহ্ম। চাষবাস বাড়িয়ে ফেলল। কারবারগুলোও বেশ ফেঁপে-ফুলে চলছে। গোশালায় গরু, আস্তাবলে ঘোড়া, বাড়ির সামনে জুড়িগাড়ি। শুকনো বাগানে আবার গাছ লাগানো হল, তাতে ফুল ফুটল। বাড়িটা কলি ফেরানোর পর আবার ঝলমল করতে লাগল! এর মধ্যেই দারুব্রহ্মের জন্য যে মেয়েটি দেখা হয়েছিল তার বাবা এসে হাতজোড় করে বলল, “আমার মেয়েটি নিলে ধন্য হই।” তা তিনি হলেনও। নহবতখানায় সানাই বাজল, দারুব্রহ্ম বিয়ে করে এসে বিরাট ভোজ দিয়ে সাত গাঁয়ের লোককে খাওয়াল।

কিন্তু সাত গাঁয়ের লোকের মতো খাবার একা খেয়েও ব্যাটা দৈত্যটা কিন্তু সেঁকুর তুলল না। তবে বলল, ‘খিদেটা এবারে একটু কমেছে। পেটের জ্বলুনিটা তেমন নেই।” বলে ফের ঘুমোতে চলে গেল। নতুন বউয়ের সামনে এই অপমানে কান লাল হয়ে উঠল দারুব্রহ্মের বলতে নেই সে এখন লাখোপতি। একটা দৈত্যের পেট ভরাতে পারবে না? পরদিন থেকে সে কাজকর্ম দ্বিগুণ করে দিল।

মাসখানেক বাদে সে একশো গাঁয়ের লোকের অয়োজন করে দৈত্যটাকে ডাকল। খুবই লজ্জার সঙ্গে প্রকাণ্ড চেহারার বিকট দৈত্যটা এসে বসল আসনে। আচমন করে একটু ভাত মেখে মুখে দিয়েছে কি দেয়নি অমনি একটা বাজ পড়ার আওয়াজে আঁতকে উঠল সবাই। ঘড় ঘড়াত। ঘড় ঘড়াত। ঘড় ঘড়াত। পরপর

তিনবার। অমনি চারদিকে হৈ হুল্লোড় ঠেলাঠেলি পড়ে গেল। বাচ্চারা হাততালি দিয়ে নাচতে লাগল। তুলেছে। তুলেছে। দৈত্য ঢেঁকুর তুলেছে।

মাথা নীচু করে দৈত্যটা উঠে পড়ল। আঁচিয়ে যখন প্রদীপের মধ্যে ঢুকতে যাবে তখনই গিয়ে দারুব্রহ্ম তাকে ধরল, "এই যে বাপু। এই দিনটারই অপেক্ষা করছিলাম। সেঁকুর তো তুললে, এবার তো কাজকর্ম কিছু করতে হয়।"

দৈত্যটা অবাক হয়ে চেয়ে বলল, "আপনি হুকুম করলে সবই করতে হবে মালিক। কিন্তু কাজটা আর বাকি রেখেছেন কী? লোকে আমাকে পেলেই গাড়ি চায়, বাড়ি চায়, ধনদৌলত চায়। আমি দিইও। কিন্তু আপনার যা দেখছি, এর ওপরেও আমাকে কিছু করতে হবে নাকি?"

দারুব্রহ্ম কথাটা আগে ভেবে দেখেনি। এখন দেখল। বাস্তবিকই তার যা আছে তার ওপর আরও কিছু চাওয়ার মানেও হয় না। সে মাথা চুলকে বলল "তা বটে। তবে কিনা–"

দৈত্যটা করুণ মুখ করে বলল, "যে-বাড়িতে খেয়ে আমার ঢেঁকুর ওঠে, বুঝতে হবে সে-বাড়ির ত্রিসীমানায় কোনো অভাব নেই। ঝুটমুট আমাকে আর খাটাবেন কেন? দেড় হাজার বছরের ঘুমটা আর কয়েক হাজার বছর চালাতে দিন। শরীরটা বড় ম্যাজ-ম্যাজ করছে।"

দারুব্রহ্ম একটা শ্বাস ফেলে বলল, "তাই হোক।"

দৈত্যটা প্রদীপের মধ্যে মিলিয়ে গেল। দারুব্রহ্ম সেটাকে আবার সাবধানে কাঠের সিন্দুকে ভরে রাখল।

# তাহলে

**তাহলে**

গোয়েন্দা বরদাচরণ ভাগনে কঞ্চির ঘাড়ে ভর দিয়ে প্রকাণ্ড আলমারিটার মাথা থেকে স্কুল আর ধুলো মেখে এবং কাঁধে একটা টিকটিকি সমেত নীচে নেমে এসে গম্ভীর মুখে বললেন, ‘হুঁ’। বরদাচরণের ‘হুঁ’ শুনে গরীব জমিদার বজ্রকুণ্ডল আশার আলো দেখে আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কোনো ক্লু পেলে বাবা?’ বরদাচরণ বেশি কথার মানুষ নন। হামাগুড়ি দিয়ে মস্ত একটা খাটের নীচে ঢুকে বিস্তর কলসী, হাঁড়ি, বাক্স পোঁটলার ভিড়ে টর্চ ফোকাস করে আবার গম্ভীর গলায় বললেন, ‘হুঁ’। ঠাকুর্দার আমলের দামি সোনার ঘড়িটা যে পাওয়া যাবে এমন আশা বজ্রকুণ্ডলের নেই। পাড়ার গোয়েন্দা বরদাচরণকে পঞ্চাশ টাকা ফি কবুল করে ডেকে এনেছেন নিতান্তই নিজের মনকে প্রবোধ দিতে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, জমিদারির সবই তো গেছে, এখন যে দু একটা দামি জিনিস ছিল তাও একে একে যাচ্ছে। দেখ খুঁজে, যদি পাও তবে সে তোমারই ভাগ্যে।

খাটের তলা থেকে বরদাচরণের কোনো সাড়া শব্দ এল না। কাজের সময় বরদাচরণ কখনো অন্যমনস্ক হন না। তার ওপর মক্কেলদের বিশ্বাস না থাক, কিন্তু তার আচার আচরণে শ্রদ্ধা না জেগে পারে না। তার কোনো কিছুই সাধারণ নয়। যেমন, তিনি কখনো নিজের বাড়ি বা অন্য কারো বাড়িতে সদর দরজা দিয়ে ঢোকেন না। গোয়েন্দাদের নাকি ঢুকতে নেই। তাই সর্বদাই তাকে পাঁচিল টপকাতে হয়, ঝোঁপঝাড় ভাঙতে হয়, পাইপ বেয়ে ছাদে উঠতে হয়। তার তদন্তের পদ্ধতিও আলাদা। চোর বাড়ির উত্তর দিক দিয়ে ঢুকেছিল শুনলে তিনি তদন্ত শুরু করেন দক্ষিণ ধারে।

যাই হোক আজ নিয়ে দুদিন বজ্রকুণ্ডলের বিশাল পুরোনো ভাঙা বাড়িটায় তিনি তদন্ত চালাচ্ছেন। এ যাবৎ অন্তত পঞ্চাশটা আলমারির মাথায় উঠেছেন,

কুড়িখানা খাটের তলায় ঢুকেছেন, সব মিলিয়ে কম সে কম পঁচিশখানা ঘরের সবগুলিই খোঁজা শেষ করে ফেলেছেন। ঘড়ির হদিশ পাননি। আধ ঘণ্টা বাদে আরো ঝুল, আরো ধুলো এবং পকেটে একটা নেংটি ইঁদুরের বাচ্চা সমেত বেরিয়ে এসে বরদাচরণ আবার বললেন, ‘হুঁ। কাল থেকে অন্তত একশ বার বজ্রকুণ্ডল ঐ ‘হুঁ’ শুনেছেন এবং প্রতিবারই আশার আলো দেখেছেন। এবারও দেখে বললেন, ‘কোনো ক্লু?’

বরদাচরণ একটু বিরক্ত হয়ে বললেন, ‘আপনি ক্লু চান, না ঘড়ি চান? ক্লু বিস্তর আছে। কিন্তু দরকার তো ঘড়িটার’। বকুণ্ডল ম্লান মুখে বললেন, ‘ঘড়িটাই চাই বাবা। অবস্থা তো জানো। নিমে স্যাকরা দুশো টাকায় ঘড়িটা কিনতে চেয়েছিল। ভেবেছিলাম ঘড়িটা বেচে শীতের জন্য একটা লেপ করাব’। বরদাচরণ বললেন, ‘হুঁ’। তারপর বাক্যব্যয় না করে একটা বিশাল কাঠের সিন্দুকের ডালা খুলে বিস্তর ছেঁড়া কাঁথা কানির মধ্যে হাতড়াতে লাগলেন। কঞ্চি বজ্রকুণ্ডলকে চাপা গলায় বলল, ‘জ্যাঠামশাই, আপনি গিয়ে নেয়ে খেয়ে দুপুরে একটু গড়িয়ে নিন। মামা যখন লেগেছে তখন ঘড়ি যদি ইহজগতে থাকে তবে বেরোবেই।’ ‘ইহজগতেই আছে বাবা। বেশিদুর যায়নি। আমার বজ্জাত নাতি হেমকুণ্ডল, ঘড়িটা পোষা বেড়াল দুগ্‌গার গলায় বেঁধে দিয়েছিল। দুগ্‌গা এই বাড়ির বাইরে তো যায়নি। এখানেই কোথাও আনাচে কানাচে এখনো পড়ে আছে। হঠাৎ বরদাচরণ সিন্দুক থেকে মুখ তুলে বললেন, ‘চারহাতি গামছা পাওয়া যাবে?’

‘গামছা!’ বজ্রকুণ্ডল অবাক হয়ে বলেন, গামছা কী হবে বাবা?’ ‘গলায় দেবো। কটমট করে চেয়ে বরদা বলেন। বজ্রকুণ্ডল দৌড়ে গিয়ে একটা বড় গামছা নিয়ে এসে বলেন, ‘তোমার হলে আমাকে দিও। আমিও গলায় দিয়ে ঝুলে পড়বখন।’ বরদাচরণ কটমট করে আর একবার চেয়ে জামাকাপড় ছেড়ে গামছাটা পরে ফেললেন টাইট করে। তারপর সোজা গিয়ে হাজির হলেন অন্দরমহলের পুরোনো পুকুরটার ধারে। গভীর পুষ্করিণী। ভাল পাথর দিয়ে বাঁধানো ঘাটের অনেকটাই ভেঙে গেছে বটে, তবু এখনো পৈঠার বাহার কিছুটা অবশিষ্ট আছে। বরদাচরণ কঞ্চি বা বজ্রকুণ্ডলের দিকে দৃকপাত না করে পুকুরে নেমে পড়লেন। বুক ভরে দম নিয়ে সবুজ আভার গভীর জলে ডুব দিলেন। ডুবে একবারে থৈ পেলেন না। মিনিটখানেক বাদে ভেসে উঠে দম নিয়ে আবার ডুব। তারপর আবার। তারপর আবার। পুকুরের পূব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণ-বায়ু-অগ্নি-নৈঋৎ-ঈশান কোনো দিক বাদ রাখলেন না। অবশেষে,ঘণ্টা দুই বাদে উঠে হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, একটা শাবল শীগগির।

বজকুণ্ডল দৌড়ে গিয়ে একটা মস্ত শাবল এনে দিয়ে বললেন, কোনো ক্লু পেলে বাবা? বরদাচরণ জবাব না দিয়ে শাবল হাতে পুকুরের পশ্চিম পাড়ে গিয়ে ডুব লাগালেন। ডুবতে ডুবতে যেখানে পা ঠেকল সেখানে দুটো পাথরের চাই দাঁড়িয়ে আছে পাশাপাশি। বরদা দুটো পাথরের মাঝখানে শাবলটা ঢুকিয়ে একটা চড় মারতেই পাথর দুটো সরে গেল। বরদাচরণ ভেসে দম নিয়ে আবার ডুব দিয়ে পাথরের চাইয়ের পিছনে যে জং-ধরা লোহার দরজাটা ছিল সেটার কজায় শাবল ঢুকিয়ে আবার চাড় দিলেন। দরজাটা হড়াস করে খুলে গেল। বরদাচরণ আর একবার ভেসে দম নিয়ে সোজা ডুব সাঁতারে সেই দরজা দিয়ে ঢুকে একটা জলে-ডোবা সুড়ঙ্গ বেয়ে খানিকটা ওপরে উঠে দম নেওয়ার মত বাতাস আর পায়ের নীচে জমি পেয়ে গেলেন। খুবই অন্ধকার। শাবলটা দিয়ে চারদিক দেখতে দেখতে এগিয়ে যেতে লাগলেন। সামনে একটা কাঠের দরজা। বেশ পুরু কাঠ। দরজায় মস্ত তালা ঝুলছে। কিন্তু বরদাচরণের হাতে শাবল থাকতে দরজার সাধ্য কি তার গতি রোধ করে? দু মিনিটের মাথায় পাতালের সেই ঘরে ঢুকে বরদাচরণ চারদিক হাতড়ে দেখলেন অন্তত দশ বারোটা লোহার সিন্দুক রয়েছে। বরদাচরণ আপনমনে বললেন, হুঁ। বরদাচরণের প্রাণের আশা সবাই যখন প্রায় ছেড়ে দিয়েছে সেই সময়ে তিনি ভেসে উঠলেন পাড়ে। বললেন, পাওয়া গেছে।

বজ্রকুণ্ডল সাগ্রহে জিজ্ঞেস করেন, কী বাবা? ঘড়ি, না ক্লু? বরদাচরণ মাথা নেড়ে বললেন, না। ক্লুও না, ঘড়িও না। যা পেয়েছি তাতে আমি খুশিও না। তবু লোকজন ডেকে পুকুরের জলটা ঘেঁচে ফেলুন। কাউকে কিছু বলতে যাবেন না। ‘পুকুর ঘেঁচে কী পাওয়া যাবে বাবা?’ ‘ঘড়ি নয়।‘ বলে গম্ভীর মুখে শুকনো জামাকাপড় পরতে লাগলেন বরদা। মাছের লোভেজমিদারদের পুকুর হেঁচতে অবশ্য অনেক লোক জুটল। দিন দুয়েকের মধ্যে মাছ সমেত জল লোপাট। সন্ধ্যের পর বরদাচরণ বাতি হাতে বজ্রকুণ্ডল আর কঞ্চিকে সঙ্গে নিয়ে পিছল ঘাট বেয়ে নেমে শ্যাওলা আর কাদায় ঢাকা পাথরের দুটো চাইয়ের মুখে এসে দাঁড়ালেন। বুদ্ধি করে চাই দুটোকে জুড়ে দিয়ে গিয়েছিলেন বরদা। নইলে জল হেঁচতে এসে লোকে সুড়ঙ্গটার সন্ধান পেত।

সুড়ঙ্গ বেয়ে পাতাল কুঠুরিতে পৌঁছে বরদা তাচ্ছিল্যের স্বরে বললেন, ‘ঐ সিন্দুক গুলোয় আপনার পূর্বপুরুষদের লুকোনো ধনরত্ন আছে। খুলে দেখুন। ‘বলো কী?’ বজ্রকুণ্ডল মূর্ছা যেতে যেতে সামলে নিলেন। তারপর শাবল আর কুন্ডুলের ঘায়ে একে একে বারোটা সিন্দুক খোলা হল। কোনোটায় মোহর, কোনোটায় হীরে জহরত, কোনোটায় চাদির টাকা, কোনোটায় সোনা-রুপোর বাসনপত্র। সে এক

কুবেরের ভাণ্ডার। দেখে আত্মহারা হয়ে গেলেন বজ্রকুণ্ডল। আনন্দে কেঁদে ফেলে বললেন, ছেলেবেলা থেকে বড় কষ্টে মানুষ হয়েছি বাবা। জমিদারির ঠাটবাট রাখতে গিয়ে কাছা দিতে কেঁচায় টান পড়ত। এতদিনে ভগবান মুখ তুলে চাইলেন। বরদাচরণ একটা কাঠের সিন্দুকের ডালার ওপর বসে গভীরভাবে ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্কভাবে বললেন, হুঁ। কিন্তু বেড়ালটা বাড়ির বাইরে যায়নি। তা হলে ঘড়িটা… বজ্রগুল উত্তেজিত গলায় চেঁচিয়ে বললেন, রাখো তোমার ঘড়ি। এই যা পেয়েছি তাতে হাজারটা ওরকম ঘড়ি কেনা যায়।

বরদাচরণ কটমট করে বকুণ্ডলের দিকে একবার চাইলেন। তারপর আবার গভীর ভাবনায় ডুবে গিয়ে আপনমনে বললেন, 'শেষবার বেড়ালটাকে দেখা গিয়েছিল পুকুরের ধারে, তার আগে ভাঙা নহবৎখানার ছাদে। কিন্তু সেখানেও ঘড়ি নেই। তা হলে…'।

বজ্রকুণ্ডল বরদাচরণের দুখানা হাত ধরে বললেন, আমি তোমাকে দশ লাখ টাকা দেবো। বুঝলে? দশ লাখ; এখন ঘড়ির চিন্তাটা ছাড়ো।' বরদাচরণ হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আপনমনে বলতে লাগলেন, তা হলে পুকুরের ধারেও যদি না এসে থাকে তবে বেড়ালটা গিয়েছিল..বলতে বলতে বরদাচরণ উঠে সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে ভাঙা রসুইখানার দিকে হাঁটা দিলেন। পিছনে বজ্রকুণ্ডল। তিনি বার বার বলতে লাগলেন, 'ঘড়ি আর চাই না বাবা বরদাচরণ। তোমাকে খুশি হয়ে দশ লাখ দিচ্ছি।' বরদাচরণ আনমনে মাথা নেড়ে বললেন, উন্থ। আমার ফি একশো টাকা। তাও ঘড়ি পেলে।

'কিন্তু এ টাকায় যে লাখ ঘড়ি কেনা যায়। বরদাচরণ ঠোঁট উল্টে বললেন, 'ওসব মোহর সোনা হীরে এই তদন্তে অবান্তর। ওসব নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় আমার নেই। বলে আপনমনে বরদাচরণ বিড়বিড় করতে করতে চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে থাকেন, বেড়ালটা আর ঘড়িটা এক সূত্রে বাঁধা। বেড়ালটা বাড়ির বাইরে না গেলে ঘড়িটারও স্বাভাবিক অবস্থায় যাওয়ার কথা নয়। তা হলে…

# দিনকাল

**দিনকাল**

বিলাস গরু চরাতে হক সাহেবের মাঠে এসেছে। কোচড়ে মুড়ি, এক হাতে বাঁশি, অন্য হাতে রিমোট কন্ট্রোল। গরুদের প্রত্যেকটির কানের কাছে একটি করে রিসিভার যন্ত্র আছে। পাঁচনবাড়ির দরকার হয় না, রিমোটের বোতাম টিপেই ব্যাদড়া গরুকে বশে রাখা যায়।

হক সাহেবের মাঠটি চমৎকার। সবুজ দেড় বিঘা লম্বা পুষ্টিকর ঘাসে ছাওয়া। একসময়ে অবশ্য ন্যাড়া বালিয়াড়ি ছিল। প্রায় দুশো বছর আগে অর্থাৎ বাইশ শো তেষট্টি সালে অজিত কুণ্ডু নামে এক বৈজ্ঞানিক তার বিখ্যাত যান্ত্রিক ইঁদুর আবিষ্কার করলেন। ছোটো ছোটো যন্ত্রের ইঁদুর মাটিতে গর্ত করে দশ পনেরো বিশ মিটার নীচে নেমে যায় আর সেখান থেকে তুলে এনে ওপরে ছড়িয়ে দেয়। এইভাবে বালিয়াড়ি, সাহারা বা কালাহারির মতো মরুভূমি সব অদৃশ্য হয়ে এখন উর্বর মাটি, শস্যক্ষেত্র আর বনে জঙ্গলে সেসব জায়গা ভরে গেছে। মাটিকে উর্বর আর সরস রাখতে কেঁচো ও জীবাণুদের কাজে লাগানো হয়েছে। ফলটা হয়েছে চমৎকার! হক সাহেবের মাঠটি দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়।

পাশেই রামরতন ঘোষের মস্ত ধানক্ষেত। ক্ষেতের পাশে একটা বেলুন চেয়ারে বসে রামরতন তার রিমোট কন্ট্রোলে ক্ষেতে ধান রুইছে। রামরতনের রোবট যন্ত্রটি দেখতে অবিকল একটা বাচ্চা মেয়ের মতো। প্রোগ্রাম করে দেওয়া আছে। যন্ত্র-বালিকা ঠিকমতোই ধান রুইবে। তবে রামরতনের যন্ত্র-বালিকাটির দোষ হলো, চোখের আড়াল হলেই খানিকটা এক্কা দোক্কা খেলে নেয়। হয়তো আগে অন্যরকম প্রোগ্রাম করা ছিল, সেটা পুরোপুরি তুলে না দিয়েই নতুন প্রোগ্রাম বসিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। এজন্য রামরতনের একটু ঝামেলা হচ্ছে।

বিলাস তার নাইলনের ব্যাগ থেকে চোপসানো একটা বেলুনের মতো জিনিস বের করল। একটা খুদে সিলিন্ডারের নজুল বেলুনের মুখে চেপে ধরতেই লহমায় বেলুনটা ফুলে একটা ভারী সুন্দর আরামের চেয়ারে পরিণত হলো। বিলাস চেয়ারে বসে কেঁচড় থেকে মুড়ি খেতে খেতে হাঁক মারল, ও রামরতনদাদা, বলি করছেটা কি?

রামরতন তার দিকে চেয়ে বিরক্ত মুখে বলল, চার একর জমিতে ধান রুইতে বড় জোর আধঘণ্টা লাগবার কথা। আর ওই বিচ্ছু মেয়ে ঝাড়া দু ঘণ্টায় এক একরও পারেনি।

বিলাস তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে, স্পিডটা একটু বাড়িয়ে দাও না। যন্তর তো তোমার হাতেই রয়েছে।

রামরতন বিরক্ত হয়ে বলে, তাহলে তো কথাই ছিল না। এঁর তো গুণের শেষ নেই। যেই স্পিড বাড়াবো অমনি ফাঁক ফাঁক করে বুনতে শুরু করবে। তাতে কাজ বাড়বে বই কমবে না।

যন্তরটা তাহলে তোমাকে খারাপই দিয়েছে। বদল করে নাও না কেন?

রামরতন এবার তার চেয়ারে লাগানো নম্বরের স্লেটে একটা নম্বর টিপল। তার চেয়ারটা সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে উঠে ভাসতে ভাসতে বিলাসের চেয়ারের পাশে এসে নামল। রামরতন টিসু কাগজে মুখ মুছে বলে, সে চেষ্টা কি আর করিনি নাকি? ও মেয়েকে তুমি চেনো না। যন্ত্রবালিকা হলে কি হয়, মাথায় খুব বুদ্ধি। চার মাস হলো কিনেছি গুচ্ছের টাকা দিয়ে, দু বছরের গ্যারান্টি আছে। কাজে দোষ হলে বদলে দেবে বা টাকা ফেরত দেবে। কিন্তু এ মেয়েটা বাড়িতে ঢুকেই আমাকে বাবা বলে, আর আমার গিন্নিকে মা বলে ডাকতে শুরু করেছে। চালাকিটা দেখেছ? এখন আমার গিন্নির এত মায়া পড়ে গেছে যে মৃগনয়নীকে ফেরৎ দেওয়ার কথা শুনলেই খেপে ওঠেন।

মৃগনয়নী কি ওর নাম?

আমার গিন্নির দেওয়া। মেয়েটাকে নিয়ে জেরবার হচ্ছি। ওই দেখ, আবার খেলতে লেগেছে।

বাস্তবিকই মৃগনয়নী ধান রোয়া ফেলে একটা স্কিপিং দড়িতে তিড়িং তিড়িং করে লাফাচ্ছিল। মুখে হাসি।

রামরতন রিমোটটা তুলে ধরে বোতাম টিপে মেয়েটাকে ফের কাজে লাগিয়ে দিয়ে বলল, সারাক্ষণ এই করতে হচ্ছে। সকালে পান্তাভাত খেয়ে এসেছি, কোথায় একটু ঝিম মেরে চোখটি বুজে থাকব, তার উপায় নেই।

ফেরত না দাও, রিপ্রোগ্রামিং করিয়ে নিলেই তো পারো। ওরা ডিস্কটা ভাল করে পুঁছে আবার প্রোগ্রাম করে দেবে।

রামরতন বিমর্ষ মুখে বলে, সে চেষ্টাও কি আর করিনি? গিন্নি তাও করতে দিচ্ছে না। বলে, ও যে দুষ্টুমি করে, খেলে তাতেই আমার বেশি ভাল লাগে। এ সময়টায় একটু ভাত-ঘুম ঘুমিয়ে না নিলে আমার শরীরটা বড় ম্যাজম্যাজ করে।

রামরতন গোটা দুই হাই তুলল, দেখে বিলাস সমবেদনার সঙ্গে বলল, একটা হর্ষ-বড়ি খেয়ে নেবে নাকি? তাহলে বেশ চাঙ্গা লাগবে। আমার কাছে আছে।

রামরতন মাথা নেড়ে বলে, না রে ভাই। সেদিন একটা খেয়ে যা অবস্থা হলো, আনন্দের চোটে মন নাচানাচি, লাফালাফি, চেঁচামেচি করেছি যে পরে গা-গতরে ব্যথা হয়ে গলা ভেঙে কাহিল অবস্থা।

মুড়ি চিবোতে চিবোতে বিলাস বলে, তা তোমার তো প্লাস্টিকের হার্ট, তুমি কাহিল হয়ে পড়ো কেন? প্লাস্টিকের হার্টওলা লোকেরা নাকি সহজে কাহিল হয় না।

সে কথা ঠিক। তবে আমার কপালটাই তো ওরকম। যে হার্টটা বসানো হয়েছে সেটা নাকি বাঙালিদের ধাত অনুযায়ী টিউন করা নয়, তখন বাঙালী হার্টের সাপ্লাই ছিল না বলে আমাকে একটা জার্মান হার্ট লাগিয়ে দিয়েছে, সেটা একটু বেশি শক্তিশালী! ফলে আমার শরীরের সঙ্গে বনিবনা হচ্ছে না। মাস তিনেক বাদে বাঙালি হার্ট এলে এটা বদলে দেবে বলেছে।

দুজনে কথা হচ্ছে এমন সময়ে হঠাৎ আকাশে একটা গোলগোল মেঘ দেখা দিল, আর ছাড় ছাড় করে বৃষ্টি হতে লাগল।

বিলাস চমকে উঠে বলে, আরে! বৃষ্টি হচ্ছে কেন? এখন তো বৃষ্টি হওয়ার কথা নয়! দেখ তো মুড়িগুলো ভিজে গেল!

আমারও আবার সর্দির ধাত। বলে রামরতন হাতের রিমোটটা উলে নম্বর ডায়াল করতে লাগল। রিমোটটার উল্টো পিঠটা টেলিফোনের কাজ করে।

রামরতন বলল, হাওয়া অফিস? তা ও মশাই, হক সাহেবের মাঠে এখন বৃষ্টি হওয়াচ্ছেন কেন? আমরা তো বৃষ্টি চাইনি।

হাওয়া অফিস খুব লজ্জিত হয়ে বলে, এঃ হেঃ সরি, একটু ভুল হয়ে গেছে। আসলে ওটা হওয়ার কথা সাহাগঞ্জের মাঠে। ঠিক আছে আমরা মেঘটাকে সরিয়ে দিচ্ছি।

মেঘটা হঠাৎ একটা চক্কর খেয়ে ভো করে মিলিয়ে গেল। আবার রোদ দেখা দিল।

বিলাস ক্ষুব্ধ গলায় বলে, হাওয়া অফিসটা আর মানুষ হলো না। সব সময়ে ক্যালকুলেশনে ভুল করে যা নয় তাই ঘটিয়ে দিচ্ছে। এ হলো ফিনল্যান্ডের বাবু-মুড়ি, জল লাগলেই গলে যায়। ওই তো কত ফিরিওলা চরে বেড়াচ্ছে। একটাকে ডেকে মুড়ি কিনে নে না।

বাস্তবিকই আকাশে ইতস্তত কয়েকটা বাটির মতো আকারের জিনিস শ্লথ গতিতে উড়ে বেড়াচ্ছে। তাদের তলায় কোনোটায় লেখা জলখাবার, কোনোটায় লেখা প্রসাধন সামগ্রী, কোনোটায় লেখা বৈদ্যুতিক সামগ্রী মেরামত ইত্যাদি।

বিলাস বাঁশিটা মুখে নিয়ে বাঁশির গায়ে একটা বোতাম টিপে ফুঁ দিল। কোনো শব্দ হলো না। কিন্তু আকাশ থেকে একখানা বাটি নেমে এসে তার সামনে থামল। বাটিতে মেলা খাবার জিনিস সাজানো। দোকানি একজন বুড়ো মানুষ। বলল, কী চাই?

ফিনল্যান্ডের বাবু-মুড়ি আছে নাকি?

ফিনল্যান্ডের মুড়ি আবার মুড়ি নাকি?

যন্তরে মুড়ি আছে, একবার খেলে জীবনে আর স্বাদ ভুলতে পারবে না। নাম হলো উড়ুক্কু মুড়ি।

আজকাল নিত্যি নতুন জিনিস বেরোচ্ছে। উড়ুক্কু মুড়ি বিলাস খায়নি। নিল এক প্যাকেট। দাম নিয়ে বুড়ো বাটি সমেত ফের আকাশে উঠে গেল।

বিলাস একমুঠো মুখে দিয়ে দেখল, চমৎকার, চিবোতে না চিবোতেই যেন মুখে মিলিয়ে যায়। স্বাদটাও ভাল।

ওরে ও বিলাস, তোর কেলে গরু যে আমার ক্ষেতে ঢুকে যাচ্ছে, এখনই সব তছনছ করবে। ওটি সাঙ্ঘাতিক দুষ্ট গাই।

বিলাস তাড়াতাড়ি রিমোট তুলে বোতাম টিপতেই কেলে গরুটা থমকে একটু শিং নাড়া দিল। তারপর সুড়সুড় করে আবার ফিরে এসে ঘাস খেতে লাগল। বিলাস বলল, রামরতনদা, তোমার রিমোটটা আমাকে দিয়ে তুমি একটু ঘুমিয়ে নাও। আমি মৃগনয়নীকে সামলে রাখব'খন।

বাঁচালি ভাই, এই নে, বলে রিমোটটা বিলাসকে দিয়ে রামরতন সবে চোখ বুজেছে এমন সময় হঠাৎ মৃগনয়নী কাজ ফেলে দুড়দাড় করে দৌড়ে এল। ও বাবা!

রামরতন বিরক্ত হয়ে চোখ খুলে বলল, কী বলছিস?

ভূতে ঢেলা মারছে যে!

অ্যাঁ!

এই অ্যাত বড় বড় ঢেলা। এই দেখ। বলে মৃগনয়নী একটা ঢেলা হাতের মুঠো খুলে দেখাল।

আর এই সময়েই আরও দু চারটে ঢেলা ওদিককার ক্ষেত থেকে উড়ে এসে আশেপাশে পড়ল। ব্যাপারটা নতুন নয়, আগেও দু'চারবার হয়েছে। রামরতন শুকনো মুখে বিলাসের দিকে চেয়ে বলে, কি করি বল তো!

বিলাস বলল, কার ভূত?

তা কি করে বলব?

দাঁড়াও, থিওসফিক্যাল ল্যাবরেটরিতে ফোন করে জেনে নিচ্ছি।

বিলাস ডায়াল করে জিজ্ঞেস করল, ও মশাই, হক সাহেবের মাঠে কার ভূত দৌরাত্ম করছে তা জানেন?

ও হলো ষষ্ঠীচরণ সাহার ভূত। ওকে চটাবেন না।

কিছু একটা করুন। ক্ষেতের কাজ যে বন্ধ হওয়ার জোগাড়।

সে আমাদের কম্ম নয়। ভূতের সঙ্গে কে এঁটে উঠবে? তাহলে?

চোখ কান বুজে সয়ে নিন। কিছু করার নেই।

বিলাস ফোন বন্ধ করে বলে, ষষ্ঠী খুড়োর ভূত। কেউ কিছু করতে পারবে না।

রামরতন একটু খিঁচিয়ে উঠে মৃগনয়নীকে বলে, তোর এত আদিখ্যেতা কিসের? ঢেলা পড়ছে তো পড়ুক না। তোর তো আর ব্যথা লাগবার কথা নয়!

মৃগনয়নীর চোখ ভরে জল এল। ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, না, লাগেনি। বুঝি! এই দেখ না কনুইয়ের কাছটা কেমন ফুলে আছে।

সত্যিই জায়গাটা ফোলা দেখে রামরতনের চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। বিলাসের দিকে চেয়ে বলল, এ কী রে? রোবটেরও যে ব্যথা লাগছে আজকাল।

বিলাস বলল, শুধু কি তাই? চোখে জল, ঠোঁটে অভিমান, নাঃ, দিনকাল যে কী রকম পড়ল।

রামরতন মৃগনয়নীকে বকবে বলে বড় বড় চোখ করে ধমকাতে যাচ্ছিল, মৃগনয়নী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, তুমি আমাকে একটুও ভালবাস না কেন বাবা?

রামরতনের রাগ জল হয়ে গেল। ঠিক বটে, সে মানুষ আর মৃগনয়নী নিতান্তই যন্ত্র-বালিকা। কিন্তু সবসময়ে কি আর ওসব খেয়াল থাকে? রামরতন হাত বাড়িয়ে মৃগনয়নীকে কাছে টেনে এনে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলল, কঁদিসনে মা, তোকে খুব সুন্দর একটা ডলপুতুল, কিনে দেবো।

বিলাস মুখটা ফিরিয়ে একটু হাসল।

# দুই পালোয়ান

**দুই পালোয়ান**

পালোয়ান কিশোরী সিং-এর যে ভূতের ভয় আছে তা কাক পক্ষিতেও জানে না। কিশোরী সিং নিজেও যে খুব ভাল জানত এমন নয়।

আসলে কিশোরী ছেলেবেলা থেকেই বিখ্যাত লোক। সর্বদাই চেলাচামুণ্ডারা তাকে ঘিরে থাকে। একা থাকার কোন সুযোগই নেই তার। আর একথা কে না জানে যে একা না হলে ভূতেরা ঠিক সুবিধে করে উঠতে পারে না। জো পায় না।

সকালে উঠে কিশোরী তার সাকরেদ আর সঙ্গীদের নিয়ে হাজার খানেক বুকডন আর বৈঠক দেয়। তারপর দঙ্গলে নেমে পড়ে। কোস্তাকুস্তি করে বিস্তর ঘাম ঝরিয়ে দুপুরে একটু বিশ্রাম। বিকেলে প্রায়ই কারও

কারও সঙ্গে লড়াইতে নামতে হয়। সন্ধ্যের পর একটু গানবাজনা শুনতে ভালবাসে কিশোরী। রাতে সে পাথরের মতো পড়ে এক ঘুমে রাত কাবার করে। তখন তার গা হাত পা দাবিয়ে দেয় তার সাকরেদরা। এই নিচ্ছিদ্র রুটিনের মধ্যে ভূতেরা ঢুকবার কোনও ফঁকই পায় না।

গণপত মাহাতো নামে আর একজন কুস্তিগীর আছে। সেও মস্ত পালোয়ান। দেশ বিদেশের বিস্তর দৈত্য দানবের মতো পালোয়ানকে সে কাৎ করেছে। কিন্তু পারেনি শুধু কিশোরী সিংকে। অথচ শুধু কিশোরী সিংকে হারাতে পারলেই সে সেরা পালোয়ানের খেতাবটা জিতে নিতে পারে।

কিন্তু মুস্কিল হল নিতান্ত বাগে পেয়েও নিতান্ত কপালের ফেরে সে কিশোরীকে হারাতে পারেনি। সেবার লক্ষ্ণৌতে কিশোরীকে সে যখন চিৎ করে প্রায় পেড়ে ফেলেছে সেই সময়ে কোথা থেকে হতচ্ছাড়া এক মশা এসে তার নাকের মধ্যে

ঢুকে এমন পন পন করতে লাগল হাঁচি না দিয়ে আর উপায় রইল না তার। আর সেই ফাঁকে কিশোরী তার প্যাঁচ কেটে বেরিয়ে গেল। আর দ্বিতীয় হচিটার সুযোগে তাকে রদ্দা মেরে চিৎ করে ফেলে দিল।

পাটনাতেও ঘটল আর এক কাণ্ড। সেবার কিশোরীকে বগলে চেপে খুব কায়দা করে স্ক্রু প্যাঁচ আঁটছিল গণপত। কিশোরীর তখন দমসম অবস্থা। ঠিক সেই সময়ে একটা ষাঁড় ক্ষেপে গিয়ে দঙ্গলের মধ্যে ঢুকে লণ্ডভণ্ড কাণ্ড বাধিয়ে দিল। কিন্তু গণপত দেখল এই সুযোগ হাতছাড়া হলে আর কিশোরীকে হারানো যাবে না। সুতরাং সে প্যাঁচটা টাইট রেখে কিশোরীকে ল্যাং মেরে ফেলে দেওয়ার ফিকির খুঁজছিল। সেই সময় ষাঁড়ের তাড়া খেয়ে দর্শকরা সব পালিয়েছে আর ষাঁড়টা আর কাউকে পেয়ে দুই পালোয়নের দিকেই তেড়ে এল।

কিশোরী তখন বলল, গণপত, ছেড়ে দাও। ষাঁড় বড় ভয়ঙ্কর জিনিস।

গণপত বলল, ষাঁড় তো ষাঁড়, স্বয়ং শিব এলেও ছাড়ছি না। ষাঁড়টা গুতোতে এলে গণপত অন্য বগলে সেটাকে চেপে ধরল। সে যে কী সাংঘাতিক লড়াই হয়েছিল তা যে না দেখেছে সে বুঝবে না। দেখেছেও অনেকে। গাছের ডালে ঝুলে, পুকুরের জলে নেমে, বাড়ির ছাদে উঠে যারা আত্মরক্ষা করছিল তারা অনেকেই দেখেছে। গণপত লড়াই করছে দুই মহাবিক্রম পালোয়ানের সঙ্গে-ষাঁড় এবং কিশোরী সিং। গাছের ডালে ঝুলে, পুকুরে ডুবে থেকেও সে লড়াই দেখে লোকে চেঁচিয়ে বাহবা দিচ্ছিল গণপতকে।

ষাঁড়ের গুঁতো, কিশোরীর হুড়ো এই দুইকে সামাল দিতে গণপত কিছু গণ্ডগোল করে ফেলেছিল ঠিকই। আসলে কোন্ বগলে কে সেইটেই গুলিয়ে গিয়েছিল তার। হুড়যুদ্ধুর মধ্যে যখন সে এক বগলের আপদকে যুৎসই একটা প্যাঁচ মেরে মাটিতে ফেলেছে তখনও তার ধারণা যে চিৎ হয়েছে কিশোরীই।

কিন্তু নসিব খারাপ। কিশোরী নয়, চিৎ হয়েছিল ষাঁড়টাই। আর সেই ফাঁকে কিশোরী তার ঘাড়ে উঠে লেংগউটি প্যাঁচ মেরে ফেলে দিয়ে জিতে গেল।

তৃতীয়বার তালতলার বিখ্যাত আখড়ায় কিশোরীর সঙ্গে ফের মোলাকাৎ হল। গণপত রাগে দুঃখে তখন দুনো হয়ে উঠেছে। সেই গণপতের সঙ্গে সুন্দরবনের বাঘ পর্যন্ত রণে ভঙ্গ দিয়ে লেজ গুটিয়ে পালাবে। তার হুংকারে তখন মেদিনী কম্পমান।

লড়াই যখন শুরু হল তখনই লোকে বুঝে গেল, আজকের লড়াইতে কিশোরীর কোনও আশাই নেই। কিশোরী তখন গণপতের নাগাল এড়িয়ে পালিয়ে বেড়াতে ব্যস্ত।

ঠিক এই সময়ে ঘটনাটা ঘটল। ভাদ্র মাস। তালতলার বিখ্যাত পাঁচসেরী সাতসেরী তাল ফলে আছে চারধারে। সেই সব চ্যাম্পিয়ন তালদের একজন সেইসময়ে বোঁটা ছিঁড়ে নেমে এল নীচে। আর পড়বি তো পড় সোজা গণপতের মাথার মধ্যিখানে।

গণপতের ভাল করে আর ঘটনাটা মনে নেই। তবে লোকে বলে, তালটা পড়ার পরই নাকি গণপত কেমন স্তম্ভিতের মতো দাঁড়িয়ে গালে হাত দিয়ে কী যেন ভাবতে লাগল। সে যে লড়াই করছে, তার প্রতিদ্বন্দ্বী যে কিশোরী, এবং সতর্ক না হলে যে বিপদ তা আর তার মাথায় নেই তখন। সে নাকি গালে হাত দিয়ে হঠাৎ বিড়বিড় করে তুলসীদাসের রামচরিতমানস মুখস্থ বলে যাচ্ছিল। কিশোরী যখন সেই সুযোগে তাকে চিৎ করে তখনও সে নাকি কিছুমাত্র বাধা দেয়নি। হাতজোড় করে রামজীকে প্রণাম জানাচ্ছিল।

গণপতের বয়স হয়েছে। শরীরের আর সেই তাগদ নেই। কিশোরী সিংকে হারিয়ে যে খেতাবটা সে জিততে পারল না এসব কথাই সে সারাক্ষণ ভাবে।

ভাবতে ভাবতে কী হল কে জানে। একদিন আর গণপতকে দেখা গেল না।

ওদিকে কিশোরীর এখন ভারী নামডাক। বড় বড় ওস্তাদকে হারিয়ে সে মেলা কাপ মেডেল পায়। লোকে বলে, কিশোরীর মতো পালোয়ান দুনিয়ায় দ্বিতীয়টি নেই।

তা একদিন ডাকে কিশোরীর নামে একটা পোস্টকার্ড এল। গণপতের আঁকাবাঁকা হস্তাক্ষরে লেখা, ভাই কিশোরী, তোমাকে হারাতে পারিনি জীবনে এই আমার সবচেয়ে বড় দুঃখ। একবার মশা, একবার ষাঁড়, আর একবার তাল আমার সাধে বাদ সেধেছে। তবু তোমার সঙ্গে আর একবার লড়বার বড় সাধ। তবে লোকজনের সামনে নয়। আমরা দুই পালোয়ান নির্জনে পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করব। আমি হারালে তোমাকে গুরু বলে মেনে নেবো। তুমি হারালে আমাকে গুরু বলে মেনে নেবে। কে হারল, কে জিতল তা বাইরের কেউ জানবে না। জানব শুধু আমি, আর জানবে তুমি। যদি রাজি থাকো তবে আগামী অমাবস্যায় খেতুপুরের

শ্মশানের ধারে ফাঁকা মাঠটায় বিকেলবেলায় চলে এসো। আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করব।

চিঠিটা পড়ে কিশোরী একটু ভাবিত হল। সত্যি বটে, গণপত খুব বড় পালোয়ান। এবং কপালের জোরেই তিন তিনবার কিশোরীর কাছে জিততে জিততেও হেরে গেছে। অত বড় একটা পালোয়নের এই সামান্য আব্দারটুকু রাখতে কোনও দোষ নেই। হারলেও কিশোরীর ক্ষতি নেই। সাক্ষীসাবুদ তো থাকবে না। কিন্তু হারার প্রশ্নও ওঠে না। কিশোরী এখন অনেক পরিণত, অনেক অভিজ্ঞ। তাছাড়া গণপতকে যে সে খুব ভালভাবে হারাতে পারেনি সেই লজ্জাটাও তার আছে। সুতরাং লজ্জাটা দূর করার এই-ই সুযোগ। এবার গণপতকে ন্যায্যমতো হারিয়ে সে মনের খচখচানি থেকে মুক্ত হবে।

নির্দিষ্ট দিনে কিশোরী তৈরি হয়ে খেতুপুরের দিকে রওনা হল। জায়গাটা বেশি দূরেও নয়। তিন পোয়া পথ। নিরিবিলি জায়গা।

শ্মশানের ধারে মাঠটায় গণপত অপেক্ষা করছিল। কিশোরীকে দেখে খুশি হয়ে বলল, এসেছো! তাহলে লড়াইটা হয়েই যাক।

কিশোরীও গোঁফ মুচড়ে বলল, হোক।

দুজনে ল্যাঙট এঁটে, গায়ে মাটি থাবড়ে নিয়ে তৈরি হল।

তারপর দুই পালোয়ান তেড়ে এল দুদিক থেকে। কিশোরী ঠিক করেছিল, পয়লা চোটেই গণপতকে মাটি থেকে শূন্যে তুলে ধধাবিপাট মেরে কেল্লা ফতে করে দেবে।

কিন্তু সাপটে ধরার মুহূর্তেই হঠাৎ পো করে একটা মশা এসে নাকে ঢুকে বিপত্তি বাধালে। হাচ্চো হ্যাঁচুঠো হাঁচিতে গগন কেঁপে উঠল। আর কিশোরী দেখল, কে যেন তাকে শূন্যে তুলে মাটিতে ফেলে চিৎ করে দিল।

গণপত বলল, আর একবার।

কিশোরী লাফিয়ে উঠে বলল, আলবাৎ।

দ্বিতীয় দফায় যা হওয়ার তাই হল! লড়াই লাগতে না লাগতেই একটা ষাঁড় কোথা থেকে এসে যে কিশোরীর বগলে ঢুকল তা কে বলবে। কিশোরী আবার চিৎ।

গণপত বলল, আর একবার হবে?

কিশোরী বলল, নিশ্চয়ই।

কী হবে তা বলাই বাহুল্য। লড়াই লাগতে না লাগতেই দশাসই এক তাল এসে পড়ল কিশোরীর মাথায়। কিশোরী 'পাখি সব করে রব' আওড়াতে লাগল। এবং ফের চিৎ হল।

হতভম্বের মতো যখন কিশোরী উঠে দাঁড়াল তখন দেখল, গণপতকে ঘিরে ধরে কারা যেন খুব উল্লাস করছে। কিন্তু তারা কেউই মানুষ নয়! কেমন যেন কালো কালো, ঝুলকালির মতো রং, রোগা, তেঠেঙে লম্বা সব অদ্ভুত জীব।

জীব? না কি অন্য কিছু?

কিশোরী হাঁ করে দেখল, গণপতও আস্তে আস্তে শুকিয়ে, কালচে মেরে, লম্বা হয়ে ওদের মতোই হয়ে যেতে লাগল।

কিশোরী আর দাঁড়ায়নি, বাবা রে, মা রে' বলে চেঁচিয়ে দৌড়াতে লেগেছে।

.

কিশোরী পালোয়ানের ভূতের ভয় আছে, একথা এখনও লোকে জানে না বটে। কিন্তু কিশোরী নিজে খুব জানে। আর এই জানলে তোমরা।

# দুই ভুত

## দুই ভুত

লালু আর ভুলুর কোনও কাজ নেই। তারা সারাদিন গল্প করে কাটায়। সবই নিজেদের জীবনের নানা সুখ-দুঃখের কথা। কথা বলতে-বলতে যখন আর কথা কইতে ভালো লাগে না তখন দুজনে খানিক কুস্তি লড়ে। তাদের কুস্তিও খুব একঘেয়ে–কেউ হারে না। কেউ জেতে না। কুস্তি করে তাদের ক্লান্তিও আসে না, ঘামও ঝরে না। তার কারণ লালু আর ভুলু দুজনেই ভূত। প্রায় চোদ্দো বছর আগে দুই বন্ধু মনুষ্য জন্ম শেষ করে ভূত হয়ে লালগঞ্জের লাগোয়া বৈরাগী দিঘির ধারে আশ-শ্যাওড়ার জঙ্গলে ঘাঁটি গেড়ে আছে। মামলা-মোকদ্দমা থেকেই বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবে আশ্চর্যের বিষয়, বুড়ো বয়সে মাত্র সাত দিনের তফাতে লালু আর ভুলু পটল তোলে। ভূত হয়ে যখন দুজনের দেখা হল তখন দুজনের মনে হল পুরোনো ঝগড়া জিইয়ে রাখার আর কোনও মানেই হয় না। তাই দুজনের বেশ ভালো ভাব হয়ে গেল। সময় কাটানোর জন্য তারা মাঝে-মাঝে ইচ্ছে করে ঝগড়া লাগানোর চেষ্টা করেও দেখেছে। কিন্তু দেখা গেল ঝগড়াটা তেমন জমে না, আরও একটা আশ্চর্যের বিষয় হল তারা ভূত হয়ে ইস্তক এ তল্লাটে কোথাও কখনও আর কোনও ভূতের দেখা পায়নি।

ভুলু বলে, হারে লালু, গায়ে গত চোদ্দো বছরে তো বিস্তর লোক মরেছে, তাদের ভূতগুলো সব গেল কোথায় বল তো?

সেটা তো আমিও ভাবছি, আমরা ছাড়া আর কাউকে তো কখনও দেখিনি! আরও কয়েকজন থাকলে সময়টা একটু কাটত ভালো।

ব্যাপারটা কিন্তু বড্ড গোলমেলে।

আমারও ভালো ঠেকছে না! বেশিদিন এরকম চললে আমাদের এ গাঁ ছাড়তে হবে। সেটা কি সোজা! আমি গাঁ ছাড়ার চেষ্টা করে দেখেছি, ভারি সূক্ষ্ম একটা বেড়া আছে। চোখে দেখা যায় না এতই মিহি, সেই বেড়া ভেদ করা অসম্ভব।

বটে, এ তো ভারী অন্যায় কথা! আমরা কি সব জেলখানার কয়েদী নাকি রে?

মনে হয় এক জায়গার ভূত অন্য জায়গায় গেলে হিসেবের গোলমাল হবে বলেই যমরাজা বেড়া দিয়ে রেখেছে।

তা অলপ্পেয়ে যমরাজাটাই বা কোথায়? আজ অবধি তো তার দেখাঁটি পেলাম না।

হবে রে হবে। এই একঘেয়ে বসে থাকাটা আমার আর ভালো লাগছে না। বরং গাঁয়ের ভূতগুলো কোথায় গায়েব হচ্ছে সেটা জানা দরকার। আরও গোটা কয়েক হলে দিব্যি গল্পটল্প করা যেত। দল বেঁধে থাকতাম–

তাহলে খুঁজেই দেখা যাক।

তাই চলো।

দুই বন্ধু মিলে অতঃপর ভূত খুঁজতে বেরোল। কিন্তু খুঁজতে খুঁজতে হয়রানিই সার হল। একটা ভূতের গায়ের আঁশও দেখা গেল না।

বড় চিন্তার কথা হল রে লালু!

বটেই তো! এরকম তো হওয়ার কথা নয়।

একটা কথা বলি, যতীন মুৎসুদ্দির বয়স হয়েছে। অবস্থাও কদিন ধরে খারাপ যাচ্ছে। এখন-তখন অবস্থা। চল তো গিয়ে তার শিয়রে বসে থাকি। আত্মাটা বেরোলেই খপ করে ধরবখন।

কথাটা মন্দ বলোনি। তাহলে চলো যাই।

দুজনেই গিয়ে যতীন মুৎসুদ্দির শিয়রে আস্তানা গাড়ল। খুব সতর্ক চোখে চেয়ে রইল যতীনের দিকে। যতীন বুড়ো মানুষ, শরীর জীর্ণ, শক্তিও নেই।

দুদিন ঠায় বসে থাকার পরে তিনদিনের দিন যখন গভীর রাত তখন লালু আর ভুলু লক্ষ্য করল যতীনের আত্মাটা নাকের ফুটোর কাছে বসে সাবধানে বাইরে উঁকিঝুঁকি মারছে।

লালু চেঁচিয়ে উঠল, ওই বেরোচ্ছে। সাবধান রে ভুলু, ঘ্যাঁচ করে ধরতে হবে কিন্তু।

হ্যাঁ, একবার বেরোক বাছাধন।

তা আত্মাটা বেরোল বটে, কিন্তু ধরা গেল না। শরীর ছেড়ে হঠাৎ এমন চো করে এরোপ্লেনের মতোই উড়ে গেল নাকের ফুটো দিয়ে যে লালু-ভুলু হাঁ করে চেয়ে রইল। তারপর 'ধর-ধর' করে ছুটল পিছনে।

যতীন মুৎসুদ্দির আত্মা সোজা গিয়ে গণেশ গায়েনের বাড়িতে ঢুকে পড়ল। পিছু-পিছু লালু আর ভুলু।

গণেশ গায়েন যতীনের আত্মাকে দেখেই একগাল হেসে বলল, এসেছিস, তোকে নিয়ে সাত হাজার সাতশো পনেরোটা হল। দাঁড়া যতেন, দাঁড়া তোর শিশিটা বের করি। মলমটলম ভরে একদম রেডি করে রেখেছি। এই বলে একটা দুইঞ্চি সাইজের শিশি বের করে যতীনকে তার ভিতরে পুরে কয়েকটা নাড়া দিয়ে ছিপি বন্ধ করে তাকে রেখে দিল। তারপর আপন মনেই বলল, আর দুটো হলেই কেল্লা ফতে। পরশু ঝুনঝুনওয়ালা লাখ খানেক টাকা নিয়ে আসবে। সাত হাজার সাতশো সতেরোটা হলেই লাখ টাকা হাতে এসে যেত। টাইফয়েড হয়ে চোদ্দ বছর আগে শয্যা নিতে হল বলে লালু আর ভুলুর ভূত দুটো হাতছাড়া হল, নইলে আমাকে আজ পায় কে! সে দুটোকে পেলে হতো।

লালু-ভুলু দরজার আড়ালে থেকে কথাটা শুনে ভয়ে সিঁটিয়ে রইল।

গণেশ গায়েন ঘুমোলে তারা ঘরের তাকে জমিয়ে রাখা সাত হাজার সাতশো পনেরোটা শিশি ভালো করে পরীক্ষা করে দেখল প্রত্যেকটিতে একটা করে ভূত মলম মেখে ঘুমিয়ে আছে।

লালু, দেখেছিস!

দেখছি রে ভুলু, কী করবি?

আয়, শিশিগুলোকে তাক থেকে ফেলে আগে ভাঙি। তাই হল। দুজনে মিলে নিশুত রাতে ঝনঝন করে শিশিগুলোকে ঠেলে ফেলে দিল মেঝেতে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমন্ত ভূতেরা জেগে মহা কোলাহল শুরু করে দিল।

ভুলু তাদের সম্বোধন করে বলল, ভাই বোনেরা, তোমরা ভয় পেয়ে না, আমরা তোমাদের উদ্ধার করতেই এসেছি।

সবাই আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল।

গণেশ গায়েনও ঘুম ভেঙে উঠে ধমকাতে লাগল, চুপ-চুপ বেয়াদব কোথাকার! তোদের তো মন্তর দিয়ে বেঁধে রেখেছি।

কে শোনে কার কথা। ভূতেরা মহানন্দে চিৎকার করতে করতে লালু ভুলুর সঙ্গে চোখের পলকে হাওয়া হয়ে গেল।

গণেশ দুঃখ করে বলল, সুখে থাকতে ভূতে কিলোয় রে। কত ভালো কাজ হত তোদের দিয়ে। ঝুনঝুনওয়ালা তোদের নিয়ে গিয়ে তার আয়ুর্বেদ ওষুধের কারখানায় চোলাই করে কর্কট রোগের ওষুধ বানাত, তা তোদের কপালে নেই। তা আমি আর কী করব?

# নয়নচাঁদ

**নয়নচাঁদ**

গভীর রাতে একটা শব্দ শুনে নয়নচাঁদবাবুর ঘুম ভেঙে গেল।

এমনিতেই নয়নাদের ঘুম খুব পাতলা। টাকা থাকলেই দুশ্চিন্তা। আর দুশ্চিন্তা থাকলেই অনিদ্রা। অনিদ্রা থেকেই আবার অগ্নিমান্দ্য হয়। অগ্নিমান্দ্য থেকে ঘটে উদরাময়। সুতরাং টাকা থেকেও নয়নাদের সুখ নেই। সারা বছর কবরেজি পাঁচন, হোমিওপ্যাথি গুলি আর অ্যালোপ্যাথির নানা বিদঘুঁটে ওষুধ খেয়ে বেঁচে আছেন কোনও মতে।

ঘুম ভাঙতেই নয়নচাঁদ চারদিকে চেয়ে দেখলেন। রাত্রিবেলা এমনিতেই নানা রকমের শব্দ হয়। ইঁদুর দৌড়োয়, আরশোলা খরখর করে, কাঠের জোড় পটপট করে ছাড়ে, হাওয়ায় কাগজ ওড়ে, আরও কত কী। তাই নয়নচাঁদ তেমন ভয় পেলেন না। তবে আধো ঘুমের মধ্যে তার মনে হয়েছিল, শব্দটা হলো জানালায়। জানালার শিক-এ যেন টুং করে কেউ

বিছানার মাথার দিকেই জানালা, জানালার পাশেই একটা টেবিল। তাতে ঢাকা দেওয়া জলের গেলাস। নয়নচাঁদ টর্চ জ্বেলে জলের গেলাসটার একটা ঢিল মেরেছিল দিকে হাত বাড়িয়েই থমকে গেলেন। টেবিলের ওপর একটা কাগজের মোড়ক পড়ে আছে।

নয়নচাঁদ উঠে বড় বাতি জ্বেলে মোড়টা খুললেন। যা ভেবেছেন তাই। ঢিলে জড়িয়ে কে একখানা চিঠি পাঠিয়েছে তাঁকে, সাদামাটা একখানা কাগজে লাল অক্ষরে লেখা : নয়নচাঁদ, আমাকে মনে আছে? সামান্য দেনার দায়ে আমার ভিটেয় ঘুঘু চরিয়েছিলে। শেষ অবধি গলায় গামছা বেঁধে আমাকে আত্মহত্যা

করতে হয়। আমার বউ আর বাচ্চারা ভিখিরি হয়ে সেই থেকে পথে পথে ঘুরছে। অনেক সহ্য করেছি, আর না। আগামী অমাবস্যায় তোমার ঘাড় মটকাবো। ততদিনে ভাল মন্দ খেয়ে নাও। ফুর্তি করো, গাও, নাচো, হাসো। বেশী দিন তো আর নয়। ইতি তোমার যম জনার্দন।

নয়নাদ ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলেন। তার শিথিল হাত থেকে চিঠিটা পড়ে গেল। চাকরবাকর, বউ, ছেলেমেয়েদের ডাকার চেষ্টা করলেন। গলা দিয়ে স্বর বেরোলো না।

জনার্দনকে খুব মনে আছে নয়নচাঁদের। নিরীহ গোছের মানুষ। তবে বেশ খরচের হাত ছিল। প্রায়ই হ্যাণ্ড নোট লিখে নয়নাদের কাছ থেকে চড়া সুদে টাকা ধার করত। কখনও টাকা শোধ দিতে পারেনি। নয়নচাঁদ মামলায় জিতে লোকটার বাড়িঘর সব দখল করে নেয়। জনার্দন সেই দুঃখে বিবাগী হয়ে কোথায় চলে যায়। মাসখানেক বাদে নদীর ওপাড়ে এক জঙ্গলের মধ্যে একটা আমড়া গাছের ডাল থেকে ঝুলন্ত অবস্থায় তার পচা গলা লাশটা পাওয়া যায়। তার বউ ছেলেপিলেদের কী হয়েছে তা অবশ্য নয়নাদ জানেন না। সেই ঘটনার পর বছর তিন চার কেটে গেছে।

নয়নচাঁদের ভূতের ভয় আছে। তাছাড়া অপঘাতকেও তিনি খুবই ভয় পান। খানিকক্ষণ বাদে শরীরের কাঁপুনিটা একটু কমলে তিনি জল খেলেন এবং বাড়ির লোকজনকে ডাকলেন। রাত্রে আর কেউ ঘুমাতে পারল না! এই রহস্যময় চিঠি নিয়ে উত্তেজিত আলোচনা গবেষণা হতে লাগল।

পরদিন সকালে গোয়েন্দা বরদাচরণকে ডেকে পাঠানো হলো। গোয়েন্দা বরদাচরণ পাড়ারই লোক।

বরদাচরণ লোকটা একটু অদ্ভুত। স্বাভাবিক নিয়মে কোনও কাজ করতে তিনি ভালবাসেন না। তার সব কাজেই একটা বৈশিষ্ট্য আছে। এই যেমন কোনও বাড়িতে গেলে তিনি কখনও সদর দরজা দিয়ে সেই বাড়িতে ঢুকবেন না। এমন কি খিড়কি দরজা দিয়েও না। তিনি হয় পাঁচিল টপকাবেন, নয়তো গাছ বেয়ে উঠে ছাদ বেয়ে নামবেন। এমন কি জানালা ভেঙেও তাঁকে ঢুকতে দেখা গেছে।

নয়নাদের বাড়িতে বরদা ঢুকলেন টারজানের কায়দায়। বাড়ির কাছেই একটা মস্ত বটগাছ আছে। সেই বটের একটা ঝুরি ধরে কষে খানিকটা ঝুল খেয়ে বরদা

পাশের একটা জাম গাছের ডাল ধরলেন। সেটা থেকে লাফিয়ে পড়লেন একটা চালতা গাছে। সেখান থেকে নয়নাদের বাড়ির পাঁচিল ডিঙিয়ে অবশেষে একটা রেইন পাইপ ধরে তিনতলার জানালায় উঁকি দিয়ে হাসিমুখে বললেন, "এই যে নয়নবাবু, কী হয়েছে বলুন তো?"

জানালায় আচমকা বরদাচরণকে দেখে নয়নচাঁদ ভিরমি খেয়ে প্রথমটায় গোঁ গোঁ করতে লাগলেন। চোখেমুখে জলের ঝাঁপটা দিয়ে তাঁকে ফের সামাল দেওয়া হলো। বরদাচরণ ততক্ষণে ধৈর্যের সঙ্গে জানালার বাইরে পাইপ ধরে ঝুলে রইলেন।

অবশেষে যখন ঘটনাটা বরদাচরণকে বলতে পারলেন নয়নাদ তখন বরদা খুব গম্ভীর মুখে বললেন, "তাহলে এ জানালাটাই! এটা দিয়েই ঢিলে বাঁধা চিঠিটা ছোঁড়া হয়েছিল তো?"

"হ্যাঁ বাবা বরদা।"

জানালাটা খুব নিবিষ্টভাবে পরীক্ষা করে বরদা বললেন, "হুম, অনেকদিন জানালাটা রং করাননি দেখছি।"

"না। খামোখা পয়সা খরচ করে কী হবে? জানালা রং করালেও আলো হাওয়া আসবে, না করালেও আসবে। বুটমুট খরচ করতে যাবো কেন?"

"তার মানে আপনি খুব কৃপণ লোক, তাই না?"

"কৃপণ নই বাবা, লোকে বাড়িয়ে বলে। তবে হিসেবী বলতে পারো।"

"কাল রাতে আপনি কী খেয়েছিলেন?"

"কেন বাবা বরদা, রোজ যা খাই তাই খেয়েছি। দুখানা রুটি আর কুমড়োর হেঁচকি।"

বরদাচরণ গম্ভীর হয়ে বললেন, "আপনি খুবই কৃপণ। ভীষণ কৃপণ।"

"না বাবা, কৃপণ নই! হিসেবী বলতে পারো।"

"আমার ফিস কত জানেন? পাঁচশো টাকা, আর খরচপাতি যা লাগে।"

নয়নাদ ফের ভিরমি খেলেন। এবার জ্ঞান ফিরতে তার কিছুক্ষণ সময়ও লাগল।

বরদা বিরক্ত হয়ে বললেন, "কৃপণ বা হিসেবী বললে আপনাকে কিছুই বলা হয় না। আপনি যাচ্ছেতাই রকমের কৃপণ। বোধহয় পৃথিবীর সবচেয়ে কৃপণ লোক আপনিই।"

নয়নচাঁদ মুখখানা ব্যাজার করে বললেন, "পাড়ার লোক হয়ে তুমি পাঁচশো টাকা চাইতে পারলে? তোমার ধর্মে সইল?"

"আপনার প্রাণের দাম কি তার চেয়ে বেশী নয়?"

"কিছু কমই হবে বাবা। হিসেব করে দেখেছি আমার প্রাণের দাম আড়াইশো টাকার বেশী নয়।"

"তবে আমি বললুম, ভিজিট বাবদ কুড়িটা টাকা আমার বাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন।"

নয়নচাঁদ আঁতকে উঠে বললেন, "যেও না বাবা বরদা, ওই পাঁচশো টাকাই দেবোখন।"

বরদাচরণ এবার পাইপ বেয়ে নেমে সিঁড়ি বেয়ে ঘরে এসে উঠলেন। হাত বাড়িয়ে বললেন, "চিঠিটা দেখি।"

চিঠিটা নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবটা পড়লেন। কালিটা পরীক্ষা করলেন। কাগজটা পরীক্ষা করলেন। আতসকাঁচ দিয়ে অক্ষরগুলো দেখলেন ভাল করে। তারপর নয়নাদের দিকে চেয়ে বললেন, "এটা কি জনার্দনেরই হাতের লেখা?"।

"ঠিক বুঝতে পারছি না। জনার্দন কয়েকটা হ্যাণ্ডনোট আমাকে লিখে দিয়েছিল। সেই লেখার সঙ্গে অনেকটা মিল আছে।"

বরদা বললেন, "হুঁ মনে হচ্ছে গামছাটা তেমন টেকসই ছিল না।"

"তবে মানে কী বাবা? এখানে গামছার কথা ওঠে কেন?"

"গামছাই আসল। জনার্দন গলায় গামছা বেঁধে ফঁসে লটকেছিল তো! মনে হচ্ছে গামছা ছিঁড়ে সে পড়ে যায় এবং বেঁচেও যায়। এ চিঠি যদি তারই লেখা হয়ে থাকে

তো বিপদের কথা! আপনি বরং কটা দিন একটু ভাল খাওয়া-দাওয়া করুন। আমোদ-আহ্লাদও করে নিন প্রাণভরে।”

“তার অর্থ কী বাবা। কী বলছো সব? আমি জীবনে কখনও ফুর্তি করিনি। তা জানো?”

“জানি বলেই বলছি। টাকার পাহাড়ের ওপর শকুনের মতো বসে থাকা কি ভাল? অমাবস্যার তো আর দেরিও নেই।”

নয়নচাঁদ বাক্যহারা হয়ে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, “জনার্দন যে মরেছে তার সাক্ষীসাবুদ আছে। লাশটা সনাক্ত করেছিল তার আত্মীয়রাই।”

“তবে তো আরও বিপদের কথা। এ যদি ভূতের চিঠি হয়ে থাকে তবে আমাদের তো কিছুই করার নেই।”

নয়নাদ এবার ভ্যাক করে কেঁদে উঠে বললেন, “প্রাণটা বাঁচাও বাবা বরদা, যা বলো তাই করি।”

বরদা এবার একটু ভাবলেন। তারপর মাথাটা নেড়ে বললেন, “ঠিক আছে, দেখছি।”

এই বলে বরদাচরণ বেরিয়ে গেলেন। ফিরে এলেন তিন দিন পর। মাথার চুল উসকোখুসকো, গায়ে ধুলো, চোখ লাল। বললেন “পেয়েছি।”

নয়নাদ আশান্বিত হয়ে বললেন, “পেরেছো ব্যাটাকে ধরতে? যাক বাঁচা গেল।”

বরদা মাথা নেড়ে বললেন, “তাকে ধরা অত সহজ নয়। তবে জনার্দনের বউ ছেলে মেয়ের খোঁজ পেয়েছি। এই শহরেরই একটা নোংরা বস্তিতে থাকে, ভিক্ষে-সিক্ষে করে পরের বাড়িতে ঝি চাকর খেটে কোনও রকমে বেঁচে আছে।”

“অ, কিন্তু সে খবরে আমাদের কাজ কী?”

বরদা কটমট করে চেয়ে থেকে বললেন, “চিঠিটা যদি ভাল করে পড়ে থাকেন তবে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন, ভূতটার কেন আপনার ওপর রাগ! তার বউ ছেলে মেয়ে ভিখিরি হয়ে যাওয়াটা সে সহ্য করতে পারছে না।”

“তা বটে।”

“যদি বাঁচতে চান তো তাদের আগে ব্যবস্থা করুন।”

“কী ব্যবস্থা বাবা বরদা?”

“তাদের বাড়ি ঘর ফিরিয়ে দিন। আর যা সব ক্রোক করেছিলেন তাও।”

“ওরে বাবা! তার চেয়ে যে মরাই ভাল।”

“আপনি চ্যাম্পিয়ন।”

“কিসে বাবা বরদা!”

“কিপটেমিতে। আচ্ছা আসি, আমার কিছু করার নেই কিন্তু।”

“দাঁড়াও দাঁড়াও। অত চটো কেন? জনার্দনের পরিবারকে সব ফিরিয়ে দিলে কিছু হবে?”

‘মনে হয় হবে। তারপর আমি তো আছিই।”

একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নয়নচাঁদ বললেন, “তাহলে তাই হবে বাবা।”

অমাবস্যার আর দেরী নেই। মাঝখানে মোটে সাতটা দিন। নয়নচাঁদ জনার্দনের ঘরবাড়ি, জমিজমা, ঘটিবাটি এবং সোনাদানা সবই তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিলেন। জনার্দনের বউ আনন্দে কেঁদে ফেলল। ছেলেমেয়েগুলো বিহ্বল হয়ে গেল।

বরদা নয়নচাঁদকে বললেন, “আজ রাতে রুটির বদলে ভাল করে পরোটা খাবেন। সঙ্গে ছানার ডালনা আর পায়েস।”

“বলো কী?”

“যা বলছি তাই করতে হবে। আপনার প্রেশার খুব লো। শক টক খেলে মরে যাবেন।”

"তাই হবে বাবা বরদা। যা বলবে করব। শুধু প্রাণটা দেখো।"

নয়নচাঁদ পরোটা খেয়ে দেখলেন, বেশ লাগে। কোনোদিন খাননি। ছানার ডালনা খেয়ে আনন্দে তার চোখে জল এসে গেল। আর পায়েস খেতে খেতে পূর্বজন্মের কথাই মনে পড়ে গেল তার। না, পৃথিবী জায়গাটা বেশ ভালই।

সকালবেলাতেই বরদা জানালা দিয়ে উঁকি মারলেন।

"এই যে নয়নচাঁদবাবু, কেমন লাগছে?"

"গায়ে বেশ বল পাচ্ছি বাবা। পেটটাও ভুটভাট করছে না তেমন।"

"আপনার কাছারিঘরে বসে কাগজপত্র সব দেখলাম। আরও দশটা পরিবার আপনার জন্য পথে বসেছে। তাদের সব সম্পত্তি ফিরিয়ে না দিলে কেসটা হাতে রাখতে পারব না।"

"বলো কী বাবা বরদা? এরপর যে আমিই পথে বসব।"

"প্রাণটা তো আগে।"

কী আর করেন, নয়নাদ বাকি দশটা পরিবারের যা কিছু দেনার দায়ে দখল করেছিলেন তা সবই ফিরিয়ে দিলেন। মনটা একটু দমে গেল বটে, কিন্তু ঘুমটা হলো রাত্রে।

অমাবস্যা এসে পড়ল প্রায়। আজ রাত কাটলেই কাল অমাবস্যা লাগবে।

সন্ধ্যেবেলা বরদা এসে বললেন, "কেমন লাগছে নয়নচাঁদবাবু, ভয় পাচ্ছেন না তো?"

'ভয়ে শুকিয়ে যাচ্ছি বাবা।"

"ভয় পাবেন না। আজ রাত্রে আরও দুখানা পরোটা বেশী খাবেন। কাল সকালে যত ভিখিরি আসবে কাউকে ফেরাবেন না। মনে থাকবে?"

নয়নচাঁদ হাঁপছাড়া গলায় বললেন, "তাই হবে বাবা, তাই হবে। সব বিলিয়ে দিয়ে লেংটি পরে হিমালয়ে চলে যাব, যদি তাতে তোমার সাধ মেটে।"

পরদিন সকালে উঠে নয়নচাঁদের চক্ষু চড়ক গাছ। ভিক্ষে দেওয়া হয় না বলে এ বাড়িতে কখনও ভিখিরি আসে না। কিন্তু সকালে নয়নচাঁদ দেখেন, বাড়ির সামনে শয়ে শয়ে ভিখিরি জুটেছে। দেখে নয়নচাঁদ মূর্ছা গেলেন। মূর্ছা ভাঙার পর বেজার মুখে উঠলেন। সিন্দুক খুলে টাকা বের করে চাকরকে দিয়ে ভাঙিয়ে আনলেন। ভিখিরিরা যখন বিদেয় নিল তখন নয়নাদের হাজার খানেক টাকা খসে গেছে।

নয়নচাঁদ মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন অনেকক্ষণ। হাজার টাকা যে অনেক টাকা!

দুপুরে একরকম উপোস করেই কাটালেন নয়নচাঁদ। টাকার শোক তো কম নয়।

নিজের ঘরে শুয়ে থেকে একটু তন্দ্রাও এসে গিয়েছিল। যখন তন্দ্রা ভাঙল তখন চারদিকে অমাবস্যার অন্ধকার। ঘরে কেউ আলোও দিয়ে যায়নি। আতঙ্কে অস্থির হয়ে নয়নচাঁদ চেঁচালেন, "ওরে কে আছিস?"

কেউ জবাব দিল না।

ঘাড়টা কেমন সুড়সুড় করছিল নয়নাদের। বুকটা ছমছম। চারদিকে কিসের যেন একটা ষড়যন্ত্র চলছে অদৃশ্যে। ফিসফাস কথাও শুনতে পাচ্ছেন।

নয়নচাঁদ সভয়ে কাঠ হয়ে জানালাটার দিকে চেয়ে রইলেন। হঠাৎ সেই অন্ধকার জানালায় একটা ছায়ামূর্তি উঠে এল।

নয়নাদ আর সহ্য করতে পারলেন না। হঠাৎ তেড়ে উঠে জানালার কাছে ধেয়ে গিয়ে বললেন, "কেন রে ভূতের পো, আর কোন্ পাপটা আছে আমার শুনি? আর কোন্ কর্মফল বাকি আছে? হোড়াই পরোয়া করি তোর?"

একটা টর্চের আলোয় ঘরটা ভরে গেল হঠাৎ। জানালার বাইরে থেকে বরদাচরণ বললেন, "ঠিকই বলেছেন নয়নবাবু। আপনার আর পাপটাপ নেই। ঘাড়ও কেউ মটকাবে না। অমাবস্যা একটু আগেই ছেড়ে গেছে।"

"বটে?"

"তবে ফের অমাবস্যা আসতে আর কতক্ষণ? এবার থেকে যেমন। চালাচ্ছেন তেমনি চালিয়ে যান। সকালে ভিখিরি বিদেয়, দুপুরে ভরপেট খাওয়া, বিকেলে

দানধ্যান সৎচিন্তা, রাত্রে পরোটা, মনে থাকবে?"

নয়নাদ একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন, "থাকবে বাবা থাকবে।"

# নিশি কবরেজ

---

**নিশি কবরেজ**

হারানো একটা পুঁথিতে নিশি কবরেজ একটা ভারী জব্বর নিদান পেয়েছেন। গাঁটের ব্যথার যম। তবে মুশকিল হলো পাঁচনটা তৈরি করতে যে পাঁচরকম জিনিস লাগে তার চারটে যোগাড় করা যায়। কিন্তু পাঁচ নম্বরটাই গোলমেলে। পাঁচ নম্বর জিনিসটা হচ্ছে আধ ছটাক ভূত।

নিশি কবরেজ রাতে খাওয়ার পর দাওয়ায় দাঁড়িয়ে আচমন করছিলেন। ঘুটঘুট্টি অন্ধকার রাত্রি। চারদিক নিঃঝুম। শীতকালের কুয়াশা আর ঠাণ্ডাটাও জেঁকে পড়েছে। আঁচাতে আঁচাতে নিশি কবরেজ পাঁচনটার কথাই ভাবছিলেন। রাজবল্লভবাবু বিরাট বড়লোক! কিন্তু গাঁটের ব্যথায় শয্যাশায়ী। ব্যথাটা আরাম করতে পারলে রাজবল্লভবাবু হাজার টাকা অবধি দিতে রাজি বলে নিজে মুখে কবুল করেছেন। কিন্তু ভূতটাই সব মাটি করলে। আধ ছটাক ভূত এখন পান কোথায়? হঠাৎ নিশি কবরেজের মনে হলো, উঠোনের ওপাশটায় হাঁসের ঘরের পাশটায় কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

–কে রে? ওখানে কে?

কেউ জবাব দিল না।

নিশি কবরেজ জলের ঘটিটা ঘরে রেখে হ্যারিকেন আর লাঠিগাছাটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। দিনকাল ভাল নয়। চোর ছ্যাচড়ের দারুণ উপদ্রব। ঘরে কিছু কাঁচা টাকাও আছে। সোনাদানাও মন্দ নেই।

বাঁহাতে হ্যারিকেনটা তুলে ডানহাতের লাঠিটা নাচাতে নাচাতে কয়েক পা এগোতেই উঠোনের ওপাশ থেকে একটু গলা খাঁকারির বিনয়ী শব্দ হলো। চোরের

তো গলা খাঁকারি দেওয়ার কথা নয়।

–কে রে? ওখানে কে? ওপাশ থেকে খোনাসুরে জবাব এল। ইয়ে, আমি হলুম গে রামহরি–না, না, থুড়ি, আমি হলুম ধনঞ্জয়।

নিশি কবরেজ আলোটা ভাল করে তুলে ধরে লোকটাকে দেখার চেষ্টা করতে করতে বললেন, রামহরি বা ধনঞ্জয় নামে এ গাঁয়ে আবার কে আছে? কোথা থেকে আসা হচ্ছে শুনি? দরকারটাই বা কী? রুগী দেখতে হলে রাতে বিশেষ সুবিধা হবে না বলে রাখছি। দিনেরবেলা এস।

কে যেন বলে উঠল, আজ্ঞে ওসব কিছু নয়।

নিশি কবরেজ লোকটাকে ঠিক ঠাহর করতে পারছেন না। তার চোখের জোর কিছু কম নয়। হ্যারিকেনেও কালি পড়েনি। তবু ভালমতো লোকটাকে দেখতে পাচ্ছেন না। শুধু বুঝতে পারছেন, হাঁসের ঘরের পাশে খুব কালো একটা লম্বাপানা ছায়া ছায়া কী যেন।

নিশি কবরেজ মনে মনে ভাবলেন, এঃ চোখের বোধহয় বারটা বাজল এতদিনে। না, কাল থেকে চোখে তিন বেলা ত্রিফলার জল দিতে হবে।

নিশি কবরেজ বললেন, রুগীর ব্যাপার নয় তো এত রাতে চাও কি? চোরটোর নও তো বাপু?

–আজ্ঞে না, চোর-ডাকাত হওয়ার উপায়ও নেই কিনা। একটা সমস্যা নিয়ে আপনার কাছে এসেছিলুম আজ্ঞে।

–সমস্যাটা কী?

–আজ্ঞে বলে দিতে হবে যে আমি রামহরি, না ধনঞ্জয়। নিশি কবরেজ খ্যাক করে উঠে বললেন, ইয়ার্কি হচ্ছে? তুমি রামহরি ধনঞ্জয় তা আমি কি করে বলব? আমি তোমাকে চিনিই না।

–আজ্ঞে আপনি আমাদের চেনেন–থুড়ি-চিনতেন! আমরা দুজনেই গেলবার ওলাউঠায় মরলুম, মনে নেই? আপনার পাঁচন ফেল মারল।

নিশি কবরেজ আঁতকে উঠে বললেন, তোমরা? ওরে বাবা!

–আজ্ঞে ভয় খাবেন না। আমরা ভারি দুর্বল জিনিস। নিশি কবরেজ কাঁপতে কাঁপতে বললেন, পাঁচনের দোষ নেই বাবা, সবই কপালের ফের। আমাকে তোমরা মাপ কর।

–আজ্ঞে সেজন্য আপনাকে আমি দুষতে আসিনি। ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু সমস্যা একটা দেখা দিয়েছে। ভূত হওয়ার পর আমরা সব কেমন যেন ধোঁয়াটে মার্কা হয়ে গেলুম। শরীর-টরীর নেই, তবু কী করে যেন আছি। তা আমরা অর্থাৎ আমি আর ধনঞ্জয়–মানে আমি আর রামহরিমানে কে যে কোন্ জন তা বলা মুশকিল–তা আমরা দুজন খুব মাখামাখি করি। খুব বন্ধুত্ব ছিল তো দুজনে। এ ওর শরীরে ঢুকে যাই, ও এর শরীরে মিশে যায়। কিন্তু ওই মাখামাখি করতে গিয়েই কে যে কোন্ জন তা গুলিয়ে গেছে।

–বল কী?

— আজ্ঞে সেই কথাটাই তো বলতে আসা। দুজনে প্রায়ই ঝগড়া লেগে যাচ্ছে। কখনও আমি বলি যে, আমি রামহরি, ও ধনঞ্জয়। কখন ও বলে

যে, ও রামহরি আর আমি ধনঞ্জয়।

নিশি কবরেজ এই শীতেও ঘামছিলেন। হাতের হ্যারিকেন আর লাঠি দুই-ই ঠকঠক করে কাঁপছে। পেটের ভেতরে গুড়গুড় করছে। মাথা ঘুরছে। কিন্তু হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, গাঁটের ব্যথার পাঁচনটার জন্য আধ ছটাক ভূত লাগবে।

নিশি কবরেজ এক গাল হাসলেন। তার হাত পায়ের কাপুনি বন্ধ হলো। গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, এ আর বেশি কথা কী? তবে এখন তোমার যেমন বেগুন পোড়ার মতো চেহারা হয়েছে তাতে তো কিছু বোঝবার উপায় নেই। একটু ধৌতি দরকার। বেশি কষ্ট হবে না। একটা পাঁচনের মধ্যে মিনিট দশেক সেদ্ধ করে নেব তোমাকে, তাতেই আসল চেহারাটা বেরিয়ে আসবে।

বটে!–বলে কালো জিনিসটা এগিয়ে এল।

নিশি কবরেজ আর দেরি করলেন না। নিশুতিরাতেই পাঁচনটা উনুনে বসিয়ে কোমর বেঁধে লেগে গেলেন। ভূতটা সেদ্ধ হতে হতে মাঝখানেই মাথা তুলে বলে,

হলো?

নিশি কবরেজ অমনি কাঠের হাতাটা দিয়ে সেটাকে ঠেসে দিতে দিতে বলেন, হচ্ছে হে হচ্ছে। তাড়াহুড়ো করলে কি হয়? তোমার তো আর গায়ে ফোস্কা পড়ছে না হে!

পাঁচনটা ভোররাতে তৈরি হয়ে গেল। আর আশ্চর্যের বিষয় ভূতের ঝুলকালো রংটাও একটু ফ্যাকাসে মারল। নিশি কবরেজ খুব ভাল করে জিনিসটাকে নিরীক্ষণ করে বললেন, আরে, তুমি তো রামহরি!

ভুতটা একথায় ভারি খুশি হয়ে বলল, আজ্ঞে বাঁচালেন, ধনঞ্জয়ের কাছে রামহরি গোটা তিনেক টাকা পেত কিনা। ভারি দুশ্চিন্তা ছিল আমার। পেন্নাম হই আজ্ঞে বলে ভূতটা মিশে গেল।

নিশি কবরেজ পাঁচনটা বোতলে পুরে নিশ্চিন্ত মনে তামাক খেতে বসলেন, বড্ড ধকল গেছে।

# পকেটমার

**পকেটমার**

হরবাবুর সঙ্গে কুঞ্জ সেনের বাজারেই দেখা হয়ে গেল। দুজনেই পুরোনো বন্ধু। হরবাবু এখানে ছিলেন না। মঙ্গলগ্রহের মাটিতে চাষবাস নিয়ে গবেষণা করছিলেন। কুঞ্জ সেন ছিলেন আরও দূরে। নেপচুনের চারদিকে আবহমণ্ডল রচনার গুরুতর কাজে প্রায় ত্রিশ বছর সেখানে থাকতে হয়েছে। গড়িয়াহাট বাজারে দুজনের দেখা হয়ে গেল এক সকালবেলায়।

আরে! হর যে?

কুঞ্জ না? কী খবর?

ভারী খুশি হলেন দু'জনে। পুরোনো দিনের কথাবার্তা হল খানিকক্ষণ। কুঞ্জ সেন বললেন, সবই পাল্টে গেছে হে! এই গড়িয়াহাটে মার্কেট মাত্র ত্রিশ বছর আগেও ছিল একশ তিনতলা একটা ছোটো বাড়ি। এখন দেখ তো কেমন তিনশ তলা অবধি তুলে ফেলেছে।

হরবাবু বললেন শুধু কী তাই! আগে দু'চারটে রোবট দোকানদার ছিল। এখন সবকটাই রোবট। আর এরা ভারী বেরসিক। সবজি বাজারে একটা রোবটকে ডাঁটার দর দু'টাকা কমাতে বলেছি। অমনি মুখখানা এমন আঁশটে করে ঘসকে ছিল যে অপমান বোধ করলুম।

কুঞ্জ যেন একটা শ্বাস ফেলে বললেন, দর বেশ চড়া। ত্রিশ বছর আগে কুঁচো চিংড়ির দর ছিল আড়াই হাজার টাকা কিলো। এখন পাঁচ হাজারের নীচ পাবে না। নেপচুনে তো এখনও চাষবাস ইত্যাদি শুরু হয়নি। ভ্যাকুয়াম প্যাকের খাবার খেয়ে খেয়ে পেটে চড়া পড়ে গেল। তাই ভাবছিলুম একটু পালং-চিংড়ির ঘণ্ট খাবো।

হরবাবু একগাল হেসে বললেন, আমাদের মঙ্গলে ভায়া, সমস্যা নেই। গ্রিণ হাউসে দিব্যি সবজির চাষ হয়। মাছের ব্যবস্থাও হয়েছে। সব টাটকা।

তোমার কপাল ভাল। তা কদিন থাকবে এখানে?

দেখি। মঙ্গল থেকে বৃহস্পতি বা অন্য কোথাও পাঠাতে পারে। তোমার নেপচুনে থাকার মেয়াদ আর কত দিনের?

হয়ে এল। সামনের বছরেই চাদে চলে আসছি। ওখানে একটু জমি কিনে বাড়িও করে রেখেছি আগে থেকে।

ভালো করেছে। থাকার পক্ষে চাঁদই এখন ভাল। পৃথিবীর পলিউশনটা ওখানে নেই। দিব্যি গাছপালা হয়েছে। রাস্তাঘাট ভাল। পৃথিবীর সব জিনিসই পাওয়া যায়। আমিও ভাবছি একটু জমি কিনে রাখব।

চলে এসো চাঁদে। জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে রোজ।

গল্প করতে করতে দুই বন্ধুতে একটা দোকানে গিয়ে ঢুকলেন। বড় মুদির দোকান। খদ্দের গিজগিজ করছে। চারটে রোবট হিমশিম খাচ্ছে খদ্দের সামলাতে।

হরবাবু বললেন, ভীড় দেখেছো? পৃথিবীর জনসংখ্যা বেড়ে গেল নাকি?

না হে। এসবই গ্রহান্তর থেকে আসা প্রবাসী। যাওয়ার আগে জিনিসপত্র কিনে নিচ্ছে। তা তুমি কী নেবে?

হরবাবু বললেন, দুশো গ্রাম পোস্ত নেবো, একটু ছুঁড়ো হলুদ আর গরম মশলা।

আমি নেবো ধনে, জিরে, আদা, নুন আর সর্ষের তেল। ওহে ও রোবট ভায়া, এই আমার ফর্দখানা নেবে নাকি?

রোবট গম্ভীর গলায় বলে, একটু দাঁড়াতে হবে।

দোকানটা বেশ বড়, ছিমছাম। পলিপ্যাকে সাজানো সব জিনিস। ভীড়টা একটু পাতলা হতেই দু’জনে জিনিস কিনে দাম মেটাতে গেলেন।

দাম দিতে গিয়েই হরবাবু আর্তনাদ করে উঠলেন, এই রে! আমার মানিব্যাগ! সর্বনাশ, আমার যে পকেটমার হয়ে গেছে!

কুঞ্জবাবু তাড়াতাড়ি নিজের পকেটে হাত দিয়ে বলে উঠলেন, আরে! আমারটাও যে গেছে হে!

ক্যাশ রোবট বিরক্ত হয়ে বলল, ক্রেডিট কার্ডে দাম দিয়ে জিনিস ডেলিভারি নিন না! কাউন্টার আটকে রাখবেন না, পিছনে ভীড় হয়ে যাচ্ছে।

দু'জনে চাওয়া-চাওয়ি করলেন। কুঞ্জবাবু বললেন, ক্রেডিট কার্ড করা ই হয়নি। দু-চারদিনের জন্য আসা, ওসব ঝামেলা কে করে?

দু'জনেই দোকানের প্রবেশপথের পাশে "পুলিশ" লেখা কোন যন্ত্রে বার্তা পাঠিয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই উড়ন্ত পুলিশের দু'জন কনস্টেবল আকাশ থেকে নেমে এল। জিজ্ঞাসাবাদের পর সব টুকে নিয়ে বলল, পাকা হাতে কাজ।

কুঞ্জবাবু উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, পাওয়া যাবে তো!

একজন কনস্টেবল বলে, পাওয়া যেত, যদি পকেটমার মানুষ হত। আজকাল মানুষের ছদ্মবেশে কত রোবট পকেটমার ঘুরে বেড়াচ্ছে তার হিসেব নেই। দেখলে বুঝতেও পারবেন না। এদের কাজ এত পাকা যে কোনও সূত্রই রেখে যায় না। তবে আমরা চেষ্টায় আছি।

দুই বন্ধুতে একটু মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন।

কুঞ্জবাবু মুখটা বিকৃত করে বললেন, পৃথিবীটা দিনদিন উচ্ছন্নে যাচ্ছে! এই পঁয়ত্রিশশো পঁচাশি সালেও পকেটমারি চলছে ভাবতে পারো?

হরবাবুও সায় দিয়ে বললেন, যা বলেছো।

# পটকান যখন পটকালো

**পটকান যখন পটকালো**

পটকান পালোয়ান ছিল শেরপুরের গর্ব। সে চেহারা না দেখলে বিশ্বাস হয় না। ষাট ইঞ্চি বুক, আশি ইঞ্চি পেট, গরিলার মতো হাত পা। শরীরটার কোথাও কোনোও ভেজাল নেই। ভুঁড়িখানা ঢালের মতো শক্ত। পটকান পালোয়ান ভূঁড়ি দিয়ে বিস্তর কুস্তিগিরকে চেপে দমসম করে

তিন কুলে পটকান পালোয়ানের কেউ ছিল না। খুব অল্পবয়স থেকে ভীষণ খাই খাই ছিল বলে খিটখিটে বাপ তাকে ঘর থেকে বের করে দেয়। সেই থেকে পটকান বিবাগী। অবশ্য সে বাপ এখন নেই, মাও গত হয়েছেন। পটকান তাই একা আনন্দে থাকে। সকালে দঙ্গলে গিয়ে তেল মাটি মাখে, কসরৎ করে, মুগুর ভঁজে। অসংখ্য ডন-বৈঠক দেয়। একসের ছোলা দিয়ে সকালে জল খায়। বেলা পড়লে রুটির পাহাড় মাংসের পর্বত দিয়ে শেষ করে। বিকেলে একপুকুর দুধ আর এক গামলা বাদাম বাটা খায়, রাতে ফের ঘিয়ের পরোটার বংশ লোপ করে চারটে মুরগি দিয়ে। এর ফাঁকে ফাঁকে এন্তার ডিম, সবজি, মিছরি, শরবৎ চালান হয়ে যায় তার অজান্তে। এসব ছোটোখাটো খাবারগুলো সে খাওয়ার মধ্যে ধরে না।

পটকানের সঙ্গে সেবার লড়তে এল পাঞ্জাবের ভীম সিং, তারও বিশাল চেহারা। খাওয়াদাওয়াও প্রায় পটকানের সমান। জমিদারের কাছারি বাড়িতে লোক ভেঙে পড়ল কুস্তি দেখতে। পটকান ভীম সিংকে তিন মিনিটে চিৎ করে হাত ঝেড়ে বলল–ছেঃ! জমিদারের দিকে চেয়ে হাতজোড় করে বলল–হুজুর, বেয়াদবি মাপ করবেন। কিন্তু এসব চ্যাংড়া প্যাংড়ার সঙ্গে লড়ার জন্য আমাকে ডাকা কেন?

সবাই ভাবে, ঠিক কথা, কিন্তু মুশকিল হলো পটকান লড়বেই বা কার সঙ্গে? দেশ বিদেশ থেকে যারাই লড়তে আসে, সে যত বড় ওস্তাদই হোক, পটকান তিন

মিনিটের বেশি সময় নেয় না। লড়াইয়ের শেষে আবার বলে–ছছাঃ! জমিদারের দিকে চেয়ে অভিমানের সঙ্গে বলে– আনাড়িদের সঙ্গেই কি আমাকে বরাবর লড়তে হবে হুজুর?

জমিদারমশাই মহা সমস্যায় পড়ে বললেন–তা বাপু, তোমার যোগ্য কুস্তিগির পাই কোথায়? এঁরা যারা আসছেন লড়তে তারাও সব নাম ডাকের লোক, কিন্তু তোমার কাছে কেউই ধোপে টেকে না দেখি।

–তার চেয়ে হুজুর বন্দোবস্ত করুন ওরা দুজন করে আসুক লড়তে, আমি একা।

তাই হলো। লড়তে এল বচন পাণ্ডে আর হরি দোসাদ। দুজনকে দু বগলে নিয়ে হা হা করে হেসে ওঠে পটকান। তারপর তাদের মাটিতে ফেলে দিয়ে বলেছেঃ ছেঃ! বলে জমিদারবাবুর দিকে তাকায়–হুজুর, দেশে কি আর মানুষ পাওয়া গেল না!

জমিদারমশাই মিইয়ে গিয়ে বললেন–তাই তো! এরা তো দেখছি তেমন কিছু নয়। অথচ শুনেছিলাম এরা কিলিয়ে পাথর ভাঙে, পাঁচ মন ওজন তোলে এক এক হাতে, হাতি বুকে নেয়। সে সব তো গল্প কথা নয় বাপু, নিজের চোখে দেখেই এনেছি। আচ্ছা দেখি তোমার উপযুক্ত যদি কাউকে পাই।

এরপর তিন পালোয়ান লড়তে এল একসঙ্গে। ভীষণ ভীষণ তাদের চেহারা। গোল্লা গোল্লা করে চায় আর দাঁত কিড়মিড় করে। তা সেই তিনজন যখন লড়তে নামল তখন বেলুন চুপসে আমসত্ত্ব হয়ে গেল ফের। তিনটেকে নিয়ে খানিক লোফালুফি খেলল পটকান, চেঁচিয়ে জমিদার মশাইকে বলল–হুজুর, যখন বলবেন তখনই তিনজনকে মাটিতে ফেলব।

ফেললও তাই, তিনবার ছোঃ দিয়ে জমিদারমশাইয়ের দিকে তাকাতেই জমিদারমশাই বেজায় ভয়-খাওয়া মুখ করে মিন মিন করলেন–তাই তো বাপু, এ তো বড় মুশকিলে ফেললে তুমি। খুব বড় একটা শ্বাস ফেলে পটকান বলল– এরকম চললে আমাকে সাধু হয়ে হিমালয়ে চলে যেতে হবে দেখছি।

এই কথায় সবাই ভারী চিন্তিত হয়ে পড়ে। জমিদারমশাইযের একেই হার্টের ব্যামো, বাঁ পায়ে বাত ব্যাধি, রক্তচাপের রোগ, রাত্রে ভাল ঘুম হয় না, পেটটা ভুটভাট করে সব সময়ে। তার ওপরে পটকানের এই কথা শুনে তিনি প্রায় অন্নজল ছাড়েন

আর কি! শেরপুরের গর্ব পটকান পালোয়ান সাধু হয়ে হিমালয়ে চলে গেলে লজ্জার সীমা থাকবে না।

শেরপুরের লোকেরা ভীষণ বিমর্ষ। পটকানের সঙ্গে কেউ লড়ে পারে না সে ঠিক, কিন্তু তা বলে একটু লড়াই হবে তো, কিছুক্ষণ কোস্তাকুস্তি করে তবে চিৎ হবি। এ যেন সব হেরোর দল মাটি নেওয়ার জন্যই আসে। এইসব হেরোর দলকে শেরপুরের লোকেরা হারু বলে উল্লেখ করে। জেতে বলে পটকানের নাম তারা দিয়েছে জিতেন। সবাই বলাবলি করে–জিতেনের সঙ্গে এবার কোন্ হারু লড়তে আসছে রে?

তা এল এবার। সারা দেশে লোক পাঠিয়ে তন্নতন্ন করে খুঁজে মানুষের চেহারার দশজন দানবকে ধরে আনা হলো। তিনদিনে তারা শেরপুরের সব খাবার খেয়ে ফেলল প্রায়। চারদিকে দুর্ভিক্ষের অবস্থা। দশ পালোয়ান বাঘের মতো গর-র-আওয়াজ ছাড়ে, মানুষের ভাষায় কথাই বলে না। দিনমানে তারা নিজেদের সামলাবার জন্য নিজেরাই নিজেদের শেকল দিয়ে বেঁধে রাখে। ভীষণ রাগী, কখন কার ঘাড় মটকে দিয়ে জেল হয়। তবু শেষ রক্ষা হয় না বুঝি। তাদের যে ঘরে থাকতে দেওয়া হয়েছিল তা মজবুত পাকা ঘর। তবু দশ পালোয়ানের নড়াচড়ায় মেঝে দেবে গেল, দেওয়াল ভেঙে গেল একধারের। হাঁকডাকে চারধারে ভূমিকম্প হলো কয়েকবার।

লড়াইয়ের দিন চারটে রথযাত্রার ভীড় ভেঙে পড়ল কাছারি বাড়িতে। হুলুস্থুল কাণ্ড। দশ দানব দঙ্গলের মাটি কাঁপিয়ে এসে ঢুকল একসঙ্গে। দশজনের সঙ্গে একা লড়বে পটকান।

চোখে দেখেও কারো বিশ্বাস হচ্ছিল না ব্যাপারটা। পটকান দঙ্গলে ঢুকে গুরু প্রণামটা সেরে নিল কেবল। তারপরই দেখা গেল সে এক একটা দানবকে ধরে পটাপট ভীড়ের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে, ঠিক যেমন গদাই মালি বাগানের আগাছা তুলে ছুঁড়ে দেয় বেড়ার বাইরে। দু মিনিটে দশ পালোয়ান সাবাড় করে ঠিক দশবার ছোঃ দিল পটকান। তারপর ভীষণ অভিমানের চোখে তাকাল জমিদারমশাইয়ের দিকে। বলল–হুজুর–

রোগা-ভোগা জমিদারমশাইয়ের চোখমুখ লাল হয়ে গেছে অপমানে। তিনি কয়েকবার গলা খাকারি দিলেন।

পটকান বলল, হুজুর, এরা সব কারা এসেছিল হুজুর? এসব রোগা দুবলা তোক কোত্থেকে আনলেন?

হঠাৎ জমিদারমশাই চেঁচিয়ে উঠলেন–চোপরাও বেয়াদব। রোগা দুবলা লোক? আঁ? রোগা দুবলা লোক এরা সব!

বলতে বলতে রাগে দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে জমিদারমশাই বাত ব্যাধির কথা ভুলে, হার্টের ব্যামোর কথা বিস্মরণ হয়ে, রক্তচাপকে পরোয়া না করে, পেটের ভুটভাটকে উপেক্ষা না করে এক লাফে এগিয়ে এলেন দঙ্গলের মাটির ওপর।

কিছুতেই তোমার শিক্ষা হয় না, অ্যাঁ–বলতে বলতে জমিদারমশাই পটকানের ঘাড়টা ধরে এক ঝটকায় তুলে ফেললেন মাথার ওপরে। তারপর সে কী বাই বাই করে ঘোরাতে লাগলেন, না দেখলে বিশ্বাস হয় না।

পটকান প্রাণভয়ে চেঁচাচ্ছে তখন–বাবা গো! গেলাম গোয় মেরে ফেললে গো! কে কোথায় আছো ছুটে এসো!

কে শোনে কার কথা! কয়েকবার আচ্ছাসে ঘুরিয়ে জমিদারমশাই পটকানকে এক বেদম আছাড় মারলেন। তারপর হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন–ছোঃ!

# পটলবাবুর বিপদ

## পটলবাবুর বিপদ

পটলবাবু খুন হয়েছেন, অথচ তার লাশ পাওয়া যাচ্ছে না, এইটেই সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে। খুন হওয়া ব্যাপারটা নিয়ে অবশ্য সন্দেহ নেই। কারণ তাকে খুন করার হুমকি দিয়েছিল ভিমরুল। আর ভিমরুল যদি কাউকে খুন করার হুমকি দেয় তবে সেই লোক নিজেকে নিহত হবে বলে ধরেই নিতে পারে। কারণ, ভিমরুল হল এক সাঙ্ঘাতিক আততায়ী। পুলিশ-টুলিশ তার টিকিরও নাগাল পায় না। অথচ সে বহাল তবিয়তেই তার পছন্দমতো লোককে খুন করে বেড়ায়। তাও আবার আগে থেকে তাকে সতর্ক করে দিয়ে।

পটলবাবু অবশ্য তোক সুবিধের নন। সোনা রুপোর ব্যবসায় তার লাখো-লাখো টাকা আয়। সুদের কারবারও আছে। তা ছাড়া তার আবার একটি পোষা গুণ্ডাবাহিনীও আছে। পটলবাবুর হয়ে এই গুণ্ডাগুলোই আদায় উশুল করে। রথতলা এবং আশপাশের অঞ্চল পটলবাবুর ভয়ে তটস্থ। মাসকয়েক আগে শ্রীমন্ত নামে একটা গরিব লোক বউয়ের গয়না বাঁধা রেখে পটলবাবুর কাছ থেকে পাঁচশো টাকা ধার নিয়েছিল। শোধ দিতে না পারায় কয়েক মাসেই পটলবাবুর নিজস্ব সুদের হারে ধার বেড়ে সুদে আসলে দাঁড়াল পাঁচ হাজার। শ্রীমন্তর তো মাথায় হাত। যাই হোক, হঠাৎ শ্রীমন্ত একটা লটারিতে পাঁচ লাখ টাকা প্রাইজ পেয়ে গেল। আনন্দে সে তখন আত্মহারা। ঠিক সেই সময়ে পটলবাবুর গুণ্ডারা গিয়ে হাজির। তারা বলল, সুদে-আসলে পটলবাবুর পাওনা ওই পাঁচ লাখই দাঁড়িয়েছে। শ্রীমন্তকে মারধর করে তারা লটারির টিকিটটা কেড়ে নিয়ে এল। পটলবাবু দিব্যি হাসতে-হাসতে প্রাইজের টাকাটা বাগিয়ে নিলেন। এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই ভিমরুলের চিঠি এল। সেই মার্কামারা নীল রঙের খামের ওপর একটা ভিমরুলের ছবি। ভেতরে নীল চিরকুটে পরিষ্কার হাতের লেখায় কয়েকটি কথা, “তোমার পাপের সীমা ছাড়িয়েছে। মরার জন্য প্রস্তুত হও। চব্বিশ ঘণ্টার

মধ্যে শ্রীমন্তর পাঁচ লাখ টাকা ও তৎসহ ক্ষমাভিক্ষার মূল্যস্বরূপ আরও দশ হাজার টাকা তাকে প্রত্যর্পণ করতে পারলে ভাল, নইলে আর সাতদিনের মধ্যেই তোমাকে খুন করা হবে।–তোমার যম ভিমরুল।”

ভিমরুলের চিঠি ইয়ার্কির ব্যাপার নয়। সুতরাং উদ্বিগ্ন পটলবাবু পুলিশের কাছে গেলেন।

দারোগাবাবু চিঠিটা তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে হাই তুলে বললেন, “আমাদের কিছু করার নেই মশাই। উড়ো চিঠির পিছনে ছোটা আমাদের কর্ম নয়।”

উত্তেজিত পটলবাবু বললেন, “উড়ো কী মশাই, এ যে ভিমরুলের চিঠি!”

“সে তো জানি মশাই, কিন্তু ঘটনাটা না ঘটলে তো আর কিছু করতে পারি না। আগে ঘটুক তারপর দেখা যাবে।”

আসলে পুলিশও পটলবাবুকে ভাল চোখে দেখে না।

পটলবাবু তখন এসে ধরলেন গোয়েন্দা বরদাচরণকে। “বাবা বরদা, আমি যে মারা পড়তে চলেছি।”

বরদা একটু হেসে বলল, “শুভস্য শীঘ্রম।”

“তার মানে! তুমি কি আমার মৃত্যু চাইছ?”

“ভোট নিলে দেখবেন জনমত তাই চাইছে। তবে আমি গোয়েন্দা। আর্তকে রক্ষা করাই আমার কাজ। দেখি চিঠিটা।”

বরদা চিঠিটা ভাল করে দেখল। নিজের ল্যাবরেটরিতে নিয়ে গিয়ে আঙুলের ছাপ খুঁজল। পেল না। পোষা কুকুর টমিকে চিঠি শুকিয়ে খানিক এদিক ওদিক খুঁজে এল। তারপর চিঠিটা ফেরত দিয়ে বলল, “সাতদিন একটু সাবধানে থাকবেন।”

“সাবধানে থাকব! তুমি তো বলেই খালাস। সাবধানে থাকলেই কি ভিমরুল রেহাই দেবে? সে যে ভিমরুলের মতোই সাত হাত জলের তলায় গিয়ে হুল দেয়।”

“কেন আপনার তো একটা গুণ্ডাবাহিনী আছে বলে শুনেছি। তারাই আপনাকে পাহারা দেবে।”

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পটলবাবু বললেন, “তা তারা দেবে। কিন্তু তারা বেশি বুদ্ধি ধরে না। গায়ের জোর দিয়ে কি আর সব কাজ হয়? শুনেছি ভিমরুল তুখোড় চালাক, কোথা দিয়ে যে তার মৃত্যুবাণ আসবে কে জানে। বাপু বরদাচরণ, তোমাকে মোটা টাকা দেব, আমাকে পাহারা দেওয়ার ভারটা তুমিই নাও।”

বরদাচরণ পটলবাবুকে পছন্দ করে না। তা বলে পটলবাবু খুন হন সেটাও সে চায় না। বলল,”পটলবাবু আমার হাতে এখন অনেক কাজ। চারদিকে অপরাধের সংখ্যা যেমন বাড়ছে গোয়েন্দাদের ব্যস্ততাও তেমনই বাড়ছে। তিনটে দিন কোনওরকমে যদি কাটিয়ে দিতে পারেন তা হলে চতুর্থ দিন থেকে আমি আপনার নিরাপত্তার ভার নেব। আগামী তিনদিন আমি বড়ই ব্যস্ত। তবে আমি বলি কি, ওই বেচারার টাকাগুলো দিয়ে দিলেই তো ল্যাটা চুকে যায়।”

পটলবাবু খ্যাক করে উঠলেন, “হকের টাকা দিয়ে দিলেই হবে? ধর্ম বলে একটা ব্যাপার আছে না?”

“ওঃ তাই তো! ধর্ম বলেও তো একটা কথা আছে।”

পটলবাবু বরদাচরণের ফি বাবদ পাঁচ হাজার টাকা অগ্রিম দিয়ে বিদায় নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। কিন্তু বুকের ধুকধুকুনিটা যাচ্ছে না। রাতে ঘুম আসে না, খিদে পায় না, কাজে মন দিতে পারেন না। তাঁর তিনজন বিশ্বস্ত দেহরক্ষীর মধ্যে ন্যাপা হল প্রাক্তন ব্যাটরাশ্রী। বিশাল চেহারা, যার গায়ে পেশি কিলবিল করছে। দ্বিতীয় দেহরক্ষী হল কুংফু ক্যারাটের ওস্তাদ গুলে। তিন নম্বর দেহরক্ষী স্বর্ণপদকজয়ী মুষ্টিযোদ্ধা হারু। তারা পটলবাবুর কাছ থেকে মোটা বেতন পায়। ষণ্ডা-গুণ্ডার কাজে তারা খুবই দড়। তবে বুদ্ধির ব্যাপারে তাদের খামতি আছে। কিন্তু ভিমরুল অতি বুদ্ধিমান। সে মোটা দাগের কাজ করে না। পটলবাবু খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে রইলেন। স্থির করলেন, তিনদিন আর ঘরের বাইরে যাবেন না ।

দ্বিতীয় দিন সকালে মহীতোষ নামে এক মহাজন এল। মোটা সুদে লাখ টাকা ধার নিয়েছিল। সুদে-আসলে দু'লাখ টাকা শোধ দিতে এসেছে। সঙ্গে দু’জন পাইক।

টাকা-পয়সার লেনদেন হয় নীচের বৈঠকখানার পাশের ঘরে। এ-ঘরে সিন্দুক-টিন্দুক আছে। পটলবাবু তাঁর দেহরক্ষীদের কক্ষনো এ ঘরে ঢুকতে দেন না। লেনদেনের সময় তিনি সবসময়েই একা থাকেন, মক্কেলরাও একাই সে ঘরে ঢুকতে পায়।

পটলবাবু ঘরে ঢুকে মহীতোষকে ডেকে পাঠালেন। কিন্তু মহীতোষ যখন ঘরে ঢুকল তখন পটলবাবুর একগাল মাছি। লোকটা মোটেই মহীতোষ নয়।

পটলবাবু শুধু আঁ-আঁ করে দু'বার চিৎকার করার অবকাশ পেয়েছিলেন। তারপর যে কী হল, তা কেউ জানে না। ঘণ্টাখানেক পরেও ঘর থেকে কেউ বেরোচ্ছে না দেখে বাড়ির লোকজন জড়ো হল। বিস্তর ডাকাডাকি আর চেঁচামেচির পর দরজা ভেঙে দেখা গেল, মহীতোষ নামে আগন্তুক এবং পটলবাবু, কারও চিহ্ন নেই। গণ্ডগোলের সুযোগে মহীতোষের পাইক দু'জনও পালিয়েছে।

ঘরের মোটা গরাদের একটা জানলা ভেঙে। কিন্তু জানলা দিয়ে পটলবাবুকে নিয়ে যদি আততায়ী বেরিয়েও গিয়ে থাকে তা হলেই বা সে কী করে বাড়ির উঁচু পাঁচিল ডিঙোল কিংবা কী করেই বা দারোয়ানের চোখ এড়িয়ে ফটক দিয়ে বেরোল?

পুলিশ এসে সর্বত্র তন্নতন্ন করে খুঁজে বলল, "এটা গুম কেস। খুনের কেস বলা যাবে না।"

যাই হোক, সবাই ধরে নিল শুধু গুম নয়, গুম করে পটলবাবুকে খুনও করা হয়েছে। কারণ ভিমরুলের যেই কথা সেই কাজ। লাশটা অবশ্যই দু চারদিনের মধ্যে পাওয়া যাবে।

কিন্তু একদিন-দু'দিন করে সাতদিন কাটতে চলল। পটলবাবুর লাশের কোনও হদিশ হল না।

পটলবাবুর চার ছেলে গিয়ে বরদাচরণকে ধরে পড়ল, "বাবা আপনার ওপর খুব ভরসা করেছিলেন, কিন্তু আপনি তো বাবাকে রক্ষা করতে পারলেন না। এখন কী হবে?"

বরদাচরণ নানারকম কেস নিয়ে সর্বদাই ভাবিত। গম্ভীর মুখে শুধু বলল, "হুঁ।"

"বাবার লাশটাও যে পাওয়া যাচ্ছে না।"

"হুঁ।"

"ভিমরুলকে ধরার ব্যাপারেও তো কিছু হচ্ছে না।"

"হুঁ।"

বিরক্ত হয়ে পটলবাবুর ছেলেরা ফিরে এল।

গভীর রাত। বরদাচরণ তার দোতলার ঘরে একটা কেস হিস্ট্রি লিখছে। গভীর চিন্তামগ্ন হঠাৎ খোলা জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে একটা ঢিল এসে পড়ল। ঢিলে বাঁধা একটা কাগজ।

বরদাচরণ ঢিলটা কুড়িয়ে নিয়ে কাগজটা খুলে দেখল, তাতে লেখা? "কাহারপাড়ায় মজাপুকুরের ধারে পটলের লাশ পড়ে আছে।–ভিমরুল।"

বরদাচরণ কাগজটা মুড়ে পকেটে রাখল। তাড়া নেই! লাশ তো আর উঠে পালাবে না। সকালে গিয়ে দেখলেই হবে।

সকালেই দেরিতে ঘুম থেকে উঠে একটু গড়িমসি করে যখন বরদা মজাপুকুরের কাছে পৌঁছল তখন সেখানে লাশটাশ দেখা গেল না। মজাপুকুর, খুব নির্জন জায়গা। চারদিকে ঘন কসাড় বন। দিনেদুপুরেও এখানে কেউ বড় একটা আসে না। একসময়ে ডাকাতের আড্ডা ছিল। ডাকাতে-কালীবাড়ির ধ্বংসাবশেষ আজও বিদ্যমান। চারদিকটা ঘুরে দেখে বরদা পুকুরের ধারে এসে দেখল একটা রোগামতো ছোটখাটো চেহারার লোক পুকুরের একধারে বসে ছিপ দিয়ে নিবিষ্টমনে মাছ ধরার চেষ্টা করছে। একটু আগেও লোকটা এখানে ছিল না।

বরদাচরণ লোকটার দিকে অবহেলার চোখে একটু চেয়ে আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলে খুব আলগা গলায় বলল, "কটা মাছ পেলেন?"

লোকটা বরদাচরণের দিকে ফিরেও তাকাল না। কিন্তু একটু চাপা গলায় বলল, "একটা মাছ ধরব বলেই বসে আছি। বড় মাছ। খুব লেজে খেলাচ্ছে।"

বরদাচরণ একটু হেসে বলল, "বড় মাছ ধরতে হলে উপযুক্ত টোপ চাই তো। তা টোপটা কী?" সেইটেই বড় মাছটার কাছে জানতে চাইছি।

বরদাচরণ একটু ভেবে বলল, "বড় মাছটা টোপ গিলবে না। তবে আপস করতে রাজি আছে।"

লোকটা ছিপ গুটিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। নিতান্তই হেঁটো ধুতি আর কামিজ গায়ে একটা গেঁয়ো লোক। বয়স ত্রিশের আশেপাশে। মুখখানা একদম ভাবলেশহীন। বরদাচরণের দিকে না তাকিয়ে মাথাটা নিচু রেখে বলল, "আপসটা কিরকম?"

"পটলবাবুকে মহীতোষ সেজে আমিই সরিয়েছি বটে, তা বলে আমি তার সমর্থক নই। লোকটা আমার মক্কেল, তাকে রক্ষা করা আমার কর্তব্য।"

রোগাভোগা লোকটা নিচু গলাতেই বলল, "ভিমরুলের চাকে খোঁচা দিয়েছেন। আপনার সাহস আছে বটে!"

"আমি ভিমরুলের শত্রু নই।"

পটলকে না মারলে এলাকায় শান্তি থাকবে না। ওকে আমার হাতে ছেড়ে দিন।"

মাথা নেড়ে বরদা বলল, "তা হয় না। তাকে মারলে আমার শর্ত ভঙ্গ হবে।"

"তা হলে তো ভিমরুলের সঙ্গে শত্রুতাই আপনি চান। আমার যে কথা সেই কাজ।"

"না, ভিমরুলের মুখরক্ষার ব্যবস্থাও ভেবে রেখেছি।"

"কী ব্যবস্থা?"

"পটলকে বলেছি, প্রাণ বাঁচাতে গেলে তাকে দেশত্যাগ করতে হবে এবং অন্য জায়গায় অন্য নামে বেঁচে থাকতে হবে। পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা চলবে না। সে যে বেঁচে আছে এ-কথা কেউ জানবে না।"

"সে যদি আর কখনও এ-তল্লাটে আসে–"

"না, সে-ভয় আর নেই। আপনার ভয়ে সে আধমরা।"

"আর শ্রীমন্তর টাকাটা?"

"পটল আমার সঙ্গে পালানোর সময় নগদ পাঁচ লাখ দশ হাজার আলাদা করে শ্রীমন্তর জন্য নিয়ে নিয়েছিল। টাকাটা কাল রাতেই শ্রীমন্ত পেয়ে গেছে।"

ভিমরুল এবার একটু হাসল। বলল, "চোরের ওপর বাটপাড়ি করেছেন, তবু আপনাকে ছেড়ে দিচ্ছি। আপনি একজন দক্ষ গোয়েন্দা।"

"ধন্যবাদ।"

ছোটোখাটো লোকটা ছিপটা হাতে নিয়ে কসাড় বনের মধ্যে ঢুকে কোথায় চলে গেল কে জানে!

বরদাচরণ বাড়িতে ফিরে এসে তার দোতলার ঘরের পাশে পুরনো লেপতোশকের মস্ত কাঠের বাক্স খুলে পটলবাবুকে বের করল। পটলবাবু তখন চিচি করছেন।

"তা পটলবাবু, এবার কী করবেন?"

"প্রাণরক্ষা করো বরদা, তারপর কী করব ভাবা যাবে।"

"প্রাণের ভয় আর নেই। ভিমরুল শর্তাধীনে আপনাকে রেহাই দেবে। কিন্তু আপনি যাবেন কোথায়?"

"হিমালয়ে।"

"সাধু হবেন নাকি?"

"না, না, ব্যবসা আমার রক্তে। হিমালয়ে মেলা সাধু। আমি ঠিক করেছি সাধুদের চাল, ডাল, আটা, লোটা-কম্বল, কৌপীন ইত্যাদি সাপ্লাই দেওয়ার ব্যবসা করব।"

"সাধুদের সাপ্লাই দেবেন? টাকা দেবে কে?"

"ভক্তরা দেবে বাবা। ওসব আমার ছক করা আছে।" পটলের ব্যবসাবুদ্ধি দেখে বরদা অবাক হয়ে গেল।

# পাগলা গণেশ

## পাগলা গণেশ

মাধ্যাকর্ষণ প্রতিরোধকারী মলম আবিষ্কার হওয়ার পর থেকে পৃথিবীতে নানারকম উড়ান যন্ত্র আবিষ্কারের একটা খুব হিড়িক পড়ে গেছে। কেউ ডাইনিদের বাহন ডাণ্ডাওলা ঝাঁটার মতো, কেউ নারদের পেঁকির মতো, কেউ কার্পেটের মতো, কেউ কার্তিকের বাহন ময়ূরের মতো উড়ান যন্ত্র আবিষ্কার করে তাতে চড়ে বিষয়কর্মে যাতায়াত করছে।

আকাশে তাই সবসময়েই নানারকম জিনিস উড়তে দেখা যায়।

এমনকি কৃত্রিম পাখনাওলা মানুষকেও।

সালটা ৩৫৮৯। ইতিমধ্যে চাঁদ, মঙ্গল এবং শুক্রগ্রহে মানুষ ল্যাবরেটরি স্থাপন করেছে, সূর্যের আরও দুটি গ্রহ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং জানা গেছে আর কোনও গ্রহ নেই, মহাকাশের নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে হাজার হাজার মানুষ আলোর চেয়েও গতিবেগসম্পন্ন মহাকাশযানে রওনা হয়ে গেছে এক দেড়শো বছর আগে থেকে এবং এখনও অনেকে যাচ্ছে। কাছেপিঠে যারা গেছে তাদের ফেরার সময় হয়ে এল। তবে সেটা এক মিনিট পর না একশো বছর পর তা জানবার উপায় নেই।

তা বলে পৃথিবীর মানুষেরা হাল ছাড়েনি।

সেই এক দেড়শো বছর আগে যারা জন্মেছিল তারা সকলেই সশরীরে বর্তমান। আজকাল পৃথিবীতে মানুষ মরে না। যারা মহাকাশে গেছে তারা ফিরে এসে সেই আমলের লোকেদের দেখতে পাবে। তবে সব মানুষই বেঁচে আছে বলে নতুন মানুষের জন্মও আর হচ্ছে না। গত দেড়শো বছরের মধ্যে কেউ পৃথিবীতে শিশুর কান্না শোনেনি।

এদিকে ঘরে ঘরে মানুষ এত বেশি বিজ্ঞান নিয়ে কুঁদ হয়ে আছে। যে, প্রতিঘরের প্রত্যেকেই কোনও না কোনও বিজ্ঞানের বিজ্ঞানী। বিজ্ঞান ছাড়া অন্য কোনও চর্চাই নেই। কবিতা, গান, ছবি আঁকা, কথাসাহিত্য, নাটক, সিনেমা এসব নিয়ে কেউ মাথাই ঘামায় না। ওসব অনাবশ্যক ভাবাবেগ কোনও কাজেই লাগে না।

খামোখা সময় নষ্ট।

খেলাধুলোর পাটও চুকে গেছে।

অলিম্পিক উঠে গেছে। বিশ্বকাপ বিলুপ্ত। আছে শুধু বিজ্ঞান আর বিজ্ঞান।

পূর্ণিমার চাঁদ দেখলে, কোকিলের ডাক শুনলে বা পলাশ ফুল ফুটলে কেউ আর আহা উঁহু করে না। বর্ষাকালের বৃষ্টি দেখলে কারও মন আর মেদুর হয় না। ওগুলোকে প্রাকৃতিক কার্যকারণ হিসেবেই দেখা হয়।

গোলাপ ফুলের সৌন্দর্যের চেয়ে তার অ্যানালাইসিসটাই বেশি জরুরি। দয়া মায়া করুণা ভালবাসা ইত্যাদিরও প্রয়োজন না থাকায় এবং চর্চার অভাবে মানুষের মনে আর ওসবের উদ্রেক হয় না।

ব্যতিক্রম অবশ্য এক-আধজন আছে।

যেমন পাগলা গণেশ। পাগলা গণেশের বয়স দুশো বছর।

পঞ্চাশ বছর বয়সে, অর্থাৎ আজ থেকে দেড়শো বছর আগে মৃত্যুঞ্জয় টনিক আবিষ্কার হয়। গণেশও আর সকলের মতো টনিকটা খেয়েছিল। ফলে তার মৃত্যু বন্ধ হয়ে গেল। দেড়শো বছর আগে যখন সুকুমার শিল্পবিরোধী আন্দোলন শুরু হল এবং শিল্প সঙ্গীত সাহিত্য ইত্যাদির পাট উঠে যেতে লাগল তখন গণেশের ব্যাপারটা পছন্দ হয়নি। তাছাড়া বিজ্ঞানের বাড়াবাড়িরও একটা সীমা থাকা দরকার বলে তার মনে হল। গণেশ অনেক চেষ্টা করে যখন দেখল কালের চাকার গতি উল্টোদিকে ফেরানো যাবে না তখন সে সভ্য সমাজ থেকে দূরে থাকার জন্য হিমালয়ের একটি গিরিগুহায় আশ্রয় নিল।

তা বলে হিমালয় যে খুব নির্জন জায়গা তা নয়। এভারেস্টের চূড়া চেঁছে অবজার্ভেটরি হয়েছে, রূপকুণ্ডে বায়োকেমিস্ট্রির ল্যাবরেটারি, কে টু, কাঞ্চনজঙ্ঘা, যমুনোত্রী গঙ্গোত্রী, মানস সরোবর সর্বত্রই নানা ধরনের

গবেষণাগার। সমুদ্রের তলাতেও চলছে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা। অর্থাৎ ভূগর্ভে, ভূপৃষ্ঠে এবং অন্তরীক্ষে কোথাও নিপাট নির্জনতা নেই। পৃথিবীর জনসংখ্যা যে খুব বেশি তা নয়। কিন্তু তারা সমস্ত পৃথিবীতে এমনভাবে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যে, নির্জনতা খুঁজে পাওয়া খুব কঠিন কাজ।

এই তো আজ সকাল থেকে গণেশ বসে কবিতা লিখছে। একটু আগে একটা চেঁকি আর একটা ভেলায় চড়ে দুটো লোক এসে বলল, এই যে গণেশবাবু, কী করছেন?

কবিতা লিখছি।

কবিতা? হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ। তা আপনার কবিতা শুনছেই বা কে আর পড়ছেই বা কে?

আকাশ শুনছে, বাতাস শুনছে, প্রকৃতি শুনছে। কবিতার পাতা বাতাসে ভাসিয়ে দিচ্ছি। যদি কেউ কুড়িয়ে পায় আর পড়তে ইচ্ছে হয় তো পড়বে।

হোঃ হোঃ হোঃ হোঃ।

ক'দিন আগে সন্ধ্যেবেলা গণেশ একদিন গলা ছেড়ে গান গাইছিল। তার গানের গলা বেশ ভালই।

হঠাৎ দুটো পাখাওলা লোক লাসা থেকে ইসলামাবাদ যেতে যেতে নেমে এসে রীতিমতো ধমক দিয়ে বলল, ও মশাই, অমন বিকট শব্দ করছেন কেন?

শব্দ কী! এ যে গান!

গান! ওকেই কি গান বলে নাকি! ধুর মশাই, এ যে বিটকেল শব্দ।

একদিন পাহাড়ের গায়ে যান্ত্রিক বাটালি দিয়ে পাথর কেটে ছবি আঁকছিল গণেশ। হঠাৎ একটা ধামা নেমে এল। এক মহিলা খুব আগ্রহের সঙ্গে বলে চলেন, এটা কিসের সার্কিট ডিজাইন বলুন তো। বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হচ্ছে।

ডিজাইন নয়, ছবি। খেয়ালখুশির ছবি।

ভদ্রমহিলা চোখের পলক না ফেলে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই! ছবি হচ্ছে। ইঃ!

গণেশ জানে, একা সে পৃথিবীর গতি কিছুতেই উল্টে দিতে পারবে না। কিন্তু একা বসে বসে যে নিজের মনের মতো কিছু করবে তারও উপায় নেই। এই মৃত্যুহীন জীবন, এই অন্তহীন আয়ু কি এভাবেই যন্ত্রণার মধ্যে কাটাতে হবে? সুইসাইড করে কোনও লাভ নেই। আজকাল মরা মানুষকে বাঁচিয়ে তোলা শক্ত কাজ তো নয়ই, বরং পৃথিবীর জনসংখ্যার ভারসাম্য রাখতে তা করা আবশ্যিক।

গণেশের তিন ছেলে, এক মেয়ে। বড় ছেলের বয়স একশো চুয়াত্তর বছর, মেজোর একশো একাত্তর, ছোটো ছেলের একশো আটষট্টি এবং মেয়ের বয়স একশো ছেষট্টি। প্রত্যেকেই কৃতি বিজ্ঞানী। তারা অবশ্য বাপের কাছে আসে না। অন্তত গত একশো বছরের মধ্যে নয়। গণেশ তাদের মুখশ্রী ভুলে গেছে। গণেশের স্ত্রী ক্যালিফোর্নিয়া মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্রে কাজ করতেন, দেড়শো বছর আগে তিনি অ্যান্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জে রওনা হয়ে যান। এখনও ফেরেননি।

আজ সকালে গণেশকে কবিতায় পেয়েছে। কবিতা লিখছে আর ভাসিয়ে দিচ্ছে বাতাসে। কবিতার কাগজগুলো বাতাসে কাটা ঘুড়ির মতো লাট খাচ্ছে, ঘুরছে ফিরছে, ভাসছে, পাক খাচ্ছে, তারপর পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে অনেক দূর। প্রতিদিন যত কবিতা লিখেছে গণেশ সবই এইভাবে ভাসিয়ে দিয়েছে। যদি কারও কাছে পৌঁছোয়, যদি কেউ পড়ে।

আকাশে একটা পিপে ভাসছিল। গণেশ লক্ষ্য করেনি। পিপেটা ধীরে ধীরে নেমে এল। নামল একজন পুলিশম্যান। গণেশকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে বলল, স্যার, এককালে আপনি যখন কলকাতার সায়েন্স কলেজে মাইক্রোইলেকট্রনিক্স পড়াতেন তখন আমি আপনার ছাত্র ছিলাম। কিন্তু এসব আপনি কী করছেন? পাহাড়ময় কাগজ ছড়াচ্ছেন কেন? এটা কি নতুন ধরনের কোনও গবেষণা?

গণেশ মাথা নাড়ল, না হে না, ওসব গবেষণা টবেষণা আমি ভুলে গেছি। আমি পৃথিবীকে বাঁচানোর চেষ্টা করছি।

তার মানে? পৃথিবী তো দিব্যি বেঁচে আছে। মরার কোনও লক্ষণই নেই।

মরছে। পৃথিবী মরছে। পরে টের পাবে।

এ কাগজগুলো কি কোনও প্রেসক্রিপশন? পৃথিবীর বাঁচবার ওষুধ?

ঠিক তাই। ওগুলো কবিতা। তুমি পড়ে দেখতে পারো।

লোকটা মাথার হেলমেট খুলে মাথা চুলকে হতভম্বের মতো বলল, কবিতা।

হ্যাঁ। কবিতা। পড়ো।

লোকটা পায়ের কাছে পড়ে থাকা একটা পাক-খাওয়া কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল।

কি বুঝলে?

লোকটা অসহায় ভাবে মাথা নেড়ে বলল, কিছু বুঝতে পারছি না। স্যার। কোনওদিন এ জিনিস পড়িনি।

তোমার বয়স কত?

একশ একান্ন বছর।

বাচ্চা ছেলে।

আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। আমাদের আমলে শিক্ষানিকেতনে এসব পড়ানো হত না। শুনেছি তারও অনেক আগে কবিতা নামে কী যেন ছিল।

লোকটি নিরীহ এবং ভালমানুষ দেখে গণেশবাবু হুকুমের সুরে বলে উঠল, মনে মনে পড়লে হবে না। জোরে জোরে পড়ো।

লোকটা কাগজটার দিকে চেয়ে থেমে থেমে পড়তে লাগল, গ্রহটি সবুজ ছিল, গাঢ় নীল জল, ফিরোজা আকাশ…কোকিলের ডাক ছিল, প্রজাপতি, ফুলের সুবাস… আধো আধো বোল ছিল, টলে টলে হাঁটা ছিল, শিশু ভোলানাথশৈশব ভাসায়ে জলে, কবি যে বৃহৎ হলে, নামিল আঘাত।–

থামো, বুঝলে কিছু?

লোকটা মাথা নেড়ে বলে, কিছুই বুঝিনি স্যার।

একটুও না?

লোকটা মাথা নেড়ে বলল, শুধু মনে পড়ছে একসময়ে আমিও টলে টলে হাঁটতে শিখেছিলুম–

গণেশ হতাশ হল। কবিতা তার ভাল হয়নি ঠিকই, কিন্তু না বুঝবার মতো নয়।

লোকটা গণেশকে অভিবাদন করে চলে গেল, যেন একটু ভয়ে ভয়েই।

পরদিন সকালে রোজকার মতো কবিতা লিখতে বসেছে গণেশ। এমন সময় একটা বড়সড় পিপে এসে সামনে নামল।

স্যার!

গণেশ তাকিয়ে দেখে, সেই লোকটি, সঙ্গে দুই মহিলা।

আমার স্ত্রী আর মাকে সঙ্গে নিয়ে এলাম। আমার মা কবিতার ব্যাপারটা খানিকটা জানে। এরা দুজনেই কবিতা শুনতে চায়।

গণেশ অবাক এবং খুশি দুইই হল। তবে কবিতা শুনিয়েই ছাড়ল না। গান শোনাল, ছবি দেখাল।

তিনজন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে বসে রইল।

কিছু বুঝতে পারছো তোমরা?

তিনজনেই মাথা নেড়ে জানাল, না!

লোকটা বিনীত ভাবেই বলল, না বুঝলেও আমার মধ্যে কী যেন একটা হচ্ছে।

কী হচ্ছে?

ঠিক বোঝাতে পারব না।

পরদিন লোকটা ফের এল। সঙ্গে আরও চারজন পুলিশম্যান।

এরা স্যার আমার সহকর্মী, কবিতা গান ছবির ব্যাপারটা বুঝতে চায়।

গণেশ খুব খুশি, বোসো বোসো।

পাঁচজন শ্রোতা ও দর্শক ঘণ্টা দুই ধরে গণেশের কবিতা শুনল, গান শুনল, ছবি দেখল। কেউ ঠাট্টা বিদ্রূপ করল না। গম্ভীর হয়ে রইল।

পরদিন লোকটা এল না। কিন্তু জনা দশেক লোক এল, পুলিশ আছে, বৈজ্ঞানিক আছে, টেকনিশিয়ান আছে।

পরদিন আরও কিছু লোক বাড়ল।

পরদিন আরও।

আরও।

এক সপ্তাহ পরে রাষ্ট্রপুঞ্জের মহাসচিব তার বিমান থেকে নামলেন গণেশের ডেরায়। এ আপনি কী কাণ্ড করেছেন? পৃথিবী যে উচ্ছন্নে গেল। লোকে গান গাইতে লেগেছে, কবিতা মকসসা করছে, হিজিবিজি ছবি আঁকছে।

গণেশ হোঃ হোঃ করে হেসে উঠে বলল, যাঃ, তাহলে আর ভয় নেই। দুনিয়াটা বেঁচে যাবে…

# পুরোনো জিনিস

## পুরোনো জিনিস

মদনবাবুর একটা নেশা, পুরোনো জিনিস কেনা। মদনবাবুর পৈতৃক বাড়িটা বিশাল, তার টাকারও অভাব নেই, বিয়ে-টিয়ে করেননি বলে এই একটা বাতিক নিয়ে থাকেন। বয়স খুব বেশিও নয়, ত্রিশ পঁয়ত্রিশের মধ্যেই। তিনি ছাড়া বাড়িতে একটি পুরোনো রাঁধুনী বামুন আর বুড়ো চাকর আছে। মদনবাবু দিব্যি আছেন। ঝুট-ঝামেলা নেই, কোথাও পুরোনো জিনিস, কিম্ভুত জিনিস কিনে ঘরে ডাঁই করেছেন তার হিসেব নেই। তবে জিনিসগুলো ঝাড়পোচ করে সযত্নে রক্ষা করেন তিনি। ইঁদুর আরশোলা উইপোকার বাসা হতে দেন না। ট্যাক ঘড়ি, দেয়াল ঘড়ি, আলমারি, খাট-পালং, ডেস্ক, টেবিল, চেয়ার, দোয়াতদানী, নস্যির ডিবে, কলম, ঝাড়লণ্ঠন, বাসনপত্র সবই তার সংগ্রহে আছে।

খবরের কাগজে তিনি সবচেয়ে মন দিয়ে পড়েন পুরোনো জিনিস বিক্রির বিজ্ঞাপন, রোজ অবশ্য ওরকম বিজ্ঞাপন থাকে না। কিন্তু রবিবারের কাগজে একটি-দুটি থাকেই।

আজ রবিবার সকালে মদনবাবু খবরের কাগজ পড়তে পড়তে এক জায়গায় এসে উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। ম্যাকফারলন সাহেবের দেড়শো বছরের পুরোনো বাড়ির সব জিনিস বিক্রি করা হবে।

ব্রড স্ট্রিটে ম্যাকফারলন সাহেবের যে বাড়িটা আজও টিকে আছে তার অবস্থা খুবই শোচনীয়। পড়ো-পড়ো অবস্থা। কর্পোরেশন থেকে বহুবার বাড়ি ভাঙার নোটিশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু বুড়ো ম্যাকফারলনের আর সরবার জায়গা ছিল না বলে বাড়িটা ভাঙা হয়নি। ওই বাড়িতে ম্যাকফারলনদের তিন পুরুষের বাস। জন ম্যাকফারলনের সঙ্গে মদনবাবুর একটু চেনা ছিল, কারণ জন ম্যাকফারলনেরও

পুরোনো জিনিস কেনার বাতিক ছিল। মাত্র মাস পাঁচেক আগে সাহেব মারা যান। তখনই মদনবাবু তার জিনিসপত্র কিনে নেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু পারেননি। এক অবাঙালি ব্যবসায়ীর কাছে আগে থেকেই বাড়ি এবং জিনিসপত্র বাঁধা দেওয়া ছিল। সেই ব্যবসায়ী মদনবাবুকে সাফ বলে দিয়েছিল, উটকো ক্রেতাকে জিনিস বিক্রি করা হবে না। নিলামে চড়ানো হবে।

মদনবাবু তার বুড়ো চাকরকে ডেকে বললেন, ওরে ভজা, আমি চললুম। দোতলার হলঘরটার উত্তর দিক থেকে পিয়ানোটাকে সরিয়ে কোণে ঠেলে দিস, আজ কিছু নতুন জিনিস আসবে।

ভজা মাথা নেড়ে বলে, নতুন নয় পুরোনো।

ওই হল। আর রাঁধুনীকে বলিস খাবার ঢাকা দিয়ে রাখে যেন। ফিরতে দেরি হতে পারে।

মদনবাবু ট্যাক্সি হাঁকিয়ে যখন ম্যাকফারলনের বাড়িতে পৌঁছলেন তখন সেখানে বেশ কিছু লোক জড়ো হয়ে গেছে। মদনবাবু বেশিরভাগ লোককেই চেনেন। এরা সকলেই পুরোনো জিনিসের সমঝদার এবং খদ্দের। সকলেরই বিলক্ষণ টাকা আছে। মদনবাবু বুঝলেন আজ তার কপালে কষ্ট আছে। আদৌ কোনও জিনিস হাত দেওয়া যাবে কিনা সন্দেহ।

নিলামের আগে খদ্দেররা এঘর-ওঘর ঘুরে ম্যাকফারলনের বিপুল সংগ্রহরাশি দেখছেন। আসবাবপত্র থেকে শুরু করে ছোটখাটো জিনিসের এক খনি বিশেষ। কোনটা ছেড়ে কোনটা ধরেন তা ভাবতে গিয়ে মদনবাবু হিমসিম খেতে লাগলেন।

বেলা বারোটায় নিলাম শুরু হল। একটা করে জিনিস নিলামে ওঠে, আর সঙ্গে সঙ্গে হাঁকডাক পড়ে যায়। মদনবাবুর চোখের সামনে একটা মেহগনির পালঙ্ক দশহাজার টাকায় বিকিয়ে গেল। একটা কাট গ্লাসের পানপাত্রের সেট বিকিয়ে গেল বারো হাজার টাকায়। এছাড়া মুক্তোমালার দাম উঠল চল্লিশ হাজার।

মদনবাবু বেলা চারটে অবধি একটা জিনিসও ধরতে পারলেন না। মনটা ভারী খারাপ হয়ে গেল। দর আজ যেন বড্ড বেশি উঠে যাচ্ছে।

একেবারে শেষদিকে একটা পুরোনো কাঠের আলমারি নিলামে উঠল, বেশ বড়সড় এবং সাদামাটা। আলমারিটা অন্তত একটা স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে কজা করার

জন্য মদনবাবু প্রথমেই দর হাঁকলেন পাঁচ হাজার।

অমনি পাশ থেকে কে যেন ডেকে দিল, কুড়ি হাজার। মদনবাবু অবাক হয়ে গেলেন। একটা কাঠের আলমারির দর এত ওঠার কথাই না। কেউ ফাঁকা আওয়াজ ছেড়ে দর বাড়াচ্ছে নাকি! নিলামে এরকম প্রায়ই হয়।

তবে মদনবাবুর মর্যাদাতেও লাগছিল খালি হাতে ফিরে যাওয়াটা। একটা কিছু না নিয়ে যেতে পারলে নিজের কাছেই যেন নিজে মুখ দেখাতে পারবে না, মদনবাবু তাই মরিয়া হয়ে ডাকলেন, একুশ হাজার।

আশ্চর্য এই যে, দর আর উঠল না।

একুশ হাজার টাকায় আলমারিটা কিনে মহানন্দে বাড়ি ফিরলেন মদনবাবু। যদিও মনে মনে বুঝলেন, দরটা বড্ড বেশি হয়ে গেল।

পরদিন সকালে আলমারিটা কুলিরা ধরাধরি করে পৌঁছে দিয়ে গেল। দোতলার হলঘরের উত্তরদিকের জানালার পাশেই সেটা রাখা হল। বেশ ভারি জিনিস। দশটা কুলি গলদঘর্ম হয়ে গেছে এটাকে তুলতে।

নিলামওয়ালার দেওয়া চাবি দিয়ে আলমারিটা খুলে ফেললেন মদনবাবু।

নীচে আর ওপরে কয়েকটা ড্রয়ার। মাঝখানে ওয়ার্ডরোভ। মদনবাবু অনেকক্ষণ ধরে খুঁটিয়ে দেখলেন জিনিসটা, বর্মা-সেগুন কাঠের তৈরি ভালো জিনিস। কিন্তু একুশ হাজার টাকা দরটা বেজায় বেশি হয়ে গেছে। তার আর কী করা! এ নেশা যার আছে তাকে মাঝে মাঝে ঠকতেই হয়।

একুশ হাজার টাকার কথা ভাবতে ভাবতেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন মদনবাবু। গভীর রাতে ম্যাকফারলন সাহেবকে স্বপ্নে দেখলেন। বুড়ো তাঁকে বলছে, তুমি মোটেই ঠকোনি হে, বরং জিতেছ।

মদনবাবু ম্লান হেসে বললেন, না সাহেব, নিছক কাঠের আলমারির জন্য দর হাঁকাটা আমার ঠিক হয়নি।

ম্যাকফারলন শুধু ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলল, না না আমার তা মনে হয় না?

আমার তা মনে হয় না…

মদনবাবু মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে একবার জল খান রোজই। আজ ঘুম ভাঙল। পাশের টেবিল থেকে জলের গেলাসটা নিতে গিয়ে হঠাৎ শুনলেন, পাশের হলঘর থেকে যেন একটু খুটুর-খুটুর শব্দ আসছে। ওই ঘরে তাঁর সব সাধের পুরোনো জিনিস। মদনবাবু তাড়াতাড়ি উঠে টর্চ নিয়ে পাশের ঘরে হানা দিলেন।

টর্চটা জ্বালাতে যাবেন এমন সময় কে যেন বলে উঠল, দয়া করে বাতি জ্বালাবে না, আমার অসুবিধে হবে।

মদনবাবু ভারী রেগে গেলেন, টর্চের সুইচ টিপে বললেন, আচ্ছা নির্লজ্জ লোক তো! চুরি করতে ঢুকে আবার চোখ রাঙানো হচ্ছে! কে হে তুমি?

চোরটা যে কে বা কেমন লোক তা বোঝা গেল না। কারণ টর্চটা জ্বলল না। মদনবাবু টর্চটা বিস্তর কঁকালেন, নাড়লেন, উলটে-পালটে সুইচ টিপলেন, বাতি জ্বলল না।

এ তো মহা ফ্যাসাদ দেখছি!

কে যেন মোলায়েম স্বরে বলল, অত ঘাবড়াচ্ছেন কেন?

মদনবাবু চোরকে ধরার জন্য আস্তিন গোটাতে গিয়ে টের পেলেন যে, তার গায়ে জামা নেই, আজ গরম বলে খালি গায়ে শুয়েছিলেন, হেঁড়ে গলায় একটা হাঁক মারলেন, শিগগির বেরও বলছি, নইলে গুলি করব। আমার কিন্তু রিভলভার আছে।

নেই।

কে বলল নেই?

জানি কি না।

কিন্তু লাঠি আছে।

খুঁজে পাবেন না।

কে বলল খুঁজে পাব না?

অন্ধকারে লাঠি খোঁজা কি সোজা?

আমার গায়ে কিন্তু সাংঘাতিক জোর, এক ঘুষিতে নারকেল ফাটাতে পারি।

কোনওদিন ফাটাননি।

কে বলল ফাটাইনি।

জানি কিনা। আপনার গায়ে তেমন জোরই নেই।

আমি তোক ডাকি, দাঁড়াও।

কেউ আসবে না। কিন্তু খামোকা কেন চেঁচাচ্ছেন?

চেঁচাব না? আমার এত সাধের সব জিনিস এ-ঘরে, আর এই ঘরেই কিনা চোর!

চোর বটে, কিন্তু এলেবেলে চোর নই মশাই।

তার মানে?

কাল সকালে বুঝবেন। এখন যান গিয়ে ঘুমোন। আমাকে ডিস্টার্ব করবেন না।

মদনবাবু ফের ঘাবড়ে গিয়ে ফিরে এলেন ঘরে। দুরুদুরু বুকে বসে থেকে পাশের ঘরের নানা বিচিত্র শব্দ শুনতে লাগলেন। তাঁর সাধের সব জিনিস বুঝি এবারে যায়!!

দিনের আলো ফুটতেই মদনবাবু গিয়ে হলঘরে ঢুকে যা দেখলেন তাতে ভারী অবাক হয়ে গেলেন। ম্যাকফারলনের সেই কাট গ্লাসের পানপাত্রের সেট আর একটা গ্র্যান্ড ফাদার ক্লক হলঘরে দিব্যি সাজিয়ে রাখা। এ দুটো জিনিস কিনেছিল দুজন আলাদা খদ্দের। খুশি হবেন কি দুঃখিত হবেন তা বুঝতে পারলেন না মদনবাবু। কিন্তু অনেক ভেবেচিন্তে শেষে খুশি-খুশিই লাগছিল তাঁর।

আবার রাত হল। মদনবাবু খেয়েদেয়ে শয্যা নিলেন। তবে ঘুম হল না। এপাশ-ওপাশ করতে করতে একটু তন্দ্রা মতো এল। হঠাৎ হলঘরে আগের রাতের মতো

শব্দ শুনে তড়াক করে উঠে পড়লেন। হলঘরে গিয়ে ঢুকে টর্চটা জ্বালাতে চেষ্টা করলেন।

কে?

তা দিয়ে আপনার কী দরকার? যান না গিয়ে শুয়ে থাকুন। আমাদের কাজ করতে দিন।

মদনবাবু একটু কঁপা গলায় বললেন, তোমরা কারা বাবারা?

সে কথা শুনলে আপনি ভয় পাবেন।

ইয়ে তা আমি একটু ভীতু বটে। কিন্তু বাবারা, এসব কী হচ্ছে, একটু জানতে পারি না।

খারাপ তো কিছু হয়নি মশাই। আপনার তো লাভই হচ্ছে।

তা হচ্ছে, তবে কিনা চুরির দায়ে না পড়ি। তোমরা কি চোর?

লোকটা এবার রেগে গিয়ে বলল, কাল থেকে চোর-চোর করে গলা শুকোচ্ছেন কেন? আমরা ফালতু চোর নই।

তবে?

আমরা ম্যাকফারলন সাহেবের সব চেলা-চামুণ্ডা। আমি হলুম গে সর্দার, যাকে আপনি কিনেছেন একুশ হাজার টাকায়।

আলমারি?

আজ্ঞে। আমরা সব ঠিক করেই রেখেছিলুম, যে খুশি আমাদের কিনুক কেন আমরা শেষ অবধি সবাই মিলেমিশে থাকব, তাই—

তাই কি?

তাই সবাই জোট বাঁধছি, তাতে আখেরে আপনারই লাভ।

মদনবাবু বেশ খুশিই হলেন। তবু মুখে একটু দুশ্চিন্তা প্রকাশ করে বললেন, কিন্তু বাবারা, দেখো যেন চুরির দায়ে না পড়ি।

মেলা ফ্যাচফ্যাচ না করে, যান না নাকে তেল দিয়ে শুয়ে থাকুন গে। কাজ করতে দিন।

মদনবাবু তাই করলেন। শুয়ে খুব ফিচিক-ফিচিক হাসতে লাগলেন, হলঘরটা ভরে যাবে, দোতলা-তিনতলায় যা ফাঁকা আছে তাও আর ফাঁকা থাকবে না। এবার চারতলাটা না তুললেই নয়।

# ফটিকের কেরামতি

---

**ফটিকের কেরামতি**

মাঝরাত্তিরে শিয়রের জানালাটায় মৃদু ঠুকঠুক শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল ফটিকের। ঘুম তার খুব পলকা। সে উঠে হ্যারিকেনের আলোটা উসকে দিয়ে জানালাটার দিকে সভয়ে চেয়ে রইল। আঁট করে বন্ধ রয়েছে পাল্লা। এত রাতে কারও আসার কথা তো নয়। চোর-ডাকাত যে নয় তা ফটিক জানে। কারণ, চোরের বাড়িতে চোর আসে না। তবে কে হতে পারে?

ফটিক গলাখাঁকারি দিয়ে খুব বিনীতভাবেই জিজ্ঞেস করল, "কে আজ্ঞে? কী চাইছেন?"

ওপাশ থেকে একটা ভারী গলা চাপা স্বরে বলল, "জানালা খোলো। দরকার আছে।"

"কী দরকার?"

"তোমার কিছু রোজগার হবে।"

রোজগার জিনিসটা ফটিক বড় ভালবাসে। রোজগারের মতো জিনিস নেই। গত দিন দশেক তার এক পয়সাও রোজগার হয়নি। দিনের বেলা সে বেড়া বেঁধে বেড়ায়। রাতের বেলা একটু-আধটু চুরিটুরির চেষ্টা করত। দুটোর কোনওটাতেই তার সুবিধে হচ্ছে না। কচু-ঘেঁচু খেয়ে দিন কাটছে। একা-বোকা মানুষ বলে চলে যায়।

ফটিক বুকে একটু সাহস এনে জানলাটা খুলল। কিন্তু বাইরে অন্ধকারে কাউকে দেখা গেল না। ফটিক একটু ভয়ে-ভয়ে উঁকিঝুঁকি দিল। হঠাৎ দস্তানা-পরা

একখানা হাত তলার দিক থেকে উঠে এসে কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট ছুঁড়ে দিল তার পায়ের কাছে। ফটিক চমকে উঠে নীচু হয়ে প্যাকেটটা কুড়িয়ে নিল। বেশ ভারী জিনিস।

বাইরে থেকে ভারী গলাটা বলল, "ওটা একটা পিস্তল। গুলি ভরা। সঙ্গে পাঁচশো টাকা আছে। কাজটা করতে পারলে আরও পাঁচশো।"

পিস্তল! ফটিকের হাত-পা কাঁপতে লাগল। বলল, "আজ্ঞে এ যে ভয়ঙ্কর জিনিস।"

"শুনতে ভয়ঙ্কর, ব্যবহার করা খুব সোজা।"

"কাজটা কী বলবেন?"

"বঙ্কুবাবুর মেয়ের বিয়ে পরশুদিন। হাজার লোকের নেমন্তন্ন। দেড়শো বরযাত্রী আসবে। বাজি-টাজি ফাটবে। তোমার কাজটা হলা, গোলেমালে হরিবোল। ভিড়ের মধ্যে এক ফাঁকে বঙ্কুবাবুর কাছাকাছি চলে যাবে। নলটা পিঠের বাঁ দিকে ঠেকাবে, ঘোড়াটা টেনে দেবে, বাস।"

"ওরে বাবা!" ফটিক ঘামতে লাগল।

"কোনও ভয় নেই। সন্ধ্যে সাতটা থেকে বাজি ফাটবে। শব্দটা কেউ লক্ষ্যই করবে না। কাজ সেরে পিস্তলটা কোমরে গুঁজে ফেলবে। তাড়াহুড়ো না করে ভিড়ে মিশে দাঁড়িয়ে থাকবে, আহা-উঁহু করবে। থানা থেকে পুলিশ আসতে অনেক দেরি হবে। ততক্ষণে বেরিয়ে নদীর ধারে বটতলার বাঁধানো চাতালের কাছে গিয়ে দেখবে ইট চাপা দেওয়া আরো পাঁচশো টাকা রয়েছে। টাকাটা নিয়ে পিস্তলটা ওখানেই রেখে চলে আসবে। তোমার কিছু হবে না। কোনও ভয় নেই। কিন্তু আমাদের প্রস্তাবে রাজি না হলে তিনদিনের মধ্যে তোমাকে খুন করা হবে।"

ফটিক আঁতকে উঠে বলল, "তা বঙ্কুবাবুকেও কেন আপনারাই সাবাড় করছেন না? আমি যে জীবনে খুনখারাপি করিনি।"

"আমাদের অসুবিধে আছে। কাজটা তোমাকেই করতে হবে।"

"আমি কী পারব আজ্ঞে?"

একটা পায়ের শব্দ দূরে চলে গেল। কেউ কোনও জবাব দিল না।

ফটিক ধপ করে মেঝেতে বসে পড়ল। তার মাথা ঘুরছে, গলা শুকিয়ে কাঠ, বুক এমন ধড়ফড় করছে যেন তবলার লহরা, খানিকক্ষণ বসে থেকে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে সে ঢকঢক করে অনেকটা জল খেল। তারপর মোড়কটা খুলে পিস্তলটা দেখল। এসব জিনিস সে চোখেও দেখেনি আগে। বিদঘুঁটে চেহারা, তাকালেই ভয় হয়।

রাতে আর ফটিকের ঘুম হলো না। সারা রাত আকাশ-পাতাল ভেবে মাথাটাই গরম হয়ে গেল। খুনখারাপি তার লাইন নয়। রক্ত দেখলে সে এখনও ভিরমি খায়। সে সামান্য চুরিটুরির চেষ্টা করে বটে, কিন্তু তাতেও তার হাত যশ নেই। নিতান্ত অভাবে পড়েই চেষ্টা করতে হয়, নইলে চুরিও তার লাইন নয়। দুটো পেটের ভাতের জোগাড় হলে সে কস্মিনকালেও চুরি করত না। কিন্তু এরা যে তাকে খুনোখুনিতে কেন নামাতে চাইছে তা সে বুঝতে পারছে না। খুন না করতে পারলে খুন হতে হবে–কী সব্বোনেশে কথা! ঘন ঘন জল খেতে খেতে তার পেট জয়ঢাক হয়ে গেল, তবু বারবার গলা শুকিয়ে যাচ্ছে।

সকালবেলা মাথায় হাত দিয়ে অনেকক্ষণ দাওয়ায় বসে রইল ফটিক। তার বাটিভর্তি পান্তা পড়ে রইল। খিদেটা চাগাড় দিচ্ছে না। কাল বঙ্কুবাবুর মেয়ের বিয়ে। আর কালকেই তাকে খুন করতে হবে।

মেয়ের বিয়ে বেশ জাঁকিয়েই দিচ্ছেন বঙ্কুবাবু। তার মেলা পয়সা। চার-পাঁচ রকমের ব্যবসা আছে। বঙ্কুবাবুর বাড়ি ফটিকের একরকম গা ঘেঁষেই। রোজ দু'বেলা যাতায়াতের পথে সে দেখেছে, বিয়ের মস্ত আয়োজন হচ্ছে। বিশাল শামিয়ানা, দেবদারু দিয়ে তোরণ হচ্ছে, নহবত বসেছে। মেলা লোক খাটছে দিনরাত। দুঃখের বিষয়, এ-বিয়েতে ফটিকের নেমন্তন্ন নেই। হওয়ার কথাও নয়। তার মতো লোককে পোঁছে কে?

ভয়ে ফটিকের কেমন যেন হাঁফ ধরে যাচ্ছে। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। কিন্তু কী করবে তা বুঝতে পারছে না। বঙ্কুবাবুর মতো পাজি লোক মারা গেলে তার কিছু যায় আসে না। কিন্তু খুন করাটায় তার ঘোর আপত্তি হচ্ছে।

ফটিকের মাথায় নানা ফিকির খেলছে। কিন্তু কোনওটাই মনোমতে নয়। একবার মনে হলো, পালিয়ে যাবে। কিন্তু পালানোটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। যারা

তার পেছনে লেগেছে, তারা হয়তো নজর রাখছে। পুলিশের কাছে যাবে? গিয়ে লাভ নেই, পুলিশ তার কথায় বিশ্বাস করবে না। উলটে পিস্তল রাখার দায়ে হাজতে পুরবে। বঙ্কুবাবুকে সব ভেঙে বলবে? লাভ কী? তিনি খুন না হলে সে নিজেই যে খুন হবে।

দুপুর অবধি মাথাটা পাগল-পাগল লাগল। তারপর নুন-লঙ্কা-তেঁতুল দিয়ে পান্তাটা খেয়ে নিল সে। পেট ঠাণ্ডা হলো। মাথাটাও যেন একটু শীতল লাগতে লাগল। দাওয়ায় মাদুর পেতে শুয়ে সে ভাবতে লাগল। কে হতে পারে লোকটা? খুন করতে চায় কেন? তাকে দিয়েই খুনটা করাতে চায় কেন? বঙ্কুবাবুকে মেরে কার কী লাভ?

হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে উঠল ফটিক। একখানা কথা মনে পড়ে গেল তার। মাস তিনেক আগে বঙ্কুবাবুর বাগেনের আগাছা পরিষ্কার করতে মুনিশ খাটানো হয়েছিল। সেই দলে ফটিকও ছিল। সারাদিন খাঁটিয়ে মাত্র পাঁচটি টাকা মজুরি দিয়েছিলেন বঙ্কুবাবু। খাবার জুটেছিল চিড়ে আর গুড়। তবে বড় ঘরের জানালার নীচে আগাছা কাটার সময় ফটিকের কানে একটা কথা এসেছিল। ফটিকবাবু যেন কাকে বলছেন, “ওই গাড়াই আমাকে মারবে একদিন। তারপর সব গাপ করবে।”

এই গ্যাড়াটি কে তা ফটিক জানে না। কিন্তু চুপ করে বসে থাকলে তো সমস্যার সমাধান হবে না। সে পিস্তলটা বিছানার তোশকের তলায় লুকিয়ে রাখল। পাঁচশোটা টাকা টাকে গুজল। গায়ে জামা দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

বঙ্কুবাবুদের বাড়িতে সানাই বাজছে। মেলা লোকলস্কর খাটছে। তোরণে ফুলের তৈরি প্রজাপতি বসানো হয়েছে। লুচি ভাজার গন্ধে বাতাস ভুরভুর করছে। ফটিক বাড়িতে ঢুকে চারদিক দেখতে লাগল। তার মতো আরও অনেকেই দেখতে এসেছে। ফটকে দরোয়ানদের তেমন কড়াকড়ি নেই।

শামিয়ানার ওপরে বড় বড় ঝাড়লণ্ঠন লাগানো হচ্ছে। ঘাড় উঁচু করে দেখছিল ফটিক। হঠাৎ কে যেন বজ্রমুষ্টিতে তার ডান হাতের কনুই চেপে ধরে বলে উঠল, “এই যে!”

ফটিক এমন আঁতকে উঠল যে মূর্ছা যাওয়ার জোগাড়। তোতলাতে তোতলাতে বলল, “আজ্ঞে আমি না। আমি কিছু করিনি।”

বঙ্কুবাবু কিন্তু মোটেই বিচলিত হলেন না। হাসি হাসি মুখ করে বললেন, “তুই ফটিক না?”

“যে আজ্ঞে।”

বঙ্কুবাবু হাসি হাসি মুখ করেই বলেন, “একটু উপকার কর তো বাবা। কুমুদের দোকানে পাঁচ সের সুপুরি রাখা আছে, আনার লোক নেই। এক ছুটে গিয়ে নিয়ে আয় তো।”

ফটিক ধাতস্থ হলো। আঁতকে ওঠা ভাবটা চট করে কেটে গেল তার। কাল যে এ লোকটাকেই খুন করার কথা। ঘাবড়ালে চলবে কেন। সে হঠাৎ বলে বসল, “লোক নেই কেন বন্ধুবাবু? গাড়াকেই তো পাঠাতে পারেন।”

বঙ্কুবাবু অবাক হয়ে বললেন, “গ্যাড়া, গাড়াটা আবার কে?”

ফটিক সামান্য ঘাবড়ে গিয়ে বলে, “ও যে আপনার কী যেন হয়!”

আন্দাজে ঢিল মেরেছিল। বোধহয় লাগল না।

বঙ্কুবাবু অবাক হয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ ভ্রূ-জোড়া কুঁচকে তার দিকে চেয়ে বললেন, “তোর তো সাহস কম নয়! জামাইকে দিয়ে সুপুরি আনাতে বলছিস! আর আমার বড় জামাই কী তোর ইয়ার যে গ্যাড়া-গাড়া করছিস?”

ফটিক হাতজোড় করে বলল, “আজ্ঞে আমরা মুখসুখ মানুষ, কত ভুলভাল বলে ফেলি!”

“যা সুমুখ থেকে। সুপুরিটা নিয়ে আয়।”

পথে হাঁটতে হাঁটতে দুইয়ে দুইয়ে চার করল ফটিক। বঙ্কুবাবুর দুটো মেয়ে, ছেলে-টেলে নেই। বঙ্কুবাবু মারা গেলে মেয়েরা ওয়ারিশান! বড় জামাই গ্যাড়া। তাকে চেনে না ফটিক। তবে একটা গন্ধ পাচ্ছে।

সুপুরি পৌঁছে দেওয়ার পর বঙ্কুবাবু একটা সিকি বকশিশ দিলেন। তারপর হাসিমুখ করেই বললেন, “হঠাৎ গাড়ার কথা বললি কেন বল দিকি!”

“আজ্ঞে বুঝতে পারিনি।”

বঙ্কুবাবু একখানা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আপনমনেই বললেন, “অকালকুষ্মাণ্ড। ছিবড়ে করে ছেড়ে দিচ্ছে আমাকে। আজ এটা দাও, কাল সেটা দাও।”

ফটিক বশংবদ দাঁড়িয়ে থেকে শুনে নিচ্ছিল।

“কী শুনছিস দাঁড়িয়ে?”

“আজ্ঞে গালাগাল দিচ্ছেন তো, চলে গেলে বেয়াদপি হবে যে!”

“গালাগাল তোকে দিইনি!”

“তবে কাকে?”

“নিজের কপালকে। ওই যে দেখছিস না, চেহারা বাগিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওই আমার কপাল।”

যাকে দেখিয়ে দিলেন বঙ্কুবাবু তার বেশ লম্বা চওড়া চেহারা। রং ফরসা, কোঁচানো ধুতি আর মুগার পাঞ্জাবি পরে ঘুরে ঘুরে ব্যবস্থা দেখছে। “বেশ জামাইটি আপনার বন্ধুবাবু।”

“হ্যাঁ, একেবারে মনের মতো। এখন যা তো। জ্বলছি নিজের জ্বালায়।”

ফটিক লোকটিকে ভাল করে দেখে নিল। যাতে ভুল না হয়। তারপর ধীরে-সুস্থে ফিরে এল। মনটা একটু হালকা লাগছে।

মাঝরাতে আবার জানালায় ঠকঠক। ফটিক জানালা খুলে অমায়িক গলায় বলে, “যে আজ্ঞে।”

ভারী গলায় বলল, “মনে আছে তো?”

“খুব মনে আছে। বাকি টাকাটা দেবেন নাকি?”

“কাল পাবে। জায়গামতো। কাজে যদি গণ্ডগোল হয় তো মরবে।”

“আর বলতে হবে না।”

পরদিন ফটিক দোকানে গিয়ে ভাল করে সাঁটিয়ে খেল। দুপুরে ঘুমোল, বিকেলে একটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে গিয়ে হাজির হলো বন্ধুবাবুর বাড়িতে। সারা বাড়ি আজ যেন রাজবাড়ির মতো দেখাচ্ছে। আলোয় আলোয় স্বপ্নপুরী। ভিড়ে ভিড়াক্কার। বরসহ বরযাত্রীরাও বি এসে গেল সন্ধ্যের মুখেই। গোলাপজল ছিটোনো হচ্ছে চারদিকে। বঙ্কুবাবু সবাইকে 'আসুন, বসুন" করছেন। পাশে গাড়া। সেও খুব সেজেছে।

বাজি পোড়ানো শুরু হলো। বাজির শব্দে চারদিক একেবারে গমগম করতে লাগল। হঠাৎ ফটিক লক্ষ্য করল, গ্যাড়া এই এত ভিড়ের মধ্যেও আড়চোখে তাকে নজরে রাখছে।

ফটিক মনে মনে হাসল। গ্যাড়া এক মুহূর্তের জন্যও বন্ধুবাবুর কাছ থেকে নড়ছে না।

লোকজন যখন শামিয়ানার বাইরে এসে ভিড় করে ঊর্ধ্বমুখ হয়ে আকাশে আতশবাজি দেখছে, ঠিক সেইসময় ফটিক এগিয়ে গিয়ে গাড়ার পেছনে দাঁড়াল। নলটা তার পিঠে ঠেকিয়ে বলল, "ইষ্টনাম স্মরণ করুন বঙ্কুবাবু!" গ্যাড়া হঠাৎ আঁতকে উঠে তখনই বলল, "আমি বঙ্কুবাবু নাকি? আহাম্মক কোথাকার! ওই তো বন্ধুবাবু।"

ফটিক মাথা চুলকে বলল, "ইস, বড্ড ভুল হয়ে যাচ্ছিল তো?"

গ্যাঁড়া দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "গাধা কোথাকার! যাও যাও, কাজ সারো, আর সময় নেই!"

ফটিক একগাল হাসল, "বটে! তা টাকাটা জায়গামতো আছে তো!"

গ্যাড়া মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল, "আছে।"

"ঠিক তো?"

গ্যাড়া ঘুরে তার গালে একখানা চড় কষিয়ে দিয়ে বলল, "বেয়াদপ কোথাকার!"

ব্যাপার দেখে বঙ্কুবাবু এগিয়ে এলেন, "এ কী! কী হয়েছে?" ফটিক গালে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, "হয়নি। তবে হবে।"

“কী হবে ফটিক? ফটিক গাড়ার দিকে চেয়ে বলল, “বলব বাবু?”

গাড়ার মুখটা হঠাৎ ছাইবর্ণ হয়ে গেল। আচমকা সে ভিড় ঠেলে অন্ধের মতো ছুটতে লাগল। তাকে আর দেখা গেল না।

বঙ্কুবাবু চালাক লোক। ফটিকের হাত ধরে ভিড় থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন চট করে।

“ফটিক, ব্যাপারখানা কী?”

ফটিক লজ্জায় অধোবদন হয়ে সবই বলল। খুব অপরাধী মুখ করে। কিন্তু বঙ্কুবাবুর মুখখানা চকচক করতে লাগল। একটু খুশির গলাতেই বললেন, “ব্যাটা অনেকদিন ধরেই নানা মতলব আঁটছিল। তুই বেজায় ভয় পাইয়ে দিয়েছিস। তোর বুদ্ধি আছে। ও ব্যাটা আর ইদিকে আসবে না শীগগির!” বঙ্কুবাবু খুশি হলেই হাত-উপুড়। আর তার হাত উপুড় মানেই পর্বত। বঙ্কুবাবু ফটিককে একখানা দোকান করে দিলেন। বেশ বড়সড় মুদির দোকান। আর বটগাছের তলায় পাঁচশো টাকাও পেয়ে গিয়েছিল সে। পিস্তলটা বঙ্কুবাবুকে দিয়েছিল ফটিক। বঙ্কুবাবু বললেন, “এটা আমারই জিনিস। গাড়া গেঁড়িয়েছিল।” তা কথাটা হলো, ফটিককে আর উঞ্ছবৃত্তি করতে হচ্ছে না।

## ফুটো

দোলগোবিন্দবাবু দুঃখী মানুষ। বরাবরই তার দুঃখে কেটেছে। ছেলেবেলায় গরিব বাপের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি ঘুরে মুড়ি মোয়া বিক্রি করে পেট চালিয়েছেন। লেখাপড়া শিখেছেন অতি কষ্টে। এই পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছরের জীবনটা তাঁর আজও বেশ দুঃখেই কাটে। অল্প মাইনের একটা চাকরি করেন। ঘরে তার বউ দিনরাত গঞ্জনা দেন। ছেলেমেয়ে দুটো ভারী রোগা-ভোগা। অফিসেও তাকে কেউ বিশেষ পাত্তা দেয় না। ভালমানুষ বলে বেশি করে খাঁটিয়ে নেয়। দোলগোবিন্দবাবু নিজের ভাগ্যকে মেনে নিয়েছেন। তার অফিস বলতে একটা কেমিক্যাল ল্যাবরেটারি। নানারকম জিনিস তৈরি হয়। কালি, ইঁদুরমারা বিষ, নানারকম সিনথেটিক আঠা। দোলগোবিন্দবাবু একজন সামান্য কেমিস্ট। ক-এর সঙ্গে ফরমুলা অনুযায়ী খ মিশিয়ে গ তৈরি করা আর কী। তবে মাঝে মাঝে অনেক রাত অবধি যখন একা একা বসে কাজ করেন তখন তার ইচ্ছে যায়, নানারকম জিনিসের সঙ্গে নানারকম বেখাপ্পা জিনিস মিশিয়ে দেখলে কেমন হয়? এরকম মিশিয়ে দেনও কয়েকবার। তেমন কিছু দাঁড়ায়নি।

আজও অফিস থেকে বেরোতে বেশ রাত হয়ে গেল। বাইরে দুর্যোগ চলছে। ভয়ংকর হাওয়া দিচ্ছে, সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি। রাস্তায় হাঁটুভর জল দাঁড়িয়ে গেছে। দোলগোবিন্দবাবু র‍্যাক-এ ঝোলানো তাঁর ছাতাটা নিতে গিয়ে একটু অবাক হলেন। বাঁ দিকের দ্বিতীয় হুকটায় তিনি বরাবর তার ছেঁড়া তাপ্পি-দেওয়া ছাতাটা ঝুলিয়ে রাখেন। আজও রেখেছেন। অথচ ছাতাটা নেই। তার বদলে একটা খুব ঝকমকে নতুন ছাতা ঝুলছে। শুধু নতুন নয় বেশ কায়দার ছাতা। কালো বাঁকানো পুরু হ্যাঁন্ডেল, দারুণ দামি কাপড়, ওজনেও সাধারণ ছাতার চেয়ে পাঁচগুণ ভারী। র‍্যাক-এ আর দ্বিতীয় ছাতা নেই। অফিসের সবাই কখন বাড়ি চলে গেছে।

দোলগোবিন্দবাবু দারোয়ান রামবিলাসকে ডেকে ছাতার কথা জিজ্ঞেস করলেন। রামবিলাস বলল, আমি তো কিছু জানি না বাবু।

অন্যের ছাতাটা নেওয়া উচিত হবে কিনা তা বুঝতে পারছিলেন না তিনি। তবে ছাতা যারই হোক সে ছাতা নিতে এই দুর্যোগে আজ আর আসবে বলে মনে হয় না। সুতরাং কাল ছাতাটা ফেরত আনলেই হবে। এই ভেবে দোলগোবিন্দ ছাতাটা নিয়ে বেরোলেন।

ছাতাটা ভাল। খুবই ভাল। মাথার ওপর তুলে দোলগোবিন্দ ছাতাটা খুলবার জন্য হাত বাড়াতেই সেটা আপনা থেকেই নিঃশব্দে এবং বেশ বিনীতভাবে খুলে গেল। আজকালকার অটোমেটিক ছাতা যেমন অভদ্র ভাবে ফটাং করে খোলে সেরকমভাবে নয়।

বৃষ্টি আজ বড়ই প্রবল। রাস্তায় কলকল করে যেন নদী বয়ে চলেছে। বাস ট্রাম ট্যাক্সি সব বন্ধ। একটা কুকুরকেও দেখা যাচ্ছে না কোথাও। আকাশে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। দোলগোবিন্দবাবু বুঝলেন, আজ জল ঠেঙিয়ে পায়ে হেঁটেই বাড়ি ফিরতে হবে।

রাস্তায় পা দিয়ে দোলগোবিন্দ দেখলেন, সিঁড়ির নীচে তেমন জল নেই। চটি ভিজল না। দোলগোবিন্দও হাঁটতে হাঁটতে আরও টের পেলেন, ছাতাটা এতই ভাল যে চারদিকে প্রবল বৃষ্টি এবং বাতাস সত্ত্বেও তাঁর গায়ে একটুও ছাঁট লাগছে না, বাতাসও নয়। এত ভাল ছাতা নিশ্চয়ই এদেশে হয় না।

বেশ আনমনেই হাঁটছিলেন দোলগোবিন্দ। হাঁটতে হাঁটতে ছেলেবেলার কথা ভাবছিলেন। তাদের খোড়ো চালের ঘরে বর্ষাকালে বড় জল পড়ত। তারা ঘরে বসে ভিজতেন আর সারা রাত জেগে বসে জড়োসড়ো হয়ে কাটাতেন।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ তার মনে হল, পায়ের নীচে যেন মাটিটা ভাল টের পাচ্ছেন না! হল কী? নীচের দিকে তাকিয়ে উনি অবাক হয়ে দেখলেন, বাস্তবিকই কনভেন্ট রোডের রাস্তাটা কোন যাদুবলে যেন প্রায় দশ হাত নীচে পড়ে আছে। আর তিনি ভেসে আছেন।

না, কথাটা ঠিক হল না। তিনি ঠিক ভেসেও নেই। তিনি ধীরে ধীরে ওপরে উঠে যাচ্ছেন। কোনও বাড়তি শক্তি লাগছে না, চেষ্টা করতে হচ্ছে না, একেবারে গ্যাস

বেলুনের মতো দিব্যি উঠে যাচ্ছেন তিনি।

এই অশরীরী কাণ্ডে দোলগোবিন্দ ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, বাঁচাও! গেলুম!

ঝড় বৃষ্টিতে সেই শব্দ কেউ শুনতে পেল না। আর শুনলেও লাভ ছিল না। দোলগোবিন্দ তখন মাটি থেকে বিশতলা বাড়ির উচ্চতায় ঝুলছেন, মানুষ তার কী সাহায্য করতে পারে।

দোলগোবিন্দ কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইলেন দাঁত মুখ খিঁচিয়ে। ভাবলেন, এটা তো দুঃস্বপ্ন, কেটে যাবে এখুনি।

কিন্তু দুঃস্বপ্ন কাটল না। দোলগোবিন্দ যখন চোখ খুললেন তখন কলকাতা শহরটা প্রায় মাইলটাক নীচে পড়ে আছে। দোলগোবিন্দ শিব, কালী, হরি, দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী ইত্যাকার যত দেবদেবীর নাম মনে পড়ল তাদের বিস্তর ডাকাডাকি করতে লাগলেন। একবার ছাতাটা ছেড়ে লাফিয়ে পড়ার কথাও ভেবেছিলেন। কিছু লাফালে তার হাড়গোড় খুঁজে পাওয়া যাবে না, তাছাড়া ছাতাটাই যেন তার হাতখানা মুঠো করে ধরে আছে। ছাড়তে চাইলেও ছাড়তে পারবে না।

দোলগোবিন্দ কখনও এরোপ্লেন চড়েননি। উঁচু পাহাড়েও কখনো ওঠেননি। বলতে কি এত উঁচুতে তাঁর এই প্রথম ওঠা। নীচের দিকে চেয়ে তার মাথা ঘুরতে লাগল, হাত, পা হিম হয়ে গেল, বুক ধড়ফড় করতে লাগল। চোখের সামনে ধোঁয়া ধোঁয়া দেখতে লাগলেন।

ধোঁয়া ধোঁয়া দেখার অবশ্য দোষও নেই। একটু বাদেই দোলগোবিন্দ বুঝতে পারলেন যে ধোঁয়া নয়, তার চারপাশে মেঘ, আঁতকে উঠে ভিরমি খেতে খেতেও সজাগ রইলেন দোলগোবিন্দবাবু। মেঘ খুব বিপদের জিনিস। মেঘ থেকেই বিদ্যুৎ চমকায় এবং বাজ পড়ে। কাছাকাছি যদি এখন বিদ্যুৎ চমকায় তাহলে বড় বিপদ।

বেশ কিছুক্ষণ চারপাশ ঘন কুয়াশার মতো মেঘে ঢাকা রইল। দোলগোবিন্দ কিছুই ঠাহর করতে পারলেন না, তারপর একসময়ে হঠাৎ আকাশটা হেসে উঠল মাথার ওপর। ঝকমক করছে তারা, বেশ জ্যোৎস্নাও ফুটফুট করছে। পায়ের তলায় পড়ে আছে কোপানো ক্ষেতের মতো মেঘের স্তর।

দোলগোবিন্দ আচমকাই দেখতে পেলেন, হাত দশেক দূরে একটা ডিঙিনৌকো বাতাসে ভাসছে। এক হাতে চোখ কচলে নিয়ে তাকালেন, না, ঠিক ডিঙিনৌকো

নয়, একটা অতিকায় পটল। কিংবা…

আর ভাববার সময় পেলেন না। ছাতাটা তাকে ধরে এনে ওই অতিকায় পটলের মতো বস্তুটার পিঠে খুব যত্নের সঙ্গে নামিয়ে দিল, তারপর ছাতা আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে গেল।

দোলগোবিন্দবাবু কিছু বুঝে ওঠার আগেই পায়ের নীচে ম্যানহোলের মতো একটা ঢাকনা খুলে গেল এবং তিনি সেই ফুটো দিয়ে ভিতরে পড়ে গেলেন।

নাঃ, খুব একটা জোরে পড়লেন না। তাছাড়া যেখানে পড়লেন সেখানে ফোম রবারের মতো গদিও ছিল। শুধু ভড়কে যাওয়ায় মুখ দিয়ে ‘‘আঁচ করে একটা শব্দ বেরিয়েছিল তার।

মহাকাশযান, উফো, ভিন্ন গ্রহের জীব ইত্যাদি সম্পর্কে আর পাঁচজনের মতো দোলগোবিন্দবাবুও যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। এই পটলের মতো বস্তুটি যে ভিন্ন কোনও গ্রহ থেকে আসা একটি উফো সে বিষয়ে তার কোনও সন্দেহই রইল না। উফোর ভেতরটা খুবই বড়-সড় এবং নানারকম কিস্তৃত যন্ত্রপাতি রয়েছে চারদিকে। দিব্যি ঝলমলে আলো জ্বলছে।

দোলগোবিন্দবাবু উঠে দাঁড়াতেই একটা মানুষ, অবিকল মানুষ নয়–অনেকটা মানুষের চেহারার একটা জীব তার দিকে এগিয়ে এল। মানুষের সঙ্গে এর তফাত হচ্ছে এই জীবটার শুড় এবং লেজ আছে। বাকিটা মানুষের মতোই। শুড়টা হাতির শুড়ের মতো অত বড় নয়। লেজটা অনেকটাই গরুর লেজের মতো। লোকটার পোশাক বলতে একটা হাফ প্যান্টের মতো বস্তু, গায়ে একটা জহরকোট গোছের জিনিস।

এদিক সেদিক আরও কয়েকজন অবিকল একরকম জীবকে দেখতে পেলেন দোলগোবিন্দ, তারা সব তখনও মনোযোগে যন্ত্রপাতি দেখাশোনা করছে।

সামনের জীবটা প্রথমে শুধু দুর্বোধ্য একটা ভাষায় দোলগোবিন্দবাবুকে কিছু একটা বলল। ভাষাটা না বুঝলেও কথা বলার ঢংয়ের মধ্যে বিনয় এবং নম্রতা আছে।

এরপর জীবটা একটা রেডিওর মতো যন্ত্র মুখের কাছে তুলে ধরে কথা বলতে লাগল।

আশ্চর্য! পরিষ্কার বাংলা ভাষা।

জীবটা বলল, আমরা অনেক দূর থেকে আসছি। আমাদের ভাষা তুমি বুঝবে না। আমি যে যন্ত্রটার ভিতর দিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলছি তা একটা অনুবাদ যন্ত্র। আমার ভাষাকে তোমার ভাষায় সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ করে দিচ্ছে। আমার কথা তুমি বুঝতে পারছো তো।

ঘাবড়ে গেলেও দোলগোবিন্দ ঘাড় কাৎ করে বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।

এখন শোনো। যে ছাতাটা তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছে তা আমরাই পাঠিয়েছিলাম। আমাদের এই মহাকাশযানে একটা যন্ত্রের মধ্যে একটা ফুটো দেখা দিয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও সেই ফুটো আমরা বন্ধ করতে পারিনি। বাধ্য হয়ে আমরা আমাদের সবজান্তা যন্ত্রমগজের সাহায্য নিই। যন্ত্রমগজ আমাদের তোমার নাম জানিয়ে বলে, এক মাত্র এই লোকটাই সেই কেমিক্যাল তোমাদের দিতে পারে যার সাহায্যে ফুটো সারানো সম্ভব। তাই তোমাকে একটু কষ্ট দিয়ে এখানে টেনে এনেছি।

দোলগোবিন্দ প্রায় আকাশ থেকে পড়ে বললেন, কিন্তু আমি তো বৈজ্ঞানিক নই, সামান্য ল্যাবরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট। আমি কেমিক্যালের কী জানি? জীবটা বলল, ভাল করে ভেবে দেখ। আমাদের যন্ত্রমগজ কখনও মিথ্যে কথা বলে না। ভুলও করে না। পৃথিবীতে কোটি কোটি মানুষের মধ্যে ও শুধু একটা লোকেরই নাম বলেছে। দোলগোবিন্দ মিত্র। সুতরাং নিশ্চয়ই তুমি আমাদের সাহায্য করতে পারবে।

দোলগোবিন্দ আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলেন। কিছুই তার মনে পড়ল না। তবে মাঝে মাঝে উনি কিছু আজগুবি মিকশ্চার তৈরি করেছেন, করে সেগুলো বাতিল শিশি বা জারের মধ্যে ভরে নিজের আলমারিতে রেখে দিয়েছেন। তা দিয়ে কোনও কাজ হবে না জেনেও, আমতা আমতা করে বললেন, দেখুন এই ইয়ে, আমি ফুটো বন্ধ করার কোনও কৌশল জানি না। তবে আমার কাছে কয়েকটা আজগুবি মিকশ্চার আছে। কিন্তু তার মধ্যে কোন্টা কাজে লাগবে তা তো জানি না।

জীবটা বলল, আপনি এক্ষুনি আপনার ল্যাবরেটরিতে চলে যান। ওই ছাতাই আপনাকে নিয়ে যাবে এবং নিয়ে আসবে। যদি আমাদের ছিদ্র সারাতে পারেন,

তবে আপনাকে আমরা পুরস্কার দেবো।

তাই হল। ফের প্রাণ হাতে করে ছাতার হাতল ধরে ঝুলে রইলেন দোলগোবিন্দ। ল্যাবরেটরির সামনে এসে দেখলেন, সর্বনাশ, দরজায় তালা দেওয়া।

কী করবেন ভাবছেন, এমন সময় হাতের ছাতাটা আপনা থেকেই উঠে তালাটায় গিয়ে একটা গুতো মারল। সঙ্গে সঙ্গে টক করে খুলে গেল তালা।

ভিতরের আলমারি খুলে মোট পাঁচটা শিশি আর জার হাতে বগলে নিয়ে বেরিয়ে এলেন দোলগোবিন্দ। ছাতাটা তালায় আর একটা গুতো দিতেই সেটা এঁটে গেল। দোলগোবিন্দর হাত আর বগল থেকে শিশি আর জারগুলোও পটাপট চুম্বকের আকর্ষণে ছাতার মধ্যে সেঁধিয়ে শিকগুলোর সঙ্গে লেগে রইল।

ঝুল খেতে খেতে দোলগোবিন্দ এসে সেই মহা পটলের মতো মহাকাশযানে উঠলেন।

সেই জীবটা এগিয়ে এসে দোলগোবিন্দবাবুকে খুব খাতির করে নিয়ে গেল।

পটলটার তলার দিকে একটা ধাতব বাক্সের মতো জিনিস আছে। ফুটোটা সেখানেই।

দোলগোবিন্দবাবুর মনে পড়ল যে শিশিটায় সবুজ রঙের ঘন পদার্থ রয়েছে তা থেকে দু ফোঁটা একবার তার টেবিলের ওপর পড়ে যায়। পরে সেটা এমন শক্ত হয়ে জমে গিয়েছিল যে তিনি সেটা উকো দিয়ে ঘষেও তুলতে পারেননি। সুতরাং দোলগোবিন্দ আর দেরি না করে সবুজ শিশি থেকে দু ফোঁটা ফুটোয় ঢেলে দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেটা শক্ত হয়ে জমে গেল।

জীবটা একটা যন্ত্র থেকে তাপ্পি দেওয়া জায়গাটায় অনেকক্ষণ ধরে তাপ দিল। আবার একটা পাইপ থেকে ভীষণ ঠাণ্ডা একটা পদার্থ ছড়াল ওর ওপর। কিন্তু ফুটোর তাপ্পি টিকে রইল।

লেজ ও শুড়ওলা জীবটা দোলগোবিন্দর দিকে চেয়ে খুব বিনীতভাবে বলল, চমৎকার! আপনি যে আমাদের কী উপকার করলেন তা আর বলার নয়। এর জন্য আপনাকে আমরা আমাদের গ্রহের দুটি অতি মূল্যবান জিনিস দিয়ে যাচ্ছি। এ দুটো দিয়ে আপনি ভাগ্য ফেরাতে পারবেন।

জীব ভদ্রলোক দোলগোবিন্দকে দুটো ক্ষুদে বাক্স দিলেন। দোলগোবিন্দও ফের ছাতার বাঁট ধরে নেমে নিজের বাসার দোরগোড়ায় নামলেন।

পরদিন সকালে বাক্স দুটো খুলে হাঁ হয়ে গেলেন দোলগোবিন্দ, একটায় খানিকটা কচ লবণ, অন্যটায় একটুখানি চুন। রসিকতা নয় তো!

না। অনেকক্ষণ ভেবে দোলগোবিন্দ বুঝতে পারলেন, এ দুটো জিনিস সম্ভবত ওই গ্রহে পাওয়া যায় না, নিশ্চয়ই ভীষণ মুল্যবান। শুড় লেজওলা জীব বোধহয় জানে না যে পৃথিবীতে ওই দুই বস্তু অঢেল এবং সস্তা।

মনটা খারাপ হয়ে গেল বটে দোলগোবিন্দর, কিন্তু দমলেন না। সবুজ শিশিটা নিয়ে নাড়াচাড়া শুরু করলেন। যেখানে ফুটো পান সেখানেই প্রয়োগ করেন। ছাদের ফুটো, ছাতার ফুটো, বাসনের ফুটো।

ফুটো সারানোয় রীতিমত নাম ডাক হতে লাগল তার। ক্রমে নৌকো জাহাজ এরোপ্লেনের ফুটো পর্যন্ত সারাতে তাঁর ডাক পড়তে লাগল।

বলা বাহুল্য, দোলগোবিন্দর নাম এখন ফুটোবাবু। কোটি কোটি টাকার মালিক। বিশাল বাড়ি, গাড়ি, কোনো কিছুরই অভাব নেই।

# বহুরূপী বরদাচরণ

---

**বহুরূপী বরদাচরণ**

গোয়েন্দা বরদাচরণ যদিও খুবই বুদ্ধিমান লোক, তবু তার আচার আচরণ কিছুটা অস্বাভাবিক। সাধারণ মানুষ যা করে তিনি তা কখনো করেন না। কারো বাড়িতে ঢুকবার সময় তিনি সদর দরজা দিয়ে ঢেকেন খুবই কম। তিনি ঢোকেন পিছনের পাঁচিল ডিঙিয়ে, পাইপ বেয়ে ছাদে উঠে বা ওই রকম বিচিত্র পদ্ধতিতে। তিনি হয়তো মগরা যাবেন, কিন্তু উঠবেন মেল ট্রেনে। মেল ট্রেন মগরায় থামে না এটা তিনি ভালই জানেন। তবু ওঠেন এবং চলন্ত মেল ট্রেন থেকে লাফিয়ে মগরায় নেমে পড়েন। চড়চড়ে রোদের মধ্যেও তাকে গায়ে রেন কোট এবং পায়ে গামবুট পরে থাকতে দেখা যায়। গ্রীষ্মকালে কেন যে তিনি মাঝে মাঝে ওভারকোট পরেন তা বুঝেওঠা দায়। ছদ্মবেশ ধারণে তিনি খুবই পটু সন্দেহ নেই। কিন্তু সবসময়েই ছদ্মবেশ ধারণ করে থাকেন বলে তাঁর আসল চেহারাটা কিরকম তা লোকে ভুলেই গেছে। কখনো তাঁর পাকানো গোঁফ, কখনো ঝোলা গোঁফ কখনো ফ্রেঞ্চ কাট দাড়ি, কখনো রবীন্দ্রনাথের মতো ঝুল দাড়ি, কখনো বাবরি চুল, কখনো বা কঁকড়া চুল, চোখে কখনো লাল চশমা, কখনো কালো নীল চশমা, কখনো চশমা, কখনো দাঁতে কালি মাখিয়ে ফোকলা বুড়ো সেজে লাঠি হাতে ঠুকঠুক করে ঘুরে বেড়ান, কখনো পাগড়ি বেঁধে শিখ সেজে আবির্ভূত হন। তার এই বহুরূপের জন্য তার বাড়ির লোকও ভুলতে বসেছে বরদাচরণের প্রকৃত চেহারাটা কিরকম। সেদিন একজন ঘুঁটেউলিকে ডেকে বরদাচরণের মা ঘুঁটে রাখলেন, সেই সময় ঘুঁটেউলির নাকের বাঁ পাশে আঁচিলটা দেখে তার সন্দেহ হল, এ হয়তো বরদা। কারণ, বরদাচরণ ক দিন হল একটা তদন্তের কাজে বাইরে গেছেন, তার কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না। তাই চেঁচিয়ে উঠলেন, আমোলো, বরদা নাকি রে? কিন্তু বাস্তবিক ঘুঁটেউলি কিন্তু বরদা ছিলেন না। তবে এ নিয়ে খুঁটেউলিকে বিস্তর ঝামেলা পোয়াতে হয়েছিল। আবার একদিন রাতে বরদাচরণের বাবা কালিঝুলি মাখা একজন লোককে বরদাচরণের ঘর থেকে চুপি চুপি বেরোতে দেখে জাপটে

ধরে চোর চোর বলে চেঁচাতে লাগলেন। পাড়ার লোকজন এল, চোর পাকড়াও হল, কিন্তু চোর কেবলই বলে, আমি বরদা। নকল চুলদাড়ি খসিয়ে কালিঝুলি ধুয়ে যখন আসল চেহারাটা দেখা গেল তখনও বরদাচরণের বাবা বলতে লাগলেন, এ কখনোই বরদা নয়। বরদার মোটেই এরকম চেহারা নয়! কিন্তু বরদার মা কেবলই বলেন, ওগো এই তো আমার বরদা, কিন্তু তার কথা কে বিশ্বাস করবে। কদিন আগেই ঘুঁটেউলিকে অবধি বরদা ভেবেছিলেন। যাই হোক এ নিয়ে অনেক ঝামেলা হয় মাঝে মাঝে।

রামবাবুর মেয়ের বিয়ে। তিনি বড়লোক মানুষ। প্রায় দু লাখ টাকার সোনার গয়না কিনেছেন। বাড়িতে গয়না রেখে ভরসা পাচ্ছেন না। তাই গিয়ে বরদাচরণকে ধরলেন।

বরদাচরণ তখন এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসীর, ছদ্মবেশ ধারণ করে নিজের ঘরে বসে একটা আতসকাঁচ দিয়ে একটা কাঠি জাতীয় জিনিস গভীর মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করছেন।

রামবাবু বললেন, ভাই বরদা, আমার মেয়ের গয়নাগুলো যে একটু পাহারা দিতে হবে ভাই। দু দিন বাদে বিয়ে, বড় দুশ্চিন্তায় আছি।

বরদাচরণ স্মিত হাসি হেসে বললেন, ঠিক আছে, যাচ্ছি। রামবাবু বাড়ি ফিরে আসার ঘণ্টাখানেক বাদেই সন্ন্যাসীর বেশে বরদাচরণ গিয়ে হাজির। চাপা কথায় জিজ্ঞেস করলেন কোথায় সোনা রেখেছেন?

কোণের ঘরের সিন্দুকে, চলো দেখিয়ে দিচ্ছি।

কোণের ঘরে গিয়ে বরদাচরণ চারদিক ঘুরে টুরে দেখলেন, তারপর সিন্দুকের চাবিটা চেয়ে নিয়ে সেটাও পর্যবেক্ষণ করলেন। সিন্দুক খুলে গয়নাগুলো ভাল করে দেখলেন। তারপর বললেন, কোনো চিন্তা নেই, আপনি নিশ্চিন্ত মনে কাজে যান।

বরদার কথায় নিশ্চিন্ত হয়ে রামবাবু কাজে গেলেন। ঘণ্টাখানেক বাদে এক কাবুলিওয়ালা এসে হাজির। রামবাবু অবাক হয়ে বললেন, কী চাই?

চাপা গলায় বলল, আমি বরদা, গয়না পাহারা দিতে এসেছি।

বলে কি? রামবাবু তো হাঁ। আমতা আমতা করে বললেন, বরদা তো এসে গেছে, সাধুর ছদ্মবেশে গয়না পাহারা দিচ্ছে।

কাবুলিওয়ালা চোখ বড় বড় করে বলল, সর্বনাশ! শীগগীর চলুন তো, দেখা যাক ঘটনাটা কি।

গিয়ে দেখা গেল, সিন্দুকের ডালা খোলা, গয়নার কোনো চিহ্নও নেই। আর সেই সাধু একদম হাওয়া হয়ে গেছে।

রামবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। কাবুলিওয়ালা রাগে দাঁতে দাঁত ঘষতে লাগল।

এর পরের ঘটনাটা ঘটল গদাধরবাবুর বাড়িতে। গদাধরবাবুও বিশাল বড়লোক। তার একটা শখ আছে। পৃথিবীর যত দামী ও দুর্মূল্য মণিমুক্তো তিনি সংগ্রহ করেন। নিজের বাড়িতেই একটা স্ট্রং রুম বানিয়েছেন আর তাতেই সব দামী পাথর রাখা হয়। তিন চারজন বিশ্বাসী দারোয়ানও আছে। তার। একদিন তিনি একটা উড়ো চিঠি পেলেন তাতে লেখা "আপনার কাছে মুগীর ডিমের সাইজের যে বার্মীজ মুক্তোটা আছে ওটা আগামী বুধবার রাত এগারোটায় শ্মশানের দক্ষিণে বটগাছের তলায় বাঁধানো বেদীতে রেখে আসবেন, নইলে সাতদিনের মধ্যে আপনাকে খুন করা হবে।"

চিঠিটা পেয়েই গদাধরবাবু বরদাচরণকে ডেকে পাঠালেন। বরদাচরণ এলেন, ফকিরের ছদ্মবেশে গম্ভীর মুখে সব শুনলেন, তারপর বললেন, ঠিক আছে, নির্দিষ্ট দিনে মুক্তোটা নিয়ে আপনি শ্মশানে যাবেন, সঙ্গে আমি থাকব।

বুধবার সন্ধ্যে সাতটার মধ্যেই বরদাচরণ চলে এলেন গদাধরের বাড়িতে। বললেন, চলুন, একটু আগে থাকতেই বেরিয়ে পড়া যাক। আকাশটা মেঘলা, ঝড়বৃষ্টি আসতে পারে। মুক্তোটা রেখে আপনি চলে আসবেন, তারপর আমি যা করার করব।

তো তাই হল। ফকিরবেশী বরদাচরণকে সঙ্গে নিয়ে গদাধরবাবু নির্দিষ্ট জায়গায় মুক্তো রেখে ফিরে এলেন। রাত ন'টা নাগাদ ফকির আবার এসে হাজির।

গদাধরবাবু বললেন, কি হল হে বরদা, চলে এলে যে বড়?

চলে এলাম মানে! চলুন, শ্মশানে চলুন।

এই যে একটু আগে গিয়ে ঘুরে এলুম তোমার সঙ্গে!

ফকির চোখ কপালে তুলে বলে উঠল, সর্বনাশ! করেছেন কি? মুক্তোটা কি রেখে এসেছেন?

তুমি তো তাই বললে।

ফকির সবেগে মাথা নেড়ে বলে, আমি নই গদাধরবাবু মাইরি বলছি।

কিন্তু গদাধরবাবু সে কথায় কান দিলেন না। তিনি বরদাচরণের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে ডায়েরি করলেন যে তাঁকে বোকা বানিয়ে মুক্তোটা বরদাই হাতিয়েছেন।

পুলিশ বরদাচরণকে গ্রেফতার করতে গিয়ে দেখে ঘরে একজন রং এর মিস্ত্রি দেয়ালে চুনকাম করছে। দারোগাবাবু বরদাচরণের ছদ্মবেশের কথা জানেন। তাই তিনি বিনা দ্বিধায় মিস্ত্রিকে গ্রেফতার করে বললেন, আপনার বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আছে বরদাবাবু।

মিস্ত্রি কঁদো কাঁদো হয়ে বলল, আজ্ঞে আমি তো বরদাবাবু নই।

কেন ছলনা করছেন বরদাবাবু? আমি আপনাকে চিনি।

মিস্ত্রি অনেক কান্নাকাটি কাকুতি-মিনতি করল, কিন্তু দারোগাবাবু তাতে ভোলবার লোক নন। লোকটাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হল। শেষে লোকটার বউ বাচ্চা আর পাড়া প্রতিবেশী এসে যখন হলফ করে বলল যে, এ বরদা নয় তখন তাকে দারোগাবাবু ছেড়ে দিলেন।

কিন্তু বরদাকে গ্রেফতার করতেই হবে। তাই দারোগাবাবু গিয়ে বরদার ঘরে দুজন সেপাইকে নিয়ে ঘাপটি মেরে রইলেন। বরদাচরণের বুড়ি পিসি সন্ধ্যেবেলা বরদার ঘরে ধূপবাতি দিতে ঢুকতেই তাঁকে কাঁক করে ধরে ফেললেন দারোগাবাবু, হেঁ হেঁ বরদাবাবু, এবার আর ফাঁকি দিতে পারবেন না। ধরে ফেলেছি।

পিসি তো আঁতকে উঠে চেঁচিয়ে পাড়া মাথায় করলেন। লোকজন দৌড়ে এল। কেলেঙ্কারির একশেষ। দারোগাবাবু লজ্জিত হয়ে থানায় ফিরলেন। তবে বিভিন্ন

লোক খবর দিয়ে যেতে লাগল যে বরদাচরণকে অমুক বা তমুক জায়গায় দেখা গেছে। কেউ বলল, বরদাচরণ একটা তালগাছ হয়ে পশ্চিমের মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন। কেউ বলল, বরদাচরণ গরু হয়ে সামন্তদের গোয়ালে ঢুকে লুকিয়ে রয়েছেন। এর ওপর বরদাচরণ বলে সন্দেহ করে সাত আটজন ভিখিরি, দুজন কাবুলিওয়ালা, তিনজন শিখ, তিনজন সাধু, দুজন ফকির, পাঁচজন বুড়ি এবং ছজন বুড়োকে থানায় ধরে এনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা জেরা করা হতে লাগল।

কিন্তু বলাই বাহুল্য আসল বরদাচরণকে কোথাও পাওয়া গেল না।

দারোগাবাবু হতাশ হয়ে বললেন, তাই তো ভাবছি, ভেবে ভেবে কূলকিনারা পাচ্ছি না। বরদাচরণকে ধরতে না পারা অবধি আমার ভাল করে ঘুম হবে না, পেট ভরে খাওয়া হবে না। তা মুক্তোটা আপনার ইনসিওর করা ছিল তো?

গদাধরবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তা ছিল। কিন্তু টাকাটাই তো বড় কথা নয়। এমন রেয়ার জিনিস কি আর যোগাড় করা যাবে?

দারোগাবাবু নিজের অক্ষমতায় কেবল দাঁত কিড়মিড় করতে লাগলেন।

রামবাবুও পুলিশের কাছে অভিযোগ করলেন যে, তার মেয়ের গয়নাও বরদাচরণই চুরি করেছে বলে তার সন্দেহ হচ্ছে।

কিন্তু বরদাচরণের কোনো হদিশ পাওয়া গেল না। গয়না বা মুক্তো চুরিরও কোনো হিল্লে হল না।

একদিন নিশুত রাত্রি। গদাধরবাবু তাঁর দোতলার ঘরে শুয়ে ঘুমোচ্ছন। হঠাৎ একটা খুটখাট শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। প্রথমে ভাবলেন, ইঁদুর, তারপর মনে হল, শব্দটা আসছে জানালা থেকে।

টর্চটা নিয়ে গদাধরবাবু উঠলেন, জানালায় কাউকে দেখা গেল না। তবে ঘরের মেঝেয় একটা চিঠি পড়ে ছিল। গদাধরবাবু চিঠি খুলে পড়লেন। তাতে লেখা আপনার মুক্তোটা আমরা ফেরত দিতে চাই। তার জন্য মাত্র পাঁচ লাখ টাকা দক্ষিণা লাগবে। মুক্তোটা আমাদের কাছেই আছে, নিশ্চিন্ত থাকবেন।

চিঠিটা পড়ে গদাধরবাবুর কপালে একটু দুশ্চিন্তার রেখা পড়ল। তিনি চটপট জামা কাপড় পরে চাকরদের ডাকলেন, ড্রাইভারকে ঘুম থেকে তুলে গাড়ি বার

করা হল, নিশুত রাত্রেই গদাধরবাবু রওনা হলেন।

মাইল দশেক দূরে একটা গঞ্জে এক বাড়ির সামনে তাঁর গাড়ি থামল। বাড়িটা গদাধরবাবুর এক বিধবা দিদির।

ডাকাডাকি করতে একজন যুবক ছেলে ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে বলল, এ কি, মামা যে এত রাত্রে? কী হয়েছে? গদাধরবাবু চিঠিখানা বের করে ভাগ্নের হাতে দিয়ে বললেন, এর মানে কী?

ছেলেটা চিঠিটা পড়ে অবাক হয়ে মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, মুক্তোটা তো…

গদাধরবাবু চাপা গলায় খেঁকিয়ে উঠে বললেন, হ্যাঁ, মুক্তো তোমার কাছে, তবে এই চিঠি দিল কে?

বোধহয় কেউ চালাকি করার চেষ্টা করছে।

গদাধরবাবু মাথা নেড়ে বললেন, তবু মুক্তোটা আমি নিজের চোখে দেখে যেতে চাই।

তাহলে এসো। দেখাচ্ছি।

ভাগ্নের সঙ্গে গদাধরবাবু বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন, সিঁড়ি বেয়ে চিলে কোঠায় উঠলেন। চিলে কোঠায় রেনপাইপের মধ্যে ঝোলানো একটা সুতো টেনে তুলল তার ভাগ্নে, সুতোর মাথায় একটা কাগজের মোড়ক বাঁধা, মোড়ক খুলে দেখা গেল, মুক্তোটা যথাস্থানেই আছে।

গদাধরবাবু নিশ্চিন্তের শ্বাস ছেড়ে বললেন, যাক বাবা, যা ভয় হয়েছিল, ইনসিওরেনসের টাকাটা পেলেই ঠক্করলালকে মুক্তোটা বেচে দেব। কথা হয়ে আছে।

মুক্তো আবার সুতোয় ঝুলিয়ে দিয়ে দুজনে তাকিয়ে দেখে দরজায় ড্রাইভারটি দাঁড়িয়ে আছে।

গদাধরবাবু ভারী অসন্তুষ্ট হয়ে বলে উঠলেন, এ কি? তুমি এখানে কেন? কে তোমাকে ডেকেছে?

কেউ ডাকেনি। নিজের গরজেই আসতে হল গদাধরবাবু। থাক থাক পিস্তল বের করতে হবে না। আমার হাতেও পিস্তল আছে।

গদাধরবাবুর হাত অবশ হয়ে গেল। বললেন, তুই কে?

কে বলে আপনার মনে হয়?

গদাধরবাবুর সন্দেহটা খুঁচিয়ে উঠল, বললেন, বরদা নাকি?

আজ্ঞে আপনার সেবায় আমি বরদাচরণই হাজির বটে। চালাকিটা খুবই ভাল ছিল আপনার। রামবাবুর মেয়ের বিয়ের গয়নার মধ্যে একটা মস্ত হীরে ছিল। সেটা হাতানোর জন্য নিজের ভাগ্নেকে সাধু সাজিয়ে কাজে লাগিয়েছিলেন। তারপর নিজের মুক্তোটা নিজেই সরালেন চমৎকার প্ল্যান করে। ফকির সেজে আপনার ভাগ্নে আমার দু ঘণ্টা আগে গিয়ে হাজির হয়েছিল। বাড়ির লোক, চাকর, দারোয়ান সবাই সাক্ষী থাকল যে ফকিরবেশী সেই লোকটা আমিই, আপনারও কাজ হাসিল হয়ে গেল। তবে শেষ রক্ষাটা হল না এই যা। উঁহু উঁহু ভাগ্নেবাবাজী, মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো। সিঁড়িতে বুটের শব্দ পাচ্ছো না? পুলিশ।

বাস্তবিকই পুলিশ। সামনে স্বয়ং দারোগাবাবু।

# বাজারদর

**বাজারদর**

একশো বছর পর ঘুম ভাঙতেই রামবাবু ভারী অস্বস্তি বোধ করলেন। যে কাঁচের বাক্সে তিনি শুয়ে আছেন, সেটার ভিতরটা ভীষণ ঠাণ্ডা। তার ওপর চোখে তিনি সবকিছু ধোঁয়াটে দেখছেন, কান দুটো ভোঁ ভোঁ করছে, হাত-পা খিল ধরা, মাথাটা খুব ফাঁকা।

কিছুক্ষণ একেবারে ডোম্বলের মতো শুয়ে রইলেন রামবাবু। তারপর আস্তে আস্তে শরীর গরম হল, কানের ভো ভো কমে গেল, হাত পায়ের খিল ছাড়ল। সবকিছু মনে পড়তে লাগল। মনে পড়তেই তিনি ভীষণ আঁতকে উঠে বসলেন এবং চারদিকে প্যাট-প্যাট করে তাকাতে লাগলেন। ১৯৭৯ সালে তাকে গভীরভাবে ঘুম পাড়িয়ে একটা ঠাণ্ডা বাক্সে ভরে মাটির নীচে একটা স্টোর রুমে রেখে দেওয়া হয়েছিল। কথা ছিল একশো বছর পর পরবর্তী সমাজের মানুষ তার ঘুম ভাঙাবে।

একশো বছর কি কেটে গেল এর মধ্যেই? চোখের দৃষ্টি কিছু স্বচ্ছ হতেই তিনি দেখলেন, কাঁচের বাক্সটা একটা টেবিলের ওপর রাখা, টেবিলের চারধারে দাঁড়িয়ে সাদা পোশাক পরা কয়েকজন লোক তাকে গম্ভীরভাবে দেখছে।

রামবাবু প্রথমে একটা হাঁচি দিলেন, একটু কাশলেন, একটা হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙলেনভারী লজ্জা-লজ্জা করছিল তাঁর। স্বাভাবিক নিয়মে এতদিন তার বেঁচে থাকার কথা নয়। হিসেব করলে, এখন তার বয়স ঠিক একশো চল্লিশ বছর। তাছাড়া এই একশো বছর পরেকার দুনিয়ায় কত কী পাল্টে গেছে। কেমন লাগবে কে জানে বাবা! তিনি প্রথমেই দেখে নিলেন মানুষগুলোর এই একশো বছরের বিবর্তনে লেজ বা শিং গজিয়েছে কি না। গজায়নি। লোকগুলো খুব লম্বা বা বেঁটে হয়ে যায়নি তো? না। লোকগুলো ভাল, না খারাপ? বোঝা যাচ্ছে না। তবে

সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা তার জানতে ইচ্ছে করছিল, সেটা হল বাজারদর। এখন চাল কত করে কিলো? আলু কত? মাছ কত? পালং, কপি, কড়াইশুটিই বা কী রকম?

রামবাবু একটু হেসে বললেন, খুব একচোট ঘুম হল বাবা। টানা একশো বছর একেবারে।

লোকগুলো তার কথার জবাব দিল না। ভারী অভদ্র। এখনো খুব খরচোখে তার দিকে চেয়ে আছে। সকলের মুখেই কাপড়ের টাকা।

রামবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, হাঁ করে দেখছ কী সবাই? গত একশো বছরে আমার পেটে কিছু পড়েনি, তা জানো? দাঁতে কুটোটি পর্যন্ত কাটিনি। ছুটে গিয়ে খাবার-দাবার নিয়ে এসো। আর শোনো, চায়ের নাম শুনেছ তো? চা? জানো? হ্যাঁ, এক কাপ গরম চা দাও সবার আগে।

লোকগুলো মৃদু-মৃদু হাসছে। রামবাবু ভাবলেন, এরা বোধহয় বাংলা ভাষা বোঝে না। তার আর দোষ কী? একশো বছরে ভাষারও কত পরিবর্তন হয়ে থাকবে। এখনকার বাংলা ভাষা হয়তো চীনেভাষার মতোই দুর্বোধ্য। তাই তিনি একটু চীনে ভাষার মিশেল দিয়ে বললেন, খাবারচুং জলদিচি লাওং। গরমং চাং দরকারং।

বলে নিজের ওপর একটু বিরক্তই হলেন রামবাবু। চীনেভাষা তার কস্মিনকালেও জানা নেই। অজানা ভাষার ভেজাল দিতে গিয়ে বাংলাটা কেমন সংস্কৃতঘেঁষা হয়ে গেল না?

লোকগুলো কিছু বুঝতে পেরেছে বলে মনে হল না। তবে অপারেশন থিয়েটারের মতো নানারকম যন্ত্রপাতিওলা ঘরটায় তারা হরেক কলকাঠি নাড়তে লাগল। রামবাবু হাই তুলে বললেন, আর কতক্ষণ এই প্রায় দেড়শো বছরের বুড়োটাকে তোরা দগ্ধে মারবি বাপ? খাবার না দিস একটা আয়না অন্তত দে। বুড়ো মুখটার কী ছিরি হয়েছে দেখি।

লোকগুলো একথাটা যেন কী করে বুঝতে পারল। একজন কোত্থেকে ছোট্ট গোল একটা হাত-আয়না বের করে ধরিয়ে দিল তার হাতে। রামবাবু কী দৃশ্য দেখবেন সেই ভয়ে আয়নাটা মুখের সামনে ধরেও কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইলেন। চোখ খুলবেন কি খুলবেন না ঠিক করতে

করতেই অবাধ্য চোখদুটো বেআক্কেলের মতো খুলে গেল। কিন্তু রামবাবু খুশিই হলেন। মুখের চামড়া একটু ঝুলে গেছে ঠিকই, দাড়িও একটু হয়েছে, তবে সব মিলিয়ে তার চেহারায় বয়সের ছাপ তেমন পড়েনি। চল্লিশ বলেই চালানো যায়।

অবশ্য এরকমই কথা ছিল কাঁচের বাক্সে যন্ত্রপাতি লাগিয়ে তাঁকে এমনভাবেই রাখা হয়েছিল যাতে তাঁর শরীরে অতি মৃদু হৃৎস্পন্দন হয়, অতি মৃদু গতিতে রক্ত চলাচল করে, অতি মৃদু শ্বাসপ্রশ্বাস চলে এবং শরীরের ক্ষয়ক্ষতি নগণ্য মাত্রায় ঘটে। এই একশো বছর আসলে তিনি ছিলেন মৃত। কাজেই শরীরটার বয়স বাড়েনি।

একটা লোক তাঁর বাঁ হাতটা বাগিয়ে ধরে ইনজেকশন দিচ্ছে। তিনি তাকে আস্তে করে জিজ্ঞেস করলেন, এখন বাজারদরটা কিরকম বলতে পারো হে? আলু কত করে যাচ্ছে!

লোকটা খুব অবাক হয়ে রামবাবুর দিকে তাকাল। রামবাবু ভাবলেন, লোকটা বোধহয় বাংলা জানে না। ইংরিজিতে বললেন, পট্যাটো?

লোকটা মাথা নাড়ে। রামবাবু আবার জিজ্ঞেস করেন, রাইস? ডোন্ট ইউ ইট রাইস?

লোকটা মাথা নাড়ে। রামবাবু হাল ছেড়ে দেন। ইংরিজিও বিস্তর পাল্টে গেছে বোধ হয়। একটা ভারী অস্বস্তি হচ্ছে মনের মধ্যে। একশো বছর আগে অজ্ঞান হওয়ার সময় তার বন্ধু বৈজ্ঞানিক গয়েশ হালদারের সঙ্গে একটা বাজি ধরেছিলেন। দুশ্চিন্তা সেই বাজিটা নিয়ে।

একশো বছর পর তার ঘুম ভাঙলে লোকেরা তার ওপর বিস্তর এক্সপেরিমেন্ট চালাবে, এরকম কথাই ছিল। লোকগুলো চালাচ্ছিলও তাই। ইনজেনশন দিল, রক্ত নিল, ব্লাডপ্রেশার দেখল, হাঁ করাল, শুইয়ে বসিয়ে, চিত করিয়ে, উপুড় করে বিস্তর পরীক্ষা চালাল ।

রামবাবু আপনমনে বকবক করতে লাগলেন, চল্লিশের মতো দেখতে বলেই কি আর চল্লিশের খোকা আছি রে বাবা? বয়সটা হিসেব করে দ্যা না! তারপর বুঝেসুঝে খোঁচাখুঁচি করিস।

কিন্তু কে শোনে কার কথা! গোমড়ামুখো লোকগুলো নাগাড়ে তাদের পরীক্ষা চালিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ রামবাবুর নিজের পরিবারের কথা মনে পড়ল। এতক্ষণ পড়েনি কেন সেটাই আশ্চর্য! একশো বছর আগে অজ্ঞান হওয়ার সময় তার স্ত্রী বেঁচে ছিলেন, দুটো ছেলে আর চারটে মেয়ে ছিল, মাথার ওপর বুড়ো বাপ মা, তিন ভাই আর সাত বোনও ছিল।

এই একশো বছরে তাদের কারোরই আর বেঁচে থাকার কথা নয়।

ভাবতেই হাউহাউ করে কেঁদে উঠলেন রামবাবু। চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। একটা লোক তাড়াতাড়ি একটা টেস্ট টিউবে সেই চোখের জল ধরে রাখল।

তবে শোকটা খুব বেশিক্ষণ রইল না রামবাবুর। আত্মীয়স্বজনরা এতকাল বেঁচে থাকলে খুনখুনে বুড়োবুড়ি হয়ে যেত সব। সেটাও ভাল দেখাত না। তিনি লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, আমার বউ বাচ্চারা এতকাল বেঁচে নেই জানি, কিন্তু নাতিপুতি বা তস্য পুত্রপৌত্রাদি কে আছে জানো? একটু খবর দেবে তাদের?

একটা কিম্ভুত এক্স-রে মেশিনে তাঁকে ঝাঁঝরা করছিল লোকগুলো। পাত্তাও দিল না। তবে তারা চটপট যন্ত্রপাতি গুটোচ্ছিল। রামবাবুর মনে হল পরীক্ষা আপাতত শেষ হয়েছে। তিনি মটকা মেরে পড়ে রইলেন।

লোকগুলো কোনো সম্ভাষণ না জানিয়েই বেরিয়ে গেল। রামবাবু শুয়ে-শুয়ে চোখ পিটপিট করতে লাগলেন। একশো বছরে বাইরের দুনিয়াটার কতটা পরিবর্তন হয়েছে, তা বুঝবার উপায় নেই এখান থেকে। এ-ঘরে নিরেট দেয়াল আর যন্ত্রপাতি। একটা পুরু দরজা আছে বটে, কিন্তু তার ওপাশে একটা করিডোর। বাইরে হয়তো এখন তুষার-যুগ চলছে, সূর্য হয়তো নিভু নিভু হয়ে এসেছে, মানুষ হয়তো এখন বিজ্ঞানের বলে শূন্যে হাঁটে, জিনিসপত্রের দাম হয়তো একশো গুণ করে বেড়েছে। হয়তো…!

রামবাবু শুয়ে-শুয়ে কিছুক্ষণ ঠ্যাং নাচালেন, তারপর ‘দুত্তোর’ বলে উঠে পড়লেন। ঘুরে ঘুরে ঘরের যন্ত্রপাতিগুলো দেখতে লাগলেন। এক সময়ে তিনি নামকরা বৈজ্ঞানিক ছিলেন। তবু এই একশো বছর পরেকার আধুনিক যন্ত্রপাতিগুলোর কলাকৌশল তিনি ভাল বুঝতেই পারলেন না। একটা বোতাম টিপতেই ঝড়ের মতো শোঁ-শোঁ শব্দ ওঠায় তাড়াতাড়ি সরে এলেন সেখান থেকে এবং গিয়ে

দরজার হাতল ধরে টানাটানি করতে লাগলেন। ভাগ্য ভাল, দরজাটা হড়াক করে খুলে গেল।

কিন্তু করিডোরে রেখেই আঁতকে উঠলেন রামবাবু। করিডোরের মেঝেটা ঠিক নদীর ধীর স্রোতের মতো বয়ে যাচ্ছে। তবে চলন্ত ফুটপাথ, এসকেলেটার বা কনভেয়ার বেল্ট রামবাবুর আমলেও ছিল, তাই খুব বেশি অবাক হলেন না। মাথাটা ঘুরছিল বলে তিনি চলন্ত করিডোরে বসে রইলেন। খানিকটা ওপরে উঠে এবং অনেকটা নীচে নেমে, খানিক ডাইনে গিয়ে এবং ফের কিছুটা বাঁয়ে মোড় নিয়ে করিডোরে চলতে লাগলেন। একটু বাদে আর একটা দরজা পেলেন। করিডোর থেকে লাফ দিয়ে নেমে দরজাটা টানলেন রামবাবু। দরজাটা খুলেও গেল।

বাইরে বেরিয়ে এসে রামবাবু একটা গভীর শ্বাস ছাড়লেন। চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন, যা ভেবেছিলেন তাই। না, তুষারযুগ আসেনি বা সূর্যও নিভু নিভু হয়নি। বরং একটার বদলে আকাশের চারধারে এবং মাঝখানে একটা, মোট পাঁচটা সূর্য জ্বলজ্বল করছে। আবহাওয়া খুবই মনোরম।

গরম, না ঠাণ্ডা। চারদিকে একশো দুশোতলা বাড়ি একেবারে গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে। আকাশেও তিনি বিস্তর বাড়িঘর ভেসে বেড়াতে দেখলেন। তারই ফাঁকে-ফাঁকে শো করে নানান সাইজের রকেট উড়ে যাচ্ছে, পিরিচের মতো দেখতে কিছু জিনিসকেও উড়ে যেতে দেখলেন তিনি, আরও দেখলেন রকেট লাগানো চেয়ারের মতো দেখতে ছোট ছোট আকাশ-গাড়িতে মানুষ চলাফেরা করছে!

সামনের চলমান ফুটপাথে উঠে পড়লেন রামবাবু। আশেপাশে আরও সব লোকজন রয়েছে। তারা হাঁ করে দেখছে তাকে। দেখবেই। তার পরনে সেই একশো বছর আগেকার ধুতি আর পাঞ্জাবি। এদের পরনে শুধু জাঙ্গিয়ার মতো খাটো একটু জিনিস, গা আদুড়।

রামবাবুর পাশেই একটা বুড়ো লোক। তার বয়স সত্তর বছর হবে। তা হোক, সত্তর হলেও এ লোকটা রামবাবুর চেয়ে না হোক সত্তর বছরের ছোট। তাই আপনি বলবেন না তুমি বলবেন, তা ঠিক করতে না পেরে রামবাবু বারকয়েক গলা খাকারি দিয়ে আস্তে করে জিজ্ঞেস করলেন, এখন কটা বাজে?

বুড়ো লোকটা একটু অবাক হয়ে তাকাল বটে, তবে একটু খোনাসুরে বলল, রাত নটা বেজে ছত্রিশ মিনিট তেরো সেকেন্ড।

রামবাবু নিজে বৈজ্ঞানিক। কাজেই অবাক হলেন না! এতক্ষণে বুঝলেন, আকাশে পাঁচটা সূর্য নয়, ওগুলো কোনো রকমের কৃত্রিম আলো যার ফলে চারদিকটা দিনের মতো দেখাচ্ছে। সম্ভবত ওগুলো পৃথিবীর অন্য পাশের সূর্যের আলো থেকে এপাশে আলো প্রতিফলিত করছে। এ ধরনের একটা আইডিয়া একশো বছর আগে তার মাথাতেও এসেছিল। রামবাবু ফের জিজ্ঞেস করলেন, আজ তারিখটা কত বলবে বাবা?

লোকটা অবাক চোখে ফের তাকিয়ে বলল, জানুয়ারি, বিশ শো ঊনআশি।

রামবাবু তা জানেন। তবু লোকটার সঙ্গে একটু খেজুরে আলাপ করছেন। তার আসল উদ্দেশ্য অন্য। একশো বছর পর পৃথিবীতে কীরকম পরিবর্তন হবে না-হবে, মানুষ কতটা এগোবে না-এগোবে, তা মোটামুটি আন্দাজ ছিল। সুতরাং তিনি চারদিকের পরিবর্তন দেখে খুব অবাক হননি। কিন্তু গয়েশের সঙ্গে একটা বাজি ছিল। সেইটে বড় খোঁচাচ্ছে।

রামবাবু বললেন, আচ্ছা সুকিয়া স্ট্রীটটা কোনদিকে বলতে পারো বাবা?

লোকটা বলে, সুকিয়া স্ট্রীট? সুকিয়া স্ট্রীট বলে কিছু শুনিনি তো?

নর্থ ক্যালকাটায়।

লোকটা হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বলে, ক্যালকাটা? ওঃ, ক্যালকাটা নামে একটা গ্রাম আছে বটে। সে তো অনেক উত্তর দিকে।”

এ শহরটার নাম কী বাবা?

এ হল গোসাবা, সুন্দরবন?

বটে! গোসাবার এত উন্নতি? বলে রামবাবু চোখ কপালে তোলেন।

লোকটা হঠাৎ রামবাবুর একটা হাত খপ করে ধরে বলল, আচ্ছা, আপনি কি রামবাবু? একশো বছর আগে যাকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছিল?

রামবাবু খুব জোরে মাথা নেড়ে বললেন, আমি সে-ই। কী করে বুঝলে বাবা?

বুঝব না? আপনার ঘুমন্ত মুখের ছবি যে প্রায়ই টেলিভিশনে দেখানো হয়। খবরের কাগজেও বেরোয়।

তাই বুঝি? বলে খুব হাসলেন রামবাবু। বললেন, তা কলকাতার কী হল বলতে পার বাবা?

সে তো আরো সত্তর-আশি বছর আগেই মশা, লোডশেডিং আর জলের অভাবে হেজে গিয়েছিল। শহরে জঙ্গল গজিয়ে যায়। তারপর এখন অবশ্য কলকাতা আবার বর্ধিষ্ণু গ্রাম হয়ে উঠেছে। ভাল চাষবাস হচ্ছে। চৌরঙ্গির আলু খুব বিখ্যাত, বাগবাজারের কুমড়ো পৃথিবীর সেরা, খিদিরপুরে মোচার সাইজের পটল জন্মায়। তাছাড়া কলকাতার এখন মশা বাঁচাও আন্দোলনের একটা হেড কোয়ার্টার হয়েছে।

বটে? সে আবার কী? মশা বাঁচাবে কেন বাবা?

মশা মেরে-মেরে মানুষ তো মশার প্রজাতিই ধ্বংস করে দিয়েছিল কিনা। যেমন একসময় আপনারা বাঘ-সিংহ মেরে সব প্রায় নিকেশ করেছিলেন। পরে আপনারা যেমন ব্যাঘ্রপ্রকল্প করে বাঘ বাঁচাতে চেয়েছিলেন, এখন ঠিক সেইভাবেই মশা জিয়োনোর চেষ্টা চলছে।

রামবাবু এবার আসল কথাটায় এলেন। খুব সতর্কতার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা বাবা, একটা কথা বলবে? খুব সাবধানে বোলো। তেমন শকিং কিছু শুনলে আমার বুড়ো হার্ট থেমে যেতে পারে। এখনকার বাজারদরটা বলতে পারো?

বাজারদর? লোকটা একটু অবাক হয়, হেসেও ফেলে। বলে, খুব চড়া।

খুব? বলে রামবাবু বড় বড় চোখে তাকান। গয়েশের সঙ্গে এই নিয়েই বাজি! গয়েশ বলেছিল, একশো বছর পর বাজারদর হবে একশো গুণ, রামবাবু বলেছিলেন, কক্ষনো না। দশগুণ বড়জোর হতে পারে। রামবাবুর বুকটা তাই ঢিবঢিব করছিল। বললেন, তবু বলো বাবা, শুনে রাখি। আচ্ছা, আগে বলো চাল কত করে।

চাল? লোকটা হাসিমুখেই বলে, চাল যাচ্ছে তিন শো টাকা।

রামবাবু শকটা সামলাতে পারলেন না। চোখ উল্টে ফেললেন, হাত পা কাঠ হয়ে গেল, ভিরমি খেয়ে পড়েই যাচ্ছিলেন। এমন সময়ে লোকটা বলল, কিলো নয়। কুইন্টাল।

রামবাবু আবার সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে একটা শ্বাস ছাড়লেন। আর যা হোক তা হোক, বাজারদরটা ঠিক আছে।

# বিধু দারোগা

### বিধু দারোগা

সেবার বিধু দারোগা আমাদের গঞ্জে বদলি হয়ে এলে হৈ-হৈ পড়ে গেল।

ব্রিটিশ আমলে দারোগা-পুলিশকে ভারী ভয় খেত গাঁ-গঞ্জের লোকেরা। রাস্তায় ঘাটে বা হাটে-বাজারে পুলিশ দেখলেই নিরীহ সজ্জন মানুষরাও সাঁত সাত করে এধারে ওধারে লুকিয়ে পড়ত। এক স্বদেশী আন্দোলনের নেতাগোছের লোক বটতলায় বক্তৃতা দিতে এলেন। শ’ পাঁচেক লোক জড়ো হয়ে গরম বক্তৃতা শুনে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। ঠিক সেই সময়ে একটা টিংটিঙে রোগা লাল-পাগড়িওলা পুলিশ হাট থেকে পালংশাক কিনে ফিরছিল। তাকে দেখে সেই পাঁচশ জোয়ান মদ্দ লোক দে-দৌড় দে-দৌড়। স্বদেশী নেতা গাছতলায় বসে বিড়ি ধরিয়ে, আপনমনে হতাশভাবে বললেন, হোপলেস। আর একবার, গঞ্জের নদীর ঘাট থেকে লোকভর্তি একটা নৌকা ছাড়ছে বিকেলবেলায়, সেই সময়ে গঞ্জের দারোগা আর কয়েকজন পুলিশও ওপারে যাবে বলে এসে নৌকোয় উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বিনা কারণে বিস্তর লোক ঝুপ ঝুপ করে হাঁটুজলে নেমে পালাতে লাগল। এমনকি, তাদের মধ্যে গাঁয়ের পাঠশালার পণ্ডিতমশাইও ছিলেন। পরে তাঁকে সবাই যখন জিজ্ঞেস করল তিনি কাচুমাচু হয়ে বললেন, “কি জানি বাবা, সবাই পালাল দেখে আমিও জলে নেমে পালালাম। ভয় বড় সংক্রমিক।”

এই তো ছিল দারোগা-পুলিশদের সে-আমলের দাপট। বিধু দারোগা ছিলেন সেই দাপুটেদের মধ্যেও আর এক কাঠি দাপুটে। তাঁর দাপটে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায় এ কেবল কথার কথা নয়। তিনি গঞ্জে এসেই চেঁড়ে পিটিয়ে দিলেন যে সামনের হাটবারে সবাই যেন স্বচক্ষে দেখে যায়, থানার উত্তর ধারের দিঘিতে বাঘে আর গরুতে এক ঘাটে জল খাবে।

সেই হাটবারে দিঘির ধারে লোক ভেঙে পড়ল। বাঁধানো ঘাটে বিশাল চেহারার বিধু দারোগা চেয়ারে বসে আছেন। তাকে কেউ হাসতে দেখেনি। কখনো। ভীষণ রাগী চোখে চারিদিকে চেয়ে দেখছেন। তাঁর চোখ যার ওপর পড়ছে সে-ই নিজের জায়গা ছেড়ে একটু সরে দাঁড়াচ্ছে। আমাদের ব্যায়ামবীর ছোটোকাকাও তিনবার জায়গা বদল করে অবশেষে কচুবনের ভিতরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কেউ জোরে কথা বলছে না, ফিসফাস, গুজগুজ করছে। সবাই শুনে আসছে বটে বাঘে গরুতে একঘাটে জল খাওয়ার কথা, কিন্তু কেউ কখনো দেখেনি! হারু মণ্ডলের বাঁকানো শিঙওলা দুষ্টু গরুটা খুঁটোয় বাঁধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বাঘ তখনো দেখা যাচ্ছে না। তাই নিয়ে সকলের কৌতূহল।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। পাশের গাঁয়ের প্রবর্তক সার্কাস গত অমাবস্যা থেকে খেলা দেখাচ্ছে। সেদিক থেকে একটা খাঁচাওলা গাড়ি বলদে টেনে আনল। খাঁচার মধ্যে গলায়-দড়ি-বাঁধা বাঘ বসে ঝিমোচ্ছে। অনেকে ফিসফিস করে বলল, বাঘকে আফিং খাইয়ে রাখে কিনা, তাই ঐ ঝিমুনি!

তা সে যাই হোক, গায়ে গেঞ্জি আর কালো ফুলপ্যান্ট পরা রোগা রিং মাস্টার লোকটা হাতে চাবুক নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল খাঁচার দরজায়, দুজন লোক খাঁচার দরজাটা ওপর থেকে টেনে তুলল! খাঁচার দরজা খোলা হতেই লোকজন সব দুড়দাড় দৌড়ে খানিক তফাতে গিয়ে দাঁড়াল। ঘাটে রইলেন শুধু রিং মাস্টার, হারু মণ্ডল, বিধু দারোগা আর সার্কাসের দুজন লোক। থানার সিপাইরাও সব তফাতে এসে দাঁড়াল। বাঘ বেরোবে ইয়ার্কির কথা নয়।

তা বাঘটা আফিংখোরই হবে। রিং মাস্টার বিস্তর চাবুকের শব্দ করল, খোঁচাল, তবু বেরোয় না। বার তিনেক হাই তুলল অবিকল বুড়ো মানুষের মতো শব্দ করে। দারোগা মশাই ধমক দিয়ে বললেন, "টেনে বের করো কুলাঙ্গারটাকে।" রিং মাস্টার সেলাম দিয়ে বলল, "আপনাকে সামনে দেখে একটু ভয় খেয়েছে।"

অবশেষে দড়ি ধরে টানা-হঁচড়া করে তাকে বের করা হলো। কী আলিস্যি তার! বাইরে বেরিয়েও অবিকল বেড়ালের মতো ডন মারল একটা, তারপর ঘুরচোখে চারদিকে চাইতে লাগল। মনে হলো, বাঘটা চোখে ভাল দেখতে পায় না, ভুরু কোঁচকানো খুব ঠাহর করে করে দেখছে। বিধু দারোগা হাঁক ছাড়লেন, "দুটোকে জলের কাছে নিয়ে যা!"

তখন হারু মণ্ডল তার দুই গরুটাকে আর রিং মাস্টার তার অলস বাঘটাকে দড়ি ধরে টানতে লাগল। অনেক টানা-হাচড়ার পর দুটোকে জলের কাছে নিয়ে পাশাপাশি দাঁড় করানো হলো বটে, কিন্তু কেউই জলে মুখ দেয় না। বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খাওয়ার কথা। জলই যদি না খায় তো দারোগাবাবুর সম্মান থাকে কী করে! তাই তখন হারু মণ্ডল তার গরুর গলকম্বলে হাত বুলিয়ে অনেক আদর করে বলতে লাগল, "খাও মা ভগবতী, জল খাও। এই একবারটি খাও মা, আর কখনো বলব না। ঐ ছাগলের মতো বাঘটাকে দেখে ডরিয়ো না মা, ওর দাঁত নড়ে, চোখে ছানি, বড্ড ভীতু জীব।"

ওদিকে রিং মাস্টারও সপাসপ চাবুকের শব্দ করে বাঘটার ল্যাজ মলে দিয়ে বলে, "ড্রিঙ্ক, ওয়াটার বেঙ্গল-টাইগার, ড্রিঙ্ক, কাম কাম, হ্যাভ কারেজ, দি কাউ উইল ফ্লাই অ্যাণ্ড শো হার লেজ। ড্রিঙ্ক, ড্রিঙ্ক।"

দারোগাবাবু উঠে ফের হাঁক দিলেন, "দুটোর দড়ি খুলে দে। আপসে জল খাবে।"

তো তাই হলো। হারু মণ্ডল তার গরুটাকে ছেড়ে দিয়ে আস্তে আস্তে বলল, "কাল থেকে তোকে জল দিইনি মা, দারোগাবাবুর মুখ চেয়ে এতক্ষণ তেষ্টায় কাঠ করে রেখেছি, এবার ঠো করে পেট ভাসিয়ে খা মা।"

রিং মাস্টার তার বাঘকে ছেড়ে দিয়ে বলল, "ইউ হ্যাড নো ওয়াটার ফর টু ডেজ বেঙ্গল, নাউ ড্রিঙ্ক।"

দৃশ্যটা দেখার মতোই। এই আমরা প্রথম দেখলাম জীবনে। একটা গরু আর একটা বাঘ পাশাপাশি ভাই-বোনের মতো দাঁড়িয়ে মুখ নীচু করে এক ঘাটে জল খাচ্ছে। সবাই রৈরৈ করে উঠে দারোগাবাবুর জয়ধ্বনি দিতে থাকল। কবিয়াল দুকড়ি হালদার গান বেঁধে গাইতে লাগল, "ধন্য হে দারোগা বিধু তুমি ধন্য ধন্য হে। একই ঘাটে জল খায় গাই আর ব্যাঘ্র বন্য হে"।

কিন্তু জয়ধ্বনির রেশ তখনো মিলিয়ে যায়নি, দুকড়ি কবিয়াল 'হে'র টান দিয়ে তখনো দম ধরে রেখেছে, এমন সময়ে বাঘটা জল থেকে মুখ তুলে গরুটার দিকে তাকাল। গরুটাও তাকাল বাঘটার দিকে। ফোঁস ফোঁস দুজনেরই নিশ্বাস পড়ল। বাঘটা গরু চেনে, সে গন্ধ পেয়ে পাশে দাঁড়ানো গরুটাকে শুঁকছে। চোখে ভাল দেখতে পায় না বলে বোধহয় ঠিক ঠাহর করতে পারছিল না। কিন্তু হারু মণ্ডলের গরু কখনো বাঘ দেখেনি, তাই সে একটুও ঘাবড়াল না। বরং সে বেশ রাগের

চোখে বাঘটাকে দেখতে লাগল। সেটা হাড় হারামজাদা গরু, বহুবার খোঁটা উপড়েছে, খোঁয়াড়ে গেছে, তার গুতো খায়নি এমন মানুষ গাঁয়ে বিরল। বাঘটার ভাবসাব দেখে সে বোধহয় বেশ বিরক্ত হয়েছিল, তাই বাঘের মুখের ওপরেই সে ফোঁস করে একটা শ্বাস ছেড়ে একটু এগোলো।

দারোগাবাবু মহানন্দে গোঁফ চুমরে দৃশ্যটা দেখছেন তখন। হাসেন না বটে, কিন্তু হাসি তার চোখের দৃষ্টি, গালের মাংস, আর ভাবভঙ্গীর মধ্যে ফুটে উঠছিল। বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাচ্ছে।

গরুর ফোঁস শুনে বাঘটা দু'পা পিছিয়ে এল। বহুকাল অভ্যাস নেই বলেই বোধহয় হাঙ্গামায় যেতে চাইল না। কিন্তু গরুটাও বদমেজাজী। তার তখন রোখ চেপেছে। সে একটু শিং নাড়া দিয়ে দু পা এগোলো। বাঘটা আবার পিছিয়ে আসে। গরুটা একটা হাম্বা দিয়ে হঠাৎ আড়মোড়া ভেঙে মাথাটা নীচু করে হড়হড় করে এসে হুম্ করে একটা চুঁ দিল বাঘটাকে। বাঘটা মারপিট ভুলেই গেছে। আচমকা টুটা খেয়ে ভ্যাবাচ্যাকা মেরে আলিস্যি ঝেড়ে দুই লাফে উঠে এল ঘাটের চাতালে। পিছনে গরুটা।

দারোগাবাবু চেয়ার ছেড়ে পৈঠায় উঠে গেলেন সাত করে। লোকে থ। এমনটা হবে কেউ ভাবেনি। এ কী দৃশ্যরে বাবা! প্রকৃতির সব নিয়মকানুন যে ভণ্ডুল হয়ে গেল। বাঘটা তখন দিঘির ধারের মাঠটায় প্রাণভয়ে ছুটছে। হারুর গরু মহাতেজে শিং নেড়ে দৌড়োচ্ছে তার পিছু পিছু। তোবেই। বাঘটা হালুম-মলুম বলে ডাক ছাড়ছে প্রাণপণে। গরুটা হাম্বা-খাম্বা বলে তম্বি করছে তাকে। সে কী দৌড়! যেমন বাঘ ছোটে, তেমনি গরু। ছুটতে ছুটতে বাঘের দমসম অবস্থা। ভারী কাহিল হয়ে পড়েছে বেচারা। হারু মণ্ডল বিস্তর ডাকাডাকি আর সাধাসাধি করে তার গরুকে ফেরাতে চাইছে। গরু ফিরছে না। রিং মাস্টার ডুকরে উঠে বলছে, "ও ভাই হারু, আমার গরিব বাঘটাকে তোমার গুণ্ডা গরু মেরে ফেললে।"

তা ফেলতই মেরে। বাঘটা ছুটে ছুটে হয়রান হয়ে পড়েছে তখন, গরুটা মহাতেজে প্রায় ধরো-ধরো করে ফেলছে তাকে, এমন সময়ে হারু মণ্ডল গিয়ে সটান শুয়ে পড়ল তার ভগবতীর সামনে, বলল, "মা গো, অনেক লীলা দেখিয়েছো মা। অনেক বাঘ-সিংহী ধরে দেবো মা তোমায়, সব কটাকে গুঁতিয়ে ঢিট কোরো। আজ যে তোমার জাবনার সময় হয়ে গেছে মা।"

এইসব শুনে ভগবতী দাঁড়িয়ে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছাড়ল। বাঘটাও ফঁক বুঝে এক লাফে খাঁচায় ঢুকে ঝাঁপের দরজাটা ফেলবার জন্য নিজেই পিছনের দু পায়ে দাঁড়িয়ে টানাটানি করতে লাগল। খাঁচার ওপরের লোক দুজন ঘাপটি মেরে ছিল, তাক বুঝে ঝ করে দরজা ফেলে দিল। বাঘটা নিশ্চিন্ত হয়ে বসে হ্যাঁ হ্যাঁ করে হাঁফাতে লাগল।

এই ঘটনার পর বিধু দারোগার নাম-যশ সহস্রগুণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল গঞ্জে। তার রাজত্বে শুধু বাঘে-গরুতে একঘাটে জলই খায় না, সেখানে গরুর তাড়ায় বাঘেরও জান লবেজান হওয়ার জোগাড়। সুতরাং সাবধান!

সবাই তাই সাবধান হয়ে গেল। চুরি ছ্যাচড়ামি বন্ধ, ডাকাতি বাড়ন্ত, ঝগড়াঝাটি পর্যন্ত দেশ থেকে বিদায় নিয়েছে। প্রবীণ লোকেরা থানার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময়ে জুতো ছেড়ে রেখে থানার উদ্দেশে হাতজোড় করে ভক্তিভরে প্রণাম করে যায়। যেমন সবাই মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়ে করে। বিধু দারোগা ব্যাপার দেখেন আর হাসেন। না, হাসেন না ঠিক, কিন্তু হাসি তার গোঁফের ডগায় ঝুলে থাকে, নাকের ডগায় কঁপে, ভুরুতে নাচে। সবাই বুঝতে পারে, বিধু দারোগা হাসছেন। অথচ হাসছেন না। ময়রারা দারোগা-সন্দেশ, বিধু-অমৃতি বের করে ফেলল। খুব বিক্রি।

ওদিকে ভগবতীরও খুব নাম-ডাক। গঞ্জের লোক তো আছেই, আশপাশের গাঁ গঞ্জ, বহু দূরের ভিন গাঁ, এমনকি শহর থেকে পর্যন্ত লোক ঝেটিয়ে আসছে রোজ। ভিড়েঙ্কে ভিড়। সকলেই ভগবতীর জন্য রাশি রাশি খাবার আনছে। শাকপাতা, লাউটা-কুমড়োটা তো আছেই, সেই সঙ্গে সন্দেশ-রসগোল্লা, দুধ-দৈ, এমনকি ঘি-মাখন পর্যন্ত। হারু মণ্ডলের গোয়াল ঘরে পাহাড় প্রমাণ খাবার জমে গেল। অলৌকিক গরুর মহিমা শুনে জমিদার মশাই বিলিতি নেট দিয়ে ভগবতীর জন্য ভাল মশারি করে দিলেন, সেই সঙ্গে সাটিনের বালিশ, তাকিয়া পর্যন্ত। ভগবতী সারাদিন ঘরে বসে খায়, রাতে মশারির তলায় তাকিয়ে ঠেস দিয়ে বসে জাবর কাটে আর ঘুমোয়। তার এই তাগড়াই চেহারা হয়েছে। মোটা হয়ে গরমে হাঁসফাস করলে ভক্তরা তাকে হাতপাখার বাতাস করে ঠাণ্ডা রাখে। সাহাগঞ্জে ভগবতী বিদ্যালয় নামে ইস্কুল খোলা হলো। ‘ভগবতী তৈল’ নামে একটা বাতের মালিশ বেরিয়ে গেল।

তখন কিছুদিনের জন্য ভগবতী গরু বিধু দারোগার কথা ছাড়া লোকের মুখে অন্য কথা নেই। বিক্রি মন্দা বলে সার্কাসওলা তাবু গুটিয়ে পালিয়েছে। কাছেপিঠে আর

বাঘ-ভালুকও নেই যে ভগবতী গিয়ে গুঁতোবে। খেতে খেতে চোয়াল ব্যথা।

বিধু দারোগার দশাও তাই। চোর নেই, ডাকাত নেই। শুয়ে বসে গতরে জং ধরে গেল। লোকে রোজ পাঠা, মুরগি, ডিম, তরি-তরকারি, মাছ দিয়ে যায়। খেতে-খেতে খিদে মরে গেছে। বহুকাল আর খিদে পায় না বিধু দারোগার। খাবার দেখলে হাই ওঠে। দারোগার ঘোড়াটার পর্যন্ত পায়ে চর্বি জমেছে। নিয়মমাফিক রোজ একবার বিধু দারোগা ঘোড়ার পিঠে চড়ে গঞ্জে চক্কর মারেন। নাঃ, কোথাও কোনো হাঙ্গামা হয়নি। বিরক্ত হয়ে ফিরে এসে থানার দাওয়ায় বসে গম্ভীরভাবে হুঁকো টানেন তিনি।

একদিন সকালে একটা লোক আধমন ওজনের একটা পাকা রুইমাছ নিয়ে এসে দারোগা সাহেবকে প্রণাম করে হাতজোড় করে সামনে বসল। বিধু দারোগা প্রকাণ্ড মাছটা দেখে অরুচিতে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। লোকটা ভাবল, দারোগা সাহেবের বুঝি এত ছোটো মাছ পছন্দ হয়নি, তাই ভয় খেয়ে মিনমিন করে বলল, "বড়বাবু, আমার পুকুরে এর চেয়ে বড় মাছ। আর নেই। আমি ক্ষুদ্র মানুষ, আমার মাছটাও পুঁটিমাছের মতো ছোটো, তবু যদি আপনার ভোগে লাগে তো–।"

বিধু দারোগা ফস করে একটা শ্বাস ছেড়ে বললেন, "খিদে পায় না যে বাপ, আমার যে আর খিদে পায় না। বড্ড অরুচি।"

লোকটা ফের একটা প্রণাম করে বলে, "বড়বাবু, অপরাধ নেবেন না, তা যদি বললেন তো বলি, ঠাকুর দেবতারাও কোন জন্মে অমৃত খেয়ে গাট হয়ে বসে আছেন, খিদে তো তাদেরও পাওয়ার কথা নয়। তবু কি লোকে ভোগ নৈবিদ্যি দিতে ছাড়ে? ভক্তদের মুখ চেয়েই তারা অরুচি নিয়েও খান। আমি তো বুড়ো হতে চলোম, তবু জন্মেও শুনিনি যে রাজা-জমিদার কিংবা লাট বা দারোগার কখনো খিদে পেয়েছে। খিদে তাদের কখনো পায় না, দেবতুল্য লোক সব। তবু খেতে হয়, আমাদের মুখ চেয়েই! আমাদের মতো ছোটোলোক হাঘরেদেরই যত খিদে হুজুর।"

লোকটা লাট আর দারোগা একসঙ্গে বলায় দারোগাসাহেব খুশি হলেন। একটু হাসলেন। না, ঠিক হাসি নয় বটে তবে টাকটা যেন একটু চকচক করে উঠল, গালের মাংসে একটু ঢেউ দিল, ভুঁড়িটা কয়েকবার কেঁপে উঠল। হাসি নয়, অথচ যেন হাসি। আবার একটা শ্বাস ফেলে বললেন, "খিদেই বা পাবে কী করে! নড়াচড়া নেই, কাজকর্ম নেই, একেবারে পাথর হয়ে গেলাম। ছ্যাঃ ছ্যাঃ, তোরাই বা

সব কেমনধারা মানুষ, দারোগাবাবুর খিদে পায় না শুনছিস, সেজন্যও তো একটু শখ করে চুরিচামারি করতে পারিস। চোর-ছ্যাচড়ের পিছনে হাঁকডাক দৌড়োদৌড়ি করতে করতে আমারও একটু খিদের মতো হয় তাহলে। কেমন নির্দয় মানুষ তোরা, অ্যাঁ?”

শুনে লোকটা কান পর্যন্ত হাসল। ফের একটা প্রণাম ঠুকে বলল, “আজ্ঞে বড়বাবু, সেই জন্যই আসা। সফরগঞ্জে শ্মশানের ধারে কসারবনের মধ্যে বুড়ো বটের তলায় এক কাঁপালিক এসে থানা গেড়েছে ক দিন হলো। বড় সাঙ্ঘাতিক লোক। বাঘের পিঠে চড়ে ঘুড়ে বেড়ায়। শুনছি, আজ অমাবস্যার রাতে সেখানে নরবলি হবে। বড় ভয়ে-ভয়ে আছি আমরা।”

শুনে বিধু দারোগা একটা হুঙ্কার ছাড়লেন, “বটে?”

সেই হুঙ্কারে গঞ্জের বাড়িঘর কেঁপে উঠল, ঘোড়াটা চিহি ডেকে লাফিয়ে উঠল, ধারেকাছের লোকজন সব সাঁত সাত করে লুকিয়ে পড়তে লাগল, বাচ্চারা ককিয়ে উঠল, বেড়াল পালাল, কুকুর কেঁদে উঠল, আর কাকগুলো বন্দুকের আওয়াজ ভেবে কাকা করে ভিড় করতে লাগল আশেপাশে। যে লোকটা মাছ নিয়ে এসেছিল তারও একটু মূর্ছামতো হয়েছিল, খানিকক্ষণ পরে সামলে উঠে সে চোখ মেলে বড় সুখে হাসল। হ্যাঁ, এই হলো গিয়ে আসল দারোগা। আবার একটা প্রণাম করল সে।

অমাবস্যার নিশুতি রাতে দারোগাবাবু ঘোড়ায় চেপে সফরগঞ্জের শ্মশানে চললেন সঙ্গে বিস্তর সিপাই, অনেক লোকজন। তাদের হুঙ্কারে শেয়াল পালাল, পাখিরা ঘুম ভেঙে চেঁচামেচি করতে লাগল। খটাস, ভাম, বেঁজি, খরগোশ সব জঙ্গলের ছোটো ছোটো জীব গর্তে সেঁদিয়ে কাঁপতে লাগল। বিধু দারোগা বুড়ো বটগাছের তলায় এসে হাঁক ছাড়লেন, “কোথায় কাঁপালিক?”

কাপালিক নেই। দারোগাবাবু পাঁচ ব্যাটারির টর্চ জ্বেলে দেখলেন, খবরটা মিথ্যে নয়। নিভু নিভু হয়ে একটা ধুনি তখনো জ্বলছে, আশেপাশে বাঘের পায়ের ছাপও দেখা গেল, একটা চকচকে খাঁড়া পড়ে আছে, একপাশে একটা হাঁড়িকাঠও রয়েছে। দারোগাবাবু পিস্তল বের করে ফের হাঁক দিলেন, “কোথায় গেল সেই হারামজাদা কাঁপালিকটা?”

তাই তো! কোথায় পালাল! সবাই ভাবছে।

এমন সময়ে গাছের মগডাল থেকে করুণ স্বরে কে যেন বলে উঠল, "হুজুর আমি এইখানে। ভয়ের চোটে বড় উঁচু গাছে উঠে পড়েছি, এখন নামতে পারছি না। বাতিটা একটু ধরুন।"

অবাক হয়ে দারোগাবাবু উঁচুতে আলো ফেললেন। বটগাছের ঝুরি আর পাতার ফাঁক দিয়ে অনেক উঁচুতে কাঁপালিকের লাল কাপড় দেখা গেল, আর দাড়িগোঁফ। দারোগাবাবু গম্ভীর হয়ে বললেন–নেমে আয়। সিরিঙ্গে চেহারার কাঁপালিকটা সাবধানে নেমে এলো। টর্চের আলো মুখে পড়তেই চোখ পিটপিট করে ভারী ভীতু চোখে চাইল, তারপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল দারোগাবাবুর ঘোড়ার পায়ের ওপর, বলতে লাগল, "বড়বাবু মাপ করুন।" লোকটার চেহারা আর ভাবভঙ্গী দেখে বিধু দারোগা হতাশ হয়ে বললেন, "তোর বাঘ কই?"

"আজ্ঞে আপনাকে দেখে ভয় খেয়ে ঐদিকের একটা আমগাছে হাঁচোড়-পাঁচোড় করে উঠে বসে আছে। বড্ড ভীতু।"

দারোগাবাবু করাল চোখে চেয়ে বললেন, "আর নরবলি যাকে দিবি সে-লোকটা কোথায়?"

কাঁপালিক কেঁদে উঠে বলল, "কোথায় নরবলি হুজুর! কত লোককে সাধ্য সাধনা করলাম, পায়ে ধরলাম, ভয় দেখালাম, কেউ রাজি হলো না। তাদেরও দোষ দিই না, বলি হতে কে-ই বা সহজে রাজি হয়! হুজুর, বলির কথা না রটালে লোকে সমীহ করে না। তাই রটিয়েছিলাম। কিন্তু আমি আসলে কাঁপালিক-টাপালিক নই হুজুর, আমাকে চিনতে পারছেন না! আমি সেই রিং মাস্টার।"

রিং মাস্টার! সবাই হাঁ হয়ে গেল। তাই তো! দাড়িগোঁফের জঙ্গল ভেদ করে রিং মাস্টারকে তো চেনা যাচ্ছে একটু-একটু। রিং মাস্টার ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, "হারু মণ্ডলের গুণ্ডা গরুর তাড়া খেয়ে আমার বাঘটা সেই যে পালিয়েছিল তাইতে আমার আর বাঘের খুব বদনাম হয়ে যায়। তাই সার্কাস থেকে আমাদের তাড়িয়ে দেয়। সেই থেকে খিদের জ্বালায় দুজনে জ্বলে পুড়ে মরছি। নরবলি-টলি ওসব বাজে কথা, আমরা দুজনেই ভারী ভীতু জীব বড়বাবু।"

দারোগাবাবু হাসলেন। না, ঠিক হাসি নয়। তবে তার ভুরু চমকাল, কানটা যেন নড়ে উঠল, গোঁফের ডগা নীচু থেকে ওপরে উঠে গেল। হাসলেন না, তবু যেন হাসলেন। টর্চের আলোয় সবাই দেখল।

রিং মাস্টার আর তার বাঘকে গ্রেফতার করে আনা হলো থানায়। লোক ভেঙে পড়ল দেখতে। রিং মাস্টারের দাড়ি চুল সব কামিয়ে দেওয়া হয়েছে। কদমগাছের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা বাঘটা লজ্জায় থাবায় মুখ লুকিয়ে মাথা নীচু করে বসে আছে।

হারু মণ্ডল দারোগাবাবুকে প্রণাম ঠুকে বলল, "হুজুর, আমার একটা আর্জি আছে আপনার বরাবর। আমার ভগবতী কিছু খেতে চায় না। খেলার সঙ্গী নেই বলে দৌড়-ঝাঁপ করতে পারে না। তাই খিদে হয় না। গাঁগঞ্জের ষাঁড় গরু সবাই ওকে ভয় খায়, তাই কেউ মেশে না ওর সঙ্গে।

তাই বলি, হুজুর, বাঘটা আমার দিয়ে দিন। ভগবতী ওকে ঢুঁ মেরে মেরে খেলবে। তাতে ওর খিদে হবে। আমি বরং বাঘের দাম বাবদ একশো টাকা ধরে দিচ্ছি।"

তো তাই হলো। হারু মণ্ডল দড়ি বেঁধে বাঘটাকে টানা-হাচড়া করে নিয়ে গেল। পথে লোকজনকে ডেকে ডেকে বলল, "সস্তায় বাঘ কিনলাম হে।"

কিন্তু ভগবতী মোটা হয়ে যাওয়ার পর থেকে খুব অলস হয়ে পড়েছিল। বাঘটাকে দেখেও তেড়েটেড়ে গেল না, কেবল একটা ফোঁস করে শ্বাস ছাড়ল। সেই শ্বাসের শব্দে বাঘটা পালাতে যাচ্ছিল, হারু মণ্ডল তাকে খড়মপেটা করে টেনে আনল ফের। ভগবতীর গোয়ালেই বেঁধে রাখল কে।

সেই থেকে বাঘটা গোয়ালেই থাকে। মাছের কাটা বা মাংসের হাড়মাখা ভাত খায়। মাঝে মাঝে ভগবতীর জাবনার গামলাতেও মুখ দিয়ে বিস্বাদে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তবু চেষ্টা রাখে। ভগবতী স্নেহভরে মাঝে-মাঝে বাঘটার গা চেটে দেয়। বাঘটা থাবা দিয়ে ভগবতীর পিঠ চুলকোয়।

দেশসুদ্ধ লোক ভেঙে পড়ে দেখতে। হুঁ বাবা, বাঘে গরুতে এক গোয়ালে থাকে! দুকড়ি কবিয়াল গেয়ে গেয়ে ঘুরে বেড়ায়, "বিধুর নামে দাওরে জয়ধ্বনি। বিধু মোদের নয়নের মণি।। ভগবতীর নামে দাও গো জয় জোকার। তাঁর গোহালে বাঘের কারাগার।। জয় জয় বিধু ভাগ্যবান। রাতির বেলায় দিনের আলো, দিনে জ্যোৎস্নার বান...।।"

শুনে বিধু দারোগা হাসেন। না, হাসি নয় ঠিক। তার গোঁফের ডগায় যেন হাসি দোল খায়, চোখের মণির ভিতরে যেন ঝিকমিক করে, ভুঁড়িটা কেঁপে ওঠে, নাকের

ডগা নড়ে, কান দুটো ফড়িঙের পাখনার মতো থিরথির করে ওঠে। হাসেন না। তবু যেন হাসেন।

# বিধুবাবুর গাড়ি

## বিধুবাবুর গাড়ি

বিধুবাবুর একখানা পুরোনো মডেলের অস্টিন গাড়ি আছে। স্পেয়ার পার্টস পাওয়া কঠিন। প্রায়ই অচল হয়ে পড়ে। বুড়ো মিস্ত্রি ইরফান সারিয়ে টারিয়ে দেয় বটে, কিন্তু প্রায়ই বলে, এ গাড়ি আর বেশি দিন নয়। গাড়িটা তাঁর বাবার। বড় মায়া। গাড়িটা বেচে দিলে হয়তো কয়েক হাজার টাকা পাওয়া যাবে। কিন্তু ওই মায়ার জন্যই পারেন না। পথে ঘাটে গাড়িটা নিয়ে মাঝে মাঝে খুবই বিপদে পড়তে হয়। বাড়িতেও অশান্তি হচ্ছে খুব।

সেইরকম একটা বিপদে পড়লেন আজ। মফস্বল থেকে কলকাতা ফিরছেন। রাত ন'টা বেজে গেছে। জঙ্গলের মধ্যে হঠাৎ তোড়ে বৃষ্টি এল। এমন বৃষ্টি যে দু'হাত দূরের কিছু দেখা যায় না। ওয়াইপারটা কিছুক্ষণ চলে বন্ধ হয়ে গেল। ইঞ্জিনে জল ঢুকে সেটাও গেল থেমে। বাড়ি এখনও ঘণ্টা খানেকের পথ। গাড়ির মধ্যে জল ঢুকে সেটাও গেল থেমে। গাড়ির মধ্যে বসে বিধুবাবু দুশ্চিন্তায় এতটুকু হয়ে গেলেন। ও যা বৃষ্টি সহজে থামবে না। মাত্র পনেরো মিনিটের মধ্যে চারদিকে জল দাঁড়িয়ে যেতে লাগল।

অসহায় বিধুবাবু চুপ করে বসে রইলেন। গাড়িটারই দোষ সন্দেহ নেই। কিন্তু বিধুবাবু গাড়ির ওপর রাগ করলেন না। গাড়িটার বয়স হয়েছে, যন্ত্রপাতিরও অমিল, কী আর করা যাবে? তিনি স্টিয়ারিঙে নরম করে হাত বুলিয়ে বললেন, তুমি আমার অনেক দিনের বন্ধু, তোমাকে কি ছাড়তে পারি?

কথাটা বলার কারণ আছে। তার বন্ধু-বান্ধব শুভানুধ্যায়ীরা অনেকদিন ধরেই গাড়িটা বেচে দেওয়ার কথা বলেছে। ইদানীং বিধুবাবুর স্ত্রীও খুব ধরেছেন গাড়িটা বেচে দেওয়ার জন্য। একজন বড়লোক নাকি এটিকে ভিন্টেজ কার হিসাবে

কিনতে চান। বেশ ভালো দাম দেবেন। এই নিয়ে বিধুবাবুর সঙ্গে তাঁর গিন্নির রোজই ঝগড়া হচ্ছে। বিধুবাবুর স্ত্রী গাড়িটা বিদায় করার জন্য এতই অস্থির হয়ে পড়েছেন যে, হবু খদ্দেরের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা অবধি নিয়ে ফেলেছেন। বিধুবাবুর আরও দু'খানা নতুন ঝকঝকে গাড়ি আছে। সুতরাং পুরোনো গাড়িটার যে আর দরকার নেই, এটাই বাড়ির লোকের অভিমত।

বিধুবাবু অচল গাড়ির মধ্যে বসে ভাবছেন, গাড়িটাকে কী করে হস্তান্তর থেকে বাঁচানো যায়। কোনো উপায় তার মাথায় আসছে না। এই যে গাড়িটা খারাপ হলো, এর ফলে আজ রাতে তিনি হয়তো বাড়িতে ফিরতে পারবেন না। তার ফলে পুরোনো গাড়ির বিরুদ্ধে বাড়ির লোকের অভিমত আরও জোরদার হবে। বিধুবাবু অন্ধকার গাড়ির মধ্যে বসে বিষণ্ন মনে গাড়িটার ভবিতব্য নিয়েই ভাবতে লাগলেন।

হঠাৎ তার মনে হলো, অন্ধকারে একটা আলো জ্বলে উঠেই নিবে গেল। না, বিদ্যুতের আলো নয়। অনেকটা টর্চের আলোর মতো, তবে অনেক বেশি জোরালো। মনে হলো আলোটা এল ওপর থেকে। বিধুবাবু একটু ভাবিত হলেন। নির্জন রাস্তা, জঙ্গল, বিপদ হতে কতক্ষণ?

এরপর বিধুবাবু টের পেলেন, তাঁর গাড়িটা একটা বেশ বড় রকমের আঁকুনি খেল। ঠিক যেন, গাড়ির ছাদে একটা ভারী জিনিস এসে পড়ল। গাড়ির কাঁচ তোলা, বিধুবাবু কাঁচটা একটু নামিয়ে গলা তুলে বললেন, কে রে? কে গাড়ির ছাদে?

কেউ জবাব দিল না। কিন্তু একটু বাদেই গাড়ির ছাদ থেকে একটা কে যেন লাফ দিয়ে নেমে এল। বিধুবাবু গাড়ির গ্লাভস কম্পার্টমেন্ট থেকে টর্চ বের করে জ্বাললেন। তারপর স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

যা দেখলেন তার চেয়ে বিস্ময়কর বস্তু আর কিছু হতে পারে না। এই প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে একটা ডল পুতুল রাস্তায় দাঁড় করানো রয়েছে। প্রায় দুই ফুট উঁচু ফুটফুটে একটা মেয়ে-পুতুল। কিন্তু যেটা অবাক কাণ্ড সেটা হলো, পুতুলটা তার দিকে চেয়ে একটা হাত তুলে নাড়ছে। তাকে যেন কিছু বলতে চায়। তা বিদেশে কলের পুতুল অনেকদিন আগেই বেরিয়ে গেছে। এটা সেরকমই একটা রিমোট কন্ট্রোল পুতুল কি? হলেই বা এই জঙ্গলে বৃষ্টির মধ্যে এটা এল কোথা থেকে?

বিধুবাবু একটু ভয় খেলেন। ঘটনার পিছনে কোনও ষড়যন্ত্র নেই তো! থাকলেও তার উপায় নেই। তিনি জানলার কাঁচটা নামালেন।

পুতুলটা তুমুল বৃষ্টির শব্দের মধ্যেই বলল, তুমি চিন্তা করো না। চুপচাপ বসে থাকো।

বিধুবাবু একটু কাঁপা গলায় বললেন, তুমি কি পুতুল?

হ্যাঁ, আমি কলের পুতুল।

আমার কথা বুঝতে পারছো কেমন করে? পুতুল কি কথা বুঝতে পারে?

আমরা অন্য জগতের পুতুল।

তার মানে?

আমরা যন্ত্রগ্রহের পুতুল।

বুঝলাম না। বুঝিয়ে বলো।

পুতুলটা গুটগুট করে এগিয়ে এল। তারপর লাফ দিয়ে জানলার ওপর উঠে পা ঝুলিয়ে বসে পড়ে বলল, সব কথা কি তুমি বুঝবে?

বিধুবাবু সিঁটিয়ে গিয়ে বললেন, আমি বুঝবার চেষ্টা করব।

একান্ন আলো-বছর দূরে একটা গ্রহ আছে। সেখানে ঠিক আমাদের মতো দেখতে মানুষেরা বাস করে। তারাই আমাদের তৈরি করেছে। আমরা কলের পুতুল কিন্তু তারা সব মানুষ। মানুষগুলো একটু কুঁড়ে। আমাদের দিয়ে সব কাজ করায় আর নিজেরা কেবল বিশ্রাম করে, আর ফুর্তি করে।

বিধুবাবু খুব অবাক হয়ে বললেন, এখানে এলে কী করে?

বাঃ, আমাদের বুঝি গাড়ি নেই? আমরা তো প্রায়ই তোমাদের গ্রহে আসি।

তাই নাকি?

হ্যাঁ গো। আমাদের গ্রহের মানুষেরা খুব শৌখিন। সেখানকার শাকপাতা খেয়ে তারা খুশি নয়, নতুন নতুন জিনিস চায়। তাই আমরা ঘুরে ঘুরে তাদের জন্য শাকপাতা, ভালো মাছ, মাখন, মুরগি, ঘি, দুধ, মিষ্টি, চকোলেট নিয়ে যাই। শুধু তোমাদের গ্রহ নয়, অন্য সব গ্রহ থেকেও অনেক জিনিস আনি। কিন্তু সেগুলো কী জিনিস তা তুমি বুঝবে না।

বিধুবাবু কিছুক্ষণ হাঁ করে থেকে বললেন, এখানে এই বৃষ্টির মধ্যে এলে কি করে?

ওই তো কাণ্ড! আমাদের গাড়িটা ওই জঙ্গলের মধ্যে খারাপ হয়ে গেল যে। তখনই আমরা তোমাকে দেখলাম। আমরা কলকজা খুব ভাল জানি। গাড়িটা আমরা সারিয়ে ফেলেছি। এবার চলে যাবো। তোমাকে দেখে একটু মায়া হলো। ভাবলাম তোমার গাড়িটাও সারিয়ে দিয়ে যাই। আহা, কত পুরোনো আমলের গাড়ি।

তুমি বাংলা বলছো যে! ওমা! বলব না? প্রায়ই আসি যে। শুনতে শুনতে শিখে গেছি। আমরা যে অন্য গ্রহের পুতুল তা তো কেউ বুঝতে পারে না। ধরা পড়ার ভাব দেখলেই আমরা অদৃশ্য হয়ে যেতে পারি।

বিধুবাবু একটা স্টোক গিলে বললেন, আমার গাড়ির ছাদে কী একটা রয়েছে বলো তো!

পুতুলটা হেসে বলল, আমাদের গাড়িটা। আমার বন্ধুরা তোমার গাড়িটা একটু দেখে নিচ্ছে। এখনই কাজ শুরু করবে।

বলতে বলতেই ঝুপ ঝুপ করে দশ-বারোটা ছেলে এবং মেয়ে পুতুল ছাদ থেকে লাফ দিয়ে নেমে পড়ল। হাতে নানারকম যন্ত্রপাতি, তারা বনেট খুলে ফেলে গাড়ির ইঞ্জিনের ভেতর ঢুকে পড়ল।

বিধুবাবু দুঃখের সঙ্গে বললেন, এ গাড়িটাকে আমি বড় ভালবাসি। কিন্তু তুমি তো জানো না, এ গাড়ি বেশিদিন রাখতে পারব না। সবাই বলছে বেচে দিতে।

পুতুলটা হাসল, তুমি যে গাড়িটাকে ভালবাস তা আমরা জানি। তোমার মনের ভাব আমাদের সূক্ষ্ম যন্ত্রে ধরা পড়েছিল। যারা যন্ত্রকে ভালবাসে তাদের আমরাও ভালবাসি। যন্ত্র নিপ্রাণ বটে, কিন্তু ভালবাসা সেও ঠিক টের পায়, ভালবাসার শক্তিই আলাদা, কী বলে?

বিধুবাবু দুঃখের সঙ্গে বললেন, তা তো বুঝলাম। কিন্তু ভালোবাসা দিয়েও কি গাড়িটাকে বাঁচাতে পারব? তোমরা না হয় আজ সারিয়ে দিলে, দুদিন পর আবার খারাপ হবে।

পুতুলটা মাথা নেড়ে বলল, আর খারাপ হবে না।

কোনোদিনও না?

পুতুলটা হেসে বলল, খারাপ তো হবেই না, এমনকি এখন থেকে আর গাড়িতে পেট্রল নিতে হবে না। ব্যাটারি বদল হবে না, চাকায় হাওয়া দিতে হবে না। লক্ষ লক্ষ মাইল চললেও না।

সত্যি!

সত্যিই। তোমার পুরোনো গাড়িতে আমরা আমাদের সব যন্ত্রপাতি লাগিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। গাড়িটা হাতছাড়া করো না কিন্তু।

হাতছাড়া করব না? কিন্তু আমি যখন থাকব না, তখন?

পুতুলটা হাসল, সেও আমরা টের পাব। টের পেয়ে, এসে আমাদের যন্ত্রগুলো খুলে নিয়ে যাবো। গাড়ি আবার অচল হয়ে যাবে।

বিধুবাবু চোখ কচলে বললেন, এসব কি সত্যি বলছো? নাকি আমি স্বপ্ন দেখছি?

পুতুলটা শুধু খিলখিল করে হাসল, তারপর কয়েক মিনিট বাদেই পুতুলেরা ইঞ্জিন থেকে বেরিয়ে এসে বনেট বন্ধ করে দিল। জানালার পুতুলটা বলল, চলি, এবার নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি যাও।

চলে যাচ্ছো?

হ্যাঁ, আবার হয়তো দেখা হবে। নাও হতে পারে।

গাড়ির ছাদ থেকে হঠাৎ একটি ভারী বস্তু মচাৎ করে শব্দ তুলে চলে গেল। বিধুবাবু গাড়ি স্টার্ট দিলেন। কী সুন্দর মোলায়েম শব্দে গাড়ি স্টার্ট নিল। হেডলাইট জ্বলল। গাড়ি চমৎকার ছুটতে লাগল।

না, বিধুবাবুকে আর গাড়িটা বেচতে হয়নি। বিনা তেলে, বিনা মেরামতিতে, বিনা হাওয়ায় গাড়িটা চলছে তো চলছেই।

# ভগবানের আবির্ভাব

---

**ভগবানের আবির্ভাব**

ক্যানসারের ওষুধ যে প্রায় আবিষ্কার করে ফেলেছেন তা লোহিতাক্ষ নিজেই বুঝতে পারছিলেন। উত্তেজনায় তার বুক কাঁপছিল, তেষ্টা পাচ্ছিল, হাত-পা ঠাণ্ডা আর মাথা গরম হয়ে উঠছিল।

লোহিতাক্ষর সামনে একটা কাঁচের পাত্র বুনসেন বার্নারের ওপর বসানো। ভিতরে একটা সবুজ তরল টগবগ করে ফুটছে। সবুজ রংটা আরও গাঢ় হয়ে কালচে মেরে এলে তিনি সেটা একটা পিউরিফায়ারের মধ্যে রাখবেন। একটা ফানেলের ভিতর দিয়ে পরিশুদ্ধ তরলটি একটি টেস্ট টিউবে এসে জমবে। তারপর আর মাত্র দুটো পর্যায় থাকবে। কন্যাসারগ্রস্ত একটা ইঁদুর খাঁচায় ধুকছে। তার ওপর প্রয়োগ করবেন। কিন্তু ফলাফল কী হবে তা লোহিতা জেনে গেছেন। তার একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। সেটা হল, কপালের বাঁ দিকে একটা আব। যখনই তিনি কোন সাফল্যের কাছাকাছি আসেন তখনই ওই আবটার মধ্যে একটা কুড়কুড় শব্দ হয়। ঠিক যেন একটা পোকা। আবের মধ্যে ঘুরে ঘুরে কুড়কুড় করে আনন্দে গান গায়।

লোহিতাক্ষর আবের মধ্যে পোকাটা এখন কুড়কুড় কুড়কুড় শব্দ করছে। লোহিতাক্ষ যখন সর্দি-কাশির ওষুধ আবিষ্কার করেছিলেন তখনও আবের মধ্যে এরকমই শব্দ হয়েছিল। আর সে কী ওষুধ! চারবার নাক ঝাড়লেই সর্দি সাফ। সেবার সর্দির ওষুধ আবিষ্কারের জন্য তাকে নোবেল প্রাইজ দেওয়া হয়। ক্যানসারের ওষুধ আবিষ্কারের জন্য অতএব দ্বিতীয়বার নোবেল প্রাইজও তার বাঁধা। আবের ওপর আদর করে একটু হাত বুলিয়ে নিলেন লোহিতাক্ষ।

এমন সময় ল্যাবরেটরির দরজা খুলে বনমালী ঢুকল। বনমালী লোহিতাক্ষর কাজের লোক।

বাইরে দু'জন লোক এয়েছেন।

এই সকালে আবার কে এল?

তা কী জানি। একজন বেঁটে, অন্যজন লম্বা। ভাল লোক বলে মনে হচ্ছে না। যান গিয়ে দেখুন।

ভাল লোক নয় কী করে বুঝলি?

আপনিও বুঝবেন। আমি শুধু কয়েছিনু যে, বাবু এখন কাজে ব্যস্ত, দেখা হবে না, তাইতে প্রায় মারতে এল।

ওঃ তাই বুঝি খারাপ লোক। তা কী চায় তারা?

তা আর জিজ্ঞেস করার সাহস হয়নি। আপনার ভিজিটার, আপনি গিয়ে সামাল দিন।

লোহিতাক্ষ সাধারণত উটকো লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেন না। কিন্তু আজ তিনি নিজের সাফল্যের আনন্দে এত ডগমগ যে, বার্নারের তাপটা কমিয়ে উঠে পড়লেন, চল তো গিয়ে দেখি কেমন লোক!

লোহিতাক্ষর বাইরের ঘরে যে দুজন অপেক্ষা করছিল তারা সুবিধের লোক নয় তা এক নজরেই বোঝা যায়। বেঁটে লোকটা ভীষণ বেঁটে, পাঁচ ফুটের নীচেই হবে। আর তার চেহারা অনেকটা ফুটবলের মতো গোলাকার। লম্বা লোকটি আবার বিসদৃশ রকমের লম্বা এবং দৈত্যের মতোই তার স্বাস্থ্য। মিল একটা জায়গায়। দুজনের চোখই ভাটার মতো জ্বলন্ত। দেখলেই মনে হয়, এরা চোখের ইশারায় মানুষের গলা নামিয়ে দিতে পারে। কোন দেশের লোক তাও বুঝবার উপায় নেই। গায়ের রং তামাটে উজ্জ্বল, মুখও ভাবলেশহীন, চুল কালো। সাহেব, বাঙালি, চীনে সবই হতে পারে।

কী চাই আপনাদের?

বেঁটে লোকটা তার ভাটার মতো চোখ দুটোকে আরো গনগনে করে লোহিতাক্ষর দিকে চেয়ে থেকে পরিষ্কার বাংলায় বলল, তুমিই জড়িবুটিওয়ালা লোহিতাক্ষ সেন?

এ কথায় কার না রাগ হয়? নোবেলজয়ী বৈজ্ঞানিক লোহিতাক্ষ বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী। তাকে প্রথম পরিচয়ে তুমি' করে সম্বোধন আর 'জড়িবুটিওয়ালা' বললে তো তার ক্ষেপে যাওয়ারই কথা। লোহিতাক্ষও ক্ষেপলেন এবং দাঁত কড়মড় করে বললেন, তার মানে? এটা কি ইয়ার্কির জায়গা?

বেঁটে লোকটা একটা মস্ত চুরুট ধরিয়ে এক গাল কটু গন্ধের ধোঁয়া ছেড়ে বলল, শান্ত হও। তুমি যে একটা মেডেল পেয়েছে তা আমরা জানি।

লোহিতাক্ষ অবাক হয়ে বললেন, মেডেল! কিসের মেডেল?

ওই যে নোবেল প্রাইজ না কি যেন। তা সে যাকগে, তুমি যে ভাল ছেলে তা আমরা জানি।

লোহিতাক্ষ রাগে কাঁপছিলেন বটে, কিন্তু কাঁপতে কাঁপতেও তিনি লক্ষ্য করলেন, বেঁটে লোকটার বা কপালে একটা কালো রঙের জড়ল। লোকটা মাঝে মাঝে জড়লটায় হাত দিচ্ছে।

লোহিতাক্ষ বললেন, আপনারা বেরিয়ে যান। আমার বাজে কথায় নষ্ট করার মতো সময় নেই।

বেঁটে লোকটা একটু গা-জ্বালানো হাসি হেসে বলল, কেন, কী এমন রান্নাবান্নার কাজে ব্যস্ত আছ হে? অ্যাঁ!

বলেই লোহিতাক্ষর মুখে এক ঝাঁক ধোঁয়া ছেড়ে লোকটা খ্যাক খ্যাক করে অপমানসূচক একটা তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল। তারপর বলল, আগেকার লোকেরা ভক্তিশ্রদ্ধা জানত, আর এখনকার তোমরা! ছ্যা, ছ্যা, একটু ভদ্রতাও জান না দেখছি।

এ কথায় লোহিতাক্ষ লোকটাকে খুন করার জন্য পকেটে হাত দিয়ে রিভলবার খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু হঠাৎ মনে পড়ে গেল তার রিভলবার নেই। কস্মিনকালেও ছিল না।

বেঁটে লোকটা কিন্তু লোহিতাক্ষর মনের কথা টের পেল এবং সঙ্গীর দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, খেলনাটা দাও তো।

দৈত্যটা একটা রিভলবার বের করে বেঁটের হাতে দিল। আর বেঁটেটা রিভলবারটা নিজের বুকের দিকে তাক করে ট্রিগার টিপে দিল। ভীষণ একটা শব্দ ও ধোঁয়ার ভিতরে বুলেটটা লোকটার বুকে লেগে ঠং করে মেঝেয় গড়িয়ে পড়ল।

বেঁটে লোকটা খ্যাক খ্যাক করে হেসে বলল, দেখলে তো! বিশ্বাস

হয় নিজেই চেষ্টা করে দেখ। এই নাও রিভলবার। জেনুইন জিনিস, সত্যিকারের গুলিই ভরা আছে।

বলতে বলতে রিভলবারটা এগিয়ে দিল লোকটা।

লোকটা সোফায় গা এলিয়ে বসে আর এক কুণ্ডলী ধোঁয়া ছেড়ে বলল, আর লজ্জা কী? চালাও না। আচ্ছা আনাড়ী রে বাবা।

লোহিতাক্ষ রিভলবারটা তুলে দুম করে গুলি করলেন। গুলিটা আগের বারের মতোই লোকটার বুকে লেগে ছিটকে পড়ল।

লোকটা খ্যাক খ্যাক করে হাসতে হাসতে বলল, কী হল হে মেডেল পাওয়া কম্পাউন্ডার, সুবিধে করতে পারলে? দাও খেলনাটা আমার হাতে দাও! আর শোনো, আমি হচ্ছি ভগবান। আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করতে নেই।

লোহিতাক্ষ রাগে গড়গড় করে বললেন, ভগবানই হোন আর যাই হোন, আপনি অত্যন্ত অভদ্র।

বেঁটে লোকটা আবার হাসতে লাগল। গা জ্বালিয়ে, ভুড়ি নাচিয়ে। তারপর বলল, ওরে বাপু, আমার নাম ভগবান নয়, আমিই স্বয়ং ভগবান। যাদের মূর্তি-টুর্তি তোমরা পুজো করো তাদেরই একজন।

লোহিতাক্ষ নাস্তিক লোক। আর নাস্তিক বলেই তার ভগবদ্ভক্ত স্ত্রীর সঙ্গে প্রায়ই খুব ঝগড়া করেন। তাঁর স্ত্রী মোটেই তার নাস্তিকতাকে ভাল চোখে দেখেন না।

লোহিতাক্ষ লোকটার দিকে চেয়ে ঠাট্টার হাসি হেসে বললেন, ভগবান তো একটা বোগাস ব্যাপার। আমি ওসব বিশ্বাস-টিশ্বাস করি না। আর আপনাকেও আমার ভাল লোক মনে হচ্ছে না। আপনি থার্ড গ্রেড ম্যাজিসিয়ান মাত্র। অনেক সময় নষ্ট হয়েছে, এখন আসুন। নমস্কার।

বেঁটে লোকটা আবার হাসতে লাগল। তারপর বলল, বিশ্বাস করো কি হে? জলজ্যান্ত দেখতে পাচ্ছো চোখের সামনে। কত লোক আমাকে একবার চোখের দেখা দেখার জন্য কত সাধ্য সাধনা করে।

আমার ইয়ার্কি করার সময় নেই। ল্যাবরেটরিতে আমি একটা জরুরি কাজ করছি। আপনারা আসতে পারেন।

বলতে বলতেই লোহিতাক্ষ অবাক হয়ে গেলেন, বেঁটে লোকটার মধ্যে কী একটা পরিবর্তন অতি দ্রুত ঘটে যাচ্ছে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই দেখা গেল, মেঝের ওপর পাতা বাঘছালে স্বয়ং মহাদেব বসে আছেন, ছাই মাখা শরীর, মাথায় জটাজুট, ধ্যান নিমীলিত চোখ, সারা গায়ে ফোঁস ফোঁস করে সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

লোহিতাক্ষ তাড়াতাড়ি চোখ কচলাতে লাগলেন। ততক্ষণে শিবের বদলে ধনুর্ধর রামচন্দ্র দেখা দিয়েছেন। পরমুহূর্তেই রামচন্দ্র গায়েব হয়ে বংশীধারী কৃষ্ণকে দেখা গেল।

বেঁটে লোকটা তেমনি গা-জ্বালানো হাসি হেসে বলল, দেখলে তো! এবার প্রত্যয় হল?

লোহিতাক্ষ একটু কেমন যেন হয়ে গেলেন। ম্যাজিসিয়ানরা অনেক কৌশল জানে ঠিকই, কিন্তু এটা ম্যাজিক বলে তাঁর মনে হচ্ছিল না। একটু ধন্ধে পড়ে কিন্তু-কিন্তু করতে লাগলেন।

এমন সময় অন্দর মহল থেকে তার স্ত্রী একটা শাঁখ হাতে আলুথালু হয়ে ছুটে এলেন। তোমার যে মাহাপাপ হচ্ছে। স্বয়ং ভগবান এসেছেন আর তুমি তাকে গালমন্দ করছো? ওরে বনমালী, শিগগির জল বাতাসা আর ফুল নিয়ে আয়, ধূপ দীপ জ্বালা…

বেঁটে লোকটা খুব ভুঁড়ি দুলিয়ে হাসতে লাগল। লোহিতাক্ষর স্ত্রী দীপ জ্বেলে জল বাতাসা আর ফুল দিয়ে ঘণ্টা নেড়ে যাবতীয় স্তবস্তুতি আউড়ে যেতে লাগলেন। লোহিতাক্ষ বেকুবের মতো চেয়ে দেখতে লাগলেন।

পুজো হয়ে গেলে লোহিতাক্ষকে একটা কনুইয়ের ঠেলা দিয়ে গিন্নি বললেন, হলটা কী তোমার? প্রণাম করো।

লোহিতাক্ষ অগত্যা অনভ্যস্ত ভঙ্গিতে একটা প্রণামও করে ফেললেন।

বেঁটে লোকটা খুব খুশি হয়ে বলল, লোহিতাক্ষ গাড়ল হলেও বউমাটি ভারী লক্ষ্মীমন্ত। তা তোমরা বরটর চাইবে না?

বরের কথায় কর্তা-গিন্নি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন।

লোকটা একটু হেসে বললেন, আরে লজ্জা কিসের? চেয়ে ফেল, চেয়ে ফেল, আমার আর বিশেষ সময় নেই।

গিন্নি ধরা গলায় বললেন, আমি আর কী চাইব বাবা? স্বামী পুত্র নিয়ে যেন সুখে থাকতে পারি…

তথাস্তু।

লোহিতাক্ষ করুণ গলায় বললেন, দ্বিতীয়বার নোবেল প্রাইজটি…

তথাস্তু।

এই বলে ভগবান উঠে দাঁড়ালেন, তারপর লোহিতাক্ষর দিকে চেয়ে বললেন, তবে বাপু, আমারও কিছু চাওয়ার আছে। ওই যে কী একটা ওষুধ বানাচ্ছো, ওটা আর বানিও না, একটা দুটো দুরারোগ্য রোগ আছে বলেই মানুষ এখনো ভগবানের ডাক খোঁজ করে। রোগভোগ লোপাট হয়ে গেলে সেটুকুর পাটও উঠে যাবে। তুমি বরং একটা দাদের মলম বা আমাশার ওষুধ বানাও, তাতেই নোবেল পেয়ে যাবে। বুঝেছো?

যে আজ্ঞে। কিন্তু…

আর কিন্তু নয়। এখনই গিয়ে সব ফর্মুলা নষ্ট করে দাওগে। শুভস্য শীঘ্রম।

ওকে যেতে হবে না ঠাকুর, আমিই গিয়ে সব নদর্মায় ফেলে দিয়ে আসছি। বলে গিন্নিই উঠে গেলেন।

বেঁটে লোকটা একটা বাতাসা মুখে পুরে উঠে পড়ল, তারপর লোহিতাক্ষর দিকে চেয়ে বলল, চলি হে। অনেকটা দূর যেতে হবে। যাওয়ার আগে আসল কথাটা বলে যাই। আমি ভগবান টগবান নই। তবে গ্রহান্তরের মানুষ। পৃথিবীতে

অনেকদিন ধরেই আমাদের আনাগোনা। বাঁদর থেকে তোমাদের মানুষ বানিয়েছি আমরাই। বিজ্ঞানে তালিম দিয়েছি, চাকা বানানো থেকে অ্যাটম বোমা তৈরি অবধি সব ব্যাপারেই আমাদের অদৃশ্য হাত ছিল। আর এসব যা দেখালুম তোমায় সবই বুজরুকি বটে, তবে আসল ভগবানও একজন আছেন। কিন্তু তত দূরে তোমাদের ধারণা পৌঁছোয় না বলে এই আমাদেরই তোমরা এতকাল ভগবান ভেবে পুজো আচ্চা করে এসেছো…।

লোহিতাক্ষ লাফিয়ে উঠে বললেন, অ্যাঁ! তাহলে আমার দ্বিতীয় নোবেলের কী হবে?

তার আমি কী জানি, আমার বর ফলে কিনা তা আমি জানি না।

লোহিতাক্ষ রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, ইয়ার্কি হচ্ছে? ঠিক আছে ফরমুলা আমার মুখস্থ। আমি ক্যানসারের ওষুধ আবার বের করে ফেলব। লোকটা মাথা নাড়ল, না, বের করবে না। বের করলে কী হবে জানো?

কী হবে?

তুমি যে রোজ চুষিকাঠি ছাড়া ঘুমোতে পারো না সে কথা সবাইকে জানিয়ে দেবো।

কথাটা ঠিক। লোহিতাক্ষ এতবড় বৈজ্ঞানিক হওয়া সত্ত্বেও বাচ্চা ছেলের মতো একটা স্বভাব আছে তার। এখনও চুষিকাঠি ছাড়া তিনি ঘুমোতে পারেন না। কিন্তু সে কথা বাড়ির লোক ছাড়া কেউ জানে না।

লোহিতাক্ষ স্তিমিত হয়ে গিয়ে বললেন, যে আজ্ঞে।

লোক দুটো বেরিয়ে গেল।

# ভবিষ্যৎ

## ভবিষ্যৎ

পৃথিবীর যা অবস্থা দেখছেন ধানুরাম তাতে তার ব্যবসা চালানো কঠিন হয়ে পড়ছে। ধানুরাম কবিরাজ। এই তেত্রিশশো বাহান্ন সালে আয়ুর্বেদের তেমন কদর হওয়ার কথা ছিল না। বাপ-পিতেমোর পেশা ছেড়েই দিতে চেয়েছিলেন, আর কবরেজি করবেনই বা কি ভাবে?

সারা পৃথিবী জুড়ে কেবল শহর আর বসত। গাছ গাছালির পাঠ উঠে গিয়েছিল। ধানুরাম তখন কবরেজি ছেড়ে নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই একটা রাসায়নিক গবেষণাগারে কাজ করতে লাগলেন। তখন তার বয়স চব্বিশ পঁচিশ হবে।

একদিন সহকর্মী বনমালী বলল, ধানু গোপনে তোমাকে একটা খবর দিই। আমি একটা জিনিস বানিয়েছি, বড় আজব জিনিস।

কী বল তো!

মাধ্যাকর্ষণকে ফাঁকি দেওয়ার একটা কায়দা করা গেছে। একদিন ল্যাবরেটরিতে বসে নানারকম জিনিস মিশিয়ে যাচ্ছিলাম খেয়ালখুশিতে, হঠাৎ দ্রব্যটা লাফিয়ে শূন্যে উঠে ভাসতে লাগল।

বলো কী হে?

তবে আর বলছি কী?

বনমালীর সেই আবিষ্কার থেকে দেখ-না-দেখ দুনিয়ার ডোল পাল্টে গেল। তার কারণ ওই নতুন যন্ত্র আবিষ্কারের পর মানুষজন তাই শূন্যপথে যাতায়াত করতে

শুরু করল। মাটির ওপর দিয়ে যাতায়াত কমে যেতে লাগল। তার ফলে রাস্তাঘাট ফাঁকা পড়ে থেকে থেকে গাছপালা গজাতে লাগল। তারও ওপর বনমালীর ওই জিনিস আরও উন্নত করে মহাশূন্যে যাতায়াত হয়ে গেল আরও সহজ এবং দ্রুত। ফলে সূর্যের অন্য সব গ্রহে যাতায়াতে ঝামেলা ঝাট আর রইল না। আবিষ্কারের দশ বছরের মধ্যে অন্যান্য গ্রহে এবং চাদে বিরাট বিরাট কলোনী তো হলোই, আকাশে বেলুন বাড়ি তৈরি হলো মেলা। পৃথিবীর দু চার মাইল ওপরে শূন্যে বাড়িগুলো ভেসে থাকে। ফলে পৃথিবীতে বাস না করে অধিকাংশ মানুষই ভাল আবহাওয়ার জন্য আর নির্জনতার খোঁজে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়ল। ফলে শহর ফাঁকা হয়ে যেতে লাগল এবং সেখানে গাছপালা গজাতে লাগল ।

এখন সেই আবিষ্কারের পঞ্চাশ বছর পর পৃথিবী গাছপালায় ছেয়ে তো গেছেই, জঙ্গল এত নিবিড় হয়েছে যে পা রাখার জায়গা নেই। সাপ, বাঘ, সিংহ, ভালুক, গরিলা, ব্যাঙ, বিছে একেবারে গিজগিজ করছে। দিনে দুপুরে ঝিঁঝির ডাক শোনা যায়।

মুশকিলটা এখানেই। জঙ্গলের জন্য পৃথিবীতে গাছগাছড়ার খোঁজ করাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সকালে ধানুরাম তার ভাসমান নৌকার মতো বাতাসী যানে নাতি সহ কন্টিকারি, পাথরকুঁচি, বিশল্যকরণী ইত্যাদি গাছগাছড়ার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েছেন। কিন্তু কোথাও নামতে সাহস হচ্ছে না। এক জায়গায় ঘন জঙ্গল দেখে নামতে গিয়ে দেখলেন তলায় সাত আটটা বাঘ মুখ তুলে তাদের দেখছে।

নাতি বলল, বাঃ, কী সুন্দর!

ধানুরাম ভ্রূ কুঁচকে বলল, বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। আগে পৃথিবীতে একটাও বাঘ ছিল না। কোথা থেকে যে গজাল কে জানে!

নাতি অবশ্য মজাই পাচ্ছে। কারণ সে থাকে তার বাবার কাছে, পৃথিবীর দু মাইল ওপরে এক আকাশবাড়িতে। বাঘ দূরের কথা গাছপালাও চোখে দেখেনি। সে বলল নামো না দাদু।

বাপ রে! নামলেই ঘ্যাঁক।

তার মানে?

সে বুঝবি না। ও হলো, বাঘ।

বাঘ তো কী?

ও বড় ভয়ংকর জিনিস।

আবার আর এক জায়গায় নামতে গিয়ে ধানুরাম দেখলেন একটা গরিলা মস্ত একটা গাছের গায়ে গা ঘষে পিঠ চুলকোচ্ছে।

দাদু, আমি ওই লোকটার সঙ্গে ভাব করব।

ভাব করার লোক নয় দাদু, কাছে গেলেই ঘাড় মটকাবে।

নাতি ঝুঁকে জঙ্গলের মধ্যে গরিলাটাকে দেখছিল। দুষ্টু ছেলে, হঠাৎ নৌকোর কানা টপকে নীচে লাফিয়ে পড়ল। ধানুরাম তাকে সাবধান করার সময়টাও পেলেন না। অসহায়ভাবে চেঁচাতে লাগলেন, ও দাদু! ও দাদু! এ কী সব্বনেশে কাণ্ড করলি!

নীচে লাফ দিলেও হাত পা অবশ্য ভাঙবে না। কারণ নাতির জুতোয় বনমালীর সেই আবিষ্কার লাগানো আছে। নাতি ধীর গতিতেই পড়ল এবং গভীর জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ধানুরাম ভয়ে উদ্বেগে ঘামতে লাগলেন। ধীরে ধীরে অগত্যা নিজের যানটিকে নীচে নামিয়ে আনলেন। নামাতে খুবই ক্লেশ পেতে হলো। নিচ্ছিদ্র গাছপালা, লতাগুল্মে তলাটা দুর্ভেদ্য হয়ে আছে। যানটা ভূমিস্পর্শ করতে পারল না। লতাপাতায় আটকে ঝুলে রইল। ধানুরাম লাফ দিয়ে নীচে নেমে নাতির নাম ধরে ডাকাডাকি করে খুঁজতে লাগলেন। চারিদিকে নানারকম জীবজন্তুর পায়ের শব্দ হচ্ছে। একটা হাতি ডেকে উঠল কাছেপিঠে। হায়না হাসল। ধানুরামের বুক কাঁপতে লাগল ভয়ে। মাত্র পাঁচ বছর বয়সী নাতি। এ জঙ্গলে তার নিরাপত্তা কোথায়?

খুঁজতে খুঁজতেই ধানুরাম বুঝতে পারলেন আশা নেই। গাছপালায় চারদিক এত অন্ধকার যে এই দিন দুপুরেও কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। তবু প্রাণপণে ডাকতে লাগলেন। যদি সাড়া দেয়। তারপরেই ঘটল অত্যাশ্চর্য ঘটনা। ধানুরাম নাতিকে খুঁজতে খুঁজতে বেশ খানিকটা এগোতেই হঠাৎ দেখতে পেলেন সেই গরিলাটা তার নাতির হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে একটা ফাঁকা জায়গায়। আর সাতটা বাঘ তার নাতিকে ঘিরে পা আর গা চেটে আদর করছে।

ধানুরাম একটা শ্বাস ছাড়লেন। না, জীবজন্তুরা আর আগের মতো নেই। নব্য প্রজন্মের এরা বেশ সভ্য ভব্যই বলতে হবে।

# ভালোমানুষ হরবাবু

---

**ভালোমানুষ হরবাবু**

বাড়িতে চোর ঢুকেছে টের পেয়ে হরবাবু বিছানায় উঠে বসে আপনমনে বললেন–এসব কী অসভ্যতা?

ভারী বিরক্ত হয়ে তিনি বিছানা ছেড়ে উঠলেন। দরজা খুলে বাইরের বারান্দায় এসে চুপ করে বসে জ্যোৎস্না দেখতে লাগলেন। চুরিটুরি খুব অপছন্দ করেন হরবাবু। তাঁর চোখের সামনেই চুরি হোক–এটা তার সহ্য হবে না।

চোরটা বড়ই নির্লজ্জ। পাপ কাজ গোপন করার কোনো চেষ্টাই নেই। বারান্দায় বসেই তিনি শুনতে পেলেন, ঘরে বাক্স প্যাটরা নাড়ার, বাসনকোসন পড়ার, আলমারি ভাঙার বিকট সব শব্দ হচ্ছে।

রেগে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে হরবাবু ধমক মারলেন–আস্তে! বেহায়া কোথাকার!

চোরটা বা চোরেরা তাতে খানিকটা সাড়াশব্দ কম করতে লাগল। কিন্তু ব্যাটাদের কাজ আর শেষ হয় না। ভারী আনাড়ি চোর সব হয়েছে আজকাল। কিছু শিখবে না, জানবে না, দুদিন একটু ট্রেনিং নিয়েই কাজে নেমে পড়ে।

হরবাবু জ্যোৎস্না দেখতেই লাগলেন। ঘণ্টাখানেক বাদে ঘর থেকে একটা কর্কশ গলা যতদূর সম্ভব মোলায়েম হয়ে বলল–কাম সারা হয়ে গেছে বড়বাবু। এখন আরাম করে শুয়ে পড়ুন।

হাই তুলে হরবাবু উঠলেন এবং ঘরে গিয়ে বিছানায় শুলেন। ভারী লোভী আর অভদ্র চোর সব আজকালকার। বিছানার চাদর, বালিশের পাশে টর্চ–সব নিয়ে গেছে। কসার গ্লাসে জল ঢেকে রেখেছিলেন রাতে খাবেন বলে, সেটা শুদ্ধু নেই।

চোরে সব নিয়ে গেছে। তবু তো বাজার করতে হবে, রাঁধতে হবে, খেতেও হবে। হরবাবু তাই ধার কর্জ করে বাজারে চললেন সকালবেলায়।

আলুওলা, পটলওলা, মাছওলা সবাই ভালমানুষ হরবাবুকে ভালভাবে চেনে। হরবাবুর যেদিন আলুর দরকার নেই সেদিনও আলুওলা তাকে পাকড়াও করে ব্যাগের মধ্যে জোর করে দু কেজি আলু ঢুকিয়ে দেয়। হরবাবু ঝিঙে বা করলা খান না, কিন্তু তা বলে ঝিঙে বা করলাওয়ালারা তাকে ছাড়ে না। প্রায় দিনই তাঁকে সের খানেক ঝিঙে আর করলা কিনে আনতে হয়। সেগুলো ঘরে পড়ে থেকে পচে যায়। হরবাবু আপন মনে রাগারাগি করেন-তরকারিওয়ালারা হয়েছে যত সব গুণ্ডা বদমাস।

ধার করা পয়সায় বাজার করতে বেরিয়েছেন, রাস্তায় খলিফা হালদারের সঙ্গে দেখা।

–এই যে হর, তুমি যে মাস তিনেক আগে একশো টাকা ধার নিয়েছিলে, তার কী করলে?

হরবাবু খুব ব্যথিত হয়ে তাকিয়ে থাকেন। কথাটা ঠিকই যে মাস তিনেক আগে হরবাবু খলিফা হালদারের কাছ থেকে একশো টাকা ধার নিয়েছিলেন। কিন্তু হরবাবুর খুবই স্পষ্ট মনে আছে যে, একমাস বাদেই টাকাটা শোধ করেছিলেন। কিন্তু সেটি খলিফাবাবুর মনে ছিল না বলে পরের মাসেই আবার নতুন করে টাকাটা তাকে শোধ করতে হয়। সেটাও হরবাবু হাসি মুখেই মেনে নেন। ভুল তো মানুষের হয়ই। কিন্তু ফের গত মাসেও খলিফা সেই একশো টাকার তাগাদা দেওয়াতে খানিকটা বিরক্ত হয়েই হরবাবু আবার টাকাটা শোধ করেন। সে যা যাওয়ার গেছে। কিন্তু খলিফা আজ আবার চাইছে।

হরবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে খুব সংকোচের সঙ্গে বললেন–টাকাটা কি আপনাকে দিইনি?

–দিয়েছো? কবে দিলে? কৈ, আমার তো মনে পড়ছে না। হরবাবু মাটির দিকে তাকিয়ে লজ্জার সঙ্গে বলেন–তাহলে তো দিতেই হয়। তা নেবেন। দুচার দিনের মধ্যেই দিয়ে দেবো।

মুদির দোকান থেকে ধারে জিনিস কেনেন হরবাবু। মুদি হরবাবুকে জক দিয়ে বলে–আপনার হিসেবটা দেখে নেন হরবাবু। গত মাসে আপনি একশো বাহাত্তর টাকা বিরাশি পয়সার জিনিস নিয়েছেন।

হরবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, মুদির দোকানের হিসেব তিনিও নোট বইতে লিখে রাখেন। তার হিসেব মতো মোটে বাষট্টি টাকা পনের পয়সা হয়েছে। কিন্তু কারো মুখের ওপর স্পষ্ট কথা বলতে তাঁর বড় কষ্ট হয়।

তাই বললেন–আচ্ছা, দেবোখন। কয়েক দিনের মধ্যেই দেবো। বাজার থেকে ফিরে রান্নাবান্না করে খেতে গিয়ে ভারী অসুবিধে হল আজ। বাসনপত্র নেই, বাজার থেকে মেটে হাঁড়ি আর কলাপাতা এনেছেন। মেটে হাঁড়িতে কোনোক্রমে সেদ্ধ ভাত করে কলাপাতায় খেয়ে ইস্কুলে চললেন। তিনি অঙ্কের মাস্টারমশাই।

বাজার-হাটে পথে-ঘাটে রাজ্যের ভিখিরি। আজকালকার ভিখিরিরাও ভারী তাঁদড়। বেশির ভাগ লোকই ভিক্ষে টিক্ষে দেয় না একটা, যারা যা-ও দেয় সে-ও দু-এক পয়সার বেশি নয়। কিন্তু হরবাবুর কথা আলাদা। ভিখিরিরা তাকে দেখলেই সব নেচে ওঠে। পাঁচ দশ পয়সা দিলে ভারী চটে যায় ভিখিরিরা। একবার একটা বুড়ো ভিখিরিকে মোটে দশ পয়সা দিয়েছিলেন তিনি। তাতে সে চটে উঠে পয়সাটা ফেরত দিয়ে বলেছিল–এঃ দশ পয়সা দিয়েছ! কেন, আমরা কি ভিখিরি নাকি?

তাই বাধ্য হয়েই হরবাবুকে চার আনা আট আনা দিতে হয়। তাতে খুশি না হয়ে ভিখিরিরা এক টাকা দু টাকা চাইতে থাকে। হরবাবু খুবই রেগে যান। কিন্তু কী আর বলবেন।

ইস্কুলের ছেলেরাই কি কিছু ভাল?

হরবাবু ক্লাসে যাওয়ার আগে থেকেই ক্লাস সিক্সের ছেলেরা হাল্লা চিল্লা করছিল। কিছু ছেলে গল্পের বই পড়ছে, কেউ কাটাকুটি খেলছে, চেঁচিয়ে গল্প করছে, কিছু বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হরবাবু ক্লাসে ঢুকতেই হাল্লা দ্বিগুণ বেড়ে গেল। হাতাহাতি চলছে, চেঁচামেচি হচ্ছে, এমন কি ক্লাসের পিছন দিকে খানিকটা ফাঁকা জায়গায় কাগজ পাকিয়ে বল বানিয়ে কয়েকটা ছেলে ফুটবলও খেলছিল, হরবাবুকে কিছু না বলেই কয়েকজন জল খেতে বা বাথরুমে চলে গেল।

হরবাবু কোনোদিকে নজর দিলেন না। ব্ল্যাকবোর্ডে একটা অঙ্ক দিয়ে মিনমিন করে বললেন-কষে ফেল, গোল কোরো না।

সে কথা কারো কানেই গেল না। হরবাবু বিরক্ত হয়ে দরজা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ বসে রইলেন। ছেলেগুলো যে কেন এত গণ্ডগোল করে! খানিক বাদে উঠে তিনি আপন মনে ব্ল্যাকবোর্ডে অঙ্কটা কষে দিয়ে বললেন-”টুকে নাও সব।

কেউ টুকল না।

হরবাবু কোনো ছাত্রকে কখনো মারেননি, বকেননি, কাউকে উপদেশ পর্যন্ত দেননি। পরীক্ষার সময়ে তিনি যে ঘরে গার্ড দেন সে ঘরের ছেলেদের পোয়াবারো। আজ পর্যন্ত কারো টোকা ধরেননি হরবাবু। চোখে পড়লেও অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নেন তাড়াতাড়ি।

অন্য মাস্টারমশাইরা হরবাবুকে নিয়ে ইয়ার্কি, ঠাট্টা-মস্করা করেন। হরবাবু চুপ করে হাসিমুখে সব শোনেন, কারো কথার ওপর কথা বলেন । আবার গোপনে অনেকেই তাঁর কাছ থেকে ধারকর্জও নেন। শোধ দিলেও হরবাবু কিছু বলতে পারেন না।

ইস্কুল থেকে ফেরার পথে কালীবাড়ির গলিতে একটা পেল্লায় ষাঁড়ের মুখোমুখি পড়ে গেলেন হরবাবু। পাশ দিয়ে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ালেন। কিন্তু বজ্জাত ষাঁড়টা কাছে এসে যেন ইয়ার্কি করতেই একবার মাথানাড়া দিল, ডান পাঁজরে ষাঁড়ের শিংটা পট করে লাগতেই যন্ত্রণায় ককিয়ে ওঠেন তিনি। কিন্তু ষাঁড়টাকে কিছুই বলেন না।

তালপুকুরের পাশ দিয়ে আসবার সময়ে একটা রাস্তার কুকুর খুবই অভদ্রভাবে হরবাবুর দিকে দৃত খিঁচিয়ে তেড়ে এল। তিনি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চলে এলেন। কুকুরটাকে একটা ধমকও দিলেন না।

সন্ধ্যের পর হরবাবু একটু বেড়াতে বেরোন। রোজকার অভ্যাস।

বেড়াতে বেড়াতে একেবারে নির্জন নদীর ধারে চলে এলেন। খুব জ্যোৎস্না, প্রকাণ্ড আকাশ, বিশাল শূন্যতায় তিনি বিভোর হয়ে গেলেন। কী আনন্দই যে হচ্ছে। কী আনন্দ আর শান্তিই না চারদিকে।

ঠিক এই সময়ে কোত্থেকে একটা বিশাল চোয়াড়ে চেহারার লোক সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল–যা আছে দিয়ে দিন।

লোকটার হাতে প্রকাণ্ড ছোরা। হরবাবু ভীষণ বিরক্ত হলেন। এই সন্ধ্যেবেলার আনন্দটা কেউ মাটি করলে তিনি অসম্ভব চটে যান।

দেওয়ার মতো কিছু নেইও। কাল রাতে সব চুরি হয়ে গেছে। হরবাবু মিনমিন করে লোকটাকে বললেন, 'দিচ্ছি। তবে গোল কোরো না। এখন গোলমাল করলে আমার ভারী অসুবিধে।

বলে পকেটে টাকা পয়সা যা ছিল সব দিয়ে দিলেন লোকটাকে। লোকটাও হরবাবুর অবস্থা বুঝে বেশি ঘাঁটাল না, শুধু পকেট থেকে কলমটা টেনে নিয়ে গেল। যাক, হরবাবু আবার চারদিকের গভীর নির্জন আনন্দে ডুবে গেলেন।

বেশ কেটে যাচ্ছিল সময়টা। কিন্তু হঠাৎ একটু দূর থেকে একটা প্রবল চেঁচানি উঠল–বাঁচাও! বাঁচাও! মেরে ফেললে?

মনোযোগটা ছিন্ন হওয়ায় খুবই রেগে গেলেন হরবাবু। এসব কি? এমন সুন্দর জ্যোৎস্নারাতে একা একটু নির্জনে বসে থাকবেন তার জো। নেই?

প্রথমটায় চুপ করেই ছিলেন হরবাবু। কিন্তু আবার শুনলেন একটা মেয়ে 'বাঁচাও! বাঁচাও' বলে চেঁচাচ্ছে আর অন্য একটা হেঁড়ে গলা ধমকাচ্ছে–চুপ! শব্দ করলে মেরে ফেলব!

না, এর একটা বিহিত করা দরকার। একটু নির্জনে বসে থাকতে পারব না–এটা কেমন বিশ্রী ব্যাপার! এই ভেবে হরবাবু উঠে পড়লেন।

চাঁদমারীর ঢিবিটা পার হয়ে হরবাবু দেখতে পেলেন একজোড়া স্বামী স্ত্রী আর একটা বাচ্চা অসহায়ভাবে দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয় বেড়াতে বেরিয়েছিল। তাদের সামনে সেই প্রকাণ্ড চেহারার চোয়াড়ে লোকটা ছোরা হাতে খুব আস্ফালন করছে।

হরবাবু দাঁত কড়মড় করেন–ছিনতাই করছিস কর, তা বলে চেঁচামেচি করে লোকের শান্তি নষ্ট করবি? এমন দুধ জ্যোৎস্নার রাতটা মাটি করে দিবি? লোককে একটু ধ্যানস্থ হয়ে আনন্দ ভোগ করতে দিবি না?

হরবাবু রেগে হেঁটে গিয়ে লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে ধমক মেরে বললেন–পেয়েছিস কি তুই? অ্যাঁ! পেয়েছিসটা কি? একবার বলেছি না, গোলমাল করিস না!’

লোকটা ছোরাটা নেড়ে রক্ত চোখে চেয়ে বলে, জান নিয়ে নেব। ভাগো হিয়াসে!

–বটে! তবু গোলমাল করবি? চেঁচাবি?’ বলতে বলতে হরবাবু চড়াং করে একটা চড় কষালেন লোকটার গালে। আর সেই চড়ে লোকটা হতভম্ব হয়ে গেল।

হরবাবুর তাতে রাগ গেল না। আর একটা চড় কষালেন। লোকটার হাত থেকে ছোরা খসে গেল। লোকটা গাল চেপে উবু হয়ে বসে ‘বাপ রে! মা রে!’ বলে চেঁচাতে লাগল।

কিন্তু হরবাবু তাতে আরো ক্ষেপে গেলেন। মার খাচ্ছিস, তবু চেঁচাচ্ছিস?

হরবাবু লোকটার ঘাড় ধরে তুলে কিল চড় রদ্দা মারতে মারতে আর বকাবকি করতে করতে একেবারে রাস্তায় তুলে দিয়ে এলেন। বললেন–‘ফের এদিকে আসবি তো খুন করে ফেলব?’

ফিরে এসে হরবাবু আবার হাসি-হাসি মুখ করে জ্যোৎস্না রাতের রহস্য উপভোগ করতে লাগলেন।

# ভুসুক পণ্ডিত

## ভুসুক পণ্ডিত

ভুসুক পণ্ডিত ভারী অলস। পাঠশালায় পড়াতে পড়াতে ছেলেদের টাস্ক করতে দিয়ে প্রায় সময়েই ঘুমিয়ে পড়েন। আর ছেলেরা সেই সুযোগে দেদার ফাঁকি দেয়।

সময়টা ২০৯৬ খ্রিস্টাব্দের ফ্রেব্রুয়ারি মাসের সকাল। ভুসুক পণ্ডিত ছেলেদের একটা রচনা লিখতে দিলেন বিজ্ঞান অভিশাপ না আশীর্বাদ? তারপর ঘুমোতে লাগলেন।

পাঠশালা বসে একটা প্রকাণ্ড শিমূলগাছের তলায়। নিয়ম হয়েছে সেই আগেকার দিনের মতো প্রাকৃতিক পরিবেশে ছেলেদের লেখাপড়া শেখাতে হবে। তাই এই ব্যবস্থা। ভুসুক পণ্ডিত বসেন গাছতলায় উঁচু একটা বেদীতে। ছেলেরা বসে ঘাসের ওপর মাদুর পেতে।

ভুসুক পণ্ডিত ঘুমিয়ে পড়েছেন টের পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছেলেরা নিজেদের কাজ শুরু করে দিল। একটি ছেলে পকেট থেকে ছোট্ট একটা লেসার রশ্মির পিস্তল বের করে টুকটাক ফল পাড়তে লাগল। একজন পকেট কমপিউটারের সঙ্গে খেলতে বসে দাবা। জনা তিনেক একটা হাতঘড়ির সাইজের টেলিভিশনে চুপিচুপি অ্যাডভেঞ্চারের ফিল্ম দেখতে লাগল। একজন অ্যান্টিগ্র্যাভিটি সাইকেলে উঠে আকাশে চক্কর দিতে থাকল। একজন দুষ্টু ছেলে আর একজনকে ডেকে বলল, অ্যাই, আজ চল পণ্ডিত মশায়ের টিকি কেটে দিই।

দ্বিতীয় ছেলেটা চোখ গোল করে বলে ওঠে, ওরে বাবা! টের পেলে জ্যান্ত পুঁতে ফেলবেন।

কথাটা ঠিক। ভুসুক পণ্ডিতের চেহারাটা এমনিতে নাদুসনুদুস। পরনে হেঁটো ধুতি, খালি গা, কাঁধের ওপর একটা ভাজ করা উড়ুনি। পৈতেটা ধপধপ করছে সাদা। নিষ্ঠাবান মানুষ। চেহারাটা নিরীহ হলে কী, ভুসুক পণ্ডিত সাঙ্ঘাতিক রাগী লোক।

দুষ্টু ছেলেটা বলল, টের পেলে তো!

দ্বিতীয় জন ভয়ে ভয়ে বলে, পারবি?

খুব পারব। এই বলে ছেলেটা পকেট থেকে একটা ক্ষুদে ওয়াকিটকি বের করে অন্য সব ছেলেদের উদ্দেশ্যে ফিসফিস করে বলতে লাগল, বন্ধুগণ, আজ ভুসুক পণ্ডিত মশায়ের শিখা কর্তন করা হইবে। তোমরা কেহ ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করিবে না যে, অপকর্মটি কে করিয়াছে। কেহ যদি প্রকাশ কর তাহা হইলে তাহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া হইবে।

অন্য সব ছেলেরা তাদের গলার কাছে বাঁধা ট্রারিসিভার যন্ত্রে ঘোষণাটা শুনতে পেয়ে ভারি উত্তেজিত হয়ে উঠল। কিন্তু কেউ কোন শব্দ করল না।

দুষ্টু ছেলেটা তার ব্যাগ থেকে একটা সোনার রেঞ্জ বের করল। যন্ত্রটা দিয়ে ইচ্ছে মত নানারকম শব্দ বের করা যায়, মাইক্রোফিলমের মতো এর ভিতরে আছে একটি প্রি-রেকর্ডে  মাইক্রোক্যাসেট রেকর্ডার। ছেলেটা একটা বোতাম টিপে যন্ত্রটা চালু করল। তারপর একটা পিস্তলের নলের মতো ব্যারেল লাগিয়ে সেটা তাক করল ভুসুক পণ্ডিত মশাইয়ের দিকে।

ব্যাপারটা হল, এই শব্দটা আসলে ঘুমপাড়ানী শব্দ। যার দিকে তাক করে শব্দটা নিক্ষেপ করা হবে সে ছাড়া আর কেউ তা শুনতে পাবে না। অবশ্য কানে শোনার শব্দও এটা নয়। এটা হল এক ধরনের কাপন বা ভাইব্রেশন, যা আধ মিনিটের মধ্যে যে কোনো লোককে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন করে ফেলতে পারে।

দুষ্টু ছেলেটা পুরো এক মিনিট শব্দটা চালাল। তারপর আস্তে আস্তে উঠল। প্রত্যেকে দুরুদুরু বুকে চেয়ে আছে দুঃসাহসী ছেলেটার দিকে। যন্ত্রের প্রভাবে পণ্ডিতমশাই গভীর নিদ্রায় ডুবে গেছেন বটে, কিন্তু এক সময়ে তো জাগবেন! তখন যে কী কুরুক্ষেত্রটাই হবে। ছেলেটা পকেট থেকে ধারালো কাঁচি বের করে পণ্ডিত মশাইয়ের পেছনে গিয়ে কুচ করে টিকিট কেটে এক দৌড়ে পালিয়ে এল নিজের জায়গায়। পাঠশালায় এক চাপা হাসির হররা বয়ে গেল।

সেই শব্দেই কিনা কে জানে, আচমকা পণ্ডিতমশাই চোখ মেলে চাইলেন।

ছেলেরা তো ভয়ে কাঠ। শ্বাস বন্ধ করে বসে আছে সব। একটু অবাকও হয়েছে তারা। ভাইব্রেটার দিয়ে ঘুম পাড়ানো হয়েছে পণ্ডিতমশাইকে, এত সহজে তো তার জাগবার কথা নয়।

ভুসুক পণ্ডিতমশাই চোখ চেয়েই বিশাল একটা হাই তুলে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে ফিক ফিক করে হাসতে লাগলেন হঠাৎ। ছেলেরা স্তম্ভিত। তারা কখনো পণ্ডিতমশাইকে হাসতে দেখেনি।

কিন্তু তাদের আরো স্তম্ভিত করে দিল, পণ্ডিতমশাই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, আজ তোমাদের ছুটি! ছুটি!

ছেলেরা সমস্বরে বলে উঠল, ছুটি পণ্ডিতমশাই?

পণ্ডিতমশাই হঠাৎ হাঃ হাঃ করে হেসে উঠে বললেন, কিসের লেখাপড়া হা! অ্যাঁ! লেখাপড়া অত কিসের? বাচ্চা ছেলেরা নাচবে, গাইবে, দুষ্টুমি করবে, তবে না! ওঠো সব, উঠে পড়ো! আজ আমাদের গান হবে। নাচ হবে। হুল্লোড় হবে।

বলেন কি পণ্ডিতমশাই? ছেলেদের চোখের ভাব ক্রমশ আরো গোল হয়ে উঠছে।

ভুসুক পণ্ডিত হঠাৎ নিজেই তড়াক করে বেদী থেকে নেমে পড়লেন। তারপর দুহাত তুলে গান ধরলেন, আজ আমাদের ছুটি রে ভাই, আজ আমাদের ছুটি… গাও! গাও!

ছেলেরাও গাইতে লাগল।

ভুসুক পণ্ডিত নাচতে নাচতে বললেন, শুধু গাইলেই হবে না, নাচো! সবাই নাচতে শুরু করো।

তা ছেলেদের তো পোয়া বারো। রচনা ছেড়ে নাচ গান! এ কি ভাবা যায়। তারা সবাই পণ্ডিতমশাইয়ের সঙ্গে নাচতে লাগল।

বেশ কিছুক্ষণ নাচ গান হওয়ার পর ভুসুক পণ্ডিতমশাই বললেন, শুধু নাচ গান নয়। চলো সবাই মিলে একটু দুষ্টুমি করা যাক। চলো সনাতন মুৎসুদ্দির বাগান

থেকে পেয়ারা চুরি করি।

ছেলেরা নিজের কানকে পর্যন্ত বিশ্বাস করতে না পেরে চেঁচিয়ে উঠল, বলেন কী পণ্ডিতমশাই?।

কিন্তু ভুসুক পণ্ডিতের যেই কথা সেই কাজ। তিনি সবার আগে গিয়ে সনাতনের বাগানের বৈদ্যুতিক কাঁটাতারের বেড়াটিকে এক জায়গায় কেটে ফাঁক করে ঢোকার রাস্তা বানালেন। তারপর বাগানে ঢুকে নিজেই ঢিল মেরে এবং একটি ছেলের কাছ থেকে লেসার গান চেয়ে নিয়ে তাই দিয়ে মেলা পেয়ারা পেড়ে ফেললেন। সনাতনের রোবট চাকরগুলো তেড়ে আসায় পণ্ডিতমশাই ছেলেদের নিয়ে পালিয়ে এলেন। তারপর বললেন, চলো, একটু ফুটবল খেলা যাক।

ছেলেদের আনন্দ আর ধরে না। পড়াশুনা ছেড়ে এরকম মজার সময় কাটানো মহাভাগ্যের ব্যাপার। পণ্ডিতমশাই নিজে ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে নেমে পড়লেন। বিস্তর আছাড় খেলেন বটে, কিন্তু খেললেনও চমৎকার। দুটো দারুণ গোল করলেন।

পণ্ডিতমশাইয়ের এত বিদ্যের কথা কেউ জানত না।

খেলার শেষে পণ্ডিতমশাই বললেন, ওহে, চল পুকুরে স্নান করতে নামি।

ছেলেরা এই প্রস্তাবে হইহই করে উঠল। কাছে চমৎকার বাঁধানো পুকুর। পণ্ডিতমশাই ছেলেদের নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন জলে। তুমুল আনন্দে সবাই স্নান করতে লাগল।

কিন্তু আচমকাই তাদের আনন্দের মধ্যে একটা বজ্র এসে পড়ল যেন। আকাশ থেকে একটা ছোট্ট নৌকোর সাইজের রকেট নেমে এল। তা থেকে গম্ভীর চেহারার একজন লোক নেমে এসে ভুসুক পণ্ডিতমশাইকে একটা ধমক দিয়ে বলল, শিগগির উঠে আসুন।

ভুসুক পণ্ডিত যেন একটু ভয় পেয়ে জল থেকে উঠলেন। সঙ্গে ছেলেরা।

লোকটা ভুসুক পণ্ডিতমশাইকে ভাল করে লক্ষ্য করল, ঘুরে ফিরে দেখল, তারপর ছেলেদের দিকে চেয়ে বলল, এর অ্যানটেনাটা কে কেটেছে?

ছেলেরা অবাক হয়ে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে থাকে।

লোকটা বলল, দুষ্টু ছেলে! ছিঃ।

এই বলে সকলের চোখের সামনে লোকটা একটু স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে পণ্ডিতমশাইয়ের মাথার খুলিটা ফাঁক করে ফেলল, তারপর একটা নতুন টিকি বসিয়ে দিয়ে মাথাটা আবার জুড়ে বলল, এঃ, এই কম্পিউটার একটা পারটস্ খারাপ ছিল? কেউ লক্ষ্যই করিনি, টিকিট কাটায় ভালই হয়েছে। যাও, এবার আর পণ্ডিতমশাই ঘুমোবেন না।

টিকিটা লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে ভুসুক পণ্ডিতমশাই আবার গম্ভীর ও রাগী হয়ে গেলেন। গাছতলায় পাঠশালায় ছেলেদের জড়ো করে গমগমে গলায় বললেন, এবার আঁকের খাতা খোলো সব। করো, একসারসাইজ যোলোর এক থেকে দশ নম্বর পর্যন্ত আঁকাগুলো।

ছেলেরা প্রাণভয়ে আঁক কষতে লাগল। কারণ ভুসুক পণ্ডিতের চোখে ঘুমের লেশমাত্র আর নেই। দুই চোখ ভাটার মতো চারদিকে ঘুরছে।

# ভূত ও বিজ্ঞান

**ভূত ও বিজ্ঞান**

সন্ধ্যে হয়ে আসছে। পটলবাবু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরবেন বলে বেশ জোরেই হাঁটছেন, জোরে হাঁটার আরও একটা কারণ হলো আকাশে বেশ ঘন কালো মেঘ জমেছে, ঝড়বৃষ্টি এলে একটু মুশকিল হবে। তিনি আজ আবার ছাতাটা নিয়ে বেরোননি।

পায়ের হাওয়াই চপ্পলজোড়ার দিকে একবার চাইলেন পটলবাবু, দুখানা ছোটো ডিঙি নৌকোর সাইজের জিনিস, দেখতে সুন্দর নয় ঠিকই, কিন্তু ভারি কাজের জুতো। মাধ্যাকর্ষণ নিরোধক ব্যবস্থা থাকার ফলে আকাশের অনেকটা ওপর দিয়ে দিব্যি হাঁটাচলা করা যায়। জুতোর ভিতরে ছোটো মোটর লাগানো আছে। সেটা চালু করলে আর পা নাড়ারও দরকার হয় না। ক্ষুদে বুস্টার রকেট তীব্রগতিতে গন্তব্যস্থলে নিয়ে যাবে। কিন্তু পটলবাবুর ইদানীং খুব বেশি গতিবেগ সহ্য হয় না, মাথা ঘোরে। স্ক্যান করে দেখা গেছে তার স্নায়ুতন্ত্রে একটা গণ্ডগোল আছে। বেশি গতিবেগে গেলেই তার মাথা ঘোরে এবং নানা উপসর্গ দেখা দেয়। সুতরাং পটলবাবু ভেসে ভেসে হেঁটে চলেছেন। বৃষ্টি বাদলা থেকে আত্মরক্ষার জন্য একটা বেলুন ছাতা হালে আবিষ্কার হয়েছে। ফোল্ডিং জিনিস, ভাজ খুলে জামার মতো পরে নিতে হয়, তারপর বোতাম টিপলেই সেটা বেলুনের মতো ফুলে চারদিকে একটা ঘেরাটোপ তৈরি করে, ঝড়বৃষ্টিতে সেই বেলুনের কিছুই হয় না। সেই ছাতাটা না আনায় পটলবাবুর একটু দুশ্চিন্তা হচ্ছে। এই তিন হাজার সাতচল্লিশ খ্রিস্টাব্দেও জলে ভিজলে মানুষের সর্দিকাশি হয় এবং সর্দিকাশির কোনো ওষুধে পটলবাবুর তেমন কাজ হয় না।

পকেটে টেলিফোনটা বিপ বিপ করছিল, পটলবাবু টেলিফোনটা কানে দিয়ে বললেন, কে?

কে, পটলভায়া নাকি? আমি বিষ্ণুপদ বলছি।

বলো ভায়া।

বলি, তুমি এখন কোথায়?

আমি এখন উত্তর চব্বিশ পরগনার ওপরে, দু হাজার সাতশো ফুট অল্টিচুডে রয়েছি। আকাশে কালবোশেখীর মেঘ এবং সঙ্গে ছাতা নেই।

বাঁচালে ভায়া। ঈশ্বরেরই ইচ্ছে বলতে হবে, আমি নবগ্রামে রয়েছি। এই উত্তর চব্বিশ পরগনাতেই।

বলো কী? তুমি তো কদিন আগেও হিউস্টনে ছিলে!

তারও আগে ছিলুম মঙ্গলগ্রহে। তার আগে নেপচুনে। আমার কি এক জায়গায় থাকলে চলে?

তা নবগ্রামে কী মনে করে?

একটা সমস্যায় পড়েই আসা। তুমি নবগ্রামে নেমে পড়ো, কথা আছে।

প্রস্তাবটা পটলবাবুর খারাপ লাগল না, ঝড়বৃষ্টিতে পড়ার চেয়ে নবগ্রামে পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে একটু আড্ডা মেরে যাওয়া বরং অনেক ভাল।

পটলবাবু বললেন, ঠিক আছে, কোথায় আছো সেটা বলো।

স্ক্যানার ছেষট্টি ক-তে জিরো ইন করো।

পটলবাবু স্ক্যানার বের করে নবগ্রামের দিক নির্ণয় করে নিয়ে নম্বরটা সেট করলেন, তারপর স্ক্যানারের নির্দেশ অনুসরণ করে চলতে লাগলেন। নবগ্রাম সামনেই, কালবোশেখীর বাতাসটা শুরু হওয়ার আগেই নেমে পড়তে পারবেন বলে আশা হতে লাগল তার।

কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর। পশ্চিম দিককার আকাশে যে কালো কুচকুচে মেঘে ঘন ঘন বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছিল সেখান থেকেই হঠাৎ যেন একটা কালো গোল মেঘের বল কামানের গোলার মতোই তাঁর দিকে ছুটে আসতে লাগল। এরকম

অতিপ্রাকৃত ব্যাপার তিনি কস্মিকালেও দেখেননি। পটলবাবু ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি হাওয়াই চপ্পলের ভাসমানতা কমিয়ে দিয়ে দ্রুত নীচে নামতে লাগলেন।

কিন্তু শেষরক্ষে হলো না। মেঘের বলটা হুড়ুম করে এসে যেন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। পটলবাবুর চারদিক একেবারে ঘুটঘুট্টে অন্ধকারে ঢেকে গেল। ভয়ে তিনি সিটিয়ে গেলেন। কী করবেন বুঝে উঠতে না পেরে তিনি তাড়াতাড়ি পকেট থেকে টেলিফোনটা বের করলেন। অন্ধকারেও টেলিফোন করতে অসুবিধে নেই। ডায়ালের বোতামগুলো অন্ধকারেও জ্বলজ্বল করে।

কিন্তু টেলিফোন করার সুযোগটাই পেলেন না তিনি। কে যেন হাত থেকে টেলিফোনটা কেড়ে নিয়ে গেল।

তারপর যা হতে লাগল তা পটলবাবুর সুদূর কল্পনারও বাইরে। মেঘের গোলাটা তাকে যেন খানিক লোফালুফি করে হুঁ-হুঁ করে ওপরের দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। পটলবাবু চেঁচাতে লাগলেন, বাঁচাও! বাঁচাও!

কানের কাছে কে যেন বজ্রনির্ঘোষে বলল, চোপ!

ভয়ে পটলবাবু বাক্যহারা হলেন, কিন্তু ধমকটা কে দিল তা বুঝতে পারলেন না।

মেঘের বলটা তাকে নিয়ে এত ওপরে উঠে যাচ্ছে যে পটলবাবুর ভয় হতে লাগল, আরও ওপরে উঠলে তিনি নির্ঘাৎ কৃত্রিম উপগ্রহগুলোর উচ্চতায় পৌঁছে যাবেন। সে ক্ষেত্রে হাওয়াই চপ্পল কাজ করবে না। অক্সিজেনের অভাবে শ্বাসবায়ু বন্ধ হয়ে যাবে এবং তাঁর মৃতদেহ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরপাক খাবে।

আচমকাই মেঘের বলটা থেমে গেল। এবং ধীরে ধীরে চারদিককার অন্ধকার কেটে যেতে লাগল। মেঘ কেটে যাওয়ার পর পটলবাবু যা দেখলেন তাতে ভিরমি খাওয়ার যোগাড়। পৃথিবী থেকে অন্তত দু’শো মাইল ওপরে তিনি নিরালা শূন্যে দাঁড়িয়ে আছেন, একদম একা।

কে যেন বলে উঠল, এই যে পটল।

পটলবাবু ঘাড় ঘুরিয়ে যাকে দেখলেন তাতে তার হৃদকম্প হতে লাগল। বৈজ্ঞানিক হরিহর সর্বজ্ঞ। কিন্তু সমস্যা হলো হরিহর এই গত জানুয়ারি মাসে একশো পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে মারা গেছেন।

কাঁপা গলায় পটলবাবু বললেন, আ-আপনি?

শূন্যে দুখানা চেয়ার পাতলেন হরিহর। তারপর বললেন, বোসো হে পটল, কথা আছে।

পটলবাবু কম্পিত বক্ষে বসলেন, দুশো মাইল উচ্চতায় হাওয়ায় কোনোও ঘন স্তর নেই। তার হাওয়াই চপ্পল কাজ করছে না, তবু চেয়ার দুটো দিব্যি ভেসে রয়েছে। আর শ্বাসকষ্টও হচ্ছে না।

হরিহর বললেন, ভয় পেও না। আমাদের চারদিকে একটা বলয় রয়েছে। তোমার শ্বাসকষ্ট হবে না, ঠাণ্ডাও লাগবে না, পড়েও যাবে না। নীচে এখন প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। তার চেয়ে এ জায়গাটা অনেক নিরাপদ, কী বলো?

যে আজ্ঞে। কিন্তু আপনি তো–

মারা গেছি? হাঃ হাঃ হাঃ। আমি মরায় তোমাদের খুব সুবিধে হয়েছে, না? শোনো বাপু, আমি ভূতপ্রেত নিয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতুম বলে কেউ আমাকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি, প্রকাশ্যেই আমাকে পাগল আর উন্মাদ বলা হতো। সেই দুঃখে আমি নবগ্রামে একটা নির্জন বাড়িতে ল্যাবরেটারি বানিয়ে নিজের মনে গবেষণা করতে থাকি। একদিকে যখন তোমরা জড়বিজ্ঞান নিয়ে পৃথিবী তোলপাড় করছ, অন্যদিকে তখন আমি এক অজ্ঞাত জগতের সন্ধান করতে থাকি, তাতে যথেষ্ট কাজও হয়। ধীরে ধীরে দেহাতীত জগতের রহস্য ধরা পড়তে থাকে। আমার নানারকম কিম্ভুত যন্ত্রে আত্মাদের অস্তিত্ব নির্ভুলভাবে রেকর্ড হতে থাকে। তারপর একদিন আমি তাদের পরম বন্ধু হয়ে উঠি। আমার গবেষণায় শেষে তারাও সাহায্য করতে থাকে।

পটলবাবু সচকিত হয়ে বলেন, ভূত? কিন্তু ভূত তো–

কী বলবে জানি। ভূত একটা বোগাস ব্যাপার, এই তো! বাপু হে এই যে মহাশূন্যে ভেসে আছো, কোনো স্পেসস্যুট বা অক্সিজেন বা যন্ত্রপাতি ছাড়া–এটা কি তোমার বিজ্ঞান ভাবতে পারে?

মাথা নেড়ে পটলবাবু বললেন, আজ্ঞে না।

তবে? বিজ্ঞান শিখে এ সব না-মানার অভ্যাস মোটেই ভাল নয়, বুঝলে!

যে আজ্ঞে।

এখন যা বলছি শোনো। তোমার বন্ধু বিষ্ণুপদ সাঁতরা আমার গোপন ল্যাবরেটারির সন্ধান পেয়েছে। সেইখান থেকেই তোমাকে টেলিফোনে ডাকাডাকি করছিল। কিন্তু সে জড়বাদী বিজ্ঞানী, অবিশ্বাসী। সে আমার ল্যাবরেটারিতে নানারকম আধুনিক যন্ত্রপাতি ঢুকিয়ে সব তছনছ করছে। সে আমাকে সত্যিকারের পাগল বলে প্রতিপন্ন করতে চায়। বুঝেছো?

যে আজ্ঞে। আমি জানি তুমি তেমন খারাপ লোক নও। তাই তোমাকে একটি কাজের ভার দিচ্ছি। তুমি বিষ্ণুপদকে আটকাও।

যে আজ্ঞে।

তারপর তুমি নিজে আমার ল্যাবরেটারিতে ভূত আর বিজ্ঞান মেশাতে থাকো। আমি তোমাকে সাহায্য করবো।

ভূত আর বিজ্ঞান কি মিশ খাবে হরিহর কাকা?

খুব খাবে, খুব খাবে। খাচ্ছে যে, তা তো দেখতেই পাচ্ছো।

তা অবশ্য ঠিক, কিন্তু আমি কি পারব? আমার তো নিজের গবেষণা–

উঁহু নিজের গবেষণা তোমাকে ছাড়তে হবে। আমার ভূত-বিজ্ঞান রসায়ন গবেষণাগারের ভার তোমাকেই নিতে হবে। নইলে–

পটলবাবুর মাথা ঝিমঝিম করছিল, রাজি না হলে কী হবে তা ভাবতেও পারছিলেন না। ঘাড় কাৎ করে বললেন, আজ্ঞে তাই হবে।

তাহলে চললো, নামা যাক।

চেয়ার দুটো দিব্যি সোঁ সোঁ করে নামতে লাগল। বায়ুস্তরে নেমে হরিহর বললেন, এবার নিজে নিজেই নামো, ঝড়বৃষ্টি থেমে গেছে।

যে আজ্ঞে, বলে পটলবাবু নামতে লাগলেন।

# ভূতের ভবিষ্যৎ

---

**ভূতের ভবিষ্যৎ**

বাসবনলিনীদেবী অটো নাড়ু মেশিনের তিনটে ফুটোয় নারকেল-কোরা, গুড় আর ক্ষীর ঢেলে লাল বোতামটা টিপে দিয়ে অঙ্কের খাতাটা খুলে বসলেন। এলেবেলে অঙ্ক নয়। বাসবনলিনী যে-সব আঁক কষেন, তার ওপর নির্ভর করে বিজ্ঞান অনেক ভেলকি দেখিয়েছে। আলোর প্রতিসরণের ওপর তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম হিসেব মহাকাশবিজ্ঞানে অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। এই দু'হাজার একান্ন সালে সৌরজগৎ ছাড়িয়ে অন্যান্য নক্ষত্রপুঞ্জে মানুষ যে যাতায়াত করতে পারছে, তার পিছনে, বাসবনলিনীর অবদান বড় কম নয়।

যদি বয়সের প্রশ্ন ওঠে তো বলতেই হয় যে, বাসবনলিনীর বয়স হয়েছে। এই একশো একাশি বছর বয়সের মধ্যে তার মৃত্যু হয়েছে মোট চারবার। ডাক্তাররা যাকে বলেন ক্লিনিক্যাল ডেথ। তবে এক অসাধারণ প্রতিভার অধিকারিণী বলে আধুনিক চিকিৎসা ও শল্যবিজ্ঞানের সাহায্যে তাকে আবার বাঁচিয়ে ভোলা হয়েছে। হৃদ্যন্ত্রটি অকেজো হয়ে যাওয়ায় সেটা বদল করে একেবারে পাকাপাকি যান্ত্রিক হৃদযন্ত্র বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। দুটো চোখই নতুন। কিডনিও পাল্টাতে হয়েছে। তা ছাড়া মস্তিষ্কের বার্ধক্য ঠেকাতে নিতে হয়েছে নানারকম থেরাপি। তিনি তিনবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। নামডাকও প্রচণ্ড। কিন্তু বাসবনলিনী একেবারে আটপৌরে মানুষ। আঁক কষেন, বিজ্ঞানচর্চা করেন, আবার নাতিপুতি নিয়ে দিব্যি ঘর-সংসারও করেন।

বলতে কী, তার নাতিরাও রীতিমত বুড়ো। তবে নাতিদের নাতিরা আছে, তস্য পুত্র কন্যারা আছে। বাসবনলিনীর কী ঝামেলার অভাব? এই তো পাঁচুটা তিন দিন ধরে, নাড়ু খাব, নাড়ু খাব' বলে জ্বালিয়ে মারছে। তাও অন্য কারও হাতের নাড়ু নয়, বাসবনলিনীর হাতের নাড়ু ছাড়া তার চলবে না। পাঁচুর বয়স এই সবে আট।

বাসবনলিনীর মেজো ছেলের সেজো ছেলের বড় ছেলের ছোট ছেলের সেজো ছেলে। কে যে কোন্ ছেলের কোন্ ছেলের কোন্ ছেলে, বা কোন্ মেয়ের কোন্ মেয়ের কোন্ মেয়ের মেয়ে, বা কোন্ ছেলের কোন মেয়ের কোন্ ছেলের কোন্ মেয়ে, বা কোন্ ছেলের কোন্ ছেলের কোন্ মেয়ের কোন্ মেয়ে, সে-সব হিসেব রাখা চাট্টিখানি কথা নয়। বাসবনলিনীর একটা গার্হস্থ্য কমপিউটার আছে, তাতে সব তথ্য ভরা আছে। কে পাঁচু, কে হরি, কে গোপাল, কে তাদের বাপ-মা, ইত্যাদি সব খবরই বাসবনলিনী চোখের পলকে জেনে নিতে পারেন। কাজেই, অসুবিধে নেই। তা ছাড়া কে কোষ্টা খেতে ভালবাসে, কোটা পরতে পছন্দ করে, কে একটু খুঁতখুতে, কে খোলামেলা, কে ভিতু, কে-ই বা দুর্বল, কে পেটুক, কে ঝগড়ুটে, সবই কমপিউটারের নখদর্পণে।

কে যেন বলে উঠল, মা, নাড়ু হয়ে গেছে। গরম খোপে ঢুকিয়ে দেব?

কণ্ঠস্বরটি, বলাই বাহুল্য, মানুষের নয়। অটো নাড়ু মেশিনের।

বাসবনলিনী বিরক্ত হয়ে মেশিনের দিকে চেয়ে বললেন, তোর বুদ্ধির বলিহারি যাই মোদা, নাড়ু গরম খোপে রাখলে আঁট বাঁধবে কী করে শুনি!

ভুল হয়ে গেছে মা।

অত ভুল হলে চলে কী করে? দেখছিস তো বড় কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছি। কাজ করিস, কিন্তু বুদ্ধি খাটাস না। কেমন করলি নাড়ু, দেখি দে তো একটা।

মেশিন থেকে একটা যান্ত্রিক হাত বেরিয়ে এল। তাতে একটা নাড়ু। বাসবনলিনী তার গন্ধ শুঁকে বললেন, খারাপ নয়, চলবে। স্টোরেজে রেখে দে। তারপর সুইচ অফ করে দিয়ে একটু জিরিয়ে নে।

আচ্ছা মা। বলে মেশিন চুপ করে গেল।

খুক করে একটু কাশির শব্দ হওয়ায় বাসবনলিনী তাকালেন। তাঁর স্বামী আশুবাবু সসঙ্কোচে ঘরে ঢুকে এদিক-ওদিক কী যেন খুঁজছেন।

বাসবনলিনী চড়া সুরে বললেন, আবার এ-ঘরে ছোঁকছোঁক করছ কেন? একটু আগেই তো এক বাটি রাবড়ি আর চারখানা মালপোয়া খেয়ে চাঁদে বেড়াতে গিয়েছিলে। ফিরে এলে কেন?

আশুবাবুর বয়স একশো একানব্বই বছর। একটু রোগা হলেও বেশ শক্তসমর্থ চেহারা। ডায়াবেটিস থেকে শুরু করে অনেক রকম রোগ তার শরীরে। একটু খাই-খাই বাতিক আছে। তারও বার-পাঁচেক ক্লিনিক্যাল ডেথ হয়েছে। শরীরের অনেক যন্ত্রপাতি অকেজো হওয়ায় বদলানো হয়েছে।

তিনি বিরস মুখে বললেন, 'ছোঁকছোঁক করি কি আর সাধে? নতুন যে প্লাটন ট্যাবলেট খাচ্ছি, তাতে ঘণ্টায় ঘণ্টায় খিদে পায়। চাঁদে গিয়ে একটু পায়চারি করতেই মারমার করে ফের খিদে হল। সেখানে লড়াইয়ের চপ আর ফুলুরির কাউন্টারটা আজ আবার বন্ধ। আণ্ডারগ্রাউণ্ড ক্যান্টিনে গিয়ে দেখি সিনথেটিক খাবার ছাড়া কিছু নেই। তাই ফিরে এলুম।"

বাসবনলিনীর করুণা হল। মোদাকে ডেকে বললেন, 'ওরে, বাবুকে কয়েকখানা নাড়ু দে তো।

নাড়ু পেয়ে আশুবাবু বিগলিত হাসি হাসলেন। দু'খানা দু গোলে পুরে চিবোতে চিবোতে আরামে চোখ বুজে এল। বললেন, তোমার হাতের কলাইয়ের ডালের বড়ি কতকাল খাই না। আজ রাতে একটু বড়ির ঝাল হলে কেমন হয়?

বাসবনলিনী বিরক্ত হয়ে আঁক কষতে কষতেই একটা হাঁক দিলেন, 'ওরে ও খেদি, শুনতে পাচ্ছিস?

'যাই মা' বলে সাড়া দিয়ে একটা কালো বেঁটেমতো কলের মানবী এসে সামনে দাঁড়াল।

বাসবনলিনী বললেন, বাইরে কি বৃষ্টি হচ্ছে নাকি?

খুব বৃষ্টি হচ্ছে মা, সৃষ্টি ভাসিয়ে নিচ্ছে।

তা নিক। বুড়োকর্তা রাতে বড়ির ঝাল খাবেন। যা গিয়ে খানিকটা কলাইয়ের ডাল বেটে ভাল করে ফেটিয়ে রাখ। আমি দশ মিনিটের মধ্যে আসছি। খেদি চলে গেল!

আশুবাবু নাড়ু খেয়ে এক গেলাস জল পান করলেন। তারপর পেটে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন, নাড়ুগুলো খাসা হয়েছে।

বাসবনলিনী অঙ্কের খাতাটা বন্ধ করে উঠলেন। স্বামীর দিকে চেয়ে বললেন, ঘরে বসে থাকলে কেবল খাই-খাই করবে। তার চেয়ে যাও

একটু দক্ষিণ মেরু থেকে বেড়িয়ে এসো। আশুবাবু মাথা নেড়ে বললেন, দক্ষিণ মেরুতে ভদ্রলোক যায় কখনও?

কেন কী হয়েছে?

সেখানে সামিট মিটিং হবে বলে ঝাড়পোঁছ হচ্ছে। লোকেরা ভারি ব্যস্ত। খুব গাছটাছ লাগানো হচ্ছে, মস্ত-বড় হোটেল উঠছে। অত ভিড় আমার সয় না। তার চেয়ে বরং আলাস্কায় গিয়ে একটু মাছ ধরে আনি।

তাই যাও।

কিন্তু সন্ধ্যে সাতটার মধ্যে ফিরে এসো। এখন কিন্তু দুপুর দেড়টা বাজছে।

যা গো হা, রাতে বড়ির ঝাল হবে, আমি কি আর দেরি করব? আশুবাবু বেরিয়ে গেলেন। বাসবনলিনী গিয়ে খেদির কাজ দেখলেন। ডাল বেশ মিহি করে বেটে ফেনিয়ে রেখেছে খেদি। বাসবনলিনী দেখে খুশি হয়ে বললেন, এবার অটো বড়ি মেশিন দিয়ে বড়িগুলো ভাল করে দে। যেন বেশ ডুমো ডুমো হয়।

দিচ্ছি মা।

বড়ি দেওয়া হতে লাগল। বাসবনলিনী জানালা খুলে দেখলেন, বাইরে সাঙ্ঘাতিক ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। বাসবনলিনী ঘরের দেওয়ালের একটা স্লাইডিং ডোর খুলে কাঁচের ঢাকনাওলা বড়ি-বেলুনটা বের করলেন। এটা তার নিজের আবিষ্কার। বড়ির ট্রেটা বেলুনের ঢাকনা খুলে তার মধ্যে বসিয়ে ফের ঢাকনা এঁটে দিলেন। তারপর দরজা খুলে চাকাওলা বড়ি-বেলুনটাকে বাইরে ঠেলে একটা হাতল টেনে দিলেন।

বড়ি বেলুন দিব্যি গড়গড় করে গড়িয়ে উঠোনে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর ধীরে ধীরে শূন্যে উঠে ক্রমে দৃষ্টির বাইরে হারিয়ে গেল। মাইল পাঁচেক ওপরে গিয়ে বড়ি-বেলুন স্থির হয়ে ভাসবে। ঢাকনা আপনা থেকে খুলে যাবে। চড়া রোদে বড়িগুলো দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে শুকিয়ে মুচমুচে হয়ে যাবে। না শুকোলে বড়ি-বেলুনের ম্যাগনিফায়ার রোদের তাপকে প্রয়োজনমতো দশ বা বিশ গুণ বাড়িয়ে দেবে। পাঁচ মাইল ওপরে কাকপক্ষীর উৎপাত নেই ঠিকই, তবে আন্তমহাদেশীয় নানা

উড়ুক্কু যানের হামলা আছে। তাদের ধাক্কায় বড়ি-বেলুন বেশ কয়েকবার ঘায়েল হয়েছে। তাই এখন বড়ি-বেলুনে একটা পাহারাদার কমপিউটার বসিয়ে দিয়েছেন বাসবনলিনী। উড়ুক্কু যান দেখলেই বড়ি-বেলুন সাত করে প্রয়োজন মতো ডাইনে-বাঁয়ে বা ওপর-নীচে সরে যায়।

বৃষ্টিটা খুব তেজের সঙ্গেই হচ্ছে বটে। এরকম আবহাওয়ায় বাসবনলিনীর বাড়ি থেকে বেরোতে ইচ্ছে করে না। জানালার ধারে বসে কেবল অঙ্ক কষতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বাজারে একটু না গেলেই নয়। অবশ্য ঘর থেকে অর্ডার দিলে বাড়িতেই সব পৌঁছে যাবে, কিন্তু বাসবনলিনী নিজের হাতে বেছেগুছে শাকপাতা কিনতে ভালবাসেন। নিজে না কিনলে পছন্দসই জিনিস পাওয়া যায় না।

বেরোবার জন্য তৈরি হতে বাসবনলিনীর এক মিনিট লাগল। একটা বা শুধু পরে নিলেন। জিনিসটা কাঁচের মতোই স্বচ্ছ, তবে এত হালকা যে, গায়ে কিছু আছে বলে মনে হয় না। আসলে এই বাল বা বুদ্বুদ গায়ের সঙ্গে সেঁটেও থাকে না। চারদিকে শুধু ডিমের খোলার মতো ঘিরে থাকে। গায়ে এক ফোঁটা জল বা বাতাসের ঝাঁপটা লাগতে দেয় না।

বুদ্বুদবন্দী হয়ে বাসবনলিনী বেরিয়ে পড়লেন। ইচ্ছে করলে গাড়ি নিতে পারতেন, তার গ্যারাজে রকমারি গাড়ি আর উড়ুক্কু যান আছে। কিন্তু হাঁটতে ভালবাসেন বলে বাসবনলিনী কদাচিৎ গাড়ি নেন।

রাস্তায় অবশ্য যানবাহনের অভাব নেই। পেট্রল বা কয়লা বহুকাল আগেই ফুরিয়ে গেছে। তাই আজকাল গাড়ি চলে নানারকম শুকনো জ্বালানিতে। এসব জ্বালানি ছোট ছোট ট্যাবলেট যা বড়ির আকারে কিনতে পাওয়া যায়। কোনও ধোঁয়া বা গন্ধ নেই। শব্দও হয় না। যাতায়াতের জন্য আর আছে চলন্ত ফুটপাত। আজকাল এক রকম জুতো বেরিয়েছে যেগুলো পায়ে দিলে জুতো নিজেই হাঁটতে থাকে, যে পরেছে তাকে আর কষ্ট করে হাঁটতে হয় না।

তবে বাসবনলিনী এসব আধুনিক জিনিস পছন্দ করেন না। তিনি পায়ে-হাঁটা পথ ধরে বাজারে এসে পৌঁছলেন।

বাজার বলতে বাগান। একটা বিশাল তাপনিয়ন্ত্রিত হলঘরে মাটিতে এবং শূন্যে হাজারো রকমের সবজির চাষ। ক্রেতারা গাছ থেকেই যে যার পছন্দমতো আলু-কুমড়ো-পটল তুলে নিচ্ছে। শূন্যে ঝুলন্ত র‍্যাকে আলুর গাছ। এসব.আলুর জন্য

মাটির দরকারই হয় না। শূন্যেই নানা প্রক্রিয়ায় গাছকে ফলন্ত করা হয়। গাছের নীচে চমৎকার আলু থোকা থোকা ফলে আছে। বাসবনলিনী কিছু আলু নিলেন। বেগুন-পটল ফুলকপিও নিলেন। আজকাল সব ঋতুতেই সবরকম সবজি হয়, কোনও বাধা নেই।

বাজারের ফটকের ছোট-ছোট ট্রলি সাজানো আছে। তাতে বোঝা তুলে দিয়ে কনসোলের মধ্যে নাম আর ঠিকানাটা একবার বলে দিলেই ট্রলি আপনা থেকেই গিয়ে বাড়িতে জিনিস পৌঁছে দিয়ে আসবে।

বাসবনলিনীও বোঝাটা একটা ট্রলি মারফত বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর মেঘের ওপর হেঁটে বেড়ানোর একটু ইচ্ছে হল তাঁর। কোনও অসুবিধে নেই। উড়ন্ত পিরিচ সব জায়গায় মজুত। তিনি সবজি-বাজারের বাইরে উড়ন্ত পিরিচের গ্যারাজে ঢুকে একটা পিরিচ ভাড়া নিলেন। পাঁচ ফুট ব্যাসার্ধের পিরিচটা খুবই মজবুত জিনিসে তৈরি। তাতে একখানা আরামদায়ক চেয়ার আছে, কিছু খাদ্য-পানীয়ের একখানা ছোট আলমারি আছে, আর আছে একজোড়া হাওয়াই চপ্পল। এই চপ্পল আকাশে দিব্যি হেঁটে বেড়ানো যায়।

বুদ্বুদসমেত বাসবনলিনী পিরিচে চেপে বসলেন। পিরিচ একটা দ্রুতগামী লিফটের মতোই ওপরে উঠতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘন মেঘের স্তর ভেদ করে বাসবনলিনী রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশে উঠে এলেন। চারদিকে কোপানো মাটির মতো মেঘ। আশেপাশে অনেক পিরিচ ভেসে বেড়াচ্ছে। তাতে নানা ধরনের মানুষ। তা ছাড়া বড় বড় উড়ন্ত কার্পেটে দঙ্গল বেঁধে কোনও পরিবার পিকনিকও করছে। প্রচুর লোক। ওপরে নীচে সর্বত্র। মেঘের ওপর ক্লাউড-স্কিও করছে কেউ-কেউ। হাওয়াই বুট পরে শূন্যে ফুটবল খেলছে কিছু যুবক। কয়েকজন যুবতী ভাসমান ফুচকাওলার কাছ থেকে ফুচকা কিনে খাচ্ছে।

পিরিচটা নিয়ে একটু এদিক-ওদিক ঘুরে বাসবনলিনী তার বড়ি বেলুনের কাছে এলেন। বড়িগুলো প্রায় শুকিয়ে এসেছে। আর ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই হয়ে যাবে।

হাওয়াই চপ্পল পরে নামতে যাবেন, এমন সময় ঠিক একটা কুমড়োর আকৃতির উড়ুকুগাড়ি তার সামনে থেমে গেল। জানালা দিয়ে মুখ বের করে একটা ছোকরা হাসিমুখে বলে উঠল, কী গো ঠাকুমা, এখানে কী হচ্ছে? বড়ি রোদে দিয়েছ নাকি?

ছোকরা আর কেউ নয়, গদাধর ভটচায্যের ডানপিটে ছেলে রেমো । রেমোর জ্বালায় বাসবনলিনীর এক সময়ে ঘুম ছিল না চোখে। গাছের আম-জাম-কাঁঠাল কিছু রাখা যেত না রেমির জন্য। বিচ্ছুটা চুরিও করত নানা কায়দায়। একখানা লেজার গান দিয়ে টপাটপ পেড়ে ফেলত ফলপাকুড়, তারপর একটা খুদে পুতুলের মতো রোবটকে কোনও অসুবিধেই হত না। এই বড়ি-বেলুনে রোদে-দেওয়া আচার-আমসত্ত্বও বড় কম চুরি করেনি রেমো। তাই তাকে দেখে বাসবনলিনী একটু শঙ্কিত হয়ে বললেন, আজ রাতে বড়ির ঝাল রাঁধব, তোকে একটু পাঠিয়ে দেব'খন।

রেমো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, রাতের খাওয়া আজ যে কোথায় জুটবে কে জানে। কেন রে, কী হল?

আর বলল কেন। গত একমাস ধরে বেস্পতির চারদিকে ঘুরপাক খেতে হয়েছে। আজ সবে ফিরছি। ফিরতে ফিরতে রেডিওতেই বদলির অর্ডার এল। আজই ইউরেনাসে রওনা হতে হবে। সেখানে রোবটরা নেমে মানুষের থাকার মতো ঘরবাড়ি তৈরি করেছিল। শুনছি সেইসব রোবটদের কয়েকজন নাকি এখন ভারি বেয়াড়াপানা শুরু করেছে। মানুষের কথা শুনছে না। কয়েকটা রোবট পালিয়ে গিয়ে বিপ্লবীর দল গড়েছে।

বাসবনলিনী চোখ কপালে তুলে বললেন, 'বলিস কী! এ তো সব্বোনেশে কাণ্ড।

রেমো একটু হেসে বলল, "তোমরা পুরনো আমলের লোক ঠাকুমা, এ-যুগের কোনও খবরই রাখো না। তবে ভালর জন্যই বলে রাখি, রোবটদের ঘরের কাজে বেশি লাগিও না। খাবার-দাবারে বিষটিষও মিশিয়ে দিতে পারে। একদম বিশ্বাস নেই ওদের।

শুনে বাসবনলিনীর বুক ধড়ফড় করতে লাগল। হৃৎপিণ্ডটা কলের না হলে বুঝি বা হার্টফেলই করতেন। কোনো রকমে সামলে নিয়ে বললেন, 'তা এইসব কাণ্ড হচ্ছে, কিন্তু কই মুখপোড়ারা খবরের কাগজে তো কিছু লেখে না।

রেমো হেসে কুটিপাটি হয়ে বলল, তুমি সত্যিই আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ি হয়ে গেছ ঠাকুমা। বলি, খবরের কাগজে খবর লেখে আর ছাপে কারা তা জানো? অটোমেশিনের পাল্লায় পড়ে সবই তো যন্ত্রমগজের কজায় চলে গেছে। তা তারা কি রোবটদের দুষ্টমির কথা ছাপবে? সবই তো জ্ঞাতিভাই, তলায় তলায় সকলের

সাট। এমনকি রোবটরা তো রোবটল্যাণ্ডও দাবি করে বসেছে। ধর্মঘট, আইন অমান্যের হুমকিও দিচ্ছে। এসব শোনেনি?

না বাছা, শুনিনি। আপন মনে বসে আঁক কষি, অতশত খবর তো কেউ বলেওনি।

যাই ঠাকুমা, মা বাবার সঙ্গে একটু দেখা করে ইউরেনাসে রওনা দেব। সময় বেশি নেই।

রেমো চলে যাওয়ার পর বাসবনলিনী হাওয়াই চপ্পল পরে একটু শূন্যে পায়চারি করলেন। বাতাস এখানে বড় পাতলা। শ্বাসের কষ্ট হয়। তাই বাসবনলিনী তার অকসিজেনরুমাল মাঝে-মাঝে নাকে চেপে ধরছিলেন। কোন দুষ্টু ছেলে যেন একটা কুকুরকে হাওয়াই-জুতো পরিয়ে আকাশে ছেড়ে দিয়েছে। সেটা ঘেউঘেউ করে পরিত্রাহি চেঁচাতে চেঁচাতে কাছ দিয়েই ছুটে গেল। আজকাল আকাশেও খুব একটা শান্তি নেই।

কিন্তু রোবটদের কথায় বাসবনলিনীর দুশ্চিন্তা বেড়ে গেছে। মনে স্বস্তি পাচ্ছেন না। মোদা, সেঁদি, পেঁচি, রোহিণী, মদনা যামিনী এরকম অনেকগুলো রোবট-কাজের-লোক আছে বাসবনলিনীর। তার ওপর রোবট-গয়লা, রোবট-ধোপা, রোবট-নাপিত, রোবট-ফেরিঅলারও অভাব নেই। এদের যদি বিশ্বাস না করা চলে, তবে তো ভীষণ বিপদ। এর ওপর আছে রোবট-ডাক্তার, রোবট-নার্স। বাসবনলিনী খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে পিরিচে উঠে নিজের বাড়িতে ফিরে এলেন।

এসে দেখেন আশুবাবু গঙ্গারামকে হিন্দিতে খুব বকাঝকা করছেন। গঙ্গারাম নাকি বাগান কোপানোর কাজে ফাঁকি দিয়ে বসে বসে বিড়ি টানছিল। আশুবাবু খুব তেজি গলায় বলছিলেন, ফের কভি বিড়ি ফুঁকেগা তো কান পাকাড়কে এয়সা মোচড় গো যে, আক্কেল একদম গুড়ুম হো যায়েগা। বুঝেছিস?

গঙ্গারাম একটু বোকাগোছের রোবট। তার কাজ বাগানের মাটি কুপিয়ে চৌকস করা রোবটরা কখনও বিড়িটিড়ি খায় না। ওদের এতকাল কোনও নেশাটেশা ছিল না।

বাসবনলিনী আশুবাবুকে ইশারায় আড়ালে ডেকে বললেন, শোনো, এখন চাকর-বাকরদের ওপর হম্বিতম্বি কোরো না। দিনকাল পাল্টে গেছে।

আশুবাবু খুব রেগে গিয়ে বললেন, কিন্তু আস্পদ্দা দ্যাখো, কাজে ফাঁকি দিয়ে বিড়ি খাচ্ছে। এতটা বাড়াবাড়ি কি সহ্য করা যায়?

বাসবনলিনী চাপা গলায় বললেন, "আঃ, আস্তে বলল, শুনতে পাবে। বলি, রোবটরা যে সব দল বেঁধে বিপ্লবটিপ্লব কী সব শুরু করেছে, তা শুনেছ?'

আশুবাবু একটুও বিস্মিত না হয়ে বললেন, 'শুনব না কেন? খুব শুনেছি। চর্তুদিকে স্যাবোটাজ শুরু করেছে ব্যাটারা। আসকারা পেয়ে পেয়ে এমন মাথায় উঠেছে যে, এখন রোবটল্যাণ্ড চাইছে। এর পর হয়তো আমাদের দিয়েই কাজের লোকেদের কাজ করাতে চাইবে।

বাসবনলিনী ভিতু গলায় বললেন, সব জেনেও গঙ্গারামের ওপর চোটপাট করছিলে? ও যদি ওর জাতভাইদের বলে দেয়, তা হলে কি তারা তোমাকে আস্ত রাখবে?'

আশুবাবু একগাল হাসলেন। তারপর মৃদু স্বরে বললেন, অত সোজা নয়। আমার কাছে ওষুধ আছে।

বাসবনলিনী অবাক হয়ে বললেন, কী ওষুধ?

আশুবাবু খুব হেঁহেঁ করে হেসে বললেন, 'আছে। আমার ডার্করুমে লুকিয়ে রেখেছি। রোবটরা যে দুষ্টুমি শুরু করবে একদিন তা আমি অনেক আগেই বুঝতে পেরেছিলাম। সেই জন্যে গোপনে গোপনে বহুকাল ধরে ওষুধ বের করার চেষ্টা করেছি। এতদিনে ফল ফলেছে।

বলো কী! চলো তো তোমার ওষুধটা দেখব।

দেখাব, কিন্তু পাঁচ-কান করতে পারবে না, তোমরা তো পেটে কথা রাখতে পারো না।

না গো না, বিশ্বাস করেই দ্যাখো।

আশুবাবু বাসবনলিনীকে নিয়ে মাটির তলায় একটা গুপ্তকক্ষে এসে ঢুকলেন। ঘরে যন্ত্রপাতি কিছুই প্রায় নেই। শুধু একটা কালো বাক্স লাল আলোর ডুম জ্বলছে।

একটা টুল দেখিয়ে আশুবাবু বাসবনলিনীকে বললেন, বোসো। যা দেখাব তা তোমার বিশ্বাস হবে না তার চেয়েও বড় কথা, ভয়-টয় পেতে পারো।

জিনিসটা কী?

দেখলেই বুঝবে।

এই বলে আশুবাবু কালো বাক্সটার গায়ে একটা হাতল ঘোরাতে লাগলেন। আর মুখে নানা কিম্ভুত শব্দ উচ্চারণ করতে লাগলেন, ওঁং ফট, ওঁং ফট, প্রেত প্রসীদ, প্রেতেণ পরিপূরিত জগৎ। জগৎসার প্রেতায়া… ইত্যাদি।

বাসবনলিনী দেখলেন, কালো বাক্সটা গায়ে একটা ছোট্ট ফুটো দিয়ে কালো ধোঁয়ার মতো কী একটু বেরিয়ে এসে বাতাসে জমাট বাঁধতে লাগল। তারপর চোখের পলকে সেটা একটা ঝুলকালো, রোগা শুটকো মানুষের চেহারা ধরে সামনে দাঁড়াল।

বাসবনলিনী আঁতকে উঠে বললেন, উঃ মা গো, এ আবার কে?

আশুবাবু হেঁহেঁ করে হেসে বললেন, এদের কথা আমরা এতকাল ভুলেই মেরে দিয়েছিলুম গো! বহুকাল আগে এদের নিয়ে চর্চা হত। আজকাল বিজ্ঞানের ঠেলায় সব আউট হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু লোকটা আসলে কে?

এ-কথার জবাব কালো লোকটাই দিল। কান এটোকরা হাসি হেসে খোনা স্বরে বলল, এজ্ঞে, আমি হলুম গে ভূত। এক্কেবারে নির্জলা খাঁটি ভূত। বহুকাল ধরে দেখা-সাক্ষাতের চেষ্টা করছিলুম, হচ্ছিল না। তা এজ্ঞে, এবার এ-বাবুর দয়ায় হয়ে গেল।

শুনে বাসবনলিনী গোঁগোঁ করে অজ্ঞান হলেন। তারপর জ্ঞান ফিরে এলে অবিশ্বাসের চোখে চেয়ে রইলেন। ভূতটা তখনও দাঁড়িয়ে।

আশুবাবু একখানা তালপাতার পাখায় বাসবনলিনীকে বাতাস দিতে দিতে বললেন, আর ভয় নেই গিন্নি, ভূতেরা কথা দিয়েছে বিজ্ঞানের কুফল দূর করার জন্য জান লড়িয়ে দেবে। রোবটদেরও টিট করবে ওরাই।

কেলে ভূতটা সঙ্গে-সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে, এজ্ঞে, একেবারে বাছাধনদের পেটের কথা টেনে বের করে আনব মাঠান, কোনও চিন্তা করবেন না।

বাসবনলিনী এবার আর ভয় পেলেন না। খুব নিশ্চিন্ত হয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, বেঁচে থাকো বাবারা!

# ভৌত চশমা

**ভৌত চশমা**

বিকেলের দিকে বৈজ্ঞানিক গয়েশ সামন্তর মাথা ধরেছিল। মাথা ধরার আর দোষ কি? সারাদিন তিনি তাপহীন আগুন নিয়ে গবেষণা করেছেন। এখনো জিনিসটা তাঁর ধরাছোঁয়ার মধ্যে আসেনি। কিন্তু মনে হচ্ছে হবে, পৃথিবীতে-শুধু পৃথিবীতেই বা কেন–সারা বিশ্বজগতে একটা বিশাল বিপ্লব ঘটে যাবে তাহলে। অবশ্য তাপহীন আগুনে রান্না করা যাবে কিনা তা এখনো বলা যাচ্ছে না। তবে আলো জ্বলবে। যেমন জোনাকি পোকার আলো, যেমন বেড়ালের বা গরুর চোখের আলো, যেমন কিনা হাতঘড়ির ডায়ালের আলো। বৈজ্ঞানিক গয়েশ সেই সব আলো দেখেই তাপহীন আগুন আবিষ্কারের প্রেরণা পেয়েছেন। আবিষ্কৃত হলে সেই আগুনে অনেক কাণ্ড হবে। বাড়িতে আগুন লাগলেও বাড়ি পুড়বে না, সেই আগুন হাতে বা পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়ানো যাবে, তখন আগুন নিয়ে বাচ্চারাও খেলা করতে পারবে।

সাফল্যের খুব কাছাকাছি এসে গয়েশ খুবই উত্তেজিত। দীর্ঘদিন একটানা সাধনা করার পর খুব ক্লান্তও। তাই বিকেলের দিকে মাথা ধরা ছাড়ানোর জন্য তিনি গবেষণাগার থেকে বেরিয়ে এলেন একটু পায়চারি করার জন্য।

কিন্তু পৃথিবীটা বড় নোংরা। চারদিকে ধুলো, আবর্জনা, বদ গন্ধ, গণ্ডগোল, নাক কুঁচকে, চোখ বুজে, কানে আঙুল দিলেন তিনি। তারপর সোজা ছাদের গ্যারেজ ঘরে গিয়ে একটা মাঝারি রকেট বেছে নিয়ে তাতে উঠে বসলেন।

সোঁ করে চলে এলেন চাদে। এ জায়গাটায় এখনো তেমন ভীড়ভাট্টা নেই। বাতাসের অভাবে ধুলো-টুলো ওড়ে না, কোনো গন্ধও আসে না নাকে। তবে এখানেও হরেক রকম গবেষণাগার হয়েছে, বাড়িঘর তৈরি হচ্ছে, কৃত্রিম উপায়ে

বাতাস, মাধ্যাকর্ষণ ও আবহমণ্ডল তৈরির চেষ্টা চলছে। লজ্জার কথা, চাষবাসের জন্যও নাকি তোড়জোড় হচ্ছে। এমনকি বৈজ্ঞানিকরা চাঁদের অভ্যন্তরে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জমাট বরফ গলিয়ে নদী তৈরির চেষ্টাও করছেন। ফলে চাঁদের বিশুদ্ধতাও আর বেশিদিন থাকবে না।

মহাকাশচারীর পোশাকে গয়েশ সামন্ত তার রকেট থেকে বেরিয়ে এসে চাঁদের নির্জন এক মস্ত পাহাড়ের তলায় পায়চারি করতে লাগলেন। তাপহীন আগুনের চিন্তায় তার মাথা গরম।

পায়চারি করছেন, এমন সময় সামনে টুক করে একটা ঢিল পড়ল। পৃথিবীতে এরকম ঘটনা হামেশাই ঘটে। দুষ্টু ছেলের অভাব নেই সেখানে। কিন্তু চাঁদের এই নির্জন পাহাড়তলীতে ঢিল মারে কে! গয়েশ অবাক হয়ে চারদিকে দেখতে থাকেন। হঠাৎ নজরে পড়ল মাটি থেকে হাত বিশেক ওপরে একটা গামলার মতো বিচ্ছিরি চেহারার শূন্যযান থেকে বৈজ্ঞানিক হারাধন খাড়া উঁকি মেরে তাকে দেখছে এবং ফিক করে হাসছে। হারাধনকে দু চোখে দেখতে পারেন না গয়েশ।

হারাধন জলগ্রহ নেপচুনে হাইড্রোইলেকট্রিক প্ল্যান্ট বানিয়ে সেখান থেকে প্রজেকটারের সাহায্যে পৃথিবীতে অঢেল বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করেছে। খুব রবরবা তার।

গয়েশ বিরক্ত হলেও ভদ্রতার খাতিরে হারাধনের দিকে চেয়ে একটু হাসলেন।

হারাধন তার গামলাটা নামিয়ে আনল। মহাকাশচারীর বর্মের মতো পোশাক পরা অবস্থাতেও হারাধন তার ঘাড় চুলকোবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে গামলা থেকে মাটিতে নেমে এসে স্পিকিং টিউবের ভিতর দিয়ে বলল–কখন থেকে পোশাকের মধ্যে একটা ছারপোকা ঢুকে রয়েছে, জ্বালিয়ে খেলে।

গয়েশ তার কথা বলার যন্ত্রের ভিতর দিয়ে বললেন–স্পেশসুটে আজকাল বড্ড ছারপোকা হচ্ছে। আমাকেও প্রায়ই কামড়ায়। একজন মার্কিন সায়েন্টিস্ট সেদিন দুঃখ করে বলছিলেন তার একটা শখের স্পেশসুট নাকি উই পোকায় খেয়ে ফুটো করেছে, আর একটায় কঁকড়া বিছে বাসা বেঁধেছে, বোঝো কাণ্ড!

হারাধন একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে–শুধু তাই নয়, পোকাগুলোকে কিছুতেই মারাও যাচ্ছে না। সবচেয়ে কড়া পোকা মারার ওষুধ দিয়েও কাজ হচ্ছে না। ভারী

মুস্কিল।

পোকামাকড়ের কথা কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে আলোচনা করলেন দুজনে। তারপর হারাধন বলল–আজ বড় খাটুনি গেল গয়েশদা। নেপচুনে যন্ত্রপাতির কিছু গণ্ডগোল ছিল। সেই রাত বারোটা থেকে সারাদিন, এখনো হাতমুখ ধোয়ার সময় পাইনি।

গয়েশ আঁতকে উঠে বললেন–হাতমুখ কি চাঁদের জল দিয়ে ধোবে নাকি? সর্বনাশ, এখানকার জল কিন্তু ভীষণ ভারী, বিচ্ছিরি সব মিনারেল রয়েছে এই জলে।

হারাধন হেসে বলে–আরে না, আমি প্লটো থেকে হাতমুখ ধোয়ার বা স্নান করার জল আনি।

গয়েশ উদ্বিগ্ন হয়ে বলেন–খাও কোন জল?

–নেপচুন, ও ছাড়া অন্য জল সহ্যই হয় না। আমাশা হয়ে যায়।

গয়েশ ম্লান মুখে বলেন–আমারও। নেপচুনের জলে শুনেছি অনেক ট্রেস এলিমেন্ট আছে। আমার জন্য খানিকটা পাঠিয়ে দিও তো। পেটটা কয়েকদিন ধরেই বড় ভুটভাট করছে।

হারাধন ম্লান মুখে বলে, ভুটভাটের কথা আর বোলো না দাদা। আমিও ওই ভুটভাটের রুগী। তারা কিছুক্ষণ পেটের গোলমাল আর জলবায়ু নিয়ে কথা বললেন।

হারাধন হঠাৎ বললেন–আরে ভাল কথা, ইনজিনিয়ারদের সব মাইনে বাড়ল শুনেছো নাকি!

বিরস মুখে গয়েশ বলেন–শুনছি তো তাই।

–তো আমাদের সায়েন্টিস্টদের ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা হল না। তাহলে এবারও?

–কৈ আর হল!

–এ ভারী অন্যায় গয়েশদা। তোমাকে এই বলে রাখছি, সরকার যদি সায়েন্টিস্টদের সঙ্গে সমার মতো ব্যবহার করে তবে কিন্তু তারা ধর্মঘট করতে

বাধ্য হবে। এবার স্পেশ সায়েন্সের জন্য নোবেল প্রাইজ কাকে দিয়েছে জানো?

–না, গয়েশ খুব সতর্ক গলায় বলেন। আসলে তিনি শুনেছেন, ডিসেম্বর মাসের আগে যদি তিনি তাপহীন আগুন আবিষ্কার করতে পারেন তবে নোবেল প্রাইজ তাকেই দেওয়া হবে। মহাকাশযানে ব্যবহারের জন্য তাপহীন আগুনের বড়ই দরকার।

এবার তারা কিছুক্ষণ বেতন বৃদ্ধি এবং প্রাইজ নিয়ে কথাবার্তা চালালেন। তারপর হারাধন তাঁর গামলার মতো শূন্যযানে চড়ে চলে গেলেন হাত পা ধুয়ে বিশ্রাম নিতে।

চাঁদ থেকে আকাশের রঙ ঘোর কালো দেখায়। গয়েশ অন্যমনস্কভাবে আকাশের দিকে চেয়ে রইলেন। নিকশ কালো আকাশে প্রচণ্ড সেজে সূর্য জ্বলছে। আগুনকে তাপহীন করার পদ্ধতি যদি তিনি আবিষ্কার করতে পারেন তাহলে একদিন সূর্যের তাপকেও নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হবে না। ভ্র কুঁচকে এইসব ভাবতে ভাবতে আর অবিরল পায়চারী করতে করতে তার একটু খিদে পেল।

গয়েশের রকেটটা ঊর্ধ্বমুখ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রকেটের গায়ে চৌম্বক খিল দিয়ে একটা চমৎকার হালকা কাঁচতর শূন্যযান লাগানো। দেখতে অনেকটা পিরিচের মতো। গয়েশ পিরিচটা খুলে উঠে বসলেন। চোখের পলকে চাঁদের গবেষণাগারের কাছে লোকবসতির মধ্যে এসে নামলেন। ঢুকলেন মাটির তলার ক্যান্টিনে।

এখানে কৃত্রিম আবহমণ্ডল থাকায় স্পেশসুট খুলে ফেললেন গয়েশ। জল ছুঁলেন না, একটা রশ্মিযন্ত্রের কাছে গিয়ে সুইচ টিপে নানারকম রশ্মি দিয়ে হাত মুখ বীজাণুমুক্ত করলেন। তারপর মস্ত হলঘরে গিয়ে বসলেন। হলঘর একেবারে ফাঁকা। তবে প্রায় সিকি মাইল লম্বা হলের একেবারে শেষ প্রান্তে বুড়ো বৈজ্ঞানিক সাধন হাজরা বসে আপনমনে বিড়বিড় করছেন। ব্যর্থ ও উন্মাদ বৈজ্ঞানিকদের যে তালিকাটি গতবছর বেরিয়েছে। তাতে সাধনের নাম সবার ওপরে। লোকটা খুব সাংঘাতিক কিছু আবিষ্কার করার জন্য খুব গোপনে গবেষণা চালাচ্ছিল। আর সেই গবেষণা করতে করতেই কেমন যেন পাগলাটে আর একাচোরা স্বভাবের হয়ে গেল। পৃথিবীতে নিজের বাড়িতে আর যায় না। চাঁদের ক্যান্টিনেই সারাদিন বসে বসে সময় কাটিয়ে দেয়। তাকে কেউ ঘাঁটায় না।

গয়েশ বসতেই বেশ স্মার্ট চেহারার একটা রোবট বেয়ারা এসে টেবিলটা একটা ভ্যাকুয়াম যন্ত্রে পরিষ্কার করে দিয়ে বলল কী খাবেন?

গয়েশ বিস্বাদ মুখে ভাবতে লাগলেন। খিদে পেলেও তার মুখে রুচি নেই। কিছুই খেতে ইচ্ছে করে না, আবার সব কিছু পেটে সহ্যও হয় না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তিনি বললেন—মুড়ি আর ছাগলের দুধ।

রোবট চলে গেল। একা মস্ত হলঘরটায় বসে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিলেন গয়েশ। বড় ফাঁকা আর একা লাগছে। ওদিকে বহু দূরে বুড়ো বৈজ্ঞানিক সাধন হাজরা আপনমনে কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠছে। এক একবার সেদিকে তাকিয়ে দেখছেন গয়েশ।

হঠাৎ একবার চোখে চোখ পড়তেই সাধন হাজরা হাতছানি দিয়ে ডাকল গয়েশকে। একটু দোনোমোনো করে গয়েশ উঠলেন। ভাবলেন পাগল হোক ক্ষ্যাপা হোক একজন সঙ্গী তো বটে।

কাছে গিয়ে বসতেই সাধন গয়েশের কানে কানে বলল—কাল অবশেষে জিনিসটা আবিষ্কার করেছি।

গয়েশ বললেন—কী?

—একটা চশমা। এটার নাম হল ভৌত চশমা। বলে সাধন পকেট থেকে একটা চশমার খাপ বের করে চশমাটা খুলে টেবিলে রাখে। গয়েশ দেখলেন, চশমাটায় নানারকম ক্ষুদে যন্ত্রপাতি লাগানো। কাঁচটা গাঢ় কালো। সাধন ফিস ফিস করে বলল, দেখবে?

গয়েশ অবাক হয়ে বলেন—কি?

সাধন বলে—বহুদিন ধরেই টের পাচ্ছি যে তেনারা আছেন। কিন্তু পৃথিবীর মানুষ যত সব বৈজ্ঞানিকদের পাল্লায় পড়ে কিছুতেই ব্যাপারটা বিশ্বাস করতে চাইত না। তখনই ঠিক করেছিলুম, যেমন করে তোক একটা এমন যন্তর বের করতে হবে যা দিয়ে তেনাদের চাক্ষুষ দেখা যায়। তখন তো আর অবিশ্বাস করতে পারবে না! এতদিনে বের করেছি। দেখবে।

গয়েশ ব্যাপারটা ভাল করে বুঝবার আগেই হঠাৎ সাধন চশমাটা তুলে খপ করে পরিয়ে দেয় গয়েশকে। চশমাটাও এমন ব্যাদড়া যে চোখে বসে যেন আঠা হয়ে লেগে গেল।

প্রথমটায় গয়েশ কিছুই দেখতে পেলেন না অন্ধকার ছাড়া। তারপর দেখেন তার চারধারে হলঘরটা যেন একটা কালচে আলোয় ভরে উঠল। কিংবা ঠিক আলোও নয়, অনেকটা এক্স-রে-র মতো যেন দেখা যাচ্ছে সব কিছু দেখতে দেখতে হঠাৎ ভীষণ আঁতকে ওঠেন গয়েশ। এ কী? ফাঁকা হলঘরটা যে লোকে ভর্তি! শুধু ভর্তি নয়, একেবারে গিজগিজ করছে ঠাসাঠাসি সব মানুষ! শুধু মেঝেতে নয়, শূন্যে একেবারে সিলিং পর্যন্ত একের ঘাড়ে আর একজন চেপে বসে আছে। তারা ভাসছে ঘুরছে, হাঁটছে, হাসছে, হচছে, কথা কইছে, দেয়াল ফুঁড়ে খুশিমতো বেরিয়ে যাচ্ছে, আবার ঢুকছে।

গয়েশ চেঁচিয়ে উঠলেন–এ কী! এরা কারা?

কানের কাছে সাধন ফিস ফিস করে বলল–তেনারা। এখন বিশ্বাস হল তো! বড় যে ভূতে বিশ্বাস করতে না?

–ভূ–? বলে কোনোক্রমে অজ্ঞান হতে হতে নিজেকে সামলে নিলেন গয়েশ। চশমাটা এক হঁচকা টানে খুলে লাফিয়ে উঠে প্রাণপণে ছুটলেন হলঘরের দরজার দিকে। কোনোক্রমে স্পেশসুটটা পরে নিয়েই ঝাঁপিয়ে পড়লেন বাইরে। পিরিচে উঠে বিদ্যুৎবেগে চালিয়ে দিলেন সেটা রকেটের দিকে। আর সারাক্ষণ বড় বড় চোখ চেয়ে বিল গলায় বলতে লাগলেন–ভূ…ভূ…ভূ…ভূ…

# মাঝি

**মাঝি**

জয়চাঁদ বিকেলের দিকে খবর পেল, তার মেয়ে কমলির বড় অসুখ, সে যেন আজই একবার গাঁয়ের বাড়িতে যায়।

খবরটা এনেছিল দিনু মণ্ডল, তার গাঁয়েরই লোক।

জয়চাঁদ তাড়াতাড়ি বড় সাহেবকে বলে ছুটি নিয়ে নিল। বুকটা বড় দুরদুর করছে। তার ওই একটিই মেয়ে, বড় আদরের। মাত্র পাঁচ বছর বয়স। অসুখ হলে তাদের গাঁয়ে বড় বিপদের কথা। সেখানে ডাক্তার বদ্যি নেই, ওষুধপত্র পাওয়া যায় না। ওষুধ বলতে কিছু পাওয়া যায় মুদির দোকানে, তা মুদিই রোগের লক্ষণ শুনে ওষুধ দেয়। তাতেই যা হওয়ার হয়। কাজেই জয়চাঁদের খুব দুশ্চিন্তা হচ্ছিল।

দুশ্চিন্তার আরও কারণ হলো, আজ সকাল থেকে দুর্যোগ চলছে। যেমন বাতাস তেমনি বৃষ্টি। এই দুর্যোগের দিনে সুন্দরবনের গাঁয়ে পৌঁছোনো খুবই কঠিন ব্যাপার।

দিনু মণ্ডল বলল, পৌঁছতে পারবে না বলে ধরেই নাও। তবে বাস ধরে যদি ধামাখালি অবধি যাওয়া যায় তাহলে খানিকটা এগিয়ে থাকা হলো। সকালবেলায় নদী পেরিয়ে বেলাবেলি গায়ে পৌঁছোনো যাবে।

জয়চাঁদ মাথা নেড়ে বলল, নাঃ, আজই পৌঁছোনোর চেষ্টা করতে হবে। মেয়েটা আমার পথ চেয়ে আছে।

জয়চাঁদ আর দিনু মণ্ডল দুর্যোগ মাথায় করেই বেরিয়ে পড়ল। যাওয়ার পথে একজন ডাক্তারবাবুর চেম্বারে ঢুকে মেয়ের রোগের লক্ষণ বলে কিছু ওষুধও নিয়ে

নিল জয়চাঁদ। এরপর ভগবান ভরসা।

বৃষ্টির মধ্যেই বাস ধরল তারা। তবে এই বৃষ্টিতে গাড়ি মোটে চলতেই চায় না। দু পা গিয়েই থামে। ইঞ্জিনে জল ঢুকে গাড়ি বন্ধ হয়ে যায় বারবার। যত এসব হয় ততই জয়চাঁদ ধৈর্য হারিয়ে ছটফট করতে থাকে।

যে গাড়ি বিকেল পাঁচটায় ধামাখালি পৌঁছোনোর কথা তা পৌঁছোতে পৌঁছোতে রাত নটা বেজে গেল। ঝড়-বৃষ্টি আরও বেড়েছে। ঘাটের দিকে কোনও লোকজনই নেই। তবু ছাতা মাথায় ভিজতে ভিজতে দুজনে ঘাটে এসে দেখল, নৌকো বা ভটভটির নাম-গন্ধ নেই। নদীতে বড় বড় সাঙ্ঘাতিক ঢেউ উঠছে। বাতাসের বেগও প্রচণ্ড। উন্মাদ ছাড়া এই আবহাওয়ায় কেউ নদী পেরোবার কথা কল্পনাও করবে না এখন।

দিনু মণ্ডল বলল, চলো ভায়া, বাজারের কাছে আমার পিসতুতো ভাই থাকে, তার বাড়িতেই আজ রাতটা কাটাই গিয়ে।

জয়চাঁদ রাজি হলো না। বলল, তুমি যাও দিনুদাদা, আমি একটু দেখি, যদি কিছু পাওয়া যায়।

পাগল নাকি? আজ নৌকো ছাড়লে উপায় আছে? তিন হাত যেতে যেতে নৌকো উল্টে তলিয়ে যাবে।

জয়চাঁদ হতাশ গলায় বলল, ঠিক আছে। তুমি তোমার ভাইয়ের বাড়িতে জিরোও গিয়ে। আমি যদি উপায় করতে না পারি তাহলে একটু বাদে আমিও যাচ্ছি।

দিনু মণ্ডল ফিরে গেল। জয়চাঁদ দাঁড়িয়ে রইল ঘাটে। ছাতা হাওয়ায় উল্টে গেছে অনেকক্ষণ। ঘাটে কোনও মাথা গোঁজার জায়গাও তেমন নেই। জয়চাঁদ বৃষ্টি-বাতাস উপেক্ষা করে ঘাটে বসে ভিজতে লাগল । মেয়ের কথা ভেবে কদলও খানিক। কে জানে কেমন আছে মেয়েটা। ভগবানই ভরসা।

কতক্ষণ কেটেছে তা বলতে পারবে না জয়চাঁদ। সময়ের হিসেব তার মাথা থেকে উড়ে গেছে। বসে আছে তো বসেই আছে। ঝড়-বৃষ্টি একসময়ে প্রচণ্ড বেড়ে উঠল। এমন সাঙ্ঘাতিক যে জয়চাঁদ দুবার বাতাসের ধাক্কায় পড়ে গেল। জলে কাদায় মাখামাখি হলো সর্বাঙ্গ।

সামনে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার নদী। নদীতে শুধু পাঁচ সাত হাত বড় বড় ঢেউ উঠছে। সত্যিই এই নদীতে দিশি নৌকো বা ভটভটি চলা অসম্ভব। জয়চাঁদ তবু যে বসে আছে তার কারণ, এই নদীর ওপাশে পৌঁছোলে আরও পাঁচ সাত মাইল দূরে তার গা। এখান থেকে সে যেন গাঁয়ের গন্ধ পাচ্ছে, মেয়েকে অনুভব করতে পারছে।

গভীরভাবে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ একটু চমকে উঠল জয়চাঁদ। ভুল দেখল নাকি? অন্ধকারে নদীর সাদাটে বুকে ঢেউয়ের মাথায় একটা ডিঙি নৌকো নেচে উঠল না? চোখ রগড়ে জয়চাঁদ ভাল করে চেয়ে দেখল। দুটো ঢেউ তীরে আছড়ে পড়ার পর এবার সে সত্যিই দেখল, একটা ঢেউয়ের মাথায় ছোট্ট একটু ডিঙি নৌকো ভেসে উঠেই আবার তলিয়ে গেল। এ দুর্যোগে কেউ ডিঙি বাইবে এটা অসম্ভব। তবে এমন হতে পারে, ডিঙিটা কোনও ঘাটে বাঁধা ছিল, ঝড়ে দড়ি ছিঁড়ে বেওয়ারিশ হয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ জয়াদের মাথায় একটা পাগলামি এল। সে একসময় ভালই নৌকো বাইত। ডিঙিটা ধরে একবার চেষ্টা করবে? পারবে না ঠিক কথা, কিন্তু এভাবে বসে থাকারও মানে হয় না। ডিঙি নৌকো সহজে ডোবে না। একবার ভেসে পড়তে পারলে কে জানে কী হয়।

জয়চাঁদ তার ঝোলা ব্যাগটা ভাল করে কোমরে বেঁধে নিল। তারপর ঘাটে নেমে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ডিঙিটা একটা গোঁত্তা খেয়ে নাগালের মধ্যেই চলে এসেছে প্রায়। জয়চাঁদ ঢেউয়ের ধাক্কায় পিছিয়ে এবং ফের এগিয়ে কোনওরকমে ডিঙিটার কানা ধরে ফেলল। এই ঝড়-জলের সঙ্গে যুদ্ধ করে ডিঙি ধরে রাখা মুশকিল। জয়চাঁদ ডিঙিটাকে টেনে আনল পাড়ে। তারপর অন্ধকার হয়ে যাওয়া চোখে যা দেখল তাতে তার চোখ চড়কগাছ। নৌকোর খোলের মধ্যে জলে একটা লোক পড়ে আছে। সম্ভবত বেঁচে নেই।

জয়চাঁদ বড় দুঃখ পেল। লোকটা বোধহয় পেটের দায়েই মাছ-টাছ ধরতে এই ঝড়-জলে বেরিয়েছিল। প্রাণটা গেল। জয়চাঁদ নৌকোটা ঘাটের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে লোকটাকে পাঁজাকোলে তুলে এনে ঘাটের পাথরে উপুড় করে শোয়াল। প্রাণ থাক বা না থাক, বাঁচানোর একটা চেষ্টা তো করা দরকার। সে লোকটার পিঠ বরাবর ঘন ঘন চাপ দিতে লাগল। যাতে পেটের জল বেরিয়ে যায়। সে হাতড়ে হাতড়ে বুঝতে পারল, লোকটা বেশ রোগা, জরাজীর্ণ চেহারা। বোধহয় বুড়ো মানুষ।

খানিকক্ষণ চেষ্টার পর যখন জয়চাঁদ হাল ছেড়ে দিতে যাচ্ছিল তখন লোকটার গলা দিয়ে একটা অস্ফুট আওয়াজ বেরিয়ে এল। উঃ বা আঃ গোছের। জয়চাঁদ দ্বিগুণ উৎসাহে লোকটাকে কিছুক্ষণ দলাই মলাই করল। প্রায় আধঘণ্টা পর লোকটার চেতনা ফিরে এল যেন।

লোকটা বলল, কে বটে তুমি?

আমাকে চিনবেন না। গাঙ পেরোবার জন্য দাঁড়িয়েছিলুম, হঠাৎ আপনার ডিঙিটা চোখে পড়ল।

লোকটা উঠে বসল। ঝড়ের বেগটা একটু কমেছে। বৃষ্টির তোড়টাও যেন আগের মতো নয়। লোকটা কোমর থেকে গামছা খুলে চোখ চেপে কিছুক্ষণ বসে থেকে বলল, ওঃ, বড় ফাড়াগেল আজ। প্রাণে যে বেঁচে আছি সেই ঢের। তা তুমি যাবে কোথা?

জয়চাঁদ হতাশ গলায় বলল, যাবো ক্যাওটা গাঁয়ে। ওপার থেকে পাঁচ সাত মাইল পথ। মেয়েটার বড্ড অসুখ, খবর পেয়েই যাচ্ছিলুম। তা

সে আর হয়ে উঠল না দেখছি।

লোকটা বলল, হুঁ। কেমন অসুখ?

ভেদবমি হয়েছে শুনেছি। কলেরা কিনা কে জানে। গিয়ে জ্যান্ত দেখতে পাবো কিনা বুঝতে পারছি না।

লোকটা বলল, মেয়েকে বড্ড ভালবাসো, না?

তা বাসি। বড়ই বাসি। মেয়েটাও বড্ড বাবা-বাবা করে।

লোকটা হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, চলো তাহলে।

জয়চাঁদ অবাক হয়ে বলল, কোথায়?

তোমাকে পৌঁছে দিই।

ক্ষেপেছেন নাকি? কোনও রকমে প্রাণে বেঁচেছেন, এখন নৌকো বাইতে গেলে মারা যাবেন নির্ঘাৎ! আমার মেয়ের যা হওয়ার তা হয়েই গেছে। আর এই দুর্যোগে নদী পেরোনো সম্ভবও নয়।

রোগা লোকটা গামছাটা কোমরে বেঁধে নিয়ে বলল, ওহে, বাঁচা-মরা তো আছেই, সে কি আমাদের হাতে? আমাদের হাতে যা আছে তা হলো, চেষ্টা। চলো, নৌকোয় উঠে পড়ো, তারপর ভগবান যা করেন।

লোকটার গলার স্বরে কী ছিল কে জানে, জয়চাঁদ উঠে পড়ল।

বুড়ো লোকটা নৌকোর খোল থেকে একটা বৈঠা তুলে নিয়ে গলুইয়ে বসল। অন্য প্রান্তে জয়চাঁদ। উত্তাল ঢেউয়ে নৌকোটা ঠেলে দিয়ে লোকটা বৈঠা মারতে লাগল।

ডিঙিটা একটা ঢেউয়ের মাথায় উঠে পরমুহূর্তেই জলের উপত্যকায় নেমে যাচ্ছিল। আবার উঠল, আবার নামল। ওঠা আর নামা। মাঝ দরিয়ায় প্রচণ্ড তুফানে উত্তাল ঢেউয়ে ডিঙিটা যেন ওলট-পালট খেতে লাগল। কিন্তু জয়চাঁদ দুহাতে শক্ত করে নৌকোর দুটো ধার চেপে ধরে অবাক চোখে দেখল, জীর্ণ বৃদ্ধ মানুষটা যেন শাল খুঁটির মতো দাঁড়িয়ে। হাতের বৈঠা যেন জলকে তোলপাড় করে সব বাধা ভেঙে নৌকোটাকে তীর গতিতে নিয়ে চলেছে।

একটা বিশাল দোতলা সমান ঢেউ তেড়ে আসছিল বাঁ দিক থেকে। জয়চাঁদ সেই করাল ঢেউয়ের চেহারা দেখে চোখ বুজে ফেলেছিল।

কে যেন চেঁচিয়ে বলল, জয়চাঁদ, ভয় পেও না।

অবাক হয়ে জয়চাঁদ ভাবল, আমার নাম তো এর জানার কথা নয়!

ঢেউয়ের পর ঢেউ পার হয়ে এক সময়ে নৌকোটা ঘাটে এসে লাগল। লোকটা লাফ দিয়ে নেমে ডিঙিটাকে ঘাটের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে ফেলে বলল, এ ঘাট চেনো জয়চাঁদ?

জয়চাঁদ অবাক হয়ে অন্ধকারে একটা মস্ত বটগাছের দিকে চেয়ে বলল, কী আশ্চর্য! এ তো আনন্দপুরের ঘাট। এ ঘাট তো আমার গাঁয়ের লাগোয়া! এখানে এত তাড়াতাড়ি কী করে এলাম? নৌকোয় আনন্দপুর আসতে তো সাত আট ঘণ্টা সময় লাগে।

ঝড়ের দৌলতে আসা গেছে বাবু।

জয়চাঁদ মাথা নেড়ে বলল, না। ঝড় তত উল্টোদিকে বইছে।

যাহোক, পৌঁছে তো গেছ।

জয়চাঁদ একটু দ্বিধায় পড়ে হঠাৎ বলল, আপনি কে?

আমি! আমি তো একজন মাঝি। তোমার দয়ায় প্রাণ ফিরে পেয়েছি।

জয়াদের চোখে জল এল। মাথা নেড়ে বলল, আপনাকে প্রাণ ফিরে দিতে পারি তেমন ক্ষমতা আমার নেই। আপনি আসলে কে?

বাড়ি যাও জয়চাঁদ। মেয়েটা তোমার পথ চেয়ে আছে।

জয়চাঁদ চোখের জল মুছে পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে যেতেই লোকটা পা সরিয়ে নিয়ে বলল, করো কি জয়চাঁদ, করো কি?

বাড়ি যাও জয়চাঁদ।

গিয়ে?

মেয়ের কাছে যাও। সে ভাল আছে। অসুখ সেরে গেছে।

জানি মাঝি, আপনি যাকে রক্ষা করেন তাকে মারে কে?

বুড়ো মাঝি একটু হাসল। তারপর উত্তাল ঝড়ের মধ্যে বিশাল গাঙে তার ছোট ডিঙিটা নিয়ে কোথায় চলে গেল কে জানে।

# রাজার মন ভাল নেই

**রাজার মন ভাল নেই**

রাজার মন আর কিছুতেই ভাল যাচ্ছে না। মন ভাল করতে লোকেরা কম মেহনত করেনি। রাজাকে গান শোনানো হয়েছে, নাচ দেখানো হয়েছে, বিদূষক এসে হাজার রকমের ভাড়ামি করেছে, যাত্রা, নাটক, মেলা-মচ্ছর, যাগ-যজ্ঞ, পূজো-পাঠ সব হল। পুবের রাজ্য থেকে আনারস, উত্তরের হিমরাজ্য থেকে আপেল, পশ্চিম থেকে আখরোট, আঙুর, পেস্তা বাদাম, দেশ-বিদেশ থেকে ক্ষীর আর ছানার মিষ্টি এনে খাওয়ানো হয়েছে। এখন সাহেব আর চীনে রসুইকররা দু'বেলা হরেক খাবার বানাচ্ছে। রাজা দেখছেন, শুনছেন, খাচ্ছেন, কিন্তু তবু ঘণ্টায় ঘণ্টায় বুক কাঁপিয়ে হুহুংকারে এক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলছেন। "না হে, মনটা ভাল নেই।"

রাজবৈদ্য এসে সারাদিন বসে নাড়ি টিপে চোখ বুজে থাকেন। নাড়ি কখনও তেজি, কখনও মহা, কখনও মোটা, কখনও সরু। রাজবৈদ্য আপনমনে হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁ করেন, তারপর শতেক রকম শেকড় বাকড় পাতা বেটে ওষুধ তৈরি করে শতেক অনুপান দিয়ে রাজাকে খাওয়ান। রাজা খেয়ে যান। তারপর হড়াস করে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে যায়। "না হে, মনটা ভাল নেই।"

রাজার মন ভাল করতে রাজপুত্তুর আর সেনাপতিরা আশপাশের গোটা দশেক রাজ্য জয় করে হেরো রাজাগুলোকে বন্দী করে নিয়ে এল। রাজা তাকিয়ে দেখলেন। তারপরই অজান্তে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন একটা। 'মনটা বড় খারাপ রে।"

তখন মন্ত্রীমশাই রাজার তীর্থযাত্রা আর দেশভ্রমণের ব্যবস্থা করলেন। লোকলস্কর পাইক-পেয়াদা নিয়ে রাজা শ'দেড়েক তীর্থ আর দেশ-দেশান্তর ঘুরে এসে হাতমুখ ধুয়ে সিংহাসনে বসেই বললেন, "হায় হায়! মনটা একদম ভাল নেই।"

ওদিকে ভঁড়ামি করে করে রাজার বিদূষক হেদিয়ে পড়ায় চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। রাজনর্তকীর পায়ে বাত। সভাগায়কের গলা বসে গেছে। বাদ্যকরদের হাতে ব্যথা। রসুইকররা ছুটি চাইছে। রাজবৈদ্যকে ধরেছে ভীমরতি। সেনাপতি সন্ন্যাস নিয়েছেন। মন্ত্রীমশাইয়ের মাথায় একটু গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে বলে তার স্ত্রী সন্দেহ করছেন। রাজপুরোহিত হোম যজ্ঞের এত ঘি পুড়িয়েছেন যে এখন ঘিয়ের গন্ধ নাকে গেলে তার মূর্ছা হয়। প্রজাদের মধ্যে কিছু অরাজকতা দেখা যাচ্ছে। সভাপণ্ডিতরা রাজার মন খারাপের কারণ নিয়ে দিনরাত গবেষণা করছেন। রাজজ্যোতিষী রাজার জন্মকুণ্ডলী বিচার করতে করতে, আঁক কষে-কষে দিস্তা দিস্তা কাগজ ভরিয়ে ফেলছেন।

একদিন বিকেলে রাজা মুখখানা শুকনো করে রাজবাড়ির বিশাল ফুল বাগিচায় বসে আছেন। চারদিকে হাজারো রকমের ফুলের বন্যা, রঙে গন্ধে ছয়লাপ। মৌমাছি গুনগুন করছে, পাখিরা মধুর স্বরে ডাকছে। সামনের বিশাল সুন্দর দীঘিতে মৃদুমন্দ বাতাসে ঢেউ খেলছে, রাজহাঁস চরে বেড়াচ্ছে।

রাজা চুপচাপ বসে বসে থেকে হঠাৎ সিংহ গর্জনে বলে উঠলেন, "গর্দান চাই।"

মন্ত্রী পাশেই ছিলেন, আপনমনে বিড়বিড় করছিলেন, মাথা খারাপের লক্ষণ। রাজার হুংকারে চমকে উঠে বললেন, "কার গর্দান মহারাজ?"

রাজা লজ্জা পেয়ে বলেন, "দাঁড়াও, একটু ভেবে দেখি। হঠাৎ মনে হল কার যেন গর্দান নেওয়া দরকার।"

মন্ত্রী বললেন, "ভাবুন মহারাজ, আর একটু কষে ভাবুন। মনে পড়লেই গর্দান এনে হাজির করব।"

বহুকালের মধ্যেও রাজা কিছুই মুখ ফুটে চাননি। হঠাৎ এই গর্দান চাওয়ায় মন্ত্রীর আশা হল, এবার রাজার মনোমতো একটা গর্দান দিলে বোধহয় মন ভাল হবে। রাজ্যে গর্দান খুবই সহজলভ্য।

পরদিন সকালে রাজসভায় কাজ শেষ হওয়ার পর রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'না হে, গর্দান নয়। গর্দান চাই না। অন্য কী একটা যেন চেয়েছিলাম, এখন আর মনে পড়ছে না।"

বিকেলবেলা রাজা প্রাসাদের বিশাল ছাদে পায়চারি করছিলেন। সঙ্গে রাজকীয় কুকুর, তাম্বূলদার, হুক্কাদার, মন্ত্রী! পায়চারি করতে করতে রাজা হঠাৎ নদীর ওপারের গ্রামের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "বুড়ির ঘরে আগুন দে! দে আগুন বুড়ির ঘরে।"

মন্ত্রীর বিড়বিড় করা থেমে গেল। রাজার সুমুখে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে বললেন, "যে হুকুম মহারাজ। শুধু বুড়ির নামটা বলুন।"

রাজা অবাক হয়ে বললেন, "কী বললাম বলো তো?"

"আজ্ঞে, এই যে বুড়ীর ঘরে আগুন দিতে বললেন।" রাজা ঘাড় চুলকে বললেন, "বলেছি নাকি? আচ্ছা, একটু ভেবে দেখি।"

সেইদিনই শেষ রাতে রাজা ঘুমের মধ্যে চেঁচিয়ে বললেন, "বিছুটি লাগা। শিগগির বিছুটি লাগা।"

পরদিনই খবর রটে গেল, রাজা বিছুটি লাগাতে বলেছেন। আতঙ্কে সবাই অস্থির।

মন্ত্রী রাজার কানে কানে জিজ্ঞেস করলেন, "মহারাজ! কাকে বিছুটি লাগাতে হবে তার নামটা একবার বলুন, বিছুটি আনতে পশ্চিমের পাহাড়ে লোক পাঠিয়েছি।"

"বিছুটি!" বলে রাজা অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে ভাবতে লাগলেন।

পশ্চিমের পাহাড়ের গায়ে সূর্য ঢলে পড়ল। গরুর গাড়ি বোঝাই বিছুটি এনে রাজবাড়ির সামনের অঙ্গনে জমা করা হয়েছে। রাজার সেদিকে মন নেই।

রাজা রঘরে বসে বয়স্যদের সঙ্গে ঘুঁটি সাজিয়ে দাবা খেলছেন। মুখ গম্ভীর, চোখে অন্যমনস্ক একটা ভাব। বয়স্যরা ভয়ে ভয়ে ভুল চাল দিয়ে রাজাকে জিতবার সুবিধে করে দিচ্ছেন। কিন্তু রাজা দিচ্ছেন আরও মারাত্মক ভুল চাল।

খেলতে খেলতে রাজা একবার গড়গড়ার নলে মৃদু একটা টান দিয়ে বললেন, "পুঁতে ফেললে কেমন হয়?"

মন্ত্রী কাছেই ছিলেন। বিড়বিড় করা থামিয়ে বিগলিত হয়ে বললেন, "খুব ভাল হয় মহারাজ। শুধু একবার হুকুম করুন।"

রাজা আকাশ থেকে পড়ে বললেন, “কিসের ভাল হয়? কিছুতেই ভাল হবে না মন্ত্রী। মনটা একদম খারাপ।”

মন্ত্রী বিমর্ষ হয়ে আবার বিড়বিড় করতে লাগলেন।

পরদিন রাজা শিকারে গেলেন। সঙ্গে বিস্তর লোকলস্কর, অস্ত্রশস্ত্র, ঘোড়া, রথ। বনের মধ্যে রাজার শিকারের সুবিধের জন্যই হরিণ, খরগোশ, পাখি ইত্যাদি বেঁধে বিভিন্ন জায়গায় রাখা হয়েছে। একটা বাঘও আছে। রাজা ঘোড়ার পিঠে বসে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে ঘুরে দেখলেন, কিন্তু একটাও তীর ছুঁড়লেন না। দুপুরে বনভোজনে বসে পোলাও দিয়ে মাংসের ঝোল মেখে খেতে খেতে বলে উঠলেন, “বাপ রে! ভীষণ ভূত!”

মন্ত্রীমশাই সঙ্গে সঙ্গে মাংসের হাত মাথায় মুছে উঠে পড়লেন। রাজামশাইয়ের সামনে এসে বললেন, “তাই বলুন মহারাজ! ভূত! তা তারই বা ভাবনা কী? ভূতের রোজাকে ধরে আনাচ্ছি, রাজ্যে যত ভূত আছে ধরে ধরে সব শুলে দেওয়া হবে।”

রাজা হাঁ করে রইলেন। বললেন, “ভূত! না না ভূত নয়। ভূত হবে কী করে? ভূতের কি কখনো মাথা ধরে?”

মন্ত্রীমশাই আশার আলো দেখতে পেয়ে বিগলিত হয়ে বললেন, “মাথা ধরলেও ভূতবদ্যি আছে। তারা ভূতের ওষুধ জানে।”

রাজা গম্ভীর হয়ে বললেন, “আমি ভূতের কথা ভাবছি না। মনটা বড় খারাপ।”

কয়েকদিন পর রাজা এক জ্যোৎস্না রাতে অন্দর মহলের অলিন্দে রানীর পাশাপাশি বসে ছিলেন। হঠাৎ বললেন, “চলো রানী, চাঁদের আলোয় বসে পান্তাভাত খাই।”

রানী তো প্রথমে অবাক। তারপর তাড়াতাড়ি মন্ত্রীকে ডেকে পাঠালেন। মন্ত্রী এসে হাতজোড় করে বললেন, “তা এ আর বেশি কথা কী? ওরে, তোরা সব পান্তাভাতের জোগাড় কর।”

রাজা অবাক হয়ে বললেন, “পান্তাভাত? পান্তাভাতটা কী জিনিস বলো তো?”

“জলে ভেজানো ভাত মহারাজ, গরিবরা খায়। কিন্তু আপনি নিজেই তো পান্তাভাতের কথা বললেন।”

“বলেছি! তা হবে। কখন যে কী বলি। মনটা ভাল নেই তো, তাই।” মন্ত্রীমশাই ফিরে গেলেন। তবে সেই রাত্রেই তিনি রাজ্যের সবচেয়ে সেরা বাছা বাছা চারজন গুপ্তচরকে ডেকে বললেন, “ওরে তোরা আজ পালা করে রাজামশাইয়ের ওপর নজর রাখবি। চব্বিশ ঘণ্টা।”

পরদিনই এক গুপ্তচর এসে খবর দিল, “রাজামশাই ভোর রাত্রে বিছানা থেকে নেমে অনেকক্ষণ হামা দিয়েছেন ঘরের মেঝেয়।”

আর একজন বলল, “রাজামশাই একা একাই লাল জামা নেব, লাল জামা নেব, বলে খুকখুক করে কাঁদছেন।”

আর একজন এসে খবর দিল, “রাজামশাই এক দাসীর বাচ্চা ছেলের হাত থেকে একটা মণ্ডা কেড়ে নিজেই খেয়ে ফেললেন এই মাত্র।”

চতুর্থ জন বলল, “আমি অতশত জানি না, শুধু শুনলাম রাজামশাই খুব ঘন ঘন ঢেঁকুর তুলছেন আর বলছেন–সবই তো হল, আর কেন?”

মন্ত্রীর মাথা আরও গরম হল। তবু বললেন, “ঠিক আছে, নজর রেখে যা।”

পরদিনই প্রথম গুপ্তচর এসে বলল, “আজ্ঞে রাজামশাই আমাকে ধরে ফেলেছেন। রাত্রে শোওয়ার ঘরের জানালা দিয়ে যেই উঁকি দিয়েছি, দেখি রাজামশাই আমার দিকেই চেয়ে আছেন। দেখে বললেন, নজর রাখছিস? রাখ’ বলে চোখ বুজে শুয়ে পড়লেন।”

দ্বিতীয় জন এসে বললে, “আজ্ঞে আমি ছিলাম রাজার খাটের তলায়। মাঝরাতে রাজামশাই হামাগুড়ি দিয়ে এসে আমাকে বললেন, কানে কেন্নো ঢুকবে, বেরিয়ে আয়।”

তৃতীয় জন কান চুলকে লাজুক লাজুক ভাব করে বলল, “আজ্ঞে আমি রাজার কুঞ্জবনে রাজার ভূঁইমালী সেজে গাছ ছাঁটছিলাম। রাজা ডেকে খুব আদরের গলায় বললেন, ‘ওরে, ভাল গুপ্তচর হতে গেলে সব কাজ শিখতে হয়। ওভাবে

কেউ গাছ ছাঁটে নাকি? আয় তোকে শিখিয়ে দিই। বলে রাজা নিজেই গাছ ঘেঁটে দেখিয়ে দিলেন।"

কিন্তু সবচেয়ে তুখোড় যে গুপ্তচর সেই রাখহরি তখনও এসে পৌঁছয়নি। মন্ত্রী একটু চিন্তায় পড়লেন।

ওদিকে রাখহরি কিন্তু বেশি কলাকৌশল করতে যায়নি। সকালবেলা রাজার শোওয়ার ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল। রাজা বেরোতেই প্রণাম করে বলল, "মহারাজ, আমি গুপ্তচর রাখহরি আপনার ওপর নজর রাখছি।"

রাজা অবাক হলেও স্মিত হাসলেন। হাই তুলে বললেন, "বেশ বেশ, মন দিয়ে কাজ করো।"

তারপর রাজা যেখানে যান পেছনে রাখহরি ফিঙের মতো লেগে থাকে।

দুপুর পর্যন্ত বেশ কাটল। দুপুরে খাওয়ার পর পান চিবোতে চিবোতে রাজা হঠাৎ বললেন, "চিমটি দে। রাম চিমটি দে।"

সঙ্গে সঙ্গে রাখহরি পেটে এক বিশাল চিমটি বসিয়ে দিল। রাজা আঁক করে উঠে বললেন, "করিস কী, করিস কী? ওরে বাবা!"

রাখহরি বলল, "বললেন যে।" পেটে হাত বোলাতে বোলাতে রাজা কিন্তু হাসলেন। আবার দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। রাজা বাগানে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ বলে উঠলেন "ল্যাঙ মেরে ফেলে দে।" বলতে না বলতেই রাখহরি ল্যাঙ মারল। রাজা চিতপটাং হয়ে পড়ে চোখ পিটপিট করতে লাগলেন। রাখহরি রাজার গায়ের ধূলোটুলো ঝেড়ে দাঁড় করিয়ে রাজার পায়ের ধূলো নিল। রাজা শাস ফেলে বললেন, "স্থ।"

রাত পর্যন্ত রাজা আর কোনও ঝামেলা করলেন না। রাখহরি রাজার পিছু-পিছু শোওয়ার ঘরে ঢুকল এবং রাজার সামনেই একটা আলমারির ধারে লুকিয়ে রইল। রাজা আড়চোখে দেখে একটু হাসলেন। আপত্তি করলেন না। তবে শোওয়ার কিছুক্ষণ পরেই রাজা হঠাৎ খুঁতখুঁত করে বলে উঠলেন, "ঠাণ্ডা জলে চান করব, ঠাণ্ডা জলে"...রাখহরি বিদ্যুৎগতিতে রাজার ঘরের সোনার কলসের কেওড়া আর গোলাপের সুগন্ধ মেশানো জলটা সবটুকু রাজার গায়ে ঢেলে দিল।

রাজা চমকে হেঁচে কেসে উঠে বসলেন। কিন্তু খুব অসন্তুষ্ট হয়েছেন বলে মনে হল না। রাখহরির দিকে চেয়ে একটু হেসে বললেন, “আচ্ছা শুগে যা।”

রাখহরি অবশ্য শুতে গেল না। পাহারায় রইল।

সকালে উঠে রাজা হাই তুলে হঠাৎ বলে উঠলেন, “দে, বুকে ছোরা বসিয়ে দে”..চকিতে রাখহরি কোমরের ছোরাখানা খুলে রাজার বুকে ধরল।

ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে রাজা বললেন, “থাক, থাক্, ওতেই হবে। তোর কথা আমার মনে ছিল না।”

রাখহরি ছোরাটা খাপে ভরতেই রাজা হোঃ হোঃ করে হাসতে লাগলেন। সে এমন হাসি যে রাজবাড়ির সব লোকজন ছুটে এল। রাজা হাসতে হাসতে দু’হাতে পেট চেপে ধরে বললেন, “ওরে আমার যে ভীষণ আনন্দ হচ্ছে! ভীষণ হাসি পাচ্ছে।”

খবর পেয়ে মন্ত্রীও এসেছেন। রাজার বুকে-পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, ‘যাক্ বাবা! মন খারাপটা গেছে তাহলে।”

হাসতে হাসতে রাজা বিষম খেয়ে বললেন, “ওঃ হোঃ হোঃ! কী আনন্দ! কী আনন্দ!”

তারপর থেকে রাজার মন খারাপ কেটে গেল। কিন্তু নতুন একটা সমস্যা দেখা গেল আবার। কারণ নেই কিছু নেই রাজা সব সময়ে কেবল ফিক-ফিক করে হেসে ফেলছেন। খুব দুসংবাদ দিলেও হাসতে থাকেন। যুদ্ধে হার হয়েছে? ফিক-ফিক। অমুক মারা গেছে? ফিক-ফিক। রাজ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে? ফিক-ফিক। দক্ষিণের রাজ্যের প্রজারা বিদ্রোহ করেছে? ফিক-ফিক।

রাজার হাসি বন্ধ করবার জন্য মন্ত্রীকে এখন আবার দ্বিগুণ ভাবতে হচ্ছে।

# রামবাবু এবং কানাই কুণ্ডু

**রামবাবু এবং কানাই কুণ্ডু**

রামবাবুর খুব সর্দি হয়েছিল। বন্ধু শ্যাম কবিরাজ তাঁকে এক পুরিয়া কবরেজি নস্যি দিয়ে বললেন, শোওয়ার আগে এক টিপ টেনে শুয়ে পোড়ো।

তাই করলেন রামবাবু। ঘুম ভেঙে উঠে সকালে বেশ ঝরঝরে লাগল শরীরটা।

সকালবেলা দাড়ি কামাতে গিয়ে রামবাবু আয়নায় আবিষ্কার করলেন যে, তার বাঁ গালে একটা কালো এবং বড় জড়ুল দেখা দিয়েছে। প্রথমটায় ভেবেছিলেন কালির দাগ। আঙুল দিয়ে ঘষে দেখলেন, তা নয়, জড়ুলই। তবে আচমকা গালে একটা জড়ল দেখে রামবাবুর যতটা বিরক্ত বা বিস্মিত হওয়া উচিত ছিল ততটা হলেন না। কারণ, জড়লটা তার ফর্সা গালে মানিয়েছে ভাল।

ফর্সা! রামবাবু দাড়ি কামাতে কামাতে আবার একবার থমকালেন, ফর্সা? তিনি তো কস্মিনকালেও ফর্সা নন। বেশ কালোই তার গায়ের রঙ। তাহলে এরকম ধপধপে ফর্সাই বা তাকে লাগছে কেন এখন? রামবাবু জানালার কাছে দাঁড়িয়ে ফুটফুটে আলোয় হাত-আয়না দিয়ে মুখখানা দেখলেন। নাঃ, দারুণ ফর্সাই তো তিনি! লোকে যে এতকাল কেন তাকে কালো বলে বদনাম দিয়ে এসেছে!

যাকগে, রামবাবু আজ বেশ খোশমেজাজেই দাড়ি কামিয়ে চান সেরে নিলেন। মাথা জোড়া টাক বলে রামবাবুকে চুল আঁচড়ানোর বিশেষ ঝক্কি পোয়াতে হয় না। ঘাড় আর জুলপি আঁচড়ে নিলেই চলে।

কিন্তু আজ রামবাবু চুল সামলাতে একেবারে হিমসিম খেয়ে গেলেন। মাথা ভর্তি কালো কুচকুচে এবং ঢেউ খেলানো চুল যে কোথা থেকে এল তা রামবাবু হদিস

করতে পারলেন না। কিন্তু অফিসের সময় হয়ে যাচ্ছে। এসব ব্যাপার নিয়ে ভাববার মতো ফুরসৎ হাতে নেই।

বাথরুম থেকে বেরিয়েই রামবাবু একটা হাঁক মারলেন, গিন্নি, খেতে দাও। তারপর চটপট পোশাক পরে ফেললেন।

তার গিন্নি বেশ মোটাসোটা, একটু থপথপে, গম্ভীর প্রকৃতির। রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে তিনি রামবাবুর দিকে তার গম্ভীর চোখে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে বললেন, আপনি বাইরের ঘরে গিয়ে বসুন। উনি বাথরুমে গেছেন।

এটা কিরকম রসিকতা তা রামবাবু বুঝে উঠতে পারলেন না। তার গিন্নি খুব রসিক প্রকৃতির মানুষও নন।

রামবাবুকে খুব একটা বোকা বলা যায় না। তিনি একটু ভাবলেন এবং ফের বড় আয়নায় ভাল করে নিজেকে দেখলেন। বছর পঁচিশেক বয়সের বেশ কার্তিক ঠাকুরের মতো চেহারাবিশিষ্ট এই লোকটা যে তিনি নন তা টের পেতে আর এক লহমাও দেরি হল না তার।

প্রথমটায় একটু আতঙ্কিত হয়ে পড়লেও শেষ অবধি খুশিই হলেন রামবাবু। টাকওলা, কালো এবং নাদুসনুদুস চেহারার যে মানুষটা তিনি ছিলেন তাকে তার বিশেষ পছন্দ ছিল না।

রামবাবু এটাও বুঝলেন যে, এ বাড়িতে আর অবস্থান করা ঠিক হবে না। তিনি আর যেই হোন রামবাবু নন।

সুতরাং রামবাবু সদর খুলে গটগট করে বেরিয়ে পড়লেন।

সমস্যা হল তিনি যে রামবাবু নন এটা তিনি বেশ বুঝতে পারছেন। কিন্তু তাহলে তিনি কে? এই নতুন চেহারার লোকটার তো একটা কোনও পরিচয় আছে? গোবর্ধন, রাজবল্লভ, বগলাপতি বা যাই হোক একটা নাম এবং পাল, সিংহ, ভট্টাচার্য যা হোক একটা পদবি তো তার থাকা উচিত।

বড় রাস্তায় পড়ার আগে দেখলেন গলির মোড়ে রকে-বসে ছেলেরা আড্ডা মারছে। তারই ছেলের বন্ধুরা সব।

রামবাবু যখন তাদের পেরিয়ে যাচ্ছেন তখন হঠাৎ তারা কথাবার্তা বন্ধ করে তার দিকে হাঁ করে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ ফিসফাস করতে শুরু করল, ওরে, ওই দ্যাখ কানাই কুণ্ডু যাচ্ছে।

কানাই কুণ্ডু! রামবাবু একটু চমকালেন, কানাই কুণ্ডু মানে কি? মোহনবাগানের সেই বিখ্যাত খেলোয়াড়টি নাকি? না, তার খেলা রামবাবু কখনো দেখেননি তবে নামটা প্রায়ই শোনেন। দারুণ নাকি ভাল খেলে। রোজই একটা দুটো করে গোল দেয় বিপক্ষ দলকে। তাহলে তিনিই কানাই কুণ্ডু?

রকের ছেলেরা হঠাৎ দৌড়ে এসে তাঁকে প্রায় ঘিরে ফেলল। এই যে কানাইদা; এখানে কোথায় এসেছিলেন? কানাইদা, আপনি তো বাগবাজারে থাকেন। আপনার ঠিকানাও জানি। ওয়ান বাই সি, বাগবাজার লেন।

কানাইদা, আজ ইস্টবেঙ্গলকে ক গোল দিচ্ছেন? একটা অটোগ্রাফ দেবেন কানাইদা? রামবাবু খুব উঁচু দরের হাসি হেসে সবাইকার সঙ্গেই একটু-আধটু কথা বললেন। এই ফাঁকে নিজের একটু পাবলিসিটিও করে নিলেন। বললেন, এই পাড়ায় রামবাবুর কাছে এসেছিলাম। উনি আমার দাদার মতো।

একটা ছেলে বলে উঠল, ধুস, রামবাবু তো কুমড়োপটাশ তার ওপর হাড়-কেন। একটু ছিটও আছে মাথায়।

রামবাবু আমতা আমতা করে বললেন, তোমরা ওঁকে ঠিক চেনো না। ওরকম সদাশিব লোক হয় না।

যাই হোক, রামবাবু ছেলেগুলোকে এড়িয়ে গিয়ে বড় রাস্তায় ট্যাক্সি ধরলেন।

কোথায় যাবেন তা সঠিক জানেন না। ওয়ান বাই সি বাগবাজার লেন-এ কানাই কুণ্ডুর বাড়িতে হাজির হতে তার ঠিক সাহস হল না। সেখানে আবার কী গুবলেট হয়ে আছে কে জানে!

তবে তিনি এটা জেনে নিয়েছেন যে, ময়দানে আজ মোহনবাগানের সঙ্গে ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচ আছে। কাজেই ট্যাক্সিটা তিনি ময়দানের কাছে এনে ছেড়ে দিয়ে নেমে পড়লেন।

আর নেমেই পড়ে গেলেন বিপাকে। কোত্থেকে পিলপিল করে একগাদা লোক ছুটে এসে তাকে ঘিরে ফেলল।

এই কানাই, খুব ল্যাং মেরে খেলা শিখেছো! অ্যাঁ, সেদিন যে বড় আমাদের হাফ ব্যাকটাকে জখম করেছিলে! আজ তোমার ঠ্যাং খুলে নেবো।

কানাইয়ের খুব তেল হয়েছে রে কালু। আয় আজ ওর তেল একটু নিংড়ে নেওয়া যাক।

এই যে কানাইবাবু, বল না প্লেয়ার কাকে লাথি মারতে আপনার বেশি ভাল লাগে বলুন তো! চোখে ভাল দেখতে পান তো!

ওহে কানাই মস্তান, আজ ট্যান্ডাই ম্যান্ডাই করলে কিন্তু কলজে খেচে নেবো, বুঝলে।

এই সময়ে কিছু লোক দৌড়ে এসে রামবাবুকে ধরে বলল, এই যে কানাই, আজ এত বড় খেলা, আর তোমার পাত্তাই নেই। চলো চলো, টেন্টে চলো।

রামবাবু বুঝলেন এরা সব ক্লাবের কর্মকর্তা। তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

কর্তারা তাকে ধরে নিয়ে গিয়ে টেন্টে ঢুকিয়ে দিলেন।

টেন্টের ভিতরে তখন প্লেয়াররা গম্ভীর মুখে বসে কোচের উপদেশ শুনছে। রামবাবুও শুনতে লাগলেন। তবে কিছু বুঝতে পারলেন না। তিনি জীবনে কখনও ফুটবল খেলেননি। একটু-আধটু হাডু-ডু-ডু খেলেছেন, অল্পস্বল্প ডাংগুলি। তার বেশি কিছু নয়।

কোচ রামবাবুকে বললেন, কানাই, তুমি একদম পাংচুয়াল নও। বি সিরিয়াস। সত্যেন তোমাকে বল ঠেললে তুমি ওয়াল পাস খেলবে কালিদাসের সঙ্গে, তারপর ডায়াগোনালি…।

রামবাবু বুঝলেন না। তবে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়তে লাগলেন।

দুপুরে বেশ খাওয়াদাওয়া হল। তারপর বিশ্রাম।

তারপর সবাই উঠে বুটটুট পরতে লাগল। রামবাবুর খুব একটা অসুবিধে হল না। আড়চোখে অন্যেরটা দেখে দেখে তিনিও বুট এবং জার্সি পরে ফেললেন।

মাঠে নামতেই রামবাবুর বুক এবং পা কাঁপতে লাগল। চারদিকে

গ্যালারি ভর্তি হাজার হাজার লোক বিকট স্বরে চেঁচাচ্ছে। রামবাবুর ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। মাঠে নেমে কী করতে হবে তা তিনি বেবাক ভুলে গেলেন।

তবে একটা ব্যাপার তার জানা আছে। মাঠের শেষে ওই যে জাল লাগানো তিনটে কাঠি ওর মধ্যে বল পাঠানোই হল আসল কাজ।

প্রথম কিছুক্ষণ রামবাবু বেমক্কা ছোটাছুটি করলেন। তারপর পায়ে একবার বল পেয়েই ছুটতে শুরু করলেন প্রাণপণে। আশ্চর্যের বিষয় তাকে কেউ আটকাতে পারছিল না। রামবাবু খুব উৎসাহের সঙ্গে আরও জোরে ছুটে প্রায় মাঝ মাঠ থেকে বল নিয়ে গিয়ে তিন কাঠির সামনে হাজির হলেন এবং খুব দক্ষতার সঙ্গে বলটা পাঠিয়ে দিলেন গোলের ভিতরে।

সমস্ত মাঠ হর্ষধ্বনি আর চিৎকারে ফেটে পড়ল।

রামবাবু এক গাল হাসলেন। একেই বলে খেলা।

কিন্তু চেয়ে দেখলেন তার দলের খেলোয়াড়রা কেমন অদ্ভুত চোখে তার দিকে তাকাচ্ছে। গ্যালারি থেকে কারা যেন চেঁচিয়ে বলছে, ও ব্যাটা ঘুষ খেয়েছে। বের করে দাও মাঠ থেকে।

রামবাবু একটু ভড়কে গেলেন। এবং খানিক বাদে বুঝতে পারলেন, গোল তিনি দিয়েছেন ঠিকই তবে নিজের দলকেই। তার দেওয়া গোলে মোহনবাগান এক গোলে পিছিয়ে পড়েছে।

কোচ মাঠের মধ্যে ঢুকে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, বেরিয়ে এসো!

রামবাবু বেরিয়ে এলেন। আর তারপরই পটাপট কিল চাপড় ঘুসি এসে পড়তে লাগল তার ওপর। কে একটা ল্যাংও যেন মারল। রামবাবু মাটিতে পড়ে চোখ উল্টে গোঁ গোঁ করতে লাগলেন। আর তখনই বোঝা গেল, লোকটা রামবাবু।

কানাই কুণ্ডু নয়। আসল কানাই কুণ্ডু মামাবাড়ি গিয়েছিল কাঁঠাল খেতে। সবে ফিরেছে। বুটটুট পরে সে মাঠে নামবার জন্যে তৈরি হচ্ছে।

পরদিন সকালে যখন দাড়ি কামাতে গেলেন রামবাবু তখন তার কালো গালে জরুল ছিল না। মাথা জোড়া টাক, থলথলে শরীর। তবু রামবাবু নিজেকে দেখে বেশ খুশিই হলেন।

# লালটেম

**লালটেম**

লালটেম কারও পরোয়া করে না। সে আছে বেশ। সকালবেলা সে তিনটে মোষ নিয়ে চরাতে বেরোয়। এ জায়গাটা ভারি সুন্দর। একদিকে বেঁটে বেঁটে চা-বাগানের দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তার। অন্য ধারে বড় একটা মাঠ। মাঠের শেষে তিরতিরে একটা ঠাণ্ডা জলের পাহাড়ি নদী–তাতে সবসময়ে নুড়ি-পাথর গড়িয়ে চলে। নদীর ওপারে জঙ্গল। আর তার পরেই থমথম করে আকাশ তক উঠে গেছে পাহাড়। সামনের পাহাড়গুলো কালচে-সবুজ। দূরের পাহাড়গুলোর শুধু চূড়ার দিকটা দেখা যায়–সেগুলো সকালে সোনারঙের দেখায়, দুপুরে ঝকঝকে সাদা। আর সন্ধ্যের মুখে-মুখে ব্রোঞ্জের মতো কালোয় সোনার রং ধরে থাকে। আর চারপাশে সারাদিন মেঘ-বৃষ্টি-রোদ আর হাওয়ার খেলা। গাছে-গাছে। পাখি ডাকে, কাঠবেড়ালি গাছ বায়, নদীর ওপাশে সরল চোখের হরিণ অবাক হয়ে চারদিক দেখতে দেখতে আর থমকে থমকে থেমে জল খেতে আসে।

লালটেম বেশ আছে। মোষ নিয়ে সে মাঠে গিয়ে ছেড়ে দেয়। এক জায়গায় বসে কোঁচড় থেকে মুড়ি খায়। নদীর জল খায়। তারপর খেলা করে। তার সঙ্গীসাথী কিছু কম নেই। তারাও সব মোষ, গরু, বা ছাগল চরাতে আসে। যে যার জীবজন্তু মাঠে ছেড়ে দিয়ে চোর-চোর খেলে, ডাণ্ডাগুলি খেলে; নদীতে নেমে সাঁতরায়, আরও কত কী করে।

দুপুরের দিকে খুব খিদে পেলে বাড়ি ফিরে লালটেম খায়।

কিন্তু সব দিন খাবার থাকে না। যেদিন থাকে না, সেদিন লালটেম টের পায়। তাই সেদিন সে বাড়ি ফেরে না। দুপুরে সে গাছের পাকা ডুমুর কি আমলকী পেড়ে খায়। বেলের সময়ে বেল পাড়ে, কখনও বা টক আম বা বাতাবি লেবু পেয়ে যায়

বছরের বিভিন্ন সময়ে। তাই খায়। খেয়ে সবচেয়ে বুড়ো আর শক্ত চেহারার মোষ 'মহারাজার' পিঠে উঠে চিৎপাত হয়ে ঘুমোয়।

ছোট্ট ইস্টিশনটার গা ঘেঁষে লালটেমদের ঝোঁপড়া। তার বাবা পেতলের থালায় সাজিয়ে পেঁড়া বিক্রি করে ট্রেনের সময়ে। বাজারে বড়-বড় কারবারিদের কাছে ভৈসা ঘি বেচে, দুধ দেয় বাড়ি-বাড়ি। তিনটে মোষের মধ্যে দুটো মেয়ে মোষ। মহারাজা পুরুষ। দুটো মেয়ে-মোষই বছরের কোনও-না-কোনও সময়ে দুধ দেয়। বুড়ো মোষটার মরার সময় ঘনিয়ে এসেছে। আর দুটোও বুড়ো হতে চলল। সামনে দুর্দিন। লালটেমদের সংসার বেশ বড়। মা ঘুঁটে বিক্রি করে, বাবা দুধ, পেঁড়া, ঘি বেচে। এই করে কোনওরকমে দশজনের সংসার চলে। লালটেমের দাদু আছে, আরও ছয় ভাইবোন আছে। তারা কোনও লেখাপড়া শেখেনি, মাঝে-মাঝে মোষের দুধ, ঘি বা পেঁড়া ছাড়া কোনও ভালো খাবার খায়নি, খাটো ধুতি বা শাড়ি ছাড়া ভালো জামাকাপড় পরেনি, তারা একসঙ্গে একশো টাকাও কখনও চোখে দেখেনি।

তবু লালটেম কারও পরোয়া করে না। দিনভর সে মোষ চরায়, সাথীদের সঙ্গে খেলা করে, আর চারদিককার আকাশ-বাতাস-আলো পাহাড় দেখে চমৎকার সময় কেটে যায়।

একদিন একটা রোগা মানুষ ওপার থেকে শীতের নদীর হাঁটুভর জল হেঁটে পার হয়ে এল। লোকটার গা ময়লা চাঁদরে ঢাকা, পরনে একটা পাজামা, কাঁধে মস্ত এক পুটুলি। লালটেম আর তার সাথীরা অবাক হয়ে লোকটাকে দেখছিল। কারণ, নদীর ওপারের জঙ্গলে বাঘ আছে, বুনো মোষ, দাঁতাল শুয়োর আর গণ্ডার আছে, সাপ তো কিলবিল করছে। ওদিকে কেউ যায় না, একমাত্র কাঠুরেরা ছাড়া। তারাও আবার দল বেঁধে যায়, সঙ্গে লাঠি থাকে, বল্লম থাকে, তীর-ধনুক থাকে, আর কুড়ুল তো আছেই।

লোকটা জল থেকে উঠেই পোঁটলাটা মাটিতে রেখে একগাল হেসে বলল, একটা জিনিস দেখবে?

হ্যাঁ-অ্যা লালটেমরা খুব রাজি।

লোকটা ধীরে-আস্তে পুটলির গিট খুলে চাদরটা মেলে দিল। লালটেমরা অবাক হয়ে দেখে, ভিতরে কয়েকটা ইট।

তারা সমস্বরে বলে ওঠে, এ তো ইট!

রোগা লোকটা হেসে বলল, ‘ইট ঠিকই, তবে সাধারণ ইট নয়। প্রায় দেড় হাজার বছরের পুরোনো একটা রাজবাড়ির জিনিস। ওই জঙ্গলের মধ্যে আমি সেই রাজবাড়ির খোঁজ পেয়েছি।

রাজা বা রাজবাড়ি সম্পর্কে লালটেমের ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। তবে সে জানে, একজন রাজা সোনার রুটি খেতেন। তার রানি যে শাড়ি পরতেন সেটা জ্যোৎস্নার সুতো দিয়ে বোনা।

লোকটা ইটগুলো পুঁটলিতে বেঁধে হাত ঝেড়ে বলল, “সেই রাজবাড়িটায় অনেক কিছু মাটির নীচে পোঁতা আছে। যে পাবে, সে এক লাফে বড়লোক হয়ে যাবে। তবে কিনা সেখানে যখেরা পাহারা দেয়, সাপ ফণা ধরে আছে। চারদিকে যাওয়া শক্ত।

লালটেম বলে, তুমি তাহলে বড়লোক হলে না কেন?

লোকটা অবাক হয়ে বলে, ‘আমি! আমি বড়লোক হয়ে কী করব? দুনিয়াতে আমার কেউ নেই। দিব্যি আছি, ঘুরে-ঘুরে সময় কেটে যায়। রাজবাড়িটা দেখতে পেয়ে আমি শুধু লোককে দেখানোর জন্য কয়েকটা ইট কুড়িয়ে এনেছি। এইতেই আমার আনন্দ।

লালটেম বলে তোমাকে বাঘে ধরল না? সাপে কাটল না? বুনো মোষ তাড়া করল না?

লোকটা ভালোমানুষের মতো বলে, জানোয়ারেরাও বন্ধু আর শত্রু চিনতে পারে। আমি নিরীহ মানুষ, ওরাও সেটা টের পেয়েছিল। তাই কিছু বলেনি।

লোকটা তারপর গান গাইতে গাইতে মাঠ পেরিয়ে চলে গেল। লালটেম তার সাথীদের সঙ্গে খেলায় মেতে গেল।

পরদিন ভোরবেলায় কোদাল-গাঁইতি হাতে কয়েকজন তোক নদীর ধারে এসে হাজির। তাদের মধ্যে একজন লোককে লালটেম চেনে। সে হল এ অঞ্চলের নামকরা গুণ্ডা আর জুয়াড়ি প্রাণধর। লালটেমকে ডেকে সে লোকটা বলল, এই ছোঁড়া, ওই জঙ্গলের মধ্যে যাওয়ার রাস্তা আছে?

লালটেম ভালোমানুষের মতো বলে, কাঠুরেদের পায়ে-হাঁটা রাস্তা আছে।

লোকটা কটমট করে চেয়ে বলে, “আমরা যে এদিকে এসেছি, খবরদার কাউকে বলবি না।

লোকগুলো হেঁটে শীতের নদী পার হয়ে ওপাশের জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লালটেমরা মুখ-তাকাতাকি করে নিজেদের মধ্যে খেলা শুরু করে দেয়। কিন্তু একটু বাদেই আবার কোদাল-শাবল হাতে একদল লোক আসে। তারাও জঙ্গলের মধ্যে পথ আছে কিনা জিজ্ঞেস করে, তারপর লালটেমরা যাতে আর কাউকে না বলে সে বিষয়ে সাবধান করে দিয়ে নদী পার হয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ে।

সারাদিন যে এভাবে কত লোক জঙ্গলের মধ্যে গেল, তার গোনাগুনতি নেই। তাদের মধ্যে কানা-খোঁড়া-বুড়ো-কচি-বড়লোক-গরিব সবরকম আছে। চোরের মতো হাবভাব সবার। কী যেন গোপন করছে। এদের দলে লালটেম নিজের বাবাকেও দেখে ভারি অবাক হয়।

বাবা লালটেমকে দেখে কিছু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, আমার ফিরতে দুদিন দেরি হবে। সাবধানে থেকো। মোষগুলোকে যত্নে রেখো । বাড়ি বাড়ি দুধ দিও, পেঁড়া বেচো, ঘি বিক্রি কোরো।

বাবা গেল। কিছুক্ষণ পরে একদল যুঁটেউলির সঙ্গে মাকেও জঙ্গলে যেতে দেখল লালটেম।

মা কাছে এসে তাকে টেনে নিয়ে বলল, আমার ফিরতে একটু দেরি হবে বাবা। একদিন বা দুদিন। তুমি সব সামলে রেখো।

সেই রোগা লোকটা গ্রামে-গঞ্জে হাটে বাজারে রাজবাড়ির কথা রটিয়ে দিয়ে গেছে। এখন তাই লোভী মানুষেরা চলেছে সেই রাজবাড়ির খোঁজে। লালটেম তাই অবাক হলেও ব্যাপারটা বুঝতে পারল।

দুদিন গেল! তিনদিন গেল। লালটেম আর তার সাথীরা রোজ মোষ চরাতে আসে। এসে নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ওপারের জঙ্গলের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সকলেরই বাপ মা, আপনজনেরা জঙ্গলে গেছে। কেউই এখনো ফেরেনি!

দাঁড়িয়ে তারা একটু অপেক্ষা করে। তারপর আবার খেলায় মাতে। নদীতে স্নান করে। গাছে উঠে খাওয়ার যোগ্য ফল-পাকড় খোঁজে। মোষের পিঠে শুয়ে থাকে।

চারদিনের দিন সন্ধ্যেবেলা একটা লোক জঙ্গল থেকে টলতে টলতে বেরিয়ে ঝপাং করে নদীতে পড়ল। পড়ে আর ওঠে না। লালটেমরা দৌড়ে গিয়ে জল থেকে টেনে তুলে তাকে এপারে নিয়ে আসে।

লোকটা প্রাণধরের এক স্যাঙাত। তার চোখ রক্তবর্ণ, পেটে পিঠে এক হয়ে গেছে খিদেয়, ভালো করে কথা বলতে পারছে না। লালটেম গিয়ে শালপাতায় নদীর জল তুলে এনে তাকে খাওয়ায়। তারপর মকাই ভাজা দেয়।

লোকটা একটু দম পেয়ে বলল, সব মিথ্যে কথা। রাজবাড়ি কোথাও নেই। আমরা মাইলের পর মাইল হেঁটে খুঁজেছি। খাবার নেই, জল নেই। সারা পথে নানারকম বিপদ। আমার সঙ্গীরা কোথায় হারিয়ে গেছে!

এইরকম ভাবে দু-চার দিন পরে একটি-দুটি হা-ক্লান্ত লোক ফিরে এসে তাদের বিপদের কথা জানায়। তারা মিথ্যে মিথ্যে হয়রান হয়েছে। বহু লোক বাঘের পেটে গেছে। কিছু মরেছে বুনো হাতি, বুনো মোষ, দাঁতাল শুয়োরের পাল্লায় পড়ে। বহু লোককে সাপে কেটেছে। জঙ্গলে খাবার নেই, জল নেই, পথ নেই। সেখানে গোলকধাঁধার মতো ঘুরে মরতে হয়।

গা-ভর্তি জ্বর নিয়ে একদিন লালটেমের বাবা ফেরে। শরীর শুকিয়ে সিকিভাগ হয়ে গেছে। তার ওপর বিড়বিড় বকছে, ‘রাজবাড়ি? সোনা দানা! বাপ রে বাপ!

এর দুদিন বাদে ফিরল মা। লালটেম দেখল, তার মা এ কয়েকদিনেই খুনখুনে বুড়ি হয়ে গেছে। মাজা বেঁকে যাওয়ায় লাঠিতে ভর দিয়ে কুঁজো হয়ে হাঁটে, মাথার চুল পেকে শনের গুছি, গলার স্বরে একটা কাপ ধরেছে।

শেষ পর্যন্ত দেখা যায়, একে-একে সবাই ফিরে এসেছে। মরেনি কেউ। তবে সকলেরই ভীষণ বিপদ হয়েছিল। নানারকম বিপদ আর কষ্ট সহ্য করে মরতে মরতে ফিরেছে। তবে মানুষগুলো আর আগের মতো নেই। যুবকরা বুড়ো হয়ে ফিরেছে, বুড়োরা অথর্ব হয়ে গেছে, আমুদে লোকেরা দুঃখী, দুঃখীরা পাথর হয়ে এসেছে। কোনও মানুষই আর আগের মতো নেই।

লালটেম আজকাল মোষ চরাতে চরাতে খুব রাজবাড়ির কথা ভাবে। তার খুব জানতে ইচ্ছে করে, রাজবাড়ির জন্য লোকগুলো হন্যে হয়ে ছুটে গিয়েছিল কেন!

দুপুর গড়িয়ে গেছে। মোষ মহারাজার পিঠে গামছা পেতে চিত হয়ে শুয়ে ঘুমিয়ে ছিল লালটেম। বুড়ো মোষটা ঘাস খেতে খেতে নদীর ধারে এল। তারপর লালটেমকে পিঠে নিয়ে নদীতে নামল জল খেতে। জল খেয়ে খুব ধীরে ধীরে নদী পেরিয়ে জঙ্গলের দিকে চলতে লাগল।

লালটের ঘুম থেকে উঠে হাঁ। এ সে কোথায়? মহারাজা তাকে পিঠে নিয়ে গভীর জঙ্গলের ভিতরে দাঁড়িয়ে আছে। দুপুর শেষ হয়ে রোদে বিকেলের নরম আভা লেগেছে। চারদিকে গভীর স্বরে পাখিরা ডাকছে। পাতা খসে পড়ছে গাছ থেকে। সরসর করে হাওয়া দিচ্ছে। আর চিকড়ি মিকড়ি আলো-ছায়ায়, সামনেই এক বিশাল বাড়ির ধ্বংসস্তূপ। ভেঙে পড়া খিলান, গম্বুজ, পাথরের পরী, ফোয়ারা, শ্বেতপাথরের সিঁড়ি। বাড়ির চূড়ায় এখনও একটা সোনার কলস চিকমিক করছে।

লালটেম অবাক হয়ে চেয়ে আছে তো আছেই। মহারাজা ফোঁস করে একটা শ্বাস ছাড়তে সেই শব্দে লালটেম সচকিত হয়ে মাটিতে নামল লাফ দিয়ে। তাই তো! এই তো সেই রাজবাড়ি মনে হচ্ছে! এক-পা করে দু-পা লালটেম এগোয়।

চারিদিকে শ্যাওলা ধরা পাথর আর ইটের স্তূপ। এই সেই ইট যা রোগা লোকটা তাদের দেখিয়েছিল। সুতরাং এইটাই রাজবাড়ি। লালটেম দেখে, চারধারে নানা রঙের সাপ ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছু সাপ ফণা তুলছে। ফে ফেঁ করে ভয়ঙ্কর শব্দ করছে তারা। কোত্থেকে একটা দুটো তক্ষক ডাকল। ছমছম করে ওঠে এখানকার নির্জনতা। লালটেম ভয় পায় বটে, কিন্তু তবু এগোয়। সাপেরা তার পথ থেকে সরে যায়।

চারদিকে ফিসফাস শব্দ ওঠে। কারা যেন হিঃ হিঃ করে হেসে ওঠে কাছেই। চারদিকে চেয়ে লালটেম কাউকে দেখতে পায় না। আবার এগোয়।

কী করুণ অবস্থা! বিশাল ঘরের আধখানা ভেঙে পড়ে গেছে, বাকি অর্ধেকটায় ধুলো জঞ্জাল আর আগাছা। মাকড়শার জাল এত ধারালো যে, গায়ে লাগলে, চামড়া চিরে যায়। কাঁকড়া বিছেরা বাসা করে আছে যেখানে-সেখানে, একটা ঘরে শেয়ালের বাচ্চারা দলা পাকিয়ে ঘুমোচ্ছে, একটা জং-ধরা লোহার সিন্দুকের ওপর নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে একটা দাঁতাল শুয়োর।

একটার পর একটা ভাঙা ঘর পার হয় লালটেম। দেখে, অনেকগুলো বন্ধ কুঠুরি। কৌতূহলবশে সে একটা কুঠুরির দরজা ঠেলা দিতেই দরজাটা মড়াত করে ভেঙে পড়ে গেল। লালটেম ভিতরে ঢুকে ভীষণ অবাক হয়ে দেখে, সেখানে অনেক সোনা-রুপোর বাসন পাঁজা করে রাখা।

পাশের কুঠুরিতে ঢুকে লালটেম হাজার হাজার মোহর দেখতে পেল। তার পাশেরটায় গহনা, হীরে, মুক্তো।

কত কী রয়েছে রাজবাড়িতে। দেখে লালটেম অবাক তো অবাক! সবকিছু সে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে, নেড়েচেড়ে দেখে, তারপর আবার যেখানকার জিনিস, সেখানেই রেখে দেয়।

সাতটা কুঠুরির সব-শেষটায় ঢুকে লালটেম দেখে, ধুলোর ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে একটা মানুষের কঙ্কাল! ভীষণ ভয় পেয়ে লালটেম দরজার দিকে পিছু হটে সরে এল।

হঠাৎ কঙ্কালটা নড়ে উঠল। একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ করে কঙ্কালটা বলল, লালটেম, যেও না।

লালটেম ভয় পেয়েও দাঁড়াল।

একবোঝা হাড় নিয়ে খটমট শব্দ করে আস্তে আস্তে কঙ্কালটা উঠে বসে। লালটেম দেখে, কঙ্কালটার পাঁজরের মধ্যে একটা কালো সাপ, মাথার খুলির ভিতর থেকে চোখ আর নাকের ফুটো দিয়ে কাকড়া বিছে বেরিয়ে আসছে, আর সারা গায়ে লাল পিঁপড়ে থিকথিক করছে।

কঙ্কালটা হাত তুলে বলে, আমার দশা দেখেছ?

দেখছি।

ভয় পেও না। এখানে যা কিছু দেখছ, সব সোনাদানা মোহর-গয়না, এ সবই তোমার। নিয়ে যাও।

লালটেম মাথা নেড়ে বলে, নিয়ে কী হবে?

অভাব থাকবে না। খুব বড়লোক হয়ে যাবে। নাও।

বাইরে থেকে গম্ভীর গলায় মহারাজা ডাকল হাংগা।

লালটেম চমকে উঠে বলল, আমার মোষটার জল তেষ্টা পেয়েছে। আমি যাই।

যেও না লালটেম। কিছু নিয়ে যাও।

মহারাজা আবার ডাকে, আঃ-আঃ।

লালটেম ছটফট করে বলে, 'বেলা বয়ে যাচ্ছে। আমি যাই।

তোমার মোষগুলো বুড়ো হয়েছে লালটেম, একদিন মরবে। তখন বড় দুর্দিন হবে তোমাদের। এইবেলা বড়লোক হয়ে যাও।

মহারাজা বাইরে ভীষণ দাপিয়ে চেঁচায়, গা…গাঁ।

লালটেম একটু হেসে বলে, আমার দিন খারাপ যায় না। বেশ আছি।

কঙ্কালটা রেগে গিয়ে বলে, গাঁ-গঞ্জের হাজারো মানুষ যে রাজবাড়ি খুঁজে খুঁজে হয়রান, সেই রাজবাড়ি পেয়েও তুমি বড়লোক হবে না?

লালটেম একটু ভেবে বলে, না, আমি তো বেশ আছি। চারদিকে কত আনন্দ! কত ফুর্তি!

সাপটা ফোঁস করে কঙ্কালটার পাঁজরায় একটা ছোবল দিল। উঃ করে কঙ্কালটা পাঁজর চেপে ধরে বলল, গত একশো বছর ধরে রোজ ছোবলাচ্ছে রে বাপ।…ইঃ, ওই দেখ, মাথায় ফের কঁকড়াবিছেটা হুল দিলে…কী যন্ত্রণা!..আচ্ছা লালটেম, বলো তো, বোকা লোকগুলো রাজবাড়িটা খুঁজে পায় না কেন? তোমাদের এত কাছে, জঙ্গলের প্রায় ধার ঘেঁষেই তো রয়েছে তবু খুঁজে পায় না কেন? আর যে দু-একজন খুঁজে পায়, সেগুলো একদম তোমার মতোই আহাম্মক। লালটেম, লক্ষ্মী ছেলে, যদি একটা মোহরও দয়া করে নাও, তবে আমি মুক্তি পেয়ে যাই। নেবে?

বাইরে মহারাজা ভীষণ রেগে চেঁচায়, গাঁ-অ্যাঁ।

লালটেম মুখ ঘুরিয়ে নেয়। বলে, নিলেই তো তোমার মতো দশা হবে।

এই বলে লালটেম বেরিয়ে আসে গটগট করে। মহারাজা তাকে দেখে খুশি হয়ে কান লটপট করে, গা শোঁকে, পা দাপিয়ে আনন্দ জানায়।

পরদিন থেকে আবার লালটেম মোষ চরাতে যায়। সাথীদের সঙ্গে খেলে। পাহাড়, জঙ্গল, নদী, মাঠ, চা-বাগান দেখে তার ভারি আনন্দ হয়। রোদ আর আলো, মেঘ আর বৃষ্টি, বাতাস আর দিগন্ত তাকে কত আদর জানায় নানাভাবে। কোনওদিন তার খাবার থাকে। কোনওদিন থাকে না। যেদিন খাবার জোটে না, সেদিন সে মহারাজার পিঠে শুয়ে আকাশ দেখে। তার মনে হয়, সে বেশ আছে। খুব ভালো আছে। তার কোনও দুঃখ নেই।

# লেজ

---

**লেজ**

বাসা বদলানোর পর বদ্যিনাথ কিছু ফাঁপরে পড়ে গেল। যে বাড়িতে এল সে-বাড়ি না হোক তো এক দেড়শ' বছরের পুরোনো। নতুন চুনকাম করা সত্ত্বেও নোনাধরা দেওয়ালের চুনবালি খসে পড়ছে, গত বর্ষার জলের ছাপ এখনো দেয়াল থেকে মোছেনি। তার ওপর বড্ড ঘুপচি আর অন্ধকার, আলো বাতাসের বালাই নেই। চারদিকে সব সময়ে একটা ভেজা-ভেজা ভাব। দেয়াল আর মেঝেয় হরেক রকমের ফাটল। তাতে কাকড়াবিছে তেঁতুলবিছের আস্তানা, এখানে-সেখানে উইয়ের সুড়ঙ্গ পথ, আরশোলা ফরফর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা দিন, লুকনো গর্ত থেকে মাঝে মাঝে একটা ব্যাঙ ডাকে। বদ্যিনাথের নব্বই বছরের বুড়ি-মা দিন রাত ঘ্যানঘ্যান করছেন, "এ কী সোঁদরবন বাবা? কোন্ জীবজন্তুটা নেই এখানে? ঠাকুরঘরে বাদুড় পর্যন্ত ঝুলে আছে।"

"শুধু বাদুড়?" বদ্যিনাথের গিন্নি ঘোমটা খসিয়ে বলেন, "ভাড়ার ঘরের জল-নিকাশি ফুটো দিয়ে একটা লেজ বেরিয়ে যেতে দেখলুম। তা সে কিসের লেজ কে জানে!"

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বদ্যিনাথের মা বলেন, "লেজের কথা আর বোলো না। লেজ আমি দিনরাত দেখছি। পরশু রাতে ঘুম ভেঙে মশারির গায়ে একটা কাঁটাওলা লেজ, গতকাল আহ্নিকে বসে ঠাকুরের সিংহাসনের নীচে একটা লোমওলা লেজ, আজ সকালে বাইরের ঘরের চৌকির তলায় একটা লিকলিকে লেজ, আমার নিজের চোখে দেখা। তবে জন্তুগুলোকে ঠাহর করতে পারিনি।"

বদ্যিনাথের ছেলে মল্লিনাথ ছেলেবেলা থেকেই ভারী রোগা-ভোগা। ফ্যাকাশে সরু চেহারা। তার হাতে-গলায় রাজ্যের মাদুলি আর শেকড় বাকড় বাঁধা। সে খেলে না,

ছোটে না, দুষ্টুমি করে না। কাঁচকলা আর পেঁপের ঝোল দিয়ে ভাত খায় আর চুপ করে শুয়ে বসে থাকে। রোগে ভোগে বলে তার ঠাকুমা সবাইকে সাফ বলে দিয়েছেন, "বংশের ঐ একটি মাত্র সলতে। লেখাপড়ার ধকল যদি রোগা শরীরে না সয়? নাতি আমার বেঁচে থাক, লেখাপড়ার দরকার নেই।"

তাই মল্লিনাথ ইস্কুলে-পাঠশালেও যায় না। ঘরে বসে খুশিমতো একটু আধটু পড়ে। কথাবার্তা বড় একটা বলে না কারো সঙ্গে। মা বা ঠাকুমার আঁচলের আড়ালে সে বড় হয়। মা-ঠাকুমার কথা শুনে মল্লিনাথও চিচি করে বলল, "লেজ? লেজ তো আমিও দেখি। আমার পড়ার টেবিলের ড্রয়ার থেকে মাঝে মাঝে একটা সবুজ রঙের ভারী সুন্দর লেজ বেরিয়ে ঝুলে থাকে।"

"কী সর্বনাশ!" মা ঠাকুমা একসঙ্গে চেঁচিয়ে ওঠেন।

বদ্যিনাথ গরিব মানুষ হলেও রোজ ছেলের জন্য খেলনা আনে, খাবার আনে। কিন্তু ছেলের মুখে হাসি ফোটে না, চোখে মড়ার দৃষ্টি জ্যান্ত হয় না। বদ্যিনাথ বল কিনে এনে হাতে দেয়, খেলনা-বন্দুক দেয়, লাটু দেয়, ঘুড়ি লাটাই দেয়, বলে, "কী বাবা, একটু আনন্দ পাচ্ছ? এই দ্যাখো বল, এমনি করে পায়ে নিয়ে ছুটবে। দুম করে লাথি কষাবে, কেমন আনন্দ হবে দেখো।..ঘুড়ি কেমন শো করে আকাশে ওড়ে, না বাবা? দেখেছ তো! তেমনি ওড়াবে ছাদে উঠে, দেখবে বুকখানা ভারী হালকা হবে, ফুর্তি হবে খুব। বন্দুক দিয়ে রোজ টিপ করবে। কত আরশোলা, ইঁদুর, চামচিকে চারদিকে দেখছ তো!...টিপ করে করে মারতে মারতে দেখো রক্ত গরম হয়ে উঠবে।...এই দ্যাখো লাটু, কেমন বনবন ঘোরে জানো?"

কিন্তু খেলনা পড়ে থাকে, খাবারও ছোঁয় না মল্লিনাথ। মাদুলির ভারে কুঁজো হয়ে চুপ করে ফ্যাকাশে মুখে বসে থাকে। তার রক্ত গরম হয় না, আনন্দ হয় না, ফুর্তি হয় না। বদ্যিনাথ তার সামনে বল খেলে দেখায়, ঘুড়ি উড়িয়ে দেখায়, লাটু ঘুরিয়ে দেখায়, দেখাতে দেখাতে হাঁফিয়ে ওঠে, নেতিয়ে পড়ে, চিড়বিড়োতে থাকে।

নতুন বাসায় এসে মল্লিনাথ আরো ফ্যাকাশে হয়েছে, আরো রোগা, আরো ন্যাতানো। মা, ঠাকুমা বার-বার তার দিকে তাকিয়ে সারা দিন দীর্ঘশ্বাস ছাড়ছেন। ছেলে বাঁচলে হয়! তাই সবুজ লেজের কথা শুনে সবাই আঁতকে উঠল। টেবিল ঝাড়পোঁছ করা তো হলোই, সারা বাড়িতে ছড়ানো হলো কড়া কীটনাশক। এক তান্ত্রিক এসে প্রায় বিশ গ্রাম ওজনের আর-একটা তাবিজ বেঁধে দিয়ে গেল গলায়। মল্লিনাথ আরো একটু কুঁজো হয়ে গেল তার ভারে। তা বলে সবুজ লেজটা

কিন্তু তাকে ছাড়ল না। তাবিজ নেওয়ার পরদিন সকালে পড়ার টেবিলে বসে সে ‘গুপ্তধনের খোঁজে’ নামে একটা গল্পের বই পড়ছিল। কনুইতে সুড়সুড়ি লাগায় সে তাকিয়ে দেখল সামান্য ফাঁক হয়ে থাকা ড্রয়ার থেকে সেই কচি কলাপাতা রঙের সুন্দর সবুজ সরু লেজটা বেরিয়ে এসে খুব আদুরে-আদুরে ভাব দেখিয়ে নড়াচড়া করছে। মল্লিনাথ যে ভয় পেল তা নয়। সে চিরকাল কলকাতায় মানুষ। এই প্রায় দশ বছর পর্যন্ত সে একমাত্র চিড়িয়াখানায় ছাড়া আর কোথাও তেমন কোনো জীবজন্তু দেখেনি। লেজটা দেখে তাই তার ভারী অবাক লাগে। ভারী সুন্দর দেখতে, হাত দিতে ইচ্ছে করে। একটু ভয়ে-ভয়ে, সংকোচের সঙ্গে মল্লিনাথ হাত বাড়িয়ে লেজটা একটু ছুঁয়ে দিল। সুট করে সরে গেল লেজটা। পরদিন আবার বেরিয়ে এসে সুড়সুড়ি দিল হাতে। মল্লিনাথ আবার একটু ছুঁল। আর এইভাবেই রোজ সেই সবুজ লেজটার সঙ্গে তার দেখা হতে থাকে। একটু-একটু করে ভাব হতে থাকে। মল্লিনাথের ভারী ভাল লাগে লেজটাকে। একদিন ড্রয়ারটা একটু বেশি ফাঁক করে রাখল সে। লেজটা বেরিয়ে আসতেই উঁকি মেরে দেখল ভিতরে একটা বেশ লম্বা গড়নের সাপের মতো দেখতে প্রাণী কুণ্ডলী পাকিয়ে ঝিমোচ্ছে। পরদিন ড্রয়ারটা আরো ফাঁক করল মল্লিনাথ, সকালবেলা যথারীতি আবার লেজটার সঙ্গে ভাব করতে করতে প্রাণীটিকে দেখল আড়চোখে। ছোটখাটো একটা আমুদে সাপই হবে। অলসভাবে শুয়ে শুয়ে একটা আরশোলা চিবোচ্ছে।

পরদিন মল্লিনাথের ধৈর্য থাকল না। লেজটা বেরোতেই ড্রয়ারটা এক ঝটকায় খুলে ফেলল। লেজটা ধরল মুঠো করে। করুণ স্বরে বলল, “আমার যে আর কোনো বন্ধু নেই।”

সাপটা মল্লিনাথের এই আচরণে ভারী বিরক্ত হয়ে কিলবিলিয়ে পিছলে বেরিয়ে গেল। সড়ত করে ড্রয়ার থেকে নেমে প্রাণপণে ছুটল ভেতর বাড়ির দিকে। মল্লিনাথও লাফিয়ে ওঠে। তার একমাত্র বন্ধু, ভাবের পাত্র পালিয়ে যাচ্ছে। প্রাণপণে মল্লিনাথও তার পিছনে ছোটে।

সবুজ সাপটা ভারী চালাক। সোজা পথে না গিয়ে সে খানিকক্ষণ এ-ঘর সে-ঘর করে পালিয়ে বেড়ায়। আলমারির তলা, খাটেল তলা, জুতোর র‍্যাকের পিছন, চৌকাঠের আড়ালে ঘুরে অবশেষে উঠোন পেরিয়ে গিয়ে ভাড়ার-ঘরের পিছনে একটা ঘুপসি ছুঁটে-কয়লা রাখার ঘরে গিয়ে ঢুকল। ঘরের কোণে একটা মস্ত গর্তে সেঁধিয়ে গেল সুট করে।

মল্লিনাথ তা বলে হাল ছাড়ল না। গর্তের কাছে গিয়ে প্রথমে অনেক কাকুতি মিনতি করল। কাজ হলো না দেখে একটা লোহার শাবল এনে গর্ত বড় করতে বসল। মল্লিনাথের গায়ে জোর নেই, মাদুলির ভারেই সে জর্জরিত। কিন্তু বন্ধু হারিয়ে যাওয়ার শোকে তার গায়ে দ্বিগুণ বল এল। তাবিজ কবচ মাদুলির জন্য শাবল চালাতে অসুবিধে হচ্ছিল বলে এক-এক টান মেরে ছিঁড়ে ফেলে দিল সেগুলো। ভারী শাবলটা প্রাণপণে চালাতে লাগল।

হাত দেড়েক গর্ত খোঁড়ার পরই সে একটা ভুসভুসে ইটের গাঁথনি পেল। শাবলের দুটো চাড়ে উপড়ে ফেলল ইট। দেখল ঘরের নীচে আর একটা গুপ্ত কুঠুরি রয়েছে। ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। গর্তে মুখ দিয়ে মল্লিনাথ ডাকে, "এসো ভাই সবুজ লেজ, আমার যে তুমি ছাড়া বন্ধু নেই। আমি যে ইস্কুলে যাই না, কারো সঙ্গে ভাব করতে পারি না, সবাই যে আমাকে খ্যাপায়।"

কিন্তু সবুজ লেজ আর বেরোয় না। মল্লিনাথ একটা টর্চ নিয়ে এসে গর্তের মধ্যে লাফিয়ে নেমে পড়ল।

চোর-কুঠুরিতে টর্চের আলো ফেলে সে দেখল, চারদিকে তিন-চারটে লোহা আর কাঠের সিন্দুক। অনেক রুপোর আর সোনার বাসন রয়েছে দেয়াল আলমারিতে। কিন্তু সেসব গ্রাহ্যও করল না মল্লিনাথ। আঁতি পাঁতি করে খুঁজতে লাগল তার বন্ধুকে। সিন্দুক শাবলের চাড়ে খুলে ফেলে দেখল, রাশি রাশি সোনা আর রুপোর মোহর আর টাকা, হিরে জহরত, গয়না, সোনার বাঁট। সব হাঁটকে-মাটকে সে সবুজ লেজকে খুঁজতে থাকে। কিন্তু কোথাও পায় না। পায় না তো পায় না।

ক্লান্ত হয়ে সে একসময় শাবল আর টর্চ ফেলে দিয়ে হাঁটুতে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল অনেকক্ষণ। তারপর খুব রেগে গিয়ে বলল, "ঠিক আছে, আমিও মজা দেখাচ্ছি। আজ থেকেই আমি অন্য সব ছেলের সঙ্গে মিশব। তাদের সঙ্গে ভাব করব, খেলব। তখন দেখো তোমার হিংসে হয় কি না।"

এই বলে মল্লিনাথ কুঠুরির বাইরে বেরিয়ে আসে। গর্তের মুখ ভাল করে ইট আর মাটি দিয়ে বুজিয়ে দেয়। তার চোখে জল, মুখ থমথম করছে অভিমানে।

দুম দুম করে পা ফেলে হেঁটে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। পাড়ার ছেলেরা গলির মুখ আটকে ইট সাজিয়ে রবারের বলে ক্রিকেট খেলছিল। মল্লিনাথ গিয়ে বল কেড়ে নিল একটা ছেলের হাত থেকে। তারপর দৌড়ে গিয়ে এমন জোরে বল

করল যে, ইটের স্ট্যাম্প পর্যন্ত তিন হাত ছিটকে গিয়ে ভেঙে পড়ল। ছেলেরা মল্লিনাথের এলেম দেখে খ্যাপাতে ভুলে গেল। ওস্তাদ ওস্তাদ' বলে চেঁচাল কয়েকটা ছেলে। মল্লিনাথ পরের বলটা করল আরো ভয়ংকর। বলটাই ফেটে গেল ফটাস করে। যার বল, সে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল।

মল্লিনাথ কঁদুনে ছেলেটার পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলল, "কুছ পরোয়া নেই। আমার বল ব্যাট অনেক আছে। আনছি।" বলে দৌড়ে গিয়ে মল্লিনাথ ব্যাট বল আনে। খেলা আবার জমে ওঠে।

মল্লিনাথ ব্যাটও করল অসাধারণ। রাগে গা রি-রি করছে। তাই এত জোরে ব্যাট চালাল যে, মার খেয়ে তিনতলা চারতলা পাঁচতলা বাড়ির ছাদ ডিঙিয়ে বল গিয়ে ওভার বাউন্ডারি হতে লাগল। তার খেলা দেখে সবাই থ।

অনেকক্ষণ খেলে ঘেমে চুমে মল্লিনাথ যখন বাসায় ফিরল, তখন তার রাগ অনেকটা কমেছে, মুখে হাসি ফুটেছে, চোখে মড়ার দৃষ্টি খুব জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। সেই দৃশ্য দেখে তার মা আর ঠাকুমা ভয় খেয়ে কেঁদে খুন। "ওগো, কে আমাদের বাছাকে ওষুধ করেছে?"

শুনে মিটিমিটি হাসল মল্লিনাথ। ছাদে গিয়ে সে অনেকক্ষণ ঘুড়ি ওড়াল, বন্দুক টিপ করে তিনটে কঁকড়াবিছে ঘায়েল করল, বনবন করে লার্টু ঘোরাল। বিকেলে পাড়ার কাছে মাঠে গিয়ে ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলে তিন-তিনটে গোলও দিয়ে দিল মল্লিনাথ। সন্ধ্যেবেলা বদ্যিনাথ বাড়ি ফিরলে সে গিয়ে গম্ভীর মুখে বলল, "বাবা, আমাকে ইস্কুলে ভর্তি করে দাও! আমার অনেক বন্ধু চাই।"

শুনে বদ্যিনাথের ভিরমি খাওয়ার জোগাড়। মল্লি ইস্কুলে যাবে? যেতে আসতেই হাঁফ ধরে যাবে ছেলের!

ওদিকে মল্লিনাথের কাণ্ড দেখে মা আর ঠাকুমা শোবার ঘরে দরজা বন্ধ করে বসে চেঁচাচ্ছেন আর কাঁদছেন। তাদের ধারণা মল্লি পাগল হয়ে গেছে, এবার হয়তো কামড়ে দেবে। বাড়ির চাকর তান্ত্রিককে ডাকতে গেছে।

বদ্যিনাথও মূর্ছাই যাচ্ছিল। মল্লিনাথই তাকে জল-টল দিয়ে চাঙ্গা করল। বলল, "সবুজ লেজটা আমার সঙ্গে খুব বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। ওকে আমি মজা দেখাব।"

বদ্যিনাথ হাঁ করে চেয়ে থাকে। কিছু বুঝতে পারে না।

তখন মল্লিনাথ ঘটনাটা খুলে বলে তার বাবাকে নিয়ে গিয়ে গর্ত দেখায়। মাটি ফের খুঁড়ে দুজনে মিলে চোর-কুঠুরিতেও নামে। সব দেখিয়ে মল্লিনাথ বদ্যিনাথকে বলে, "দেখলে তো সবুজ বন্ধুর জন্য খামোখা কত খেটেছি।"

বদ্যিনাথ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, "তা বটে।"

মল্লিনাথ একমুঠো হিরে তুলে নিয়ে রাগের চোটে মেঝেয় ছুঁড়ে মেরে বলে, "ওকে মজা দেখাব। অনেক বন্ধু হবে আমার, তখন বুঝবে।"

"ঠিক, ঠিক।" বদ্যিনাথ হাসিমুখে বলে। তারপর বাপ-ব্যাটায় উঠে এসে গর্ত বুজিয়ে ফেলে। পরদিন রাজমিস্ত্রি এনে জায়গাটায় পাকা গাঁথনি দিয়ে দেয়।

এরপর থেকে মল্লিনাথ ক্রমে ক্রমে ভারী জলজ্যান্ত হয়ে ওঠে। যেমন লেখাপড়ায় তেমনি খেলাধূলায়।

চোর কুঠুরির কথা বাপ-ব্যাটা আর মুখেও আনে না।

# লোকটা

**লোকটা**

সোমনাথবাবু সকালবেলায় তাঁর একতলার বারান্দায় বসে কাগজ পড়ছেন। সামনেই মস্ত বাগান, সেখানে খেলা করছে তার সাতটা ভয়ঙ্কর কুকুর। কুকুরদের মধ্যে দুটো বকসার বুলডগ, দুটো ডোবারম্যান, দুটো অ্যালসেশিয়ান, একটা চিশি সড়ালে। এদের দাপটে কেউ বাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে পারে না, তার ওপর গেটে বাহাদুর নামের নেপালি দারোয়ান আছে। তার কোমরে কুকরি, হাতে লাঠি। সদা সতর্ক, সদাতৎপর। সোমনাথবাবু এরকম সুরক্ষিত থাকতেই ভালবাসেন। তাঁর অনেক টাকা, হীরে জহরত সোনাদানা।

কিন্তু আজ সকালে সোমনাথবাবুকে খুবই অবাক হয়ে যেতে হলো। ঘড়িতে মোটে সাতটা বাজে। শীতকাল। সবে রোদের লালচে আভা চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক এই সময়ে বাগানের ফটক খুলে বেঁটেমত টাকমাথার একটা লোক ঢুকল। দারোয়ান বা কুকুরদের দিকে ভ্রূক্ষেপও করল না। পাথরকুঁচি ছড়ানো পথটা দিয়ে সোজা বারান্দার দিকে হেঁটে আসতে লাগল। আশ্চর্যের বিষয়, দিনের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেয়েও বাহাদুর তাকে বাধা দিল না এবং কুকুরেরাও যেমন খেলছিল তেমনিই ছোটাছুটি করে খেলতে লাগল। একটা ঘেউ পর্যন্ত করল না।

সোমনাথবাবু অবাক হয়ে চেয়েছিলেন। আশ্চর্য! খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার!

লোকটার চেহারা ভদ্রলোকের মতোই, মুখখানায় একটা ভালমানুষীও আছে, তবে পোশাকটা একটু কেমন কেমন, মিস্তিরি বা ফিটাররা যেমন তেলকালি লাগার ভয়ে ওভারল পরে, অনেকটা সেরকমই একটা জিনিস লোকটার পরনে। পায়ে এই শীতকালেও গামবুট ধরনের জুতো। কারও মাথায় এমন নিখুঁত টাকও সোমনাথবাবু কখনও দেখেননি। লোকটার মাথায় একগাছি চুলও নেই।

বারান্দায় উঠে আসতেই সোমনাথবাবু অত্যন্ত কঠোর গলায় বলে উঠলেন, "কী চাই? কার হুকুমে এ বাড়িতে ঢুকেছেন?"

লোকটা জবাবে পাল্টা একটা প্রশ্ন করল, "আপনি কি সকালের জলখাবার সমাধা করেছেন?"

সোমনাথবাবু খুব অবাক হয়ে বললেন, "না তো–ইয়ে–মানে আপনি কে বলুন তো?"

লোকটা মুখোমুখি একটা বেতের চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে বলল, "আমার খুবই খিদে পেয়েছে। হাতে বিশেষ সময়ও নেই।"

লোকটার বাঁ কবজিতে একটা অদ্ভুত দর্শন ঘড়ি। বেশ বড় এবং ডায়ালে বেশ জটিল সব ছোটো ছোটো ডায়াল ও কাঁটা রয়েছে।

সোমনাথবাবু একটু গলা খাঁকারি দিয়ে রাগটাকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করে বললেন, "দেখুন, আপনি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছেন। অচেনা বাড়িতে ফস করে ঢুকে পড়া মোটেই ভদ্রতাসম্মত নয়। তার ওপর বিনা নিমন্ত্রণে খেতে চাইছেন–এটাই বা কেমন কথা?"।

লোক্টা অবাক হয়ে বলে, "আপনার খিদে পেলে আপনি কী করেন?"

"আমি! আমি খিদে পেলে খাই, কিন্তু সেটা আমার নিজের বাড়িতে।"

"আমিও খিদে পেলে খাই।" এই বলে লোকটা মিটিমিটি হাসতে লাগল।

সোমনাথবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, "আপনি নিজের বাড়িতে গিয়ে খান না।"

লোকটা হাসি হাসি মুখ করেই বললেন, "আমার নিজের বাড়ি একটু দূরে। আমার গাড়িটা খারাপ হয়ে যাওয়ায় এখানে একটু আটকে পড়েছি।"

সোমনাথবাবু বিরক্তির ভাবটা চেপে রেখে বললেন, "আপনি আমার দারোয়ানকে ফাঁকি দিয়ে কুকুরগুলোর চোখ এড়িয়ে কী করে ঢুকলেন সেটাই আমি বুঝতে পারছি না। এ বাড়িতে কোনও লোক কখনও খবর দিয়ে ঢুকতে পারে না।"

লোকটা ভালোমানুষের মতো মুখ করে বলে, "সে কথা ঠিকই, আপনার দারোয়ান বা কুকুরেরা কেউই খারাপ নয়। ওদের ওপর রাগ করবেন না। আচ্ছা, আপনার কি সকালের দিকে খিদে পায় না? খেতে খেতে বরং দু-চারটে কথা বলা যেত।"

এই বলে লোকটা এমন ছেলেমানুষের মতো সোমনাথবাবুর মুখের দিকে চেয়ে রইল যে সোমনাথবাবু হেসে ফেললেন, তারপর বললেন, "আপনি একটু অদ্ভুত আছেন মশাই! আচ্ছা, ঠিক আছে, জলখাবার খাওয়াচ্ছি একটু বসুন।"

সোমনাথবাবু উঠে ভিতর বাড়িতে এসে রান্নার ঠাকুরকে জলখাবার দিতে বলে বারান্দায় ফিরে এসে স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন, তাঁর ভয়ংকর সাত সাতটা কুকুর বারান্দায় উঠে এসে বেঁটে লোকটার চারধারে একেবারে ভেড়ার মতো শান্ত হয়ে বসে মুখের দিকে চেয়ে আছে। আর লোকটা খুব নিম্নস্বরে তাদের কিছু বলছে।

সোমনাথবাবুকে দেখে লোকটা যেন একটু লজ্জা পেয়েই বলল, "এই একটু এদের সঙ্গে কথা বললুম আর কি। ওই যে জিমি কুকুরটা, ওর কিন্তু মাঝে মাঝে পেটে ব্যথা হয়, একটু চিকিৎসা করাবেন। আর টমি বলে ওই যে অ্যালসেশিয়ানটা আছে, ও কিন্তু একটু অপ্রকৃতিস্থ, সাবধান থাকবেন।"

সোমনাথবাবু এত বিস্মিত যে মুখে প্রথমটায় কথা সরল না। বিস্ময় কাটিয়ে উঠে যখন কথা বলতে পারলেন তখন গলায় ভাল করে স্বর ফুটছে না, "আপনি ওদের কথা বুঝতে পারেন? ভাবই বা হলো কী। করে?"

লোকটাও যেন একটু অবাক হয়ে বলে, "আপনি কুকুর পোষেন অথচ তাদের ভাষা বা মনের ভাব বোঝেন না এটাই বা কেমন কথা? ওরা তো আপনার কথা দিব্যি বোঝে। দু পায়ে দাঁড়াতে বললে দাঁড়ায়, পাশের ঘর থেকে খবরের কাগজ নিয়ে আসতে বললে নিয়ে আসে। তাই না? ওরা যা পারে আপনি তা পারেন না কেন?"

সোমনাথবাবুকে স্বীকার করতে হলো যে কথাটায় যুক্তি আছে। তারপর বললেন, "কিন্তু ভাব করলেন কী করে?"

"ওরা বন্ধু আর শত্রু চিনতে পারে।" সোমনাথবাবু আমতা আমতা করে বললেন, "কিন্তু বাহাদুর! বাহাদুর তো আমার মতোই মানুষ। তার ওপর ভীষণ সাবধানী লোক। তাকে হাত করা তো সোজা নয়।"

লোকটা মিটিমিটি হেসে বলে, "আমি যখন ঢুকছিলাম তখন বাহাদুর হাসিমুখে আমাকে একটা সেলামও করেছিল। শুধু আপনিই কেমন যেন আমাকে বন্ধু বলে ভাবতে পারছেন না।"

সোমনাথবাবু একটু লজ্জা পেয়ে বললেন, "মানে–ইয়ে–যাকগে, আমার এখন আর কোনও বিরূপ ভাব নেই।"

'আমার কিন্তু খুবই খিদে পেয়েছে।"

শশব্যস্ত সোমনাথবাবু বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, ব্যবস্থা হয়েছে। আসুন।"

লোকটার সত্যিই খুব খিদে পেয়েছিল, গোগ্রাসে পরোটা আর আলুর চচ্চড়ি খেল, তারপর গোটা পাঁচেক রসগোল্লাও। চা বা কফি খেল না। খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ে ব্যস্তসমস্ত হয়ে বলল, "আর সময় নেই, ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই রওনা হতে হবে।"

সোমনাথবাবু ভদ্রতা করে বললেন, "আপনি কোথায় থাকেন?"

"বেশ একটু দূরে। অনেকটা পথ।"

"গাড়িটা কি মেরামত হয়ে গেছে? নইলে আমি আমার ড্রাইভারকে বলে দেখতে পারি, সে গাড়ির কাজ খানিকটা জানে।"

লোকটা গম্ভীর হয়ে মাথা নাড়ল, "এ গাড়ি ঠিক আপনাদের গাড়ি নয়। আচ্ছা চলি।"

লোকটা চলে যাওয়ার পর সোমনাথবাবু বাহাদুরকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, "যে লোকটা একটু আগে এসেছিল তাকে তুই চিনিস? ফস করে ঢুকতে দিলি যে বড়?"

বাহাদুর তার ছোটো চোখ যথাসম্ভব বড় করে বলল, "কেউ তো আসেনি বাবু।"

'আলবাৎ এসেছিল, তুই তাকে সেলামও করেছিস।"

বাহাদুর মাথা নেড়ে বলে, "না, আমি তো কাউকে সেলাম করিনি। শুধু সাতটার সময় আপনি যখন বাড়ি ঢুকলেন তখন আপনাকে সেলাম করেছি।"

সোমনাথবাবু অবাক হয়ে বললেন, "আমি! আমি সকালে আজ বাইরেই যাইনি তা ঢুলুম কখন? ওই বেঁটে বিচ্ছিরি টেকো লোকটাকে তোর আমি বলে ভুল হলো নাকি?"

সোমনাথবাবু তার কুকুরদের ডাকলেন এবং একতরফা খুব শাসন করলেন, "নেমকহারাম, বজ্জাত, তোরা এতকালের ট্রেনিং ভুলে একজন অজ্ঞাতকুলশীলকে বাড়িতে ঢুকতে দিলি! টুঁ শব্দটিও করলি না!"

কুকুররা খুবই অবোধ বিস্ময়ে চেয়ে রইল।

মাসখানেক কেটে গেছে। বেঁটে লোকটার কথা একরকম ভুলেই গেছেন সোমনাথবাবু। সকালবেলায় তিনি বাগানের গাছগাছালির পরিচর্যা করছিলেন। তার সাতটা কুকুর দৌড়ঝাঁপ করছে বাগানে। ফটকে সদাসতর্ক বাহাদুর পাহারা দিচ্ছে। শীতের রোদ সবে তেজি হয়ে উঠতে লেগেছে।

একটা মোলায়েম গলাখাঁকারি শুনে সোমনাথবাবু ফিরে তাকিয়ে অবাক। সেই লোকটা। মুখে একটু ক্যাবলা হাসি।

সোমনাথবাবু লোকটাকে দেখে বিশেষ সন্তুষ্ট হলেন না। কারণ, আজও দেখছেন বাহাদুর লোকটাকে আটকায়নি এবং কুকুরেরাও নির্বিকার। সোমনাথবাবু নিরুত্তাপ গলায় বললেন, "এই যে! কী খবর?"

"আজ্ঞে খবর শুভ। আজও আমার বড্ড খিদে পেয়েছে।"

"তার মানে আজও কি আপনার গাড়ি খারাপ হয়েছে?"

'হ্যাঁ। দূরের পাল্লায় চলাচল করতে হয়, গাড়ির আর দোষ কী?"

"তা বলে আমার বাড়িটাকে হোটেলখানা বানানো কি উচিত হচ্ছে? আর আপনার গতিবিধিও রীতিমতো সন্দেহজনক। আপনি এলে দারোয়ান ভুল দেখে, কুকুরেরাও ভুল বোঝে। ব্যাপারটা আমার সুবিধে ঠেকছে না।"

লোকটা যেন বিশেষ লজ্জিত হয়ে বলে, "আমাকে দেখতে হুবহু আপনার মতোই কিনা, ভুল হওয়া স্বাভাবিক।"

সোমনাথবাবু এ কথা শুনে একেবারে বুরবক, “তার মানে? আমাকে দেখতে আপনার মতো! আমি কি বেঁটে? আমার মাথায় কি টাক আছে?”

লোকটা ঘন ঘন মাথা নেড়ে বলে, “না না, তা নয়। আপনি আমার চেয়ে আট ইঞ্চি লম্বা, আপনার হাইট পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি। আপনার মাথায় দু লক্ষ সাতাশ হাজার তিনশ পঁচিশটা চুল আছে। আপনি দেখতেও অনেক সুদর্শন। তবু কোথায় যেন হুবহু মিলও আছে।”

উত্তেজিত সোমনাথবাবু বেশ ধমকের গলায় বললেন, “কোথায় মিল মশাই? কিসের মিল?”

লোকটা একটা রুমালে টাকটা মুছে নিয়ে বলল, “সেটা ভেবে দেখতে হবে। এখন হাতে সময় নেই। আমার বড় খিদে পেয়েছে।”

সোমনাথবাবু অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, “খিদে পেয়েছে তো হোটেলে গেলেই হয়।”

লোকটা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল, “আমার কাছে পয়সা নেই যে!”

“পয়সা নেই!” এদিকে তো দিব্যি গাড়ি হাঁকিয়ে যাতায়াত করেন। তাহলে পয়সা নেই কেন?”

লোকটা কাঁচুমাচু মুখে পকেটে হাত দিয়ে একটা কাঠি বের করে বলল, “এ জিনিস এখানে চলবে?”

“তার মানে?”

“আমাদের দেশে এগুলোই হচ্ছে বিনিময় মুদ্রা। এই যে কাঠির মতো জিনিসটা দেখছেন এটার দাম এখানকার দেড়শ টাকার কাছাকাছি। কিন্তু কে দাম দেবে বলুন।”

সোমনাথবাবু ভ্রূ কুঁচকে বললেন, “কাঠি! কাঠি আবার কোথাকার বিনিময় মুদ্রা হলো! এসব তো হেঁয়ালি ঠেকছে।”

লোকটা একটু কাতর মুখে বলল, "সব কথারই জবাব দেবো। আগে কিছু খেতে দিন। বড্ড খিদে।"

সোমনাথবাবু রুষ্ট হলেন বটে, কিন্তু শেষ অবধি লোকটাকে খাওয়ালেনও। লোকটা যখন গোগ্রাসে পরোটা খাচ্ছে তখন সোমনাথবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা আপনার নাম বা ঠিকানা কিছুই তো বলেননি, কী নাম আপনার?"

লোকটা কাঁচুমাচু হয়ে বলে, "নামটা শুনবেন! একটু অদ্ভুত নাম কিনা, আমার নাম খ।"

সোমনাথবাবু চোখ কপালে তুলে বললেন, 'শুধু খ! এরকম নাম হয় নাকি?"

"আমাদের ওখানে হয়।"

"আর পদবি?"

"খ মানেই নাম আর পদবি। খ হলো নাম আর অ হলো পদবি। দুয়ে মিলেই ওই খ।"

"ও বাবা! এ তো খুব অদ্ভুত ব্যাপার।"

"আমাদের সবই ওরকম।"

"তা আপনার বাড়ি কোথায়?"

"একটু দূরে। সাড়ে তিনশো আল হবে।"

"আল! আল আবার কী জিনিস?"

"ওটা হলো দূরত্বের মাপ।"

"এরকম মাপের নাম জন্মে শুনিনি মশাই। তা আল মানে কত? মাইল খানেক হবে নাকি?"

লোকটা হাসল, "একটু বেশি। হাতে সময় থাকলে চলুন না, আমার গাড়িটায় চড়ে আলের মাপটা দেখে আসবেন।"

“না না, থাক।”

লোকটা অভিমানী মুখে বলে, “আপনি বোধহয় আমাকে ঠিক বিশ্বাস করছেন না! আমি কিন্তু ভাল লোক। মাঝে মাঝে খিদে পায় বলে হামলা করি বটে, কিন্তু আমার কোনও বদ মতলব নেই।”

সোমনাথবাবু লজ্জা পেয়ে বললেন, “আরে না না। ঠিক আছে, বলছেন যখন যাচ্ছি। তবে এ সময়ে আমি একটু ব্যস্ত আছি কিনা, বেশি সময় দিতে পারব না।”

“তাই হবে, চলুন, গাড়িটা পিছনের মাঠে রেখেছি।”

“মাঠে! ও তো ঠিক মাঠ নয়, জলা জায়গা, ওখানে গাড়ি রাখা অসম্ভব।”

“আমার গাড়ি সর্বত্র যেতে পারে। আসুন না দেখবেন।” কৌতূহলী সোমনাথবাবু লোকটার সঙ্গে এসে জলার ধারে পৌঁছে অবাক। কোথাও কিছু নেই।

“কোথায় আপনার গাড়ি মশাই?” বলে পাশে তাকিয়ে দেখেন লোকটাও নেই। সোমনাথবাবু বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেলেন।

অবশ্য বিস্ময়ের তখনও অনেক কিছু বাকি ছিল। ফাঁকা মাঠ, লোকটাও হাওয়া দেখে সোমনাথবাবু ফিরবার জন্য সবে পা বাড়িয়েছেন, এমন সময় অদৃশ্য থেকে লোকটা বলে উঠল, “আহা, যাবেন না, একটা মিনিট অপেক্ষা করুন।”

বলতে বলতেই সামনে নৈবেদ্যর আকারের একটা জিনিস ধীরে ধীরে ফুটে উঠতে লাগল। বেশ বড় জিনিস, একখানা ছোটোখাটো দোতলা বাড়ির সমান। নীচের দিকটা গোল, ওপরের দিকটা সরু।

“এটা আবার কী জিনিস?”

নৈবেদ্যর গায়ে পটাং করে একটা চৌকো দরজা খুলে গেল আর নেমে এল একখানা সিঁড়ি। লোকটা দরজায় দাঁড়িয়ে হাতজোড় করে বলল, “আসুন আসুন, আস্তাজ্ঞে হোক।”

সোমনাথবাবু এমন বিস্মিত হয়েছেন যে, কথাই বলতে পারলেন না কিছুক্ষণ। তারপর অস্ফুট গলায় তোতলাতে লাগলেন, “ভূ-ভূত! ভূ ভূতুড়ে!..”

লোকটা মাথা নেড়ে বলে, “না মশাই না। ভূতুড়ে নয়। গাড়িটা অদৃশ্য করে না রাখলে যে লোকের নজরে পড়বে। আসুন, চলে আসুন। কোনও ভয় নেই।”

সোমনাথবাবু এক পা পিছিয়ে গিয়ে বললেন, “ও বাবা, আপনি তো সাঙ্ঘাতিক লোক! আমি ও ফাঁদে পা দিচ্ছি না। আপনি যান, আমি যাবো না।”

লোকটা করুণ মুখে বলে, “কিন্তু আমি তো খারাপ লোক নই সোমনাথবাবু।”

সোমনাথবাবু সভয়ে লোকটার দিকে চেয়ে বললেন, “খারাপ নন, তবে ভয়ঙ্কর। আপনি গ্রহান্তরের লোক।”

“আজ্ঞে, আপনাদের হিসেবে মাত্র দু হাজার লাইট ইয়ার দূরে আমার গ্রহ। বেশ বড় গ্রহ। আমাদের সূর্যের নাম সোনা। সোনার চারদিকে দেড় হাজার ছোটো বড় গ্রহ আছে। সব কটা গ্রহই বাসযোগ্য। আপনাদের মতো মোটে একটা গ্রহে প্রাণী নয় সেখানে। সব ক’টা গ্রহেই নানা প্রাণী আর উদ্ভিদ। কোনও কোনও গ্রহে এখন প্রস্তরযুগ চলছে কোনওটায় চলছে ডায়নোসরদের যুগ কোথাও বা সভ্যতা অনেকদূর এগিয়ে গেছে, কোনও গ্রহে ঘোর কলি, কোনওটাতে সত্য, কোনওটাতে ত্রেতা, কোথাও বা দ্বাপর–সে এক ভারী মজার ব্যাপার। বেশি সময় লাগবে না, এ গাড়ি আপনাকে সব দেখিয়ে দেবে।”

“ওরে বাবা রে!” বলে সোমনাথবাবু প্রাণপণে পাঁই পাঁই করে ছুটতে লাগলেন বাড়ির দিকে। কিন্তু পারলেন না। একটা সাঁড়াশির মতো যন্ত্র পট করে এগিয়ে এসে তাকে খপ করে ধরে সাঁ করে তুলে নিল সেই নৈবেদ্যর মধ্যে।

তারপর একটা ঝাঁকুনি আর তারপর একটা দুলুনি। সোমনাথবাবুর একটু মূর্ছার মতো হলো। যখন চোখ চাইলেন তখন দেখেন নৈবেদ্যটা এক জায়গায় থেমেছে। দরজা খোলা। লোকটা একগাল হেসে বলল, “আসুন, ডায়নোসর দেখবেন না! ওই যে।”

দরজার কাছে গিয়ে সোমনাথবাবুর আবার মূর্ছা যাওয়ার যোগাড়। ছবিতে যেমন দেখেছেন হুবহু তেমনি দেখতে গোটা দশেক ডাইনোসর বিশাল পাহাড়ের মতো চেহারা নিয়ে চলাফেরা করছে। আকাশে উড়ছে বিশাল টেরোড্যাকটিল এবং অন্যান্য বিকট পাখি।

ভয়ে চোখ বুজলেন সোমনাথ। আবার দুলুনি। এবার যেখানে যান থামল সেখানে সব চামড়া আর গাছের ছালের নেংটি পরা মানুষ ঘষে ঘষে অস্ত্র তৈরি করছে। মহাকাশযান দেখে তারা অস্ত্র নিয়ে তেড়ে এল। দু-চারটে তীক্ষ্ণ পাথরের টুকরো এসে লাগলও মহাকাশযানের গায়ে। লোকটা তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে তার গাড়ি ছেড়ে দিল।

এবারের গ্রহটা রীতিমতো ভাল। দেখা গেল রামচন্দ্র আর লক্ষ্মণভাই শিকার করতে বেরিয়েছেন। দুজনেই খুব হাসছেন। রামচন্দ্রকে জোড়হাতে প্রণাম করলেন সোমনাথবাবু। রামচন্দ্র বরাভয় দেখিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়লেন।

সোমনাথবাবু ঘামতে ঘামতে বললেন, "এসব কি সত্যি? না স্বপ্ন দেখছি?"

"সব সত্যি। আরও আছে।"

"আমি আর দেখবো না। যথেষ্ট হয়েছে। মশাই, পায়ে পড়ি, বাড়িতে ফিরিয়ে দিয়ে আসুন।"

লোকটা বিনীতভাবে বলল, "যে আজ্ঞে। মাঝে মাঝে বেড়াতে আসবেন। আরও কত কী দেখার আছে।"

মহাকাশযানটা ফের শূন্যে উঠল। সেই দুলুনি। কিছুক্ষণ পর জলার মাঠে নেমে পড়তেই সোমনাথবাবু প্রায় লাফ দিয়ে বেরিয়ে এলেন।

লোকটা পিছন থেকে চেঁচিয়ে বলল, "দাদা, একটু মনে রাখবেন আমাকে, মাঝে মাঝে বিপদে পড়ে এসে পড়লে পরোটা-টরোটা যেন পাই।"

"হবে, হবে।" বলতে বলতে সোমনাথবাবু বাড়ির দিকে ছুটতে লাগলেন।

# শক্তিপরীক্ষা

**শক্তিপরীক্ষা**

রামরিখ পালোয়ান রাজবাড়ি চলেছে। সেখানে আজ বিরাট শক্তি পরীক্ষা। নানা দেশ থেকে বহু পালোয়ান জড়ো হবে। তারপর কার কত শক্তি তার পরীক্ষা দিতে হবে। কুস্তি-টুস্তি নয়, শুধু যতটা পারে নিজের শক্তি দেখাবে, তা যে যেভাবে পারে।

রামরিখ ভেবেচিন্তে একটা পাঁচ মন ওজনের লোহার গদা নিয়েছে। এইটা সে বাই বাই করে ঘুরিয়ে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে। গদাটা একটা গরুর গাড়িতে করে পিছনে আসছে।

রামরিখ আজ ধুতি পরেছে। গায়ে রঙিন জামা, মাথায় পাগড়ি। মাঝে মাঝে গোঁফে তা দিতে দিতে নাগরা জুতোর শব্দ তুলে হাঁটছে। মনে একটা স্ফূর্তি। তার ধারণা, আজকের পরীক্ষায় সেই আসর মাত করে আসবে। ওস্তাদকে একশ মোহর পুরস্কার দেওয়া হবে।

রাজবাড়ি আর বেশি দূরে নয়। দুখানা গ্রাম পেরোলেই শহর। শহরের মাঝখানে মস্ত রাজবাড়ি। চারদিকে বিশাল অঙ্গন। আজ হাজার হাজার মানুষ পালোয়ানদের দেখতে আসবে।

সামনেই একটা গরুর গাড়ি যাচ্ছে। গরুর গাড়িতে একটা বড়সড় চেহারার লোক বসে বসে ঢুলছে। রামরিখ দেখতে পেল গরুর গাড়িটা রাস্তায় একটা খাদে পড়ে একটা ঝাঁকুনি খেয়ে আটকে গেছে। বলদ দুটো টেনে তুলতে পারছে না। যে লোকটা ঢুলছিল সে একটু বিরক্ত হয়ে নেমে পড়ল। মালকোচা মারছে। রামরিখ কাঁধ দিয়ে একটা চড় মেরে গরুর গাড়িটা খাদ থেকে তুলে নিয়ে বলল, সামান্য কাজ।

মোটাসোটা লোকটা তার দিকে চেয়ে একটু আড়মোড়া ভেঙে বলল, পালোয়ান নাকি তুমি?

ওই সামান্য কিছু চর্চা করি আর কি।

বেশ, বেশ। বলে লোকটা একটু হাসল, তা তোমার জিনিসপত্র কই?

ওই যে গরুর গাড়িতে। পাঁচ মন ওজনের গদা।

লোকটি অবাক হয়ে বলে, পাঁচ মন? যাঃ–

কথা কইতে কইতে পিছনের গরুর গাড়িটার কাছে চলে এল। রামরিখ গদাটা দেখিয়ে বলল, ওই যে।

লোকটা গদাটা দেখে বলল, এটা ফাপা জিনিস নয় তো?

রামরিখ হেসে বলল, আরে না, নিরেট লোহার গদা।

হতেই পারে না। বলে লোকটা গদাটা তুলে নিয়ে হাতে নাচিয়ে একটু দেখে নিয়ে হঠাৎ নিজের হাঁটুটা তুলে গদাটা তার ওপর রেখে দু'হাতের চাড় দিয়ে মচাৎ করে গদাটা দু-আধখানা করে ভেঙে ফেলল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, নাঃ, নিরেট জিনিসই বটে হে।

রামরিখ হাঁ করে চেয়ে রইল। লোহার গদা কেউ ভাঙতে পারে এ তার জানা ছিল না।

লোকটা মুখে একটু দুঃখপ্রকাশ করে বলল, সামনের গায়েই কামারশালা আছে, জুড়ে নিও ভাই। অসাবধানে তোমার খেলনাটা ভেঙে ফেলেছি। বলে লোকটা চলে গেল।

রামরিখ গদাটা কামারশালায় জুড়ে নিতে গাঁয়ে ঢুকল। একটু চিন্তিত। মনে আর তত স্ফূর্তি নেই।

কামার ভীষণ ব্যস্ত। বলল, আমার যে গদা জোড়া দেওয়ার সময় নেই। রামরিখ করুণ গলায় বলল, ভাই, আমি যে রাজবাড়ির শক্তি পরীক্ষায় যাচ্ছি। সময় নেই, একটু করে দাও ভাই।

কামার খুবই বিরক্ত হয়ে বলল, কোথায় তোমার গদা?

এই যে! বলে গদার টুকরো দুটো দু'হাতে তুলে বলল, এইটুকু গদা! বলে কামারশালার আর এক কোণে অন্তত একশ হাত দূরে যেখানে তার ছোট ছেলেটা কাজ করছিল সেদিকে ছুঁড়ে দিতে দিতে বলল, ওরে বিশে এ-দু'টো টুকরো জুড়ে দে তো।

বিশে একটা টুকরো বাঁ হাতে, অন্যটা ডান হাতে লুফে নিয়ে বলল, দিই বাবা।

রামরিখ অপোবদন হয়ে বসে রইল। গদা জুড়ে নিয়ে রামরিখ ফের যখন রওনা হল তখন তার পা চলছে না। মনটা বড়ই খারাপ।

আর একটা গাঁ পেরোলেই শহর। রাস্তার পাশে কতগুলো ছেলে ডাংগুলি খেলছিল। কী কারণে তাদের মধ্যে একটু বিবাদ হয়েছে। হঠাৎ একটা ছেলে ছুটে এসে বলল, মশাই, আপনার ডাণ্ডাটা একটু ধার দেবেন? আমরা এই পাটিটা খেলেই দিয়ে দেব। আমাদের ডাণ্ডাটা ভেঙে গেল কি না এই মাত্র।

বলেই ছেলেটা গদাটা গরুর গাড়ির ওপর থেকে তুলে নিয়েই ছুট। রামরিখ দাঁড়িয়ে দেখল, ছেলেটা তার গদা দিয়ে গুটি তুলল, তারপর সেই গুটি সত্তর হাত দূরে পাঠাল। গদা দিয়ে একহাতে দূরত্বটা মাপল। তারপর দৌড়ে এসে ফের গরুর গাড়িতে গদাটা রেখে ছুটে গেল।

রামরিখ আর এগোল না। গরুর গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই ফেরত যেতে লাগল।

# শিবেনবাবু ভাল আছেন তো

**শিবেনবাবু ভাল আছেন তো**

হরসুন্দরবাবু একটু নাদুসনুদুস, ধীর স্থির শান্ত প্রকৃতির মানুষ। তিনি কোঁচা দুলিয়ে ধুতি পরেন, ফুলহাতা জামার গলা অবধি বোতাম আঁটেন, কখনও হাতা গোটান না। শীত-গ্রীষ্ম সব সময়ে তিনি হাঁটু অবধি মোজা আর পাম্পশু পরেন। তাঁর বেশ মোটা এক জোড়া গোঁফ আছে। চুলে পরিপাটি সিঁথি। হরসুন্দরবাবু খুব নিরীহ মানুষও বটে।

সেদিন মাসের পয়লা তারিখ। হরসুন্দরবাবু সেদিন বেতন পেয়েছেন। সন্ধ্যেবেলা বাড়ি ফিরছেন। যে গলিটায় তিনি থাকেন সেটা বেশ অন্ধকার, পাড়াটাও ভাল নয়। হরসুন্দরবাবু গলিতে ঢুকে কয়েক পা এগোতেই তিনটে ছোকরা তাকে ঘিরে ফেলল। একজন বুকে রিভলভার ঠেকাল, একজন পেটে আর অন্যজন পিঠে দুটো ছোরা ধরল। রিভলভারওলা বলল, চেঁচাবেন না। যা আছে দিয়ে দিন।

হরসুন্দরবাবু খুবই ভয় পেলেন। ভয়ে তার গলা কাঁপতে লাগল। বললেন, প্রাণে মেরো না ভাই। দিচ্ছি।

মাইনের পুরো টাকাটা নিয়ে তিনজন হাপিস হয়ে গেল। হরসুন্দরবাবু ভয়ে চেঁচামেচি করলেন না। যদি তারা ফিরে আসে! বাড়িতে ফিরেও কারও কাছে ঘটনাটা প্রকাশ করলেন না। ভাবলেন, এ মাসটা ধারকর্জ করে চালিয়ে নিলেই হবে।

তা নিলেনও হরসুন্দরবাবু। একটা মাস দেখতে দেখতে চলে গেল। আবার পয়লা তারিখ এল। হরসুন্দরবাবু আবার বেতন পেলেন।

ফেরার সময় যখন গলির মধ্যে ঢুকলেন তখন আচমকা ফের তিনটে লোক ঘিরে ধরল। বুকে রিভলভার, পেটে-পিঠে ছোরা।

রিভলভারওলা বলল, যা আছে দিয়ে দিন। চেঁচাবেন না।

হরসুন্দরবাবু ফের ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, প্রাণে মেরো না ভাই। দিচ্ছি।

মাইনের টাকা নিয়ে লোক তিনটে হাপিস হয়ে গেল।

হরসুন্দরবাবু এবারও বাড়ি ফিরে কাউকে কিছু বললেন না। ভাবলেন, এ মাসটাও কোনওরকমে চালিয়ে নেবেন।

কষ্ট হলো যদিও, কিন্তু হরসুন্দরবাবু চালিয়েও নিলেন। ফের পয়লা তারিখ এল। হরসুন্দরবাবু বেতন পেলেন।

বাড়ি ফেরার সময় অন্ধকার গলিতে ঠিক আগের মতোই তিনটে লোক ঘিরে ধরল তাঁকে। বুকে, পিঠে, পেটে ঠিক একই জায়গায় রিভলভার আর ছোরা ধরল। একই কথা বলল এবং বেতনের টাকাটা নিয়ে হাওয়া হলো।

হরসুন্দরবাবুর আজ চোখে জল এল।

বাড়ি ফিরে তিনি গুম হয়ে রইলেন। রাতে ভাল করে খেলেন না। গভীর রাতে তিনি ছাদে উঠে চুপ করে আকাশের দিকে চেয়ে অসহায়ভাবে ভাবলেন, কী যে করব বুঝতে পারছি না।

কাছেপিঠে কে যেন একটা হাই তুলল, তারপর আঙুল মটকানোর শব্দ হলো, তারপর বলল “হরি, হরি”। হরসুন্দরবাবু চারদিকটা চেয়ে দেখলেন। ছাদ জনশূন্য, শীতকালের গভীর রাতে ছাদে আসবেই বা কে?

তিনি কঁপা গলায় জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কে?

ভেবে দেখতে হবে হে, ভেবে দেখতে হবে।

তার মানে?

কতবার জন্মেছি তার কি হিসেব আছে? কোন জন্মে কে ছিলুম তা যে গুবলেট হয়ে যায় বাপ। এ জন্মে বিশু তো ও জন্মে নিতাই, পরের জন্মে হয়তো চীনেম্যান চাঁই চুঁই।

আ-আপনি কোথায়? দে-দেখতে পাচ্ছি না তো?

গলার স্বরটা খিঁচিয়ে উঠে বলল, দেখার চোখ আছে কি তোমার যে দেখবে? সারাদিনই তো তোমার ধারে-কাছে ঘুরঘুর করি, দেখতে চেয়েছো কি কখনও?

আজ্ঞে, আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না। ভয় পাচ্ছি, মাথা ঝিমঝিম করছে।

আ মোলো! এ যে ভাল করতে এসে বিপদ হলো। আ-আপনি কি চান?

তোমার মতো গবেটদের কান দুটো মলে দিতেই চাই হে। কিন্তু বিধি বাম, সে উপায় নেই।

আমি কী করেছি? আপনি আমার ওপর রাগ করছেন কেন? রাগ করব না? তিনটে কাঁচা মাথার ছোঁড়া তিন তিনবার যে তোমাকে বোকা বানাল তা থেকে শিক্ষা পেয়েছো কি? কিছু করতে পারলে?

আজ্ঞে কী করব? তাদের হাতে যে ছোরা আর বন্দুক।

আর তোমার বুঝি কিছু নেই?

আজ্ঞে না।

কে বলল নেই?

ইয়ে, আমার বন্দুক, পিস্তল বা ছোরাছুরি নেই। তবে আমার গিন্নির একখানা বঁটি আছে, আর আমার ছেলে ভুতোর একটা পেনসিল কাটা ছুরি আছে, আর আমার মায়ের বেড়াল তাড়ানোর জন্য একখানা ছোটো লাঠি আছে।

আহা, ওসব জানতে চাইছে কে? বঁটি-লাঠির কথা জিজ্ঞেস করেছি কি তোমায়? বলি এসব ছাড়া তোমার আর কিছু নেই?

আজ্ঞে, মনে পড়ছে না। শুনেছি আমার ঠাকুরদার একটা গাদা বন্দুক ছিল।

গবেট আর কাকে বলে? বলি বন্দুক-টক ছাড়া আর কিছু নেই তোমার?

আজ্ঞে না।

বলি, বুদ্ধি বলে একটা বস্তু আছে জানো তো!

জানি।

তোমার সেটাও নেই?

আজ্ঞে, ঠিক বুঝতে পারছি না।

একটা দীর্ঘশ্বাসের আওয়াজ হলো। তারপর গলার স্বরটা বলল, শোনো, এবার যখন ওই মর্কটগুলো তোমাকে পাকড়াও করবে তখন একটুও ঘাবড়াবে না। হাসি-হাসি মুখ করে শুধু জিজ্ঞেস করবে, আচ্ছা, শিবেনবাবু ভাল আছেন তো?

শুধু এই কথা বললেই হবে?

বলেই দেখ না!

তৃতীয় মাসটাও কষ্টেসৃষ্টে কেটে গেল। আবার পয়লা তারিখ এল এবং হরসুন্দরবাবু আবার বেতন পেলেন।

বাড়ি ফেরার সময় বুকটা দুরুদুরু করছিল। যে-কথাটা বলতে হবে তা বারবার বিড়বিড় করে আওড়াচ্ছেন। হাত-পা কাঁপছে, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। গলির মুখে এসে একটু থমকে দাঁড়ালেন। তারপর দুর্গা বলে অন্ধকারে পা বাড়ালেন।

কয়েক পা যেতে না যেতেই তিন মূর্তি ঘিরে ফেলল তাকে। বুকে পিস্তল, পেটে আর পিঠে ছোরা। পিস্তলওলা বলল, চেঁচাবেন না। যা আছে দিয়ে দিন।

জীবনে কোনও সাহসের কাজ করেননি হরসুন্দরবাবু। আজই প্রথম করলেন। জোর করে মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা, শিবেনবাবু ভাল আছেন তো?

ছেলে তিনটে হঠাৎ যেন থমকে গেল। আর তার পরেই দুড়দাড় দৌড়ে এমনভাবে পালাল যেন ভূত দেখেছে।

হরসুন্দরবাবু খুবই অবাক হয়ে গেলেন। এই সামান্য কথায় এত ভয় পাওয়ার কী আছে? যাক গে, এবার মাইনের টাকাটা তো বেঁচে গেল!

না, এর পর থেকে হরসুন্দরবাবুকে আর ওদের পাল্লায় পড়তে হয়নি বটে, কিন্তু তার ধাঁধাটা গেল না। এই তো সেদিন তার অফিসের বড়বাবু তাকে কাজের একটা ভুলের জন্য খুব বকাঝকা করে চার্জশীট দেন আর কি। হরসুন্দরবাবু শুধু হাসি-হাসি মুখ করে তাকে বলেছিলেন, আচ্ছা, শিবেনবাবু ভাল আছেন তো! তাইতে বড়বাবু এমন ঘাবড়ে গেলেন যে আর বলার নয়। তারপর থেকে খুব ভাল ব্যবহার করে যাচ্ছেন।

সেদিন বাজার থেকে পচা মাছ এনেছিলেন বলে হরসুন্দরের গিন্নি তাকে খুবই তুলোধোনা করছিলেন। হরসুন্দরবাবু তাকেও বললেন, আচ্ছা, শিবেনবাবু ভাল আছেন তো? গিন্নি একেবারে জল।

হ্যাঁ, এখন হরসুন্দরবাবু খুবই ভাল আছেন। কোনও উদ্বেগ, অশান্তি নেই। বিপদ দেখা দিলেই তিনি শুধু বলেন, আচ্ছা, শিবেনবাবু ভাল আছেন তো! মন্ত্রের মতো কাজ হয়।

# সূত্রসন্ধান

---

**সূত্রসন্ধান**

ছেলেবেলা থেকেই–অর্থাৎ যখন আমার বয়স ছয় কি সাত–তখন থেকেই আমার ভিতরে একরকমের অদ্ভুত অনুভূতি মাঝে মাঝে দেখা দিত। এই অনুভূতি কিরকম তা স্পষ্ট করে বোঝানো খুব শক্ত। তবে একথা বলা যায় যে, অনুভূতিটা একধরনের অবাস্তবতার। একা একা থাকলে হঠাৎ কখনো চারদিকে চেয়ে মনে হত–আমার চারদিকে যা রয়েছে–গাছপালা, কিংবা ঘরের দেয়াল, আসবাব, কিংবা মানুষ–এরা সবাই অবাস্তব, মিথ্যে। এসব জিনিসপত্র, গাছপালা এরা কোনোটাই সত্য নয়। এরকম ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ মাথা গুলিয়ে উঠত। ওই চিন্তা মুহূর্তের মধ্যে প্রবল আকার ধারণ করত, মনে হত–এই পৃথিবীতে যা আমি চোখের সামনে দেখছি তা সবই এক অদ্ভুত উদ্ভট অবাস্তব ব্যাপার, এসবের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ নেই। আমি এই পৃথিবীর কেউ না। এই প্রত্যক্ষ বস্তুগুলি, এই আলো-অন্ধকার, এই প্রিয়জন–এসবই যেন আমার চারদিকের এক মিথ্যে, অলীক আবরণ মাত্র। ভাবতে ভাবতেই আমার শরীর যেন ঊর্ধ্বদিকে উঠতে থাকত, গা শিউরোতো। আমার মনে হত এক ভীষণ যন্ত্রণায় আমার মাথা ফেটে যাচ্ছে। আমার মন কিছুতেই এই চিন্তা তখন আর করতে চাইত না, কিন্তু চিন্তা তখন আমাকে ছাড়তও না । বেশ কয়েকটা ঝাঁকুনি দিত আমাকে। কিছুক্ষণ আমি আমার মধ্যে থাকতাম না। এই অনুভূতি আমার শরীরে এবং মনে এত প্রকট এবং প্রবলভাবে দেখা দিত যে, আমার বিশ্বাস ছিল এটা আমার অসুখ। সাঙ্ঘাতিক ধরনের কোনো অসুখ।

অস্বীকার করা যায় না, এটা একরকমের অসুখই। অবাস্তবতার এই অনুভূতির দার্শনিক ব্যাখ্যা থাকতে পারে। পরবর্তীকালে কবি ওয়ার্ডওয়ার্থের জীবনী পড়তে গিয়ে দেখেছি, তারও অনেকটা এ ধরনের অনুভূতি হত। তিনি তখন দেয়ালে বা মাটিতে হাত চেপে ধরতেন, শরীরে ব্যথা দিতেন, এবং আস্তে আস্তে সেই শারীরিক

বেদনা তার মানসিক ক্লেশকে উপশমিত করত। এ মুষ্টিযোগ আমার জানা ছিল না। তবে ওই অনুভূতি টের পেলেই আমি জলে-ডোবা মানুষের মতো প্রাণপণে মনের ওপর ভেসে থাকতে চাইতাম। বাস্তবিক ওই সময়ের অভিজ্ঞতা ছিল, যেন আমি এক অথৈ অনন্ত জলে ডুবে যাচ্ছি।

বছরে এরকম হত দুবার কি তিনবার। প্রথম প্রথম অনেকদিন বাদে বাদে হত। অনেক সময়ে ছেলেমানুষি বুদ্ধিবশত আমি ইচ্ছে করেই ওই অনুভূতিটা আনতে চেষ্টা করতাম। হাতে হয়ত কোনো কাজ নেই, খেলা নেই, একা ঘরে বসে আছি, সে সময়ে হঠাৎ ভাবতাম–আচ্ছা, আমার যদি এখন ওরকম হয় তবে কী হবে। এই ভেবে আমি চারদিকে চেয়ে গাছপালা, কি দেয়াল, কি আসবাব ইত্যাদিকে অবাস্তব, অলীক ভাবতে চেষ্টা করতাম। আশ্চর্য এই যে, চেষ্টা করার সঙ্গে সঙ্গে আমার গায়ের রোম দাঁড়িয়ে যেত, আমার শরীর হাল্কা হয়ে যেন ওপরে উঠে যেতে থাকত এবং মনের ভিতরে এক অথৈ কূলকিনারাহীন কালো জল আমাকে গভীরে আকর্ষণ করত। এরকম ভাব স্থায়ী হত বড়জোর এক-আধ মিনিট। কিন্তু ওই এক-আধ মিনিট সময়েই আবার যন্ত্রণা এবং ভয় চূড়ান্ত জায়গায় উঠে যেত। চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করত। আমার ঘাম দিয়ে বোধটা প্রশমিত হত। আস্তে আস্তে স্বাভাবিকতা ফিরে পেতাম। শরীর এবং মন ক্লান্ত লাগত।

বয়স বাড়ে । খেলাধুলো, বন্ধুবান্ধব, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা সবই নিয়মানুসারে বেড়ে যায়। বাইরের ব্যস্ততা যখন নিজের মনকে আচ্ছাদন দিয়ে রাখে তখন মন দিয়ে খেলা আপনিই কমে যায়। একটু বয়স বাড়লে আমারও ওই খেলা কমে গিয়েছিল। কমলেও কিন্তু ছাড়েনি। বছরে এক-আধবার হতই। বড় ভয় পেতাম। মাকে গিয়ে বলতাম,মা, আমার মাঝে মাঝে কীরকম যেন সব মনে হয়।

মা জিজ্ঞেস করতকী রকম?

ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারতাম না। মা-ও বুঝতে পারত না, কিন্তু ভয় পেতো। বলত– ওসব ভাবিস কেন! না ভাবলেই হয়।

আমি নিজের ইচ্ছায় যে সব সময়ে ভাবতাম তা নয়। আমার আজও মনে আছে যে আমি ইচ্ছে না করলেও কে যেন জোর করে আমার ভিতরে ইচ্ছেটাকে তৈরি করে দিত। ভাবতে চাইছি না, তবু আমার ভিতরকার এক অবাধ্য দুরন্ত বালক যেন জোর করে আমাকে ভাবিয়ে তুলছে।

আমার বাবার ছিল রেলের চাকরি। ফলে একজায়গায় বেশিদিন থাকা আমাদের হত না। নানা জায়গায় ঘুরে বেড়াতে হত। সেই সব জায়গায় সর্বত্র তখন লোকালয় ছিল না। কোনো টিলার ওপরে বা নির্জন জায়গায় বাবা কোয়ার্টার বা বাংলা পেতেন। আমাদের পরিবারে লোকসংখ্যাও ছিল সামান্য। দিদি, আমি, ছোটো বোন, ভাই তখনো হয়নি। সেই সব নির্জন জায়গায় আমার বন্ধু জুটত কমই। যা-ও জুটত তারা ছিল কুলিকামিন বা বাবুর্চি বেয়ারার ছেলেরা। তারা আমার সঙ্গী হয়ে উঠত, বন্ধু হতে পারত না। ফলে মনের দিক থেকে একাকিত্ব কখনও ঘুচত না। পৃথিবীতে বন্ধুর মতো জিনিস খুব কমই আছে। যার সৎ বন্ধু থাকে তার অনেক মনের অসুখ ভাল হয়ে যায়। সেই বয়সে বন্ধুভাগ্য আমার ছিলই না। ফলে ওই মানসিক একাকিত্ব আমার ওই অসুখটাকে বাড়িয়েই তুলত। কিছু করার ছিল না। গুরুজনদের বুঝিয়ে বলতে পারতাম না বলে সেই যন্ত্রণা একা সহ্য করতে হত।

ক্রমে বড় হয়ে উঠতে উঠতে আত্মসচেতনতা বাড়তে লাগল। খেলাধুলো করি, স্কুলে যাই, দুষ্টুমি করে বেড়াই। বাইরে থেকে দেখে স্বাভাবিক অন্য ছেলেদের মতোই লাগে আমাকে। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আমার বিশিষ্ট এক ‘আমি’ তৈরি হতে থাকে। সব মানুষেরই যেমন হয়।

উল্লেখের বিষয় এই যে, আমার ছেলেবেলাতেই যে আমি’ তৈরি হয়েছিল তার বৈশিষ্ট্য ছিল বিষণ্নতা, অন্যমনস্কতা, চিন্তাশীলতা, একাকিত্ববোধ, নিঃসঙ্গতা। এই ধরনের ছেলেরা সাধারণত বই পড়তে ভালবাসে। খেলাধুলো বা আমোদপ্রমোদে, লোকসঙ্গে, ভিড়ে তেমন আনন্দ পায় না। বই পড়তে পড়তে বল্গাহীন কল্পনাকে ছেড়ে দেওয়া, অবাধ চিন্তার রাজ্যে প্রিয় নির্বাসন–এর চেয়ে স্বাদু আমার কিছুই ছিল না। কাজেই অনিবার্যভাবে বাস্তবতাবোধ, কর্মপ্রিয়তা বা কোনো কাজে পটুত্ব কমে যেতে লাগল। কল্পনাবিলাসীর ভাগ্য যে রকম হয়ে থাকে। চিন্তার রাজ্যে যে রাজা উজীর, বাস্তবক্ষেত্রে সে প্রায় অপদার্থ।

খেলাধুলোয় আমার খানিকটা দখল ছিল। বলে শট মারতে ভালই পারতাম, ক্রিকেটে ব্যাট চালানো আনাড়ির মতো ছিল না, হাইজাম্প লঙজাম্প বা দৌড়ে পটুত্ব না থাক, অভ্যাস ছিল। অনুষ্ঠান বা সাংস্কৃতিক সম্মেলনে কবিতা আবৃত্তি করতাম। কিন্তু সেগুলো ছিল আমার মনের উপরিভাগের ব্যাপার। মনের গভীরতার স্তরেও বাইরের এসব দৌড় লাফ আবৃত্তি তরঙ্গ তুলত। সেখানে ছিল এক অনপনেয় স্পর্শকাতরতা, আত্মচিন্তা, অভিমান। বাইরের জীবনের যত

অকৃতিত্ব রাগ-ক্ষোভ সব সেখানে গিয়ে বাসা বাঁধত এবং সমস্ত আঘাতই সেখানে বারংবার কল্পনার রাজ্যের দরজার পাল্লা উন্মোচিত করে দিত। বাইরের জগতের ব্যর্থ 'আমি' সেই কল্পনার জগতে আশ্রয় পেতাম। কল্পনার জগতে বহু মানুষেরই বিচরণ-তবে তার তারতম্য আছে। নিজেকে নিয়ে যার যত চিন্তা, অস্বস্তি, আত্মমগ্নতা তার বাস্তববুদ্ধি তত কম, আঘাত সহ্য করার শক্তি সামান্যই, আত্মনির্ভরশীলতা প্রায় শূন্য। আমারও সেই বিপদ দেখা দিতে লাগল। আমি আরো বেশি করে বই আর বইয়ের মধ্যে ডুবে যেতে লাগলাম। হাতে যখন বই থাকত না তখন মনে কল্পনা থাকত।

যে অনুভূতির কথা বলছিলাম তার বীজ সম্ভবত নিহিত ছিল এখানেই। চারিদিকের পৃথিবী এবং ঘটনাপ্রবাহে অবগাহন না করলে মনটা কেবলই শিকড়হীন গাছের মতো নিজের চারধারে পাক খেয়ে শুকিয়ে কুঁকড়ে যায়। বাস্তবতার জ্ঞানবর্জিত মন হচ্ছে আত্মভু। নিজের মজ্জা-মাংস-রক্ত ছাড়া সে আর খাদ্য-পানীয় পাবে কোথায়? ফলে তার দেহের পুষ্টি এবং লাবণ্য সঞ্চার হচ্ছিল না। অল্পবয়সেই আমার মুখচোখে বিষণ্নতা ভর করতে লাগল।

মাঝে মাঝে কাজে অকাজে বাল্যকালের সেই অনুভূতি দেখা দেয়। সেই অনুভূতির বিস্ময়বোধ আমাকে ভীত, চঞ্চল করে তোলে। সমাধান পাই না। বাল্যকাল চলে গিয়ে কৈশোর আসছে–টের পাচ্ছি। দেহটি যষ্টির মতো সরল সোজা ওপরে উঠে যাচ্ছে, রোগা হাড়সার দেহ, অন্যমনস্ক, চিন্তাশীল, রুগ্ণ এক কিশোর। বই পড়তে ভালবাসে, কিন্তু পড়ার বইতে তার অনীহা। অর্থাৎ যা-কিছু কাজের কাজ তার কোনোটাতেই আগ্রহ নেই।

মনে আছে আলিপুরদুয়ারে এক স্পোর্টসে নাম দিয়েছি। অঙ্ক রেস। দর্শকদের মধ্যে আমার মা-বাবা, ছোটো দুটি ভাইবোন আর দিদিও রয়েছে। তাদের জন্যই বড় লজ্জা করছিল আমার। দৌড় শুরু হল। কুণ্ঠাজড়ানো পায়ে দৌড়ে গিয়ে কাগজের ওপর লেখা অঙ্কে উপুড় হয়ে পড়লাম। যোগ শেষ করে সবার আগে উঠেছি, দৌড়ে যাচ্ছি। নিশ্চিত ফাস্ট, কেউ ঠেকাতে পারবে না। হঠাৎ মনে হল, কাগজে নাম লেখা হয়নি। নাম লেখা না হলে বিচারকর্তা বুঝবে কি করে যে অঙ্কটা আমিই করেছি। ভেবে দাঁড়িয়ে পড়লাম। ফিরে যাবো? নামটা লিখে নিয়ে আসবো? ভাবতে ভাবতেই আর একটা ছেলে উঠে দৌড়ে এল। দেখতে পেলাম আমার প্রথম স্থান হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। অথচ কাগজে নামও লেখা হয়নি। এই কয়েক মুহূর্তের দ্বিধা-সঙ্কোচের সুযোগে ছেলেটা আমাকে পিছনে ফেলে দৌড়ে

গিয়ে তার কাগজ জমা দিল। তখন বোকার মতো অগত্যা আমিও গিয়ে নামহীন কাগজ জমা দিলাম। অঙ্ক-রেসের নিয়ম অনুযায়ী অঙ্ক ভুল হলে ফার্স্ট হলেও ফাস্ট হবে না। অঙ্ক ঠিক হওয়া চাই। অত প্রতিযোগীর মধ্যে আমরা যে প্রথম দুজন তাদেরই অঙ্ক ঠিক হয়েছিল। ফার্স্ট হল সেই ছেলেটা, আমি সেকেন্ড। পরে জানতে পারলাম সেই ছেলেটাও কাগজে নাম লেখেনি। কিন্তু তার বাস্তববুদ্ধি প্রখর বলে সে নাম লেখার কথা ভাবেওনি। আমি ভাবতে গিয়ে তার অনেক আগে অঙ্ক শেষ করেও পিছিয়ে পড়েছি। সেদিনই বুঝতে পারি, আমার সবচেয়ে বড় শত্রু হচ্ছে দ্বিধা। সেই অঙ্ক-রেসের শেষে মা হতাশ হয়ে বলেছিলেন –সবার আগে তুই উঠেছিস দেখে ভাবলাম যাক রুনু এবার ফাস্ট হবে। ওমা মাঝরাস্তায় দেখি ক্যাবলার মতো দাঁড়িয়ে আছিস হাঁ করে। কী অত ভাবছিলি? বলে রাখা ভাল যে সেই রেসে সেকেন্ড প্রাইজ ছিল না।

পরবর্তীকালে বহুবার দেখেছি সবার আগে উঠেও দৌড় শেষ করতে পারছি না। পৃথিবীতে সঠিক জায়গায় নিজেকে নিয়োগ করতে হলে খানিকটা আবেগহীন দ্বিধাশূন্য নিষ্ঠুরতা দরকার। জানা দরকার বাস্তব কলাকৌশল। নিজের ভুল ত্রুটি নিয়ে মাথা ঘামানোর চেয়ে সর্বদা নিজেকে এগিয়ে রাখার চেষ্টাই ভাল। কিন্তু তা তো হল না।

বাঙালি ছেলেদের যে ভাবপ্রবণতার কথা শোনা যায় তা মিথ্যে নয়। আমার ভিতরে এই ভাবপ্রবণতার বাড়াবাড়ি বরাবর ছিল। সহজ আবেগে উদ্বেলিত হই, সহজ দুঃখে কাতর হয়ে পড়ি। চোখের সামনে পুজোবাড়ির বলি দেখে ভয়ঙ্কর মন খারাপ হয়। মনের এই ন্যাতানো স্বভাব থাকলে বড় হওয়ার পথে নানারকম বাধাবিপত্তির সৃষ্টি হয়। ভাবাবেগ জিনিসটা খারাপ নয়, অনেক আঘাত থেকে মানুষকে রক্ষা করে। কিন্তু ভাবাবেগের নিজস্ব কিছু আঘাত আছে তা থেকে আত্মরক্ষা করা খুব দুরূহ।

ছেলেবেলা থেকেই আমি লোগা। হিলহিলে শরীর, বারোমাস পেটের অসুখ, ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড-একটানা-একটা কিছু লেগেই থাকত। বাড়িতে রেলের ডাক্তারদের আনাগোনার বিরাম ছিল না। যখন বড় হয়েছি তখনো সেইসব ছেলেবেলায় আমার চিকিৎসা যাঁরা করেছিলেন সেইসব ডাক্তারদের সঙ্গে দেখা হলে তারা বলতেন–কেমন আছিস রে?

–ভাল।

-খুব ভুগিয়েছিলি ছেলেবেলায়। মা বাবার আমাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা ছিল খুব। আমার দশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি ছিলাম মা বাবার একমাত্র ছেলে। আমার দু বছরের বড় দিদি, আট বছরের ছোটো বোন, কাজেই দশ বছর বয়স পর্যন্ত বাড়ির সবটুকু আদর আমি নিঙড়ে নিতাম। বড় মাছ, দুধের সরটুকু, ভাল জামা কাপড়–সবই পেতাম। সেই একমাত্র ছেলে কিরকম হবে না হবে– বাঁচবে কি বাঁচবে না–এই নিয়ে মা বাবার ছিল নিরন্তর ধুকপুকুনি। বাবা অনেক সাধু-সন্ন্যাসীকে বাসায় আনতেন, মাও জ্যোতিষ বা পশ্চিমা সাধু দেখলে ডেকে আনতেন। দাতাবাবা, আমেরিকা-প্রবাসী রামকৃষ্ণ মঠের সন্ন্যাসী, ভিখিরি সাধু কত এসেছে গেছে। তাদের অনেকে আমার হাত বা কোষ্ঠী বিচার করে বলেছে– এর সন্ন্যাসের দিকে টান। একে কোনো সুন্দর মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবেন। নেপালের রাজজ্যোতিষী পরিচয় দিয়ে এক কালা জ্যোতিষ আসতেন আমাদের বাড়িতে। আমাকে দেখে বলেছিলেন–এই ছেলে মাঘ মাসে মারা যাবে।

বাবা ভীষণ ঘাবড়ে বললেন–কিন্তু আমি তো কোনো পাপ করিনি। জ্যোতিষ মাথা নেড়ে বললেন–তবু মরবেই।—-উপায়?

–উপায় আর কি? মাদুলি। বাবা আর আমি দুজনেই দুটো মাদুলি ধারণ করলাম। আমি মরলাম না।

যা বলছিলাম, আমার দশবছর বয়সের সময়ে আমার ছোটো ভাই হয়। তাতে অবশ্য আমার আদর কমেনি। রোগেভোগা ছেলে বলেই বোধহয় বরাবর সমান তালে আদর পেয়ে এসেছি। আজও পাই। আমার রোগও হত এক একটা মারাত্মক। মাল জংশনে সেবার হল সেরিব্রাল ম্যালেরিয়া। ঘোর জ্বরের মধ্যে দেখছি দুধারে উঁচু পাহাড়। দুই পাহাড়ের গায়ে একটা দড়ি দোলনার মতো টাঙানো হয়েছে। সেই দড়িতে আমি বসে আছি। নীচে গভীর–গভীর এক খাদ। সেই খাদে পাহাড়ী-নদী বয়ে যাচ্ছে। একটু দূরে একইরকম আর একটা দোলনা। সেই দোলনা থেকে আমাদেরই পরিচিত এক ভদ্রলোক বন্দুক হাতে আমার দিকে গুলি ছুঁড়ছেন। গুলি গায়ে লাগছে না। দোলনাটা দুলছে। আমি দুহাতে দোলনার দড়ি ধরে চেঁচাচ্ছি ভয়ে। এ তো স্বপ্নের দৃশ্য। ওদিকে বাস্তবে আমার জ্বর তখন একশ' ছয়ের ওপর। মাথায় তীব্র রক্তস্রোত জমা হচ্ছে। যে কোনো মুহূর্তে মৃত্যু হতে পারে। মাল জংশন তখন ছোটো জঙ্গলে জায়গা। ডাক্তার-বদ্যি, ওষুধ কিছু পাওয়া দুষ্কর। রেলের ডাক্তার বক্কর খান সুচিকিৎসক নন। তার ওপর কারো ভরসা নেই। ভাগ্যক্রমে বাবা বাসায় ছিলেন। বক্কর খানকে সময় মতোই খবর

দেওয়া হল। তিনি যখন এসে পৌঁছোলেন তখন আমার খিচুনি উঠে গেছে। বক্কর খান অন্য রোগের চিকিৎসা জানুন বা না জানুন, ম্যালেরিয়াটা খুব ভাল চিনতেন। আমার অবস্থা দেখেই কোন্ ধরনের ম্যালেরিয়া তা বুঝতে পেরেই চিকিৎসা শুরু করেন। আমি মৃত্যুর কয়েকঘণ্টা দূরত্ব থেকে ফিরে আসি।

এইরকম রোগে ভুগে ভুগে আমার শরীর যেমন নষ্ট হয়েছিল, তেমনই নষ্ট হয়েছিল আমার মন। মনের জোর কাকে বলে তা জানতামই না। অল্পে ভয় পাওয়া, হাল ছেড়ে দেওয়া, আত্মবিশ্বাসে অভাব–আমি এগুলোই মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু এসব নিয়ে বেঁচে থাকা যায় না। বাস্তবে অপদার্থ বলেই বোধ হল মনটা দিন দিন অবাস্তব কল্পনাপ্রবণ হয়ে উঠেছিল। আমার বাস্তবের অপদার্থতা কল্পনা দিয়ে পুষিয়ে নিতে চেষ্টা করতাম। কল্পনার রাজত্বে আমি ছিলাম বীর, সাহসী, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর এক মানুষ। কল্পনায় বাস করার বিপদ হচ্ছে এই, কল্পনার বাইরের এই বাস্তবজীবনে সামান্যতম দুঃখ বেদনা অপমান সহ্য করার মতো, ব্যর্থতা মেনে নেওয়ার মতো জোর অবশিষ্ট থাকে না। কল্পনাপ্রবণ মানুষ তাই দিশেহারা হয়ে যায় সামান্য বিপদ বা দুঃখে। কিছু ঘটলেই তার মনে ঝড় ওঠে এবং দীর্ঘকাল সেই ঝড়ের প্রতিক্রিয়া থেকে যায়।

স্কুলে পড়ার সময়ে আমাকে ঘর ছেড়ে অচেনা ছেলেদের মধ্যে যেতে হল। সেখানে এল মানিয়ে নেওয়ার প্রশ্ন। হুল্লোড়বাজ ছেলেরা খ্যাপায়, পিছনে লাগে, অশ্লীল কথা বলে, ঝগড়া করে, গাল দেয়। মাস্টারমশাইরা নিষ্ঠুর। মারকুটে, স্নেহহীন এই পরিবেশে মন অসুস্থ হয়ে পড়ে। স্কুলে যাওয়ার নামে গায়ে জ্বর আসে। টিফিনে চাকর খাবার নিয়ে যায় দেখে ছেলেরা খ্যাপায়। আমার খেতে লজ্জা করে। স্কুলে যাওয়ার পথে রেলগাড়ির শান্টিং দেখে সময় নষ্ট করি। দেরি হয়ে যায়, বাড়িতে ফিরে এসে মাকে বলি–স্কুল বসে গেছে। ঢুকতে দিল না।

ঢুকতে দিচ্ছে না, আমাকে ঢুকতে দিচ্ছে না। প্রচণ্ড এক প্রতিযোগিতার জগতে আমি ঢুকতে পারছি না। ঢুকতে না পাওয়ার সেই প্রথম বোধ। ঠিকই টের পেয়েছিলাম, প্রতিদ্বন্দ্বীময় এক অদ্ভুত রূঢ় জীবন সামনে পড়ে রয়েছে।

আমার জীবন এইভাবে শুরু হয়েছিল, ভয়ে, বিষণ্ণতায়, অনিশ্চয়তার সঙ্গে। আমার নিশ্চিত হার, হারতে হারতেই বেঁচে থাকতে হবে, পৃথিবীতে আমার অস্তিত্বের কোনো গভীরতা থাকবে না।

যখন আমরা আমিনগাঁওতে থাকি তখন আমাদের বাসাটি ছিল ঠিক ব্রহ্মপুত্রের ধারে একটা টিলার ওপরে। খাড়া টিলা, তার নীচে ব্রহ্মপুত্র বাঁক নিয়েছে। ওপাশে নীলপর্বত, দুই পাহাড়ের মাঝখানে ব্রহ্মপুত্র সফেন গর্জন করে বয়ে চলে। ফেনশীর্ষ জলরাশির গম্ভীর ক্রোধের ধ্বনি বর্ষাকালে দুই পাহাড়ের মাঝখানের শূন্যতায় প্রতিধ্বনি তোলে ভয়াবহ। ফেরি যখন পেরোয় তখন তীর ঘেঁষে অনেকটা সাবধানে উজিয়ে স্রোত ধরে ভাটিয়ে গিয়ে ওপারের জেটিতে লাগে। নৌকো চলে খুব কম, বেচাল হলেই নৌকো ওলটায়। আমার বয়স সে সময়ে বছর তেরো, সেই বয়স যখন মা-বাবার ওপর বন্ধু বা প্রিয়জনের ওপর নানা তুচ্ছ কারণে রাগ বা

অভিমান বুকের পাঁজরা ভেঙে উঠে আসতে চায়। মাকে খুব ভালবাসতাম। সেই ভালবাসার মধ্যে আবার নির্দয় প্রতিশোধের চিন্তাও থাকত। মার ওপর রাগ করে একদিন দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে দৌড়ে টিলা থেকে নামলাম। ইচ্ছে বাড়ি ছেড়ে পালাবো, খুব দূরে কোথাও চলে যাবো। অনেকবার এমন ইচ্ছে হয়েছে, কিন্তু সাহস হয়নি। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে সন্ধ্যে পেরোলেই ঠিক বাড়ি ফিরে গেছি। বরাবর, কিন্তু এবারের রাগটা একটু চড়া, কী করছি ভেবে দেখিনি।

সকালের ফেরি ছেড়ে গেছে। বর্ষার ভয়াবহ নদী মাতালের মতো টলতে টলতে যাচ্ছে। তার জলের দোলা দেখে প্রাণ গম্ভীর হয়ে যায়। তীরে কয়েকটা নৌকো বাঁধা। সকালের স্টীমার ধরতে না-পারা কিছু লোক ওপারে পাণ্ডুতে যাবে বলে জড়ো হয়েছে। আমি তাদের দলে ভিড়ে গেলাম। কোথায় যেতে চাই এখনো তা স্পষ্ট নয়, যাবো, চলে যাবো চিরদিনের মতো এইটুকু জানি। হয়তো সন্ন্যাসী হয়ে যাবো, হয়তো হবো মস্ত মানুষ। কে জানে আমার বুকে থমথমে অভিমান আছে, আছে প্রতিশোধস্পৃহা। আর কিছু নেই, তবু ওটুকুই তখনকার মতো যথেষ্ট।

আমাদের টিলাটা বেড় দিয়ে নৌকো চলল প্রথমে উজানে। অনেকটা দূর গিয়ে স্রোতে গা ছেড়ে পেছিয়ে আসবে। আসতে আসতে স্রোতকে ফাঁকি দিয়ে ওপারের ঘাটে বাঁধবে। বিপজ্জনক কৌশল। সাঁতার জানি, কিন্তু আত্মবিশ্বাস নেই, নদীর স্রোত ক্ষুরধার, একধারে বসে জল দেখছি। স্রোতের বেগ নৌকোয় কঁকি দেয়, গুড়গুড় করে কাঁপায়। নৌকো ওঠে। নৌকো পড়ে। মানুষজন ছবির মতো স্থির বসে, মন চঞ্চল। মাঝিরা ঘেমে যাচ্ছে উজান নৌকো নিতে। তাদের দাঁতে দাঁত, টান-টান দড়ির মতো হাত-পায়ে ছিঁড়ে আসা ভাব।

অনেকদূর উজানে গেলাম, টিলার ছায়ায় ছায়ায়, তখনো আমাদের বাড়িটা দেখা যাচ্ছে না। নৌকো যখন স্রোতের মুখে ছাড়ল তখন একটানে ঘুরপাক খেয়ে মাঝদরিয়ায় চলে গেছি। মাঝি হাঁকছে–সামাল! জল নৌকোর কানার সমান। অন্য ধার উঁচু হয়ে আছে। পৃথিবীটা সে-সময়ে বাঁকা হয়ে ঝুলে আছে। আকাশ বুকের ওপর। সেই সময়ে দিকের জ্ঞান ছিল না। বেভুল নৌকোটা যে কোনদিকে যাচ্ছে বোঝবার চেষ্টাও করিনি। নৌকোর কানা আঁকড়ে প্রাণপণে জীবনের সঙ্গে, আয়ুর সঙ্গে লেগে আছি। সাঁতার জানি, কিন্তু আমার কোনো জ্ঞানই যে সম্পূর্ণ নয়। অভিমান ভেসে যায়, ভয়ে চেঁচিয়ে ডাকি 'মা'।

ঠিক সেই সময়েই হঠাৎ অলৌকিকভাবে মাকে দেখতে পাই। নীল আকাশের গায়ে একটা টিলার কালচে সবুজ মাথা জেগে ওঠে বাতিঘরের মতো, আমাদের বাসাটার লাল টিনের চাল দেখা যায়। বারান্দায় বাঁশের জারি। তার সামনে সিঁড়ির উঁচু ধাপটায় মা দাঁড়িয়ে আছে। সকালের রোদ পড়েছে চোখে। মা হাতের পাতায় চোখ আড়াল করে নিবিষ্ট মনে চেয়ে আছে নদীর দিকে। বিশাল এক অথৈ পৃথিবী তার সামনে। সেই সীমাহীন পৃথিবীর কোন্ দিকে গেল তার অভিমানী ছেলে! মা নিবিষ্টভাবে, আকুলভাবে দেখছিল, বুক থেকে আটকে থাকা খাসের একটা পাখি বেরিয়ে গেল। নৌকো সোজা হয়ে চলতে থাকে। অভিমান ভুলে গভীর তৃষ্ণায় মার মূর্তিটার দিকে চেয়ে থাকি। দূর থেকে দূরে ক্রমে ছোটো হয়ে আসে মূর্তিটা। কিন্তু স্থির থাকে, বাতিঘরের মতো।

সেবার নিরুদ্দেশে যাওয়া হল না। ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে কামাখ্যা পাহাড়ে উঠে দুপুরের আগেই ফিরে এলাম।

বাসার বাইরে যে পার্থিব সংসার সেইটাই ছিল ভয়ের। সংসারের ভিতরে আমি মা-বাবার আদুরে ছেলে, ভাই-বোনের প্রিয় সহোদর কিন্তু বাইরের পৃথিবীতে আমি কেউ না। একবার এক বুড়ো চিনে-বাদামওয়ালার কাছে একটা অচল সিকি গছানোর চেষ্টা করেছিলাম ছেলেমানুষি বুদ্ধিবশত। মনে হয়েছিল, লোকটা বোধহয় চোখে ভাল দেখে না। বাদাম নিয়ে সিকিটা দিতেই সে সেটা হাতড়ে দেখল, তারপর আমার হাত চেপে ধরে সে কী চিৎকার–এ ব্যাটা কোট্রা আমাকে সাট্রা পয়সা দিতে এসেছে। পুলিস..পুলিস! বাজারের এক ভিড় লোক ছুটে এল। অচেনা পৃথিবীর বিরুদ্ধতা দেখে এমন ভয় পেয়ে দিশেহারা হয়েছিলাম সেদিন! আর একবার বন্ধুদের সঙ্গে হাটে গেছি। হাট থেকে চুরি করা ছিল বন্ধুদের একটা খেলা। আমি করতাম না, ভয় করত। সেবারই প্রথম সাহস করে একটা টিনের

ছোট্ট বাঁশি চুরি করেছিলাম। দোকানদার লক্ষ্য করেনি করেছিল অন্য একটা উটকো লোক। বাঁশি নিয়ে দোকান থেকে বেশ কিছু দূর চলে গেছি, হঠাৎ সেই লোকটা এসে আমার হাত ধরল, একটিও কথা না বলে পকেট থেকে বাঁশিটা বের করে নিয়ে চলে গেল। কেউ কিছু বুঝল না, কিন্তু আমি সেই লোকটার ওই আচরণের বিরুদ্ধে একটি কথাও বলতে পারিনি। লজ্জায় ভিড় ভেঙে পালিয়ে গিয়েছিলাম। তারপর একা একা সেই ঘটনার কথা ভেবে কতবার এবং আজও গা শিউরে ওঠে লজ্জায়, আধোঘুমে চমকে উঠি। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময়ে কাটিহারের খালাসিটোলার রাস্তায় একজন মুসলমান ছেলে আমাকে অকারণে গাল দিয়ে একটা চড় মেরেছিল। সে জানত না তার ওই চড়টা আমার আত্মার গায়ে এত দীর্ঘকাল তার হাতের ছাপ রেখে দেবে। ভুলতে পারি না, কিছুতেই সেই চূড়ান্ত গাল আর চড়টি ভুলতে পারি না। সংসারে স্নেহচ্ছায়ার বাইরে নিষ্ঠুর ও উদাসীন এই পৃথিবীটি রয়েছে। অচেনা মানুষের হৃদয়হীনতা রয়েছে, তাদের আক্রমণ আক্রোশ, নিষ্ঠুরতা আমি কী করে ঠেকাবো!

এই মানসিকতা থেকেই একটা অসুস্থ বৈরাগ্য জন্ম নিয়েছিল আমার শক্তিহীনতা অনুজ্জ্বল মন, লড়াইয়ের আগেই পরাজয়ের মনোভাব আমাকে ক্রমশ সমাজ-সংসারের বাইরের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই, অচেনা মানুষ নেই, অপমান নেই, যেখানে আমি তৃপ্ত-একাকী, সেই নির্জনতার দিকে টান পড়তে থাকে। এই বৈরাগ্য শক্তিমানের সন্ন্যাস নয়, দুর্বলের পলায়ন।

একবার এক সুখী বাড়িতে গেছি মা-বাবা ভাই-বোনদের সঙ্গে। বড়লোকের বাড়ি, বিলিতি আসবাব, বৈঠকখানায় মদের বার, ছেলেমেয়েদের মুখে ইংরিজি। তারা আমাদের খুবই সমাদর করেছিল। সে বয়সে আমি ছিলাম ভীষণ রোগা। সেই রুগণতা বোধহয় সেই বাড়ির কর্তার খারাপ লেগেছিল। একটা ছেলে এত রোগা হবে কেন? তিনি তাঁর স্ত্রী এবং ছেলেমেয়েদের সামনে বার বার জিজ্ঞেস করেছিলেন, তুমি কি খাও না? ছোটো না? খেল না? তুমি অত রোগা কেন? সে ভারী অস্বস্তিকর একটা অবস্থা। আমার রুগ্ণতা এমনিতেই আমার মা-বাবার দুশ্চিন্তার কারণ ছিল, তার ওপর ওই সব প্রশ্ন মা-বাবারও ভাল লাগছিল না। প্রশ্ন করার ভঙ্গীটা ছিল অন্য ধরনের। তাতে সমবেদনা নেই, অনুকম্পাও না। বরং চাপা একটু ঘেন্না আর শ্লেষ ছিল। সে কেবল আমিই টের পাচ্ছিলাম। সূচিমুখ যন্ত্রণা। নানা কথার মাঝখানে ঘুরে-ফিরে তিনি আমাকে অপমান করতে লাগলেন। জিজ্ঞেস করলেন স্ট্রেট লাইনের ডেফিনেশন কী। পড়া ছিল, কিন্তু ঘাবড়ে যাওয়ায় সে মুহূর্তে মনে পড়েনি। বলতে পারলাম না দেখে তিনি

সপরিবারে হাসলেন। আমি ঘামছি। আমার ভাইবোনেরা তখন সে বাড়ির ছেলেমেয়েদের সঙ্গে কলের গান বাজাচ্ছে, ছবির বই দেখতে দেখতে অবাক হয়ে যাচ্ছে, কুকুরকে বল ছুঁড়ে দিয়ে খেলছে, আর আমি মায়ের কাছ ঘেঁষে কাঠ হয়ে বসে নিজের অপদার্থতার কথা ভাবছি। মনে হচ্ছিল, সমাজ-সংসার আমার জন্য নয়। পালাও পালাও! এরা সবাই তোমার শত্রু, প্রতিদ্বন্দ্বী, তোমার প্রতি এরা সবাই দয়াহীন। সংসারের বাইরের কোন নির্জনতায় চলে যাও, সন্ন্যাসী-বৈরাগী হয়ে যাও। বেঁচে থাকা মানেই প্রতি মুহূর্তে বৃশ্চিক দংশন, সূচিমুখ যন্ত্রণা, বেঁচে থাকা মানে আত্মায় মলিন হাতের ছাপ। সুতো হেঁড়ো, পালাও।

অর্গান্ডির মতো পাতলা নেটের পর্দা উড়ছে বাতাসে। কলের গান বাজছে, কী সুন্দর ঠাণ্ডা ঘর, নরম সোফা কৌচ, মহার্ঘ আসবাব, তবু এই পরিবেশে মানুষ কত নিষ্ঠুর ও হীন হতে পারে।

মা সবচেয়ে বেশি আমার ব্যথা বোঝে। চিরকাল মায়েদের এই ক্ষমতা। মা আমাকে একটু ঠেলে দিয়ে চাপা গলায় বলল, বাইরের বাগানটা তো সুন্দর, একটু ঘুরে-টুরে আয় না।

বেঁচে গেলাম।

সেই সুন্দর বাগানে প্রজাপতির খেলা দেখছি, আর মনে মনে নিজের জন্য লজ্জা হচ্ছে।

কোথায় পালাবো? কেমন করে? সংসারের বাইরে যাওয়া ছাড়া আমার যে উপায় নেই!

ভদ্রলোকের দশ বছর বয়সের মেম চেহারার মেয়েটি ছুটে আসে। ভয়ে এস্ত হয়ে তার দিকে চাই। সে কাছে চলে আসে বাতাসের মতো সাবলীল, কী সুন্দর জোরালো চেহারা তার, কী সদ্গন্ধ তার গায়ে! চোখে বিদ্যুৎ। নতুন অপমানের জন্য মনে মনে প্রস্তুত হতে থাকি। অপমান বা নিষ্ঠুরতা ছাড়া আমি বাইরের লোকজনের কাছ থেকে আর কিছুই আশা করতে পারি না যে!

সে বোধ হয় তার ইস্কুলে নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার করতে শিক্ষা পেয়েছিল। এসে আমার হাতখানি ধরে বলল–চলো, ওই কোণে আমার পড়ার ঘর, সেখানে বসি। তোমার গলার স্বর খুব সুন্দর, নিশ্চয় তুমি খুব ভালো কবিতা পড়তে পারো।

সে তার পড়ার ঘরে নিয়ে গেল আমাকে, কত বই তাদের! সে একটা ডিভানে আমার পাশে বসে রবি ঠাকুরের কবিতার বই খুলে বলল

একদম বাংলা পড়তে পারি না স্কুলে। ইংরিজি স্কুল তো, শেখায় না, অথচ কবিতা পড়তে আমি যে কী ভালবাসি।

জড়তা কাটাতে সময় লেগেছিল, তবু ওই একটা বিষয় আমি পারতাম। ভাব ও অর্থ অনুসারী কবিতা পাঠ। পড়লাম। তার চোখে মুগ্ধতা দেখা দিল, তারপর করুণতর কবিতাগুলি পড়ার সময়ে অশ্রু। একটা বেলা কেটে গেল তার সঙ্গে।

–তুমি আমাকে শেখাবে? উঃ, কী যে পড়ো তুমি, শুনতে শুনতে যেন ভূতে পায়।

সংসারের বাইরে আর যাওয়া হয়নি। সুতো আজও ছিঁড়ি, কিন্তু কে যেন নতুন সুতোয় নতুন বঁড়শি অলক্ষ্যে গিলিয়ে দেয়।

# সেই লোকটা

**সেই লোকটা**

তার পুরনো আমলের ঢাউস ক্যামেরায় মল্লিকবাড়ির একটা গ্রুপ ফটো তুলতে হয়েছিল কালুরামকে। ফটো তোলায় তার নাম খুব। কালো কাপড়ে মাথা ঢেকে সে যখন তার তেপায়া ক্যামেরা অ্যাডজাস্ট করে তখন লোকে হাসে বটে, কিন্তু ফটো দেখলে সবাই অবাক মানে। কালুরাম এখন বুড়ো হয়েছে, কিন্তু এখনও সবাই তাকে ডাকাডাকি করে।

এই মল্লিকবাড়ির গ্রুপ ফটো তুলতে গিয়েই ঘটনাটা প্রথম ঘটল, যেমনটা কালুরামের ফটোগ্রাফির জীবনে আর কখনও ঘটেনি। নাদু মল্লিকের ছেলের পৈতে। সেই উপলক্ষে মেলা আত্মীয়-স্বজন এসেছিল। তার মধ্যে অনেক বুড়ো-বুড়ি ছিল, দূরের লোক ছিল। কে কবে মরে যায়, কার সঙ্গে আর দেখা হয় কি না হয়, তাই কালুরামকে ডাকিয়ে গ্রুপ ফটো তোলা হল। মোট একুশজন ছিল, কালুরামের মনে আছে। ছবিটা উঠলও সুন্দর, একেবারে ঝকঝকে পরিষ্কার ছবি।

কিন্তু ছবি ডেলিভারি নিয়ে নাদু মল্লিক হঠাৎ বলে উঠলেন, সবাইকে তো চিনতে পারছি, কিন্তু পিছনের সারিতে কোণের দিকে এই গোঁফওয়ালা লোকটা কে? একে তো সেদিন দেখা যায়নি?

কালুরাম অবাক হয়ে বলল, আপনাদেরই লোক, চিনতে না পারলে আমি কী করব?

নাদু মল্লিক মাথা নেড়ে বললেন, আমাদের লোক হতেই পারে না। তবে উটকো কেউ ঢুকে পড়েছিল নিশ্চয়ই। আমরা মোট একুশজন ছিলাম মনে আছে। কিন্তু

এই লোকটাকে নিয়ে বাইশজন হচ্ছে। গুনে দেখুন।

কালুরাম গুনে তাজ্জব। সে পুরনো আমলের লোক। যা করে তা একেবারে পাকা কাজ। ক’ জনের ফটো তুলতে হবে এবং কীভাবে তার সাজিয়ে নিতে হবে এসব তার হিসেব করে নিতে হয়। যতদূর মনে পড়ছে, এ লোকটাকে সে সারিতে দেখেনি, আর লোকটা দাঁড়িয়েছে আরেক জনের কাঁধে হাত রেখে এবং একটু হেলে। ভঙ্গিটা মোটেই ভাল নয় ফটো তোলার পক্ষে। কালুরাম ফটো তোলার সময় ব্যাপারটা লক্ষ্য করেনি কেন সেইটেই তার মাথায় ঢুকছে না। এতকালের অভ্যাসে গণ্ডগোল হয়ে গেল! তার মানে কি সে বুড়ো হয়ে যাচ্ছে?

মল্লিকবাড়ির ব্যাপারে খটকাটা রয়ে গেল বটে, কিন্তু হাটখোলার ব্যানার্জিদের বাড়িতে বুড়ো সদাশিব বাঁড়ুজ্যে সাতানব্বই বছর বয়সে মারা যাওয়ায় ফটো তোলার জন্য কালুরামের ডাক পড়ল। এবং ফের ফটো নিয়ে গণ্ডগোল। এবারকার গণ্ডগোলটা কালুরামকে রীতিমতো উদ্বেগে ফেলে দিল। এ ফটোটাও ভাল উঠেছে। সামনে ফুলে সাজানো খাঁটিয়ায় সদাশিববাবু শুয়ে; বুকের উপর ভাগবদগীতা। পিছনে ছয় ছেলে, তিন মেয়ে, পুত্রবধূ, নাতি-নাতনী ও তস্য পুত্রপৌত্রাদি। সব মিলিয়ে বেশ একখানা ভিড়ের দৃশ্য! শোকবিহ্বল ভিড়। কিন্তু পিছনের সারিতে সদাশিবের বড় আর মেজো ছেলের মাথার মাঝখান দিয়ে একটা ফিচেল মুখ বেরিয়ে আছে। মুখে ইয়ার্কির হাসি। আর সেই গোঁফ! কালুরাম মুখখানা দেখে তাজ্জব হয়ে গেল। এ যে চেনা মুখ! কালুরাম মল্লিকবাড়ির গ্রুপ ফটোটা বের করে মিলিয়ে নিল। কোনো ভুল নেই। এ সেই লোক।

সদাশিবের বড় ছেলে রামশিব ছবি দেখতে দেখতে হঠাৎ উঠে বললেন, এ লোকটা কে? এ তো আমাদের পরিবারের কেউ নয়। এ কোত্থেকে এল?

কালুরাম মাথা চুলকে বলল, এ ব্যাটা মহাবজ্জাত। মল্লিকবাড়ির ফটোতেও ঢুকে পড়েছিল।

তার মানে? মানে কি ছাই কালুরামই জানে? সে মাথা চুলকোতে লাগল। তবে এর পর থেকে খুবই সতর্ক হয়ে গেল কালুরাম।

এর পরের ফটো খুবই সাদামাটা। মহেশ দত্তর একমাত্র ছেলের বিয়ে। ছেলে আর ছেলের বউ নিয়ে মহেশ দত্ত আর তার গিন্নি ছবি তুলবেন। মোট চারজন।

কালুরাম খুবই সর্তক হয়ে চারদিক দেখে নিয়ে তবে সাবধানে ছবিটা তুলল। না, এবার আর কোনো উটকো লোক ঢুকে পড়তে পারেনি। বড় গ্রুপ তো নয়।

কিন্তু নিজেদের ডার্ক রুমে নেগেটিভটা দেখতে গিয়ে কালুরামের বুক আর হাত দুটোই কেঁপে গেল। সামনে পাশাপাশি দুটো চেয়ারে দত্ত আর দত্তগিনি, পিছনে দাঁড়ানো ছেলে আর ছেলের বউ। কিন্তু তাদের মাঝখানে আরেক জন। নির্ভুল আরেক জন। কালুরাম দুই চোখ কচলে নিয়ে ফের দেখল। ভুল নেই। তারপর নেগেটিভ প্রিন্ট করে দেখল, সেই ফিচেল গোঁফওয়ালা লোকটাই।

দত্তবাবু ছবি দেখে অবাক হয়ে বললেন, এ কী? আমার ছেলে আর বউমার মাঝখানে এটা কে?

কালুরাম সতর্ক হয়ে গেল। তার দোষ বলে দত্তবাবু যদি ছবির দাম দেন। সে মাথা চুলকে বলল, দেখুন, ছবি তোলার কথা, তুলে দিয়েছি। লোকজন কে কোত্থেকে এল তা বলি কী করে? আপনাদেরই কেউ হবে।

দত্তবাবু রাশভারী লোক। গম্ভীর মুখ করে বললেন, আমার বাড়িতে এরকম কোনো লোক নেই। তবু খোঁজ নিয়ে দেখছি বউমার বাপের বাড়ির কেউ সেদিন হঠাৎ হাজির হয়েছিল কি না।

বউমাকে ডাকানো হল। তিনি ছবি দেখে চোখ গোল করে বললেন, তো! সেদিন তো কেউ আমাদের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়নি! আর একে তো কস্মিনকালেও দেখিনি।

কালুরাম ঘন ঘন মাথা চুলকোতে লাগল। দত্তবাবু গম্ভীরতর হয়ে বললেন, বুড়ো বয়সে তোমার গণ্ডগোল হচ্ছে। অন্য কোনো ছবির নেগেটিভের সঙ্গে মিশিয়ে প্রিন্ট করেছ নিশ্চয়ই। নাঃ, দেখছি অন্য কোনো ফটোগ্রাফার ডাকিয়ে নতুন করে ছবি তোলাতে হবে।

এইভাবে কালুরামের ব্যবসা লাটে ওঠার জোগাড় হল। অন্য সব চ্যাংড়া ফটোগ্রাফার দিব্যি ছবি তুলে বেড়াচ্ছে, কারও কোনো গোলমাল হয় না। কিন্তু কালুরাম ক্যামেরা ক্লিক করলেই কোত্থেকে গোঁফওয়ালা ফিচেল লোকটা এসে হাজির হয় তা কালুরাম আকাশ-পাতাল ভেবেও বুঝতে পারছে না। ক্যামেরা বা

ফিল্মের কোনো দোষ নেই, কালুরাম ভালই জানে। প্রিন্টেও কোনো গণ্ডগোল সে করছে না। তবে এটা হচ্ছেটা কী?

কালুরাম ফিচেল লোকটার ছবি নেগেটিভ থেকে কেটে এনলার্জ করে ভাবভাবে মুখটা স্টাডি করল। লোকটার বয়স ত্রিশের মধ্যেই। গোঁফজোড়া বেশ মিলিটারি ধাঁচের এবং জম্পেশ। মাথায় অনেক চুল। চেহারাটা ভালই। হাসিটাও খারাপ বলা যায় না। যাকে ফটোজেনিক ফেস বলে তাই। ক্যামেরায় যখন ধরা পড়েছে, তখন লোকটাও কোথাও না কোথাও আছে। কিন্তু কোথায় আছে?

কালুরামের রীতিমতো দুশ্চিন্তা হতে লাগল। ভয়ও হতে লাগল। খাওয়া কমে গেল। ঘুম কমে গেল। শরীরটা বেশ রোগাও হয়ে গেল। পুরনো ক্যামেরাগুলো কালুরাম ভাল করে পরিষ্কার করে নিল। ফিল্ম পাল্টে ফেলল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। নিতান্তই একটা সূর্যাস্তের ছবি তুলেছিল কালুরাম। তাতেও দেখল, সেই লোকটা ঠিক ছবির বা কোণে দাঁত বের করে দাঁড়িয়ে।

অগত্যা লোকটার এনলার্জ করা ছবিটা নিয়ে কালুরাম দাবোগাবাবু হরিহরের সঙ্গে দেখা করে বলল, একটু মুশকিলে পড়ে এসেছি।

দারোগাবাবু কালুরামকে ভালই চেনেন। তিনি বললেন, আরে এসো, এসো। অনেক কাল তোমাকে দেখি না। তা আমি তো ভাই শিগগিরই রিটায়ার করব। আমার এই ইউনিফর্ম-পরা চেহারাটা একদিন বেশ জুত করে তুলে দাও তো।

কালুরাম আমতা-আমতা করে বলল, সে আর বেশি কথা কী? দেব’খন তুলে। আচ্ছা দারোগাবাবু, এই লোকটাকে কি চেনা-চেনা ঠেকছে? একটু ভাল করে দেখুন তো।

ছবিটা দেখেই দারোগাবাবু চমকে উঠলেন, কোথায়! কোথায় সে। এক্ষুনি একে ধরা দরকার।

দারোগাবাবু এমন চেঁচামেচি শুরু করলেন যে কালুরাম ঘাবড়ে গেল। আমতা-আমতা করে বলল, এ কি কোনো ফেরার আসামী? দারোগাবাবুর চেঁচামেচিতে সেপাই-সান্ত্রী ছুটে এসেছে।

দারোগাবাবু কালুরামের দিকে চেয়ে বললেন, কোথায় লোকটা? কালুরাম দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে বলল, তা তো জানি না।

কিন্তু এ কে দারোগাবাবু?

কে! কে তা কি তুমি জানো না?

আজ্ঞে না।

কিন্তু এই যে বললে লোকটা খুনী!

কালুরাম অবাক হয়ে বলে, কখন বললুম?

বলোনি?

না তো!

তা হলে কি ডাকাত?

তাও তো জানি না।

দারোগাবাবু রুমালে মুখের ঘাম মুছে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়লেন। তারপর হাতের ইঙ্গিতে সেপাই-সান্ত্রীদের বিদেয় দিয়ে বললেন, তা হলে লোকটার ছবি নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছ কেন? যেভাবে ছবিটা বের করে দেখালে তাতে তো আমি ধরেই নিয়েছিলাম যে, লোকটা নির্ঘাত কোনো খুনী, ডাকাত, ফেরার আসামী।

কালুরাম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, আপনার ব্লাডপ্রেশারটা বোধহয় খুব বেশি।

দারোগাবাবু বললেন, হ্যাঁ বড্ড বেশি। একটুতেই এমন অ্যাজিটেটেড হয়ে যাই। তা লোকটা তা হলে কে?

সেইটে জানতেই তো আপনার কাছে আসা। লোকটাকে চোখে দেখতে পাইনি। অথচ যতবার যেখানেই ছবি তুলি, লোকটা ছবিতে এসে যায়।

অ্যাঁ, সে কী কথা!

আজ্ঞে। এমন-কি ডার্করুমে পর্দার ওপর আলো ফেলে ছবি তুলেও দেখেছি। ছবিতে কিছুই না থাকার কথা। কিন্তু এই লোকটা ঠিক ছবিতে চলে আসে।

রাম রাম রাম রাম। শিগগির ছবিটা নিয়ে বিদেয় হয়ে যাও।

কেন দারোগাবাবু?

এ ভূতের ছবি। আমার ওতে ভীষণ ভয়। ভূতটুত আমি আদপেই ভালবাসি না। কালুরাম উঠে পড়ল। তারপর সে এস. ডি. ও. সাহেবের সঙ্গে দেখা করল। এস. ডি. ও. সাহেব ভারি মিষ্টি শান্ত ভালমানুষ। মশামাছি অবধি মারেন না। ছবিটি দেখে মোলায়েম গলায় বললেন, পাত্রটি কে?

পাত্র! পাত্র নয়। আসলে

এস. ডি. ও. সাহেব কালুর কথায় কর্ণপাত না করে বললেন, আমরা হলুম কুলীন কায়স্থ। আমার মেয়েকে তো দেখেছেন! একটু কালো। আর দাঁতগুলো যা একটু উঁচু। এ ছাড়া নিখুঁত সুন্দরী। মনে করে যে পাত্রের খবর এনেছেন তাতে ভারি খুশি হয়েছি। পাত্র আমার পছন্দসই। তবে গোঁফজোড়া বড্ড প্রমিনেন্ট। মিলিটারি হলে তো খুবই ভাল। দাঁড়ান। মেয়ের মাকে ফটোটা দেখিয়ে আনি।

সত্য বটে, কালুরাম অনেক জায়গায় ঘোরে বলে তাকে এস. ডি. ও. সাহেব মেয়ের জন্য পাত্রের কথা বলেছিলেন। কিন্তু এ যে পাত্র নয় সেই কথাটা কালুরাম আর বোঝাতে পারল না।

এস. ডি. ও. সাহেব ফিরে এসে হাসিমুখে বললেন, পাত্র আমাদের খুব পছন্দ। তাড়াতাড়ি সম্বন্ধটা এনে ফেলুন। পাত্রের বাবার ঠিকানাটাও দরকার।

কালুরাম বেজার মুখে বলল, যে আজ্ঞে।

জনে-জনে ছবিটা দেখিয়ে বেড়াল বটে কালুরাম, কিন্তু সুবিধে হল না। ফিচেল লোকটা যে কোত্থেকে এসে ছবিতে উদয় হয় তা বোঝা গেল না।

কালুরাম নিজে ফটোগ্রাফার হলেও তার নিজের ছবি কস্মিনকালেও তোলেনি। বলতে কি, কালুরামের কোনো ফটোও নেই। কয়েকদিন দুশ্চিন্তায় কাটিয়ে কালুরাম স্থির করল, টাইমার দিয়ে এবার সে নিজের কয়েকটা ছবি তুলবে। লোকটা যদি তার আশেপাশে এসে হাজির হয় তা হলে টপ করে চেপে ধরবে বাছাধনকে।

নিজের স্টুডিওর ভিতরে ক্যামেরা ফিট করে সামনে চেয়ার বসিয়ে কালুরাম তৈরি হল। সেলফ টাইমারের বোতাম টিপে গিয়ে চেয়ারে বসল। তারপর দু'ধারে হাত ছড়িয়ে দিয়ে বলল, হুঁ হুঁ বাবা, এত সোজা নয়। এসো দেখি এবারে বাছাধন, দেখাব মজা।

ক্লিক করে ক্যামেরার অটোমেটিক শাটারের শব্দ হল। কালুরাম চারদিকে চেয়ে দেখে নিশ্চিন্ত হল, কেউ নেই।

কিন্তু ছবিটা প্রিন্ট করার পর কালুর একগাল হাসি। ছবিতে তার নিজের চিহ্নও নেই। চেয়ারে সেই ফিচেল লোকটাই গোঁফ চুমরে হাসি-হাসি মুখে বসে আছে।

কালুরাম দুশ্চিন্তায় ঘেমে উঠল। অন্য সব ছবিতে লোকটা এসে হানা দেয় বটে, কিন্তু যাদের ছবি তোলা হয় তাদের কেউ অদৃশ্য হয়ে যায় না। কিন্তু এ ছবিতে তা-ই ঘটেছে। কালুরাম সম্পূর্ণ অদৃশ্য। বসে আছে ফিচেলটা।

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত কালুরাম স্টুডিওতে বসে বসে রাত গভীর করে ফেলল। তার দেরি দেখে ভিতর বাড়ি থেকে তার স্ত্রী এসে বললেন, কী ব্যাপার। তুমি এখনও বসে বসে কী করছ? রাত হয়ে গেছে যে!

কালুরাম বিরসবদনে বলল, বড় চিন্তা হচ্ছে।

কিসের চিন্তা! বাঃ, এই ছবিটা কোথায় পেলে? এই বলে কালুরামের বউ ফিচেলের ফটোটা তুলে নিয়ে মন দিয়ে দেখতে লাগলেন।

কালুরাম কৌতূহলী হয়ে বলল, ছবিটা কেমন দেখছ?

চমৎকার। দেখাওনি তো আমাকে কখনও? চেনো নাকি লোকটাকে?

কালুরামের বউ অবাক হয়ে বলল, ও আবার কীরকম কথা? যার সঙ্গে পঁচিশ বছর ঘর করছি তাকে চিনব না মানে? বিয়ের সময় তো তোমার এই গোঁফই ছিল! ঝাটা গোঁফ পছন্দ করি না বলে বকে বকে ঘাঁটিয়েছিলুম। ওই তো গালের আঁচিলটা দেখা যাচ্ছে। আর এই যে বা ভ্রুর ওপর কাটা দাগ!

কালুরামের মাথাটা বোঁ করে ঘুরে গেল। সে তোতলাতে তোতলাতে বলল, কিন্তু... কিন্তু...

বউ হেসে বলল, তুমি তো জন্মেও ফটো তোলাও না। এমন কি বিয়ের সময় পর্যন্ত ছবি তোলাতে রাজি হওনি। আমার যেজন্য ভারি দুঃখ ছিল। যে দুনিয়াসুদ্ধ সকলের ফটো তুলে বেড়ায় তার নিজের কোনো ফটো নেই। কিন্তু এই ফটোটা যে তুলিয়েছিলে তা কখনও বলোনি তো। এটা আমি নিলুম, বাঁধিয়ে রাখব।

কালুরামের একেবারে বাক্য হরে গেল। তবে কথাটা মিথ্যেও নয়। তার হঠাৎ মনে পড়ল, ঠিক এইরকম গোঁফ সে যৌবনে রাখত বটে। গালের আঁচিল এবং জ্বর ওপর কাটা দাগ এখনও আছে। সে ফিচেল হাসিও হাসতে জানত এক সময়ে। না, সন্দেহ নেই। এটা তারই ছবি বটে। তবে যৌবনকালের ছবি।

ফটোগ্রাফার কালুরাম রাতে ঘুমোতে পারল না। এপাশ ওপাশ করতে লাগল। তারপর এক সময়ে থাকতে না পেরে ভূতের মতো গিয়ে নিজের অন্ধকার স্টুডিওতে ঢুকে বসে রইল। সে নিজেই কী করে ছবির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে? তাও এখনকার সে নয়, যৌবনের সে!

ভাবতে ভাবতে কালুরাম বিড়বিড় করে বলল, অসম্ভব! এ হতে পারে না। আমারই মাথার গণ্ডগোল।

অন্ধকারে ফিচ্ করে কে যেন হাসল।

কালুরাম চমকে উঠে বলল, কে রে?

আমি গো আমি। আমি কালুরাম। তার মানে আমি হচ্ছি তুমিই।

অ্যাঁ! বলে কালু হাঁ করে রইল।

অবিশ্বাসের কী আছে হে? আমিই তুমি। বহুকাল ধরে একসঙ্গেই আছি।

কালুরাম কথা বলতে পারছিল না। অনেক কষ্টে শুধু বলল, কী করে হয়?

ফিচ্ করে একটু হাসি শোনা গেল অন্ধকারে। ফিচেলটা বলল, কালুরাম, এক সময়ে তোমার গোঁফ ছিল, হাসি ছিল, মজা ছিল। এখন তুমি এক গোমড়ামুখো ফটোগ্রাফার। তোমার ভিতরকার হাসিখুশি কালুরামটা শুকিয়ে যাচ্ছিল। তাই একদিন হাসিখুশি কালুরাম গোমড়ামুখো কালুরামের ভিতর থেকে ফট করে বেরিয়ে এসেছে।

অ্যাঁ! বলো কী?

তাই তো বলছি। গোমড়ামুখো কালুরামের সঙ্গে পোষাল না বলে ভেন্ন হয়েছি, তাই বলে কি আর খুব তফাত হতে পারি? কাছাকাছিই আছি হে। কিন্তু ফটোর ভিতরে ঢুকছু কী করে?

খুব সোজা। আমাকে এমনিতে তুমি দেখতে পাও না বটে, কিন্তু তোমার ক্যামেরা তো আমাকে ভালই চেনে। তোমাকে জব্দ করার জন্য হুট করে ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়ে যাই।

কিন্তু আমার যে ব্যবসা লাটে উঠতে বসেছে তোমার জন্য।

তার আমি কী করব? গোমড়ামুখো লোক আমি দু'চোখে দেখতে পারি ।

কালুরামের এবার ভয় কেটে গিয়ে খুব রাগ হল। এই ফিচেলটা যদি সে নিজেই হয়ে থাকে তাও ক্ষমা করা যায় না। সে রাগে গরগর করে বলে উঠল, ভাল চাও তো শিগগির ফের আমার ভিতরে ঢুকে পড়ো। নইলে–

নইলে কী করবে? তোমাকে ভয় খাই নাকি?

তবে রে–বলে কালুরাম গলার স্বরটা লক্ষ্য করে অন্ধকারে আঁপিয়ে পড়ল দ্বিতীয় কালুরামের ওপর।

তারপর যা ঘটল তা আর কহতব্য নয়। ধুন্ধুমার লড়াই চলতে লাগল। ক্যামেরা-ট্যামেরা সব উলটে পড়ে গেল, কাঁচ ভাঙল, চেয়ার ওলটাল, কালুরামের গা থেকে গলগল করে ঘাম ঝরতে লাগল। কিন্তু কে হারল, কে জিতল তা ঠিক বোঝা গেল না। তবে এক সময়ে লড়াই থামল। কালুরাম তখন মেঝের ওপর পড়ে হ্যাঁ-হ্যাঁ করে হাঁফাচ্ছে। পাশাপাশি আর-একটা লোকও পড়ে আছে, টের পেল কালুরাম।

একটু মায়া হল কালুরামের। শত হলেও লোকটা তো সে নিজেই। লোকটার দিকে হাত বাড়িয়ে কালুরাম বলল, খুব লেগেছে নাকি?

তুমি মহা পাজি লোক।

আহা রাগ করো কেন? মাথাটা গরম হয়ে গিয়েছিল। ওঠো, হাতে মুখে জল দিয়ে এসো।

তুমি দাও, তা হলেই আমারও হবে।

একটা কথা ছিল।

কী কথা? বলছিলাম কি, এবার আর আমি অত গোমড়ামুখো থাকব না। বেশ হাসিখুশি লোক হয়ে যাব। চাও তো বেশ জম্পেশ গোঁফও রাখতে পারি।

মাঝে মাঝে নিজের ফটো তোলাবে?

তাও তোলাব। সব হবে। এবার টুক করে আমার মধ্যে ঢুকে পড়ো তো কালুরাম।

কালুরাম কালুরামের মধ্যে ঢুকে পড়ল। পরদিন থেকে আর কালুরামের ফটোতে কোনো গণ্ডগোল রইল না।

# হনুমান ও নিবারণ

**হনুমান ও নিবারণ**

নিবারণবাবু শান্তিপ্রিয় মানুষ। কারও সাতেও নেই পাঁচেও নেই। উটকো উৎপাত তিনি পছন্দ করেন না। তবু তার কপালেই হালে এক ঝামেলা এসে জুটেছে। বাড়ির সামনেই একখানা পেল্লায় জাম গাছ। সেই গাছে দু তিন দিন আগে হঠাৎ কোথা থেকে এক বিশাল জাম্বুবান কেঁদো হনুমান এসে থানা গেড়েছে। এ তল্লাটে হনুমান বাঁদর ইত্যাদি কোনও কালেই ছিল না। হনুমানটা যে কোথা থেকে উটকো এসে জুটল তা কে জানে!

তা হনুমান আছে থাক, নিবারণবাবুর তাতে বিশেষ আপত্তি নেই। হনুমান হনুমানের মতো থাক, তিনি থাকবেন তার মতো। কিন্তু এই ব্যাটাচ্ছেলে হনুমান কি করে যেন টের পেয়েছে যে, এ পাড়ায় সবচেয়ে নিরীহ ভাল মানুষ হলো এই নিবারণ ঘোষাল। হতচ্ছাড়া আর কাউকে কিছু বলে না, কারও দিকে দৃকপাত অবধি নেই। কিন্তু নিবারণবাবু বাড়ি থেকে বেরোলেই জামগাছে তুমুল আলোড়ন তুলে হুপহাপ দুপদাপ করে দাপাদাপি করতে থাকে।

প্রথম দিনের ঘটনা। শান্ত শরৎ কালের মনোরম সকাল। সোনার থালার মতো সূর্য উঠেছে। চারদিকে একেবারে আহ্লাদী বোদ। একটানা কোকিলও কুহুস্বরে ডাকছিল। নিবারণবাবু থলি হাতে প্রশান্ত মনে বাজার করতে বেরিয়েছেন। দুর্গানাম স্মরণ করে চৌকাঠের বাইরে সবে পা রেখেছেন, এমন সময়ে হঠাৎ জাম গাছটায় ওই তুমুল কাণ্ড। নিবারণবাবু সভয়ে আবার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেন। তিনি ভারী ভীতু লোক।

গিন্নি বললেন, কী হলো, ফিরে এলে কেন?

নিবারণবাবু আমতা আমতা করে বললেন, জাম গাছে কী যেন একটা কাণ্ড হচ্ছে।

গিন্নি হেসে বললেন, ও তো একটা হনুমান! কাল আমিও দেখেছি। পাড়ার ছোঁড়ারা ঢিল মারছিল।

নিবারণবাবু একটা নিশ্চিন্দির শ্বাস ফেলে বললেন, তাই বলো। হনুমান। জাম গাছতলা দিয়েই রাস্তা আর রাস্তা দিয়ে মেলা লোক যাতায়াত করছে। দুধওয়ালা, কাগজওয়ালা, বাজারমুখো এবং বাজারফেরত মানুষ, ঝাড়ুদার। হনুমান কাউকে দেখেই উত্তেজিত নয়, কিন্তু যেই নিবারণবাবু ফের দরজার বাইরে পা দিয়েছেন অমনি লম্ফঝম্প শুরু হয়ে গেল।

নিবারণবাবু তখন সাহসে ভর করে একটু দৌড় পায়েই জাম গাছটা পেরিয়ে গেলেন বটে, কিন্তু কেমন যেন একটা অস্বস্তি রয়ে গেল মনের মধ্যে।

তবে সেদিন বাজারে গিয়ে মনটা ভারী ভাল হয়ে গেল। সস্তায় বেশ বড় বড় পাবদা মাছ পেয়ে গেলেন। মরশুমের প্রথম ফুলকপি একটু দর করতেই দাম নেমে গেল, আর এক আঁটি ধনেপাতা কিনে ফেললেন মাত্র চার আনায়। বাজার সেরে যখন ফিরছেন তখন আর হনুমানটার কথা তার খেয়াল নেই। যেই আনমনে জাম গাছটার কাছাকাছি এসেছেন অমনি ডালপালায় তুমুল শব্দ করে হনুমানটা নেমে এল একেবারে নীচে। একখানা ডাল ধরে এমন ঝুল খেতে লাগল যে তার লেজখানা নিবারণবাবুর নাকের ডগা ছোঁয়-ছোঁয়। নিবারণবাবু জীবনে দৌড়ঝাঁপ বিশেষ করেননি, তবু হনুমানের হামলা থেকে বাঁচার জন্য সেদিন এমন দৌড় দিলেন যে তার ছোট ছেলে বিশু অবধি পরে প্রশংসা করে বলেছিল, বাবা, তুমি যদি সিরিয়াসলি দৌড়োতে তাহলে অলিম্পিক থেকে প্রাইজ আনতে পারতে। চটি পরা পা আর বাজারের ব্যাগ নিয়ে যে কেউ অমন দৌড়াতে পারে তা চোখে না দেখলে বিশ্বাসই হতো না।

দৌড়টা যে ভালই হয়েছিল তা নিবারণবাবুও জানেন, তবে শেষ অবধি চটিজোড়া পায়ে ছিল না, ছিটকে পড়েছিল। আর বাজারের ব্যাগ হাতছাড়া হয়ে সাধের পাবদা মাছ চারটেকে নিয়ে গেল, ছ’খানা ডিম ভাঙল আর রাস্তার একটা গরু দুখানা ফুলকপি চিবিয়ে খেয়ে নিল।

দ্বিতীয়বার ঘটনাটা ঘটল অফিসে বেরোনোর সময়। নিস্তব্ধ জাম গাছতলা দিয়ে বিস্তর লোক বিষয়কর্মে যাচ্ছে আসছে। কিন্তু টিফিনকৌটো নিয়ে ছাতা বাগিয়ে

গালে পানটি পুরে দুর্গানাম স্মরণ করে যেই নিবারণবাবু বেরোলেন অমনি জামগাছে যেন ঝড় উঠল। হনুমানটা এ ডালে ও ডালে ভীষণ লাফালাফি করতে করতে হুপহাপ করে বকাঝকাই করতে লাগল বোধহয়!

কিন্তু অফিস তো আর কামাই করা যায় না, নিবারণবাবু ছাতাখানা ফট করে খুলে তার নীচে আত্মগোপন করে প্রাণপণে দৌড় লাগালেন। কিন্তু স্পষ্ট টের পেলেন, জাম গাছটা পেরোনোর সময় হনুমানটা তার ছাতায় একটা খাবলা মারল।

গত তিনদিন ধরে নিবারণবাবুর জীবনে আর শান্তি নেই। আসতে হনুমান, যেতে হনুমান। হনুমানটা কেন যে শুধু তার পিছনে লাগছে। তা চিন্তা করে করে তিনি হয়রান। খেতে পারছেন না, ঘুমোতে পারছেন, তিনদিনেই বেশ রোগা হয়ে গেছেন। তাঁর দুই ছেলে কানু আর বিশু হনুমানটাকে তাড়ানোর জন্য বিস্তর ঢিল আর গুলতি ছুঁড়েছে, তাদের সঙ্গে পাড়ার ছেলেরাও। কিন্তু বিশেষ লাভ হয়নি। হনুমানটা গাছের মগডালে উঠে ঘন ডালপালার মধ্যে চুপচাপ বসে আছে। ইট-পাটকেল তার ধারে কাছে ঘেঁষতে পারেনি।

গিন্নি বললেন, পূর্বজন্মে ও তোমার ভাই ছিল, তাই এত টান।

নিবারণবাবু খিঁচিয়ে উঠে বললেন, হনুমানের ভাই হতে আমি যাবো কেন?

দুশ্চিন্তা নিয়েই নিবারণবাবু রাতে শুয়েছেন। তবে ঘুআসছেনা। মাথাটা বেশ গরম। কাল সকালেই আবার বাজার আছে, অফিস আছে। জাম গাছতলা ছাড়া যাওয়ার পথ নেই। শুয়ে এপাশ ওপাশ করছেন। কিছুদিনের ছুটি নিয়ে

পুরী বা ওয়াল্টেয়ার ঘুরে আসবেন কিনা তাও ভাবছেন।

হঠাৎ একটা বিকট হুপ শব্দে নিস্তব্ধ রাতটা যেন কেঁপে উঠল। নিবারণবাবু চমকে উঠে বসলেন আতঙ্কে। অন্ধকার ঘর, তবু জানলার দিকে চেয়ে তার বুক হিম হয়ে গেল। জানলাটা অর্ধেক ভেজানো ছিল। এখন জানলাটা পুরো খোলা। আর গ্রিল ধরে সেই অতিকায় হনুমানটা দাঁড়িয়ে। দু'খানা চোখ ভাটার মতো জ্বলছে।

ভয়ে এমন সিঁটিয়ে গেলেন নিবারণবাবু যে, কাউকে ডাকতে পারলেন না, গলা দিয়ে স্বরই বেরোলো না তার। কিছুক্ষণের জন্য যেন পাথর হয়ে গেলেন।

হঠাৎ একটা বেশ ভরাট গমগমে গলা বলে উঠল, ভয় পাবেন না…ভয়ের কিছু নেই…।

বিস্ময়ে হতবাক নিবারণবাবু কে কথা বলল, তা চারদিকে চেয়ে খুঁজতে লাগলেন। কিন্তু ঘরের মধ্যে কারও থাকার কথা নয়।

কণ্ঠস্বরটি ফের বলে উঠল, রামচন্দ্র আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান। আমি তার দূত মাত্র।

নিবারণবাবু নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। স্বপ্ন দেখছেন কিনা তা বুঝবার জন্য হাতে একখানা রাম চিমটি কেটে নিজেই উঃ করে উঠলেন।

গলাটা বলল, স্বপ্ন নয়। যা দেখছেন, যা শুনছেন সব সত্যি। নিবারণবাবু হনুমানের দিকে চেয়ে কঁপা কাঁপা গলায় বললেন, কথাগুলো কি আপনিই বলছেন? মানুষের ভাষায়?

আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু আমাদের হাতে সময় বিশেষ নেই। রামচন্দ্র অপেক্ষা করতে ভালবাসেন না।

রামচন্দ্র কে?

আমার প্রভু।

কোথায় তার সঙ্গে দেখা করতে হবে?

আপনি আমার সঙ্গে যাবেন।

ও বাবা! আমি পারব না, আমার বড় ভয় করছে।

ভয় কিসের?

আমার ব্যাপারটা বড্ড গোলমেলে ঠেকছে।

গোলমালের কিছু নেই। চলে আসুন। দেরি হয়ে যাচ্ছে। নিবারণবাবু বুঝলেন, এসব ভূতুড়ে কাণ্ড। এবং বেশ জবরদস্ত ভূতের পাল্লায় তিনি পড়েছেন। তবে এখনও উদ্ধারের উপায় আছে। তিনি ঘুমন্ত গিন্নিকে প্রবল ধাক্কা দিয়ে জাগাতে

জাগাতে কানু আর বিশুকে প্রাণপণে চেঁচিয়ে ডাকতে লাগলেন। সে এমন রামধাক্কা আর বিকট চেঁচানি যে মরা মানুষেরও উঠে বসবার কথা। কিন্তু কোনও সাড়াশব্দই পেলেন না। হনুমান বলল, ওদের ঘুম এখন ভাঙবে না। বৃথা চেঁচামেচি করছেন। ভয়ে নিবারণবাবুর শরীর প্রথমে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু এখন তার ভয়ে আবার কলকল করে ঘাম হতে লাগল। বুকের ভিতরটা এমন ধড়ফড় করছে যে, হার্টফেল হওয়ার জোগাড়।

ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, আমাকে ছেড়ে দাও বাবা, এসব আমার ভাল লাগছে না।

নিবারণ শুয়ে পড়ে জোর করে চোখ বন্ধ করে রইলেন।

হনুমান বলল, নিবারণবাবু, প্রভুর হুকুম তামিল না করে আমার উপায় নেই। আপনি সহজে না গেলে জোর করে নিয়ে যেতে হবে।

এই বলে হনুমান চুপ মারল। নিবারণবাবু চোখ মিটমিট করে দেখতে পেলেন, হনুমান দু'হাতে গ্রিল ধরে টানাটানি করছে। শক্ত লোহার গ্রিল, ভাঙতে পারবে বলে মনে হলো না নিবারণবাবুর।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হনুমান মাত্র একটা হ্যাঁচকা টানেই পুরো গ্রিলটা জানলার ফ্রেম থেকে উপড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলল।

নিবারণবাবু এত ভয় পেয়েছেন যে, আরও বেশি ভয় পাওয়া তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। মজা হলো ভয় যখন সাংঘাতিক বেশি হয় তখন মানুষের একটা মরিয়া সাহসও আসে। চোর তাড়ানোর জন্য খাটের মাথার কাছে একখানা মোটা বেতের লাঠি রাখা থাকে। আজ অবধি সেটা কোনও কাজে লাগেনি। আজ লাগল। নিবারণবাবু ভাবলেন, এমনিতেও গেছি, অমনিতেও গেছি, সুতরাং আর ভয়ের কী? যা থাকে কপালে–

ভেবে লাফিয়ে উঠে তিনি লাঠিটা নিয়ে প্রবল বিক্রমে হনুমানের মাথায় বসিয়ে দিলেন। কিন্তু বসালেও লাঠিটা ঠিকমতো বসল না।

হনুমান খুব আলগা হাতে লাঠিটা কেড়ে নিল হাত থেকে, তারপর সেটাকে পাকাটির মতো ভেঙে ফেলে বলল, কেন ঝামেলা করছেন? প্রভু রামচন্দ্র ডাকছেন, এ আপনার মহা সৌভাগ্য।

নিবারণবাবু যাকে বলে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। হনুমানটা লম্বায় প্রায় তার সমান। আর চওড়ায় কুস্তিগীরদের মতো। এত বড় হনুমান তিনি এর আগে আর দেখেননি। বিপদে পড়ে মাথাটা একটু গণ্ডগোল হয়ে গিয়েছিল বলে তিনি হনুমানের কথাগুলো শুনেও বুঝবার চেষ্টা করেননি। এবার তার হঠাৎ মনে হলো, এ কি সেই রামচন্দ্রের হনুমান নাকি? হনুমান তো অমর, তার এখনও পৃথিবীতে বেঁচেবর্তে থাকবার কথা। আর প্রভু রামচন্দ্র তিনি তো স্বয়ং ভগবান। তাহলে এসব হচ্ছেটা কী? রামচন্দ্র তার ভক্ত হনুমানকে পাঠিয়েছেন তাকে ডাকবার জন্য? কিন্তু কেন? তিনি তো তেমন উঁচুদরের ভক্ত বা ধার্মিক নন!

হনুমান জলদগম্ভীর গলায় বলল, আমার লেজটা ধরুন।

ভয়ে ভয়ে নিবারণবাবু বিনা বাক্যব্যয়ে লেজটা ধরলেন আর ধরতেই যেন চৌম্বক আকর্ষণে হাতদুটো লেজের সঙ্গে আটকে গেল। আর দাঁড়ানোর উপায় রইল না।

তারপর যে কী হলো তা নিবারণবাবু ঠিকঠাক বুঝতে পারলেন না। হনুমান তাকে জানালা গলিয়ে বাইরে এনে ফেলল এবং তারপর ইনজিনের মতো ছুটতে শুরু করল। এত ছুট জীবনে কখনও ছোটেননি নিবারণবাবু। তবে কেন যেন তার হাঁফ ধরছিল না। চোখের পলকে নিজেদের তল্লাট এবং শহর ছাড়িয়ে খোলা মাঠঘাটে এসে গেলেন তারা। হনুমান মস্ত মস্ত লাফ মেরে ঢেউয়ের মতো চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে নিবারণবাবুও ঢেউ হয়ে বয়ে যাচ্ছেন। প্রায় দশ বারো হাত দূরে দূরে এক একবার পা মাটিতে ঠেকছে।

অনেকটা চলে আসার পর একটা জঙ্গলে ঢুকে গেলেন তারা। তারপর একটা ফাঁকা চত্বর। জঙ্গলঘেরা জায়গাটায় একটা লোক পিছনে হাত রেখে মৃদুমন্দ পায়চারি করছে। লোকটা বেঁটে এবং দেখতে একটু কিম্ভূত। পরনে একটা পাশবালিশের ওয়াড়ের মতো পোশাক, মাথায় একটা সরু টুপি। লোকটার গোল মুখখানায় চোখ নাক কান কোনওটাই ঠিক জায়গায় নেই বলে মনে হলো দূর থেকে।

কাছে গিয়ে হনুমান লোকটাকে প্রণাম করে বলল, প্রভু এনেছি।

লোকটা নিবারণের দিকে ফিরে তাকাল, মুখটা ভাল করে দেখে আঁতকে উঠলেন নিবারণবাবু। এর চোখদুটো দুই গালে। ঠোঁটদুটো নাকের ওপরে। আর গলা বলে কিছু নেই। কানদুটো গরুর কানের মতো।

এই কি রামচন্দ্র? এত বিচ্ছিরি দেখতে?

রামচন্দ্র লোকটা ডান গালের চোখটা দিয়ে নিবারণবাবুকে দেখে নিয়ে ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন, পেন্নাম করলে না?

যে আজ্ঞে। বলে নিবারণবাবু তাড়াতাড়ি মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে ভয়ে ভয়ে প্রণাম করলেন।

রামচন্দ্র খকখক শব্দ করে হেসে বললেন, শোনো হে বাপু, আমি সত্যিই কিন্তু তোমাদের সেই রামায়ণের রামচন্দ্র নই। তার গল্পটা বেশ লাগে, তাই ভাবলুম রামচন্দ্র নামটা নিলে মন্দ হয় না।

আপনি আসলে কে তাহলে?

লোকটা মাথাটা একটু নেড়ে বলে, সে বাপু অনেক কথা। তবে সোজা কথায় আমি এ তল্লাটের লোক নই, এই দেশের নই, এমনকি এই হতচ্ছাড়া নোংরা গ্রহেরও নই। অনেক দূরের পাল্লা রে বাপু। আর আমার এই হনুমানটিও আসল হনুমান নয়। কলের হনুমান। তবে কল হলেও বড় খুঁতখুঁতে, সবাইকে পছন্দ করে না। দুনিয়া ঘুরে ঘুরে মাত্র একটা লোককেই ও বেছে বের করেছে। সে হলো তুমি।

নিবারণবাবু ঘন ঘন চোখ কচলাচ্ছিলেন। প্রত্যয় হচ্ছে না। যা শুনছেন সব সত্যি নাকি? এসব তো কল্পবিজ্ঞানে থাকে।

রামচন্দ্র বলল, তোমাদের গ্রহটা নোংরা হলেও মহাকাশে আমার কাজের পক্ষে সুবিধেজনক।

আমার হনুমানকে তাই তোমাদের গ্রহে পাকাপাকি ভাবে রেখে যেতে চাই। সমস্যা হলো, ওকে ঠিকমতো দেখাশুনা করার লোক চাই! ও তোমাকে খুঁজে বের করেছে, কাজেই ওর ভার তোমাকেই নিতে হবে।

নিবারণবাবু ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, যে আজ্ঞে, তবে কেমন যত্নআত্তি করতে হবে?

খুব সোজা, ওর মাথায় একটা ছোট্ট ফুটো আছে, চাদির একেবারে মাঝখানে। এই তেলের কৌটোটা নাও, মাসে একবার ওই ফুটোর মধ্যে দু’ফোঁটা তেল ঢেলে

দিলেই হবে। আর তোমার বাড়ির জাম গাছটাতেই ও থাকবে। ওকে যেন কেউ বিরক্ত না করে দেখো। বেশি বিরক্ত করলে কিন্তু ও গা থেকে এমন রশ্মি বের করতে পারে যা তোমাদের পক্ষে বিপজ্জনক।

নিবারণবাবু শিউরে উঠে বললেন, যে আজ্ঞে।

আর তুমি ইচ্ছে করলে ওকে ফাঁইফরমাস করতে পারো, ওর সঙ্গে হিল্লি-দিল্লি বেড়িয়ে আসতে পারো।

নিবারণবাবু স্বস্তির শ্বাস ফেলে বললেন, যে আজ্ঞে।

তাহলে এসো গিয়ে। কোনওরকম গোলমাল কোরো না কিন্তু।

আজ্ঞে না।

লোকটা অর্থাৎ রামচন্দ্র গটগট করে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে একটা শিস দিল। অমনি মাটির তলা থেকে একটা কিম্ভূত পটলাকৃতি মহাকাশযান বেরিয়ে এল। লোকটা দরজা খুলে ভিতরে ঢুকতেই জিনিসটা সাঁ করে আকাশে উঠে মিলিয়ে গেল।

নিবারণবাবু এখন বেশ আছেন। হনুমানটা জাম গাছেই থাকে। তবে তাকে আর ভয় পাওয়ার কারণ নেই। বরং মাঝরাতে হনুমানটা এসে তার সঙ্গে দিব্যি আড্ডা দিয়ে যায়। ঘরের কাজকর্মও অনেক করে দেয়। গিন্নি তো পছন্দ করেনেই, বিশু আর কানুরও সে বেশ বন্ধু হয়ে গেছে।

হনুমানকে তেল দিতে নিবারণবাবুর একবারও ভুল হয় না।